ISSN: 2348-487X

এবং প্রান্তিক

An International Research Refereed Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Issue 4th Vol. 12th June & September, 2017
UGC Approved Journal No. 45563

সম্পাদক
আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

An International Research Refereed Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Issue 4th Vol. 12th June & September, 2017
UGC Approved Journal No. 45563

সম্পাদক
আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik
An International Research Refereed Journal

Issue : 4th Vol. 12th June & September, 2017

ISSN : 2348-487X

প্রকাশ : ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

প্রকাশক : এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস : চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
কথা - ৯৩৩২৩৫৮৬৪৪, ৯৮০৪৯২৩১৮২
ব্রাঞ্চ অফিস : ভগবানপুর, বি.এইচ.ইউ, বারাণসী - ২২১ ০০৫
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
Website : www.ebongprantik.in

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম,
ধ্যানবিন্দু, তিলোত্তমা বুক স্টল, দিয়া

মুদ্রণ : অনন্যা
বুড়ো বটতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
যোগাযোগ - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

বিনিময় মূল্য : ২৫০ টাকা

* লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

Ebong Prantik

An International Research Refereed Journal

Editorial Board

Executive Editor- Prof. Bratati Chakravarty

Associate Editor - Pronab Naskar

Editor- Dr. Ashis Roy

Co-Editor- Tumpa Bapari, Tapas Kr. Sardar, Sujay Sarkar

Advisory Board- Ranjushree Patra, Bibhabasu Dutta, Tarun Kr. Mandal, Akash Biswas, Asish Kr. Sau, Mrinmoy Paramanik, Md. Intaj Ali, Mohan Kr. Mayra

Expert Members-

Dr. Alokranjan Dasgupta (Hedelberg University)
Dr. Achinta Chatterjee (California University)
Dr. Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals,Boston)
Dr. Manas Majumdar (Calcutta University)
Dr. Samar Ghosh (Principal Scientist, FIE, ICAR/Govt.of India)
Dr. Subalkumar Maity (Ex-Scientist, Min. of Ayush)
Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)
Dr. Sanatkumar Naskar (Calcutta University)
Dr. Malbika Ranjan (Benaras Hindu University)
Dr. Geetika Ranjan (North-Eastern Hill University)
Dr. Soumitra Basu (Rabindrabharati University)
Dr. Himabanta Bandyopadyay (Rabindrabharati University)
Dr. Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)
Dr. Sucharita Bandyopadhyay (Calcutta University)
Dr. Bikash Roy (Gour Banga University)
Dr. Srabani Pal (Rabindrabharati University)
Dr. Monalisa Das (Kazi Nazrul University)
Dr. Mohinimohan Sardar (West Bengal State University)
Dr. Sk. Rafikul Hossain (Calcutta University)
Dr. Sandipkumar Mandal (Presidency University)
Dr. Uttamkumar Biswas (Presidency University)
Dr. Tania Hossain (Waseda University)
Dr. Soumitra Shekhar (Dhaka University)
Dr. Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)
Dr. Samaresh Debnath (Dhaka University)
Dr. Bhuina Iqbal (Chattagram University)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৭

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় : বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সৃষ্টি
ব্রততী চক্রবর্তী ৯

যুক্তি তর্কের বৃত্তান্ত ও লালন
মোনালিসা দাস ও অরিজিৎ ভট্টাচার্য ২০

কদমতলায় কে?
সৌরভ মিত্র ২৬

সাহিত্যে সমাজবাস্তবতা
সেলিম বক্স মণ্ডল ৪৬

নারীবাদী ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতা :
প্রেক্ষিত অবিভক্ত বাংলার তেভাগা আন্দোলন
এস. এম. সারওয়ার মোর্শেদ ৬৫

নবীন প্রাণের জাগরণ : বীরবলের সবুজপত্র
নন্দকুমার বেরা ৬৯

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মে জাহ্নবাদেবীর ভূমিকা
বিজলী দে ৭২

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বদেশ-সাধনা
পদ্মনাভ বেরা ৭৭

বহুমুখী প্রতিভার আলোকে সরলাদেবী চৌধুরাণী
শুভশ্রী পাত্র ৮১

সত্তর দশকের বুদ্ধিজীবী : উপন্যাসে, জীবনে
যশোদা বেরা ৮৮

অনুরূপা দেবী
সোমা দত্ত ৯৬

জাদুবাস্তবতা এবং অস্তিত্বের সংকট : সন্ধানী আলোয়
শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'
তিলক মণ্ডল ১০১

ঈশ্বরদর্শন, মায়া, তন্ত্র ও 'অন্তর্জলী যাত্রা'
হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ১১৮

'শেষের কবিতা'র শেষ অধ্যায় : রচনার নেপথ্যে
শ্রাবণী পাল ১৩৫

বুদ্ধদেব বসুর স্বতন্ত্র ভাবনা : 'প্রথম পার্থ' নাটকে কর্ণ ও কুন্তী
অনিরুদ্ধ নায়ক ১৪৪

লোকায়ত বিশ্বাসে ধর্ম ঠাকুর
সৌভিক পাঁজা ১৫৪

ওসমান : মননের ঔপনিবেশিকতা মুক্তির সেপাই
সৌমী বসু ১৫৯

ভ্রান্ত রাজনীতির প্রেক্ষিতে সুনীলের গল্প
শ্যামাশ্রী মণ্ডল ১৬৬

বিপণনের বর্ণমালা : একুশের ছোটোগল্প
কৌশিক মণ্ডল ১৭১
পদ্মানদীর মাঝি : লোক উপাদানের বহুমাত্রিক প্রয়োগ
অর্পিতা মণ্ডল ১৭৮
বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও বৈচিত্র্যে বরাক উপত্যকার গল্প
সুদীপ সরকার ১৮৬
মহাশ্বেতাদেবীর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে আদিবাসীদের বিশ্বাস ও সংস্কার
অরুণাভ মুখার্জ্জী ১৯৩
মঙ্গলকাব্যে চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ
অনিমেষ নস্কর ২০২
"বঙ্গবানী" : প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক প্রবন্ধ চর্চায় দীনেশচন্দ্র
বিভাষ নায়েক ২১১
অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বর্গী হাঙ্গামার চিত্রায়ণ
সুস্মিতা ঘোষ ২২৬
আমার অনুভবে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'নীলঘূর্ণি'র দয়িতা
সুতপা মুখার্জী ২৩৭
দেশভাগ : নারী বঞ্চনার চিত্র - একটি অনুসন্ধান
সমরেশ মণ্ডল ২৪৩
বৈষ্ণব সংস্কৃতি চর্চায় শ্রীপাট শ্রীখণ্ড
মিতালী বিশ্বাস ২৪৮
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চর্যাপদ চর্চা : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ
শুভাশিষ গায়েন ২৫৮
শিশু মনস্তত্ত্বের আলোকে 'পথের পাঁচালী'
শিখা হালদার ২৭০
ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক ঃ ছোটো গল্পের হিরন্ময় উদ্ভাস
সুরজিৎ সুলেখাপুত্র ২৭৫
বিংশ শতাব্দীর বাংলা ও প্রবাসী পত্রিকা
নিতাই গায়েন ২৯৫
Girls Working in Households : Some Reflections on Girl Child Domestic Labour
Geetika Ranjan ৩০৭
Origin And Development of Tabla Baz and Gharana of North-indian Music [From 18th To 20th Century A.d]
Partha Dey ৩১৮
Psychotherapeutic Impact of Rabindrasangeet On Bengali Culture for stress Management
Siddhartha Sankar Deb ৩২৬
Labour Politics
Kashi Nath Mahaldar ৩৩৬
Kajoli in 'So Many Hungers' By Bhabani Bhattacharya
Amit Kumar De ৩৪৭

সম্পাদকীয়

‘সংখ্যা এবং সংখ্যা’ যোগ করলেই বা আর বিয়োগ করলেই বা... তার এক এবং অদ্বিতীয় পরিচয় সেই সংখ্যা’ই। অর্থাৎ দুই -তিন-চার.... ‘অঙ্ক’ যাইহোক না কেন সংখ্যা থাকে নিজের মতন নিজের ঘরে। ‘ছয়-নয়’ অথবা ‘নয়-ছয়’ একে অন্যের সাথে থাকতে থাকতে বেশ মানিয়ে নিয়েছে অভ্যস্ত জীবন যাপনের সঙ্গে। ‘ছয়-নয়’ হলেই আদর-খুনসুটি-গালাগালি-মাখামাখি... আর ‘নয়-ছয়’ হলেই যেন ভাঁটার টান গৃহী জীবনের সংখ্যা নদীতে। তবুও তাদের কাছাকাছি-পাশাপাশি থাকাটাই যেন ভবিতব্য। মেনে নেওয়া মানিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, ‘নয়-ছয়’ করেও এগোতে হয়। হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে করতে বয়সের চৌকাঠে এসে যখন দাঁড়াই আমরা, ফিরে দেখি কী মজবুত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে সম্পর্কগুলো। বয়সের ইঞ্চি মাপে, সংখ্যার গাণিতিক প্রকাশ ভঙ্গীতে এখন তারা ‘নয়ে নয়ে’ নিরানব্বই।

প্রবাদের আলপথ ধরে এগোতে গিয়ে আচমকা পা রেখেছি সংখ্যার জমিতে। অগুনিত ফসলের সোনালী আলোয়াণ জমিজুড়ে; ‘দশে মিলি করি কাজ’ নয়তো ‘দশের লাঠি একের বোঝা’ অথবা ‘দশ চক্রে ভগবান ভূত’ এমনতর কতশত সোনালী উপাদান। এসবই জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এসব কিছু নিয়েই আমাদের অধিক পথচলা। হিসাব মেলা না মেলা যেখানে হিসাবের বাইরেই থেকে যায়। তবুও থেমে থাকে না গাণিতিক প্রথা মেনে আঙ্কিক সমাধান খোঁড়ার কাজ। হাজারও তথ্য-সূত্র উদাহরণ পাথেয় হয়ে ওঠে সংখ্যা সৌধ নির্মাণ যজ্ঞে। তখন সংখ্যা আর নেহাৎই সংখ্যা থাকে না। সংখ্যা হয়ে ওঠে আমাদের দৈনন্দীন, সংখ্যা হয়ে ওঠে আমাদের সাফল্যের সোপান, সংখ্যা হয়ে ওঠে ভাবীকালের পথে পা বাড়ানোর চরৈবেতি মন্ত্র।

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় : বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সৃষ্টি

ব্রততী চক্রবর্তী*

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ও বিশিষ্ট লেখক। এক সময় তাঁর গ্রন্থরাজি প্রায় দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। প্রমথনাথ বিশী মহাশয় তাঁর সাহিত্যকর্মের বিদগ্ধ মূল্যায়ন ও সম্পাদনা করে (১৯৬৭) ত্রৈলোক্য-সাহিত্যের সংকলন প্রকাশ ও অনুশীলনের পথটি প্রশস্ত করে দেন। ত্রৈলোক্যনাথকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 'বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিক বা Satirist' বলেছেন। কারণ তাঁর মতে ''ব্যঙ্গশিল্পীর সম্পূর্ণ বক্র দৃষ্টি লইয়াই ত্রৈলোক্যনাথ জন্মিয়াছিলেন, এই দৃষ্টির সম্পূর্ণতার অধিকারী বাংলা সাহিত্যে তিনি একাই। অপর যাঁহারা ব্যঙ্গ রচনা করিয়াছেন, ব্যঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই tour de force, স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার নহে।"

ত্রৈলোক্য-সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গের আবরণের অন্তরালে প্রবাহিত হয়ে চলেছে অসহায়, নিপীড়িত, দরিদ্র, নিরন্ন দেশ-বাসীর প্রতি গভীর মমতা, প্রীতি, সহমর্মিতার ফল্গুধারা; নিরন্তর কল্যাণ প্রচেষ্টা! তাঁর সাহিত্যে অনুভূত সেই বিশিষ্ট জীবনবোধ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি। কর্মজীবনে (১৮৬৮-১৮৯৬) ওড়িয়া ভাষায় পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন তিনি, ইংরেজি ভাষায় শিল্পসংক্রান্ত সাতটি মূল্যবান গ্রন্থ বা পুস্তিকা এবং একটি ভ্রমণকাহিনী লেখেন। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে (১৮৯২), 'কঙ্কাবতী' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ডমরুচরিত (১৯২৩)। দুটি বই-ই বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয়।

ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম হয়েছিল ৬ শ্রাবণ ১২৬৪ সালে (১৮৪৭) কলকাতার কাছেই ২৪ পরগনার রাহুতে গ্রামে একটি অসচ্ছল কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে। রাহুতা গ্রাম কবিগানের প্রাচীন পীঠস্থান। ত্রৈলোক্যনাথের পরিবারেও কাব্যচর্চার একটি ধারা অব্যাহত ছিল। তাঁর পিতামহ সুকবি ছিলেন। পিতা বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় ও ছিলেন স্বভাবকবি। অগ্রজ রঙ্গলাল ও অনুজ হরিমোহনের সাহিত্যপ্রতিভা ছিল। বিশেষত রঙ্গলাল সুসাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকবি। অগ্রজ রঙ্গলাল ও অনুজ হরিমোহনের সাহিত্যপ্রতিভা মাত্র ন'বছর বয়সে নতুন বর্ণমালা আবিষ্কার করেন ও ছড়া-গান হেঁয়ালি রচনা করেন। এই রচনার প্রেরণামূলে সম্ভবত তাঁর পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক উত্তরাধিকার ছিল। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর নিজস্ব মেধা।

প্রথমে গ্রামের পাঠশালা ও স্কুলে, পরে চুঁচড়ার ডফ সাহেবের স্কুলে তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন (১৮৫৯-১৮৬২)। স্কুলে ডবল প্রেমোশন পেয়ে ৭ম শ্রেণি থেকে

---

* প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

নবম শ্রেণিতে উঠেছিলেন তিনি। মেধাবী হলেও স্কুলের পড়াশোনায় তাঁর ছেদ পড়ে অচিরেই। কৈশোরে পিতামাতার মৃত্যু, প্রবল আর্থিক অনটন, প্লীহা-ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ নিজের ও পরিবারের অন্নচিন্তা ত্রৈলোক্যনাথকে ঘরছাড়া করে। কিন্তু, অনিশ্চয়তায় ভয় পাননি তিনি একাকী পদব্রজে, অজানা বিপদস্কুলে পথে এগিয়ে গেছেন। প্রবল কষ্টসহিষ্ণুতা, অনমনীয় জেদ, জ্ঞানতৃষ্ণতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, স্বাধীন ভাবনাচিন্তা, সৃষ্টিমূলক কাজকর্মের সঙ্গে অসাধারণ হৃদয়বেত্তা, আত্মসম্মানবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তার গুণে গ্রামের সহায়সম্বলহীন একটি বালক ক্রমে শহর কলকাতায় নিজেকে সুপ্রিতিষ্ঠিত করেন এবং একটি স্থায়ী ছাপ রেখে যান।

সতের বছর বয়সে, জানুয়ারি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে, ত্রৈলোক্যনাথ পায়ে হেঁটে, পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে, আসামে কুলি চালানকারীর হাত থেকে অতি-কষ্টে উদ্ধার পেয়ে, এক আত্মীয়ের কাছে মানভূমে পৌঁছোন। সেখানে বিদ্যালয়ের বালকদের দলপতি হয়ে দুঃসাহসিক, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রাঁচি পৌঁছোন। বিদ্যালয়ের পড়াশোনায় ইতি হলেও এক মৌলবীর কাছে পার্শি শিক্ষা করেন তিনি বর্ধমানে।

জীবিকার সন্ধানে পায়ে হেঁটে একস্থান থেকে অন্য স্থানে গেছেন তিনি। ইছাপুরে, যশোহরে সামান্য কাজ করেছেন। এক আত্মীয়ের চেষ্টায় বীরভূমের দ্বারকায়, সেখান থেকে রানিগঞ্জের উখড়ায় ১৮ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করেন (১৮৬৬-৬৭)। এ সময় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ করে ভারত থেকে দুর্ভিক্ষ দূরীকরণ, দেশের দরিদ্র, নিরন্ন, নিপীড়িত মানুষের স্থায়ী কল্যাণসাধন তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে পড়ে। নিজের সামান্য আর্থিক নিয়েই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের তিনি সাহায্য করেন। তাঁর এই আন্তরিকতা এবং প্রচেষ্টা আজীবন বজায় ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে পঁচিশ টাকা বেতনে ত্রৈলোক্যনাথ এরপর পাবনা জেলার সাজাতপুরে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। সেখানে বর্ষাকালে জলমগ্ন এক স্থানে পরিত্যক্তা তিন অসহায়া বৃদ্ধাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়ে নায়েবের বিরাগভাজন হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে চলৎশক্তিহীনা সেই বৃদ্ধারা নিখোঁজ হলে ত্রৈলোক্যনাথ মানুষের নিষ্ঠুরতায় গভীর মর্মাহত হন। অল্পদিন পর, পুজোর ছুটির শেষে সাজাতপুরে ফেরার পথে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনোমতে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতার চিত্র এঁকেছেন তিনি 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্প। তাঁর বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা 'কঙ্কাবতী'র খেতু চরিত্রে ছায়া ফেলেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের সাজাতপুরে ফেরা হয়নি আর। অসুস্থ শরীরে এক আত্মীয়ের সাহায্যে গৃহে ফিরে, পুনরায় জীবিকার সন্ধানে আর এক আত্মীয়ের কাছে কটকে যান তিনি পায়ে হেঁটে, মহানন্দা সাঁতরে পার হয়ে। এবার তিনি পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টর, পরে বিভিন্ন থানার দারোগাও হয়েছেন (১৮৬৮-৭০) কটকে তিনি মাত্র ১৫ দিন ওড়িয়া ভাষা শিখে

নেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র উৎকল পত্রিকা বা উৎকল শুভকারীর সম্পাদনা করেন তিনি। এ সময় উড়িষ্যায় বাংলা ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করেন তিনি জাতীয় সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ কাজে তিনি সফল হননি।

কটকে স্যার উইলিয়াম হান্টারের সঙ্গে পরিচয় নতুন মোড় আনে তাঁর জীবনে। কলকাতায় হান্টারের অফিসে একশো পঁচিশ টাকা বেতনে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ত্রৈকোল্যনাথ যোগ দেন। এখানে বেঙ্গল গেজেটিয়ার্স সংকলনের কাজ করেন ১৮৭৫ পর্যন্ত। হান্টার বিলেত গেলে ত্রৈলোক্যনাথকেও আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু পারিবারিক প্রতিকূলতায় তাঁর যাওয়া হয়নি।

এরপর ত্রৈলোক্যনাথ নতুন চাকরি নিলেন এডওয়ার্ড বক্ সাহেবের অধীনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কৃষিবাণিজ্য অফিসে। এবার তাঁর কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হল। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে ক্রমেই বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন তিনি। দুস্থ অবহেলিত শিল্পীদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন, তাদের পুনর্বাসনের প্রয়াস করলেন তিনি শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। ১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বিভাগে ত্রৈলোক্যনাথ যোগ দেন। এ সময় ভারতীয় শিল্পদ্রব্যকে বিশ্বে পরিচিতি দিতে সার্থক প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। শিল্প-সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তিনি এ সময় লেখেন, যেমন A Rough List Indian Manufactures : A Handbook of Indian Products (Art Manufactures and Raw Materials); A Descriptive Catalogue of Indian Products : Contributed to the Amsterdam Exhibition 1883; A List of Indian Economic Products ইত্যাদি।

আমস্টারডামের শিল্প প্রদর্শনীতে ভারত সরকারের পক্ষে ত্রৈলোক্যনাথকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এবারও তিনি পারিবারিক বাধায় যেতে পারেন নি। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় তিনি যোগ দেন ভারত সরকারের পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক ও বিচারকরূপে। ততদিনে শিল্প-বিশেষজ্ঞরূপে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন তিনি।

ইতিমধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ অগ্রজ রঙ্গলালের সহযোগিতায় গ্রামে একটি ছাপাখানা খুলে অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। এখান থেকেই বিখ্যাত ‘বিশ্বকোষ’ গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এঁদের যৌথ সম্পাদনায় বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্প-বিভাগের ভারতপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়করূপে ত্রৈলোক্যনাথ প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন। দশ মাস ইওরোপের বিভিন্ন শহরগুলি পরিদর্শন করেন তিনি। কিছুদিন পর তিন সপ্তাহের জন্য

সরকারি কাজে পুনরায় বিদেশ যান। Visit to Europe গ্রন্থে তাঁর ভ্রমণ-কাহিনি লেখেন। ত্রৈলোক্যনাথের বিলাত-যাত্রায় বিরক্ত রঙ্গলাল ছাপাখানা ও বিশ্বকোষের স্বত্ব নগেন্দ্রনাথ বসুকে হস্তান্তরণ করেছিলেন। এদিকে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে ত্রৈলোক্যনাথকেও প্রায়শ্চিত্ত করে নতুন যজ্ঞোপবীত ধারণ করতে হয়েছিল।

সমাজের এ জাতীয় কূপমণ্ডুকতা ত্রৈলোক্যনাথের মনে গভীর ক্ষোভ-যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর ব্যাঙ্গালোরের মেয়ো হলে Change and Progress বিষয়ে তাঁর ভাষণে। অলিখিত, সুদীর্ঘ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই ভাষাণটি তিনি এক হাজার শিক্ষিত শ্রোতার সামনে দিয়েছিলেন। এই ভাষণে তিনি পরিবর্তন ও সংস্কারমুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন, সকলের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন আর তিরস্কার করেছেন বর্ণবৈষম্য, অস্পৃশ্যতা ও কুসংস্কারতা ও কাপুরুষতাকে; আহ্বান জানিয়েছেন সর্ব মানুষের মিলনকে। ত্রৈলোক্যনাথের বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এই মূল্যবান ভাষণটির জন্ম হয়েছিল। প্রথমে Daily Post পত্রিকায়, পরে পুস্তিকাকারে ভাষণটি প্রকাশিত হয়।

এখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ত্রৈলোক্যনাথের ভাষণটি প্রকাশ করেছিলেন ব্যাঙ্গালোরের ভি. এম. সদাশিব মুদলিয়ার। তিনি স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ছিলেন। এর আগে কটকে, ত্রৈলোক্যনাথ সম্পাদিত উৎকল শুভকারী পত্রিকাটিও ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপাত্র। সম্ভবত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তিনি নিজের স্বাধীন বক্তব্য প্রকাশ করার একটি মঞ্চও পেয়েছিলেন এখানে।

পয়লা এপ্রিল, ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতা মিউজিয়ামে সহকারি। কিউরেটর পদে ত্রৈলোক্যনাথ যোগ দেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ৬০ বছর বয়সে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন। এর মধ্যবর্তীকালে দুখানি মনোগ্রাফ রচনা করেন তিনি Brass and Copper Manufactures of Bengal এবং Pottery and Glassware of Bengal নামে। তাঁর শিল্পসংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Art Manufactures of India এই সময় রচিত হয়েছিল। ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসের এই অমূল্য গ্রন্থটিই তাঁকে চিরস্মরণীয় রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল; কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ থামার মানুষ ছিলেন না; অবসর গ্রহণের পর তাঁর অক্ষুণ্ণ কর্মক্ষমতা আশ্রয় করল বাংলা সাহিত্য জগৎকে এবং সেখানেও তিনি অমরতা লাভ করলেন। উদ্দাম কল্পনা, অসম্ভব ঘটনা-বিন্যাস, প্রখর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অফুরন্ত হাস্যরস সৃষ্টি করে তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। আর এ ক্ষেত্রেও তিনি পরিচিত হলেন মানবকল্যাণ কর্মী রূপে।

বিজ্ঞান-মনস্ক ত্রৈলোক্যনাথ অবসর গ্রহণের পর পুরীতে জমি কিনে সাবান তৈরির উপযোগী একটি তেলের জন্য চাষের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু স্থান নির্বাচনের ভুলের জন্য সে কাজে তিনি সফল হননি। পুরীর দরিদ্র দুঃখী মানুষদের বস্ত্রের অভাব দেখে, তিনি

কলকাতার আত্মীয় স্বজনের থেকে পুরনো জামাকাপড় সংগ্রহ করেছেন এবং নিজেই বহন করে এনে বিতরণ করেছেন পুরীতে। কলকাতার বাড়ি ভাড়া দুঃস্থ আত্মীয়দের দিতেন তিনি।

প্রথাগত শিক্ষালাভ বিশেষ না করলেও ত্রৈলোক্যনাথ যথেষ্ট পড়াশোনা করতেন। সঙ্গে সব সময় প্রচুর বইপত্র রাখতেন। বিভিন্ন দেশীবিদেশী পত্র পত্রিকা, জ্ঞান বিজ্ঞানের বই, বিখ্যাত সাহিত্য গ্রন্থাদি তিনি নিয়মিত পড়তেন। প্রয়োজনে উপাদান গ্রহণ করতেন নিজের রচনার জন্যেও। তাঁর প্রথম বই 'কঙ্কাবতী' প্রকাশিত হবার আগে 'জন্মভূমি' পত্রিকায় তাঁর লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক। কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরেই তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য গ্রন্থগুলি রচিত হয়।

পুরীতে ৩ নভেম্বর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে (১৭ কার্তিক, ১৩২৬) ৭৩ বছর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যু হয়।

সাহিত্যকর্ম ঃ

ত্রৈলোকনাথের সাহিত্য গ্রন্থগুলি সংখ্যায় আটটি — কঙ্কাবতী (১৪ নভেম্বর, ১৮৯২), ভূত ও মানুষ (জানুয়ারি, ১৮৯৮), ফোকলা দিগম্বর (৪ মার্চ, ১৯০১), মুক্তামালা (৭ জানুয়ারি, ১৯০২), ময়না কোথায় (১৬ অক্টোবর, ১৯০৪) মজার গল্প (১৩ এপ্রিল, ১৯০৬) পাপের পরিণাম (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) ও ডমরুচরিত (১০ অগাস্ট, ১৯২৩)। জন্মভূমি, বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথের অবশিষ্ট কিছু রচনা পরে পুনরুদ্ধার করে গ্রন্থাবলীতে সংকলিত করা হয়েছে। যেমন, সেকালের কথা, রূপসী হিরন্ময়ী, আমার সেই অমূল্য মণি ইত্যাদি এবং বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাবলী। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আরও কিছু ব্যঙ্গধর্মী রচনা গ্রন্থাগারে আজও প্রকাশিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, কারণ সেগুলির পুনরুদ্ধার করা আজ প্রায় দুঃসাধ্য। বিজ্ঞানশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, বিজ্ঞান বোধ (১৮৯৬) নামে কয়েকটি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও তিনি প্রকাশ করেন।

ত্রৈলোক্যনাথের ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা, মজার গল্প, ডমরুচরিত গ্রন্থ চারটি গল্প সংকলন। ভূত ও মানুষ-এ চারটি পৃথক বড় গল্প সংকলিত হয়েছে — বাঙ্গাল নিধিরাম, বীরবালা, লুল্লু ও নয়নচাঁদের ব্যবসা। তাঁর আখ্যানধর্মী গল্পগ্রন্থগুলিতে মূল কাহিনীর সূত্রে আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। গল্প বলার এই রীতিটি তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও অনেক সময় প্রযোজ্য। কঙ্কাবতী, ময়না কোথায়, পাপের পরিণাম, সেকালের কথা ও ফোকলা দিগম্বর ত্রৈলোক্যনাথের পাঁচটি উপন্যাস। তবে শেষের দুটি রচনাকে উপন্যাসোপম বড়গল্পের শ্রেণিতেও রাখা চলে।

বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট হাস্যরসস্রষ্ঠারূপে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব ঘটে। এই বিশিষ্ট হাস্যরসসৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং তাঁর স্বতন্ত্র মানসিকতা। জীবনের রূঢ়, কঠোর, অশোভন বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর ছিল আজন্মের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের কৌতুকপ্রিয় বিশিষ্ট মানসিকতার গুণে চিত্ততল বিষতিক্ত'

হয়ে থাকেনি তাঁর, তিক্ততা ও গ্লানির কালিমা সহাস্যে দূর করতে চেয়েছিলেন তিনি অপরিসীম প্রীতি, কারুণ্য, মমতার স্পর্শ সহযোগে।

ত্রৈলোক্যনাথ সচেতনভাবেই তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অন্যায়-অত্যাচার, ভণ্ডামি কাপুরুষতা, নিষ্ঠুরতা-নৃশংসতা, কূপমণ্ডুকতা-কুসংস্কারাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক আর সেই উদ্দেশ্যের মূলে ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন। যে কোনও ব্যঙ্গ সাহিত্যই উদ্দেশ্যমূলক রচনা। মানুষের যত প্রকারের দোষ-ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসংগতি, ব্যঙ্গ লেখকরা তার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন এবং তার সংশোধন করতে চান। তাই সেখানে প্রচারধর্মিতাও এসে পড়ে। ত্রৈলোক্যনাথেও রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে সেই প্রচারধর্মিতা এসেছে। তাঁর সাহিত্যে মানুষের বাসোপযোগী সুস্থ-স্বাভাবিক সমাজ-নির্মাণের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। ময়না কোথায়, পাপের পরিণাম, রূপসী হিরণ্ময়ীতে প্রবল উদ্দেশ্যমূলকতা শিল্পসৃষ্টির ক্ষতি করেছে; আবার কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, মুক্তমালা, ডমরুচরিত-এর প্রচার ব্যাপারটি শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে রচনাগুলিকে বিশিষ্ট শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। উদ্দেশ্যমূলকতা যেখানে প্রবল, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতাও সেখানে প্রখর; যেমন, কঙ্কাবতীর তনুরায় ও ষাঁড়েশ্বর, মুক্তমালার গুরুদেব-চরিত্র তিনটি। অপরপক্ষে নীতিকথা বা শাস্তিদানের ব্যাপারটিকে কিছুটা উপেক্ষা করে ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে হাস্যরসসৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে ব্যঙ্গের প্রকাশ মৃদু ও নিরুত্তাপ। যেমন নয়নচাঁদ ও ডমরুধর চরিত্র দুটি।

প্রথমে প্রকাশিত গ্রন্থ কঙ্কাবতীতে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব ঘটে অসাধারণ ব্যঙ্গনিপুণ শিল্পীরূপে। কঙ্কাবতী উপন্যাসটি একটি প্রাচীন রূপকথার ছায়ানুসারী। তবে প্রচলিত রূপকথাটির অশোভন স্থূল রসিকতাকে সচেতনভাবে পরিহার করে ত্রৈলোক্যনাথ রুচিসম্মত একটি নতুন রূপ দিয়েছেন। এই উপন্যাসের মাধ্যমে পরিশীলিত, শোভন, সুন্দর হাস্যরসের অবতারণা করেন তিনি। কঙ্কাবতীর প্রথমার্ধ ও পরিশেষ অংশে উপন্যাসের আঙ্গিকে ত্রৈলোক্যনাথ সামাজিক কাহিনির বর্ণনা করেছেন, মাঝের উনিশটি পরিচ্ছেদ রূপকথা অনুসারী। এই অংশে তিনি প্রথমার্ধের সামাজিক পরিস্থিতি থেকে উৎপন্ন সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন রূপকথার আশ্রয়ে। এই অংশের জড় ও মনুষ্যেতর প্রাণীরা নানান অসম্ভব ঘটনাবিন্যাসে অদ্ভূত বা উদ্ভট রসের সৃষ্টি করেছে। তাঁর সৃষ্ট পশু-পাখি-চাঁদ-চাঁদের সিপাহি-ভূত প্রভৃতিরা বিশেষ বিশেষ মানুষেরই প্রতিনিধি। কঙ্কাবতীর আপাত অলীক স্বপ্নদর্শনের মধ্যে দিয়ে ঘটনাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং সমাজের অন্যায়কে তীব্র আঘাত করে সমাজচেতনা জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কঙ্কাবতীর পিতা তনুরায়ের অর্থগৃধ্নুতা ও নীচতা অচিন্তানীয়। অর্থের লোভে বাঘকেও জামাত করতে সে অরাজি নয়। একাধারে বস্তুধর্মী ও রূপকথাশ্রয়ী এই রচনাটিতে ত্রৈলোক্যনাথের গভীর চিন্তাশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রৈলোক্যনাথের সামাজিক তিনটি উপন্যাস ফোকলা দিগম্বর, ময়না কোথায় ও পাপের পরিণাম প্রবল উদ্দেশ্যমূলক রচনা। ফোকলা দিগম্বরের কাহিনী ঘটনাবহুল ও কৌতূহলোদ্দীপক। বুদ্ধের বিবাহ দুর্বলতাকে লেখক এখানে ব্যঙ্গ করেছেন। সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম মেয়ে প্রতারকের চিত্র এঁকেছেন লেখক এই উপন্যাসে বিন্দীর 'দিগম্বরী ব্রত' প্রচলন করে রোজগার করার মধ্যে দিয়ে। ময়না কোথায় উপন্যাসে শুচিবায়ুগ্রস্ত শাশুড়ির বধূ-নির্যাতনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত চিত্রিত হয়েছে। পাপের পরিণামে তিনটি বিপথগামী ঘটনার বর্ণনা করে শাস্তি দিয়েছেন লেখক দোষীদের। এই দুটি উপন্যাসে জীবনের নানান তিক্ততার বর্ণনা করে লেখক স্বয়ং বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। রূপসী হিরণ্ময়ী গল্পে এই শাস্তির ব্যাপারটি সর্বাধিক দীর্ঘ ও কঠোর। এ জাতীয় ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও শাস্তিদান শিল্পসৃষ্টির ক্ষতি করেছে।

বাঙালি নারীর উপর সমাজনেতাদের সুদীর্ঘকালের অত্যাচারের একটি মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায় ডমরু চরিতের শেষ গল্পে। একটি নিতান্ত শিশু বিধবা কন্যাকে একাদশীর দিন নিরম্বু-উপবাসে একাকী ঘরে বন্ধ রেখে যেভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং সমাজনেতারা নিজেদের তৈরি সমাজবিধির অনুশাসনে যেভাবে গর্ববোধ করেছে তা লেখকের সঙ্গে সঙ্গে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকদেরও বিচলিত, ক্রোধিত, ব্যথিত করে।

শুধু অসহায় দুর্বল মানবসমাজ নয়, অত্যাচারিত পশুসমাজের প্রতি ও ত্রৈলোক্যনাথের করুণা সহানুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত। মুক্তমালা গ্রন্থের সুবলচন্দ্র গড়গড়ি তার গুরুদেবের মাংসের দোকানে জীবন্ত ছাগলের চামড়া ছাড়াবার একটি অসাধারণ নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছে। পারিপার্শ্বিক সমাজকে ত্রৈলোক্যনাথ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। ব্যঙ্গকৌতুকের আশ্রয়ে সমসাময়িক সমাজের জীবন্ত প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে।

ত্রৈলোক্যসাহিত্যের হাস্যরসে ব্যঙ্গ যেখানে কিছুটা মৃদু ও নিরুত্তাপ, কৌতুকরস সৃষ্টিরই যেখানে প্রাধান্য; সেইখানে তাঁর শিল্পীসত্তার পূর্ণ বিকাশ। নয়নচাঁদের ব্যবসা ও ডমরুচরিত এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যের অনন্য দুটি চরিত্র ডমরুধর ও নয়নচাঁদ। বিশেষত ডমরুধর অবিস্মরণীয়। লেখকের রচনাকৌশলে কাল্পনিক ডমরু জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। মানুষের দোষ, ত্রুটি, লোভ-কামনা-বাসনাদি প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যে ধূর্ত, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর, লোভী ডমরু-চরিত্র নির্মিত হয়েছে। ডমরুধর তার জীবনের নানান কুকীর্তির অপূর্ব কাহিনী দুর্গাপূজার দালানে বসে নজেই বন্ধুদের শুনিয়েছে। প্রধান সাতটি গল্পের সঙ্গে আরও অনেকগুলি শাখা গল্প আছে এতে। কল্পনার উদ্ভটত্বে, কাহিনী-পরিকল্পনার অভিনবত্বে, ভাষার প্রবাহমানতায়, সরস বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের সঙ্গে তীব্র শ্লেষের কষাঘাতে কাহিনিগুলি পরম উপভোগ্য হয়েছে। ডমরুধরের শঠতা, প্রখর সাংসারিক বুদ্ধি, স্বভাব লোলুপতা, অর্থোপাজনের জন্য যে কোনও পন্থা অবলম্বনে সংকোচনহীনতার ও বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার

নানা অদ্ভূত কাহিনী শুনিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ নিজে হেসেছেন, পাঠকদের হাসিয়েছেন। ডমরু নানান দোষে দোষী হলেও ত্রৈলোক্যনাথের হাতে কঠোর শাস্তি পায়নি। তার শাস্তি তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এলোকেশীর হাতের ঝাঁটার বাড়ি।

ডমরুধরের আজগুবি কাহিনিগুলির কল্পনার উদ্দামতা অভাবিত রাজ্যের দ্বার খুলে দেয়, অথচ তার মধ্যে একটি অতি বাস্তবোচিত পারস্পর্য যুক্ত করে কাহিনির পরিণতিকে নিজের সপক্ষে নিয়ে আসার একটি হিসাবী বুদ্ধিও বর্তমান। ডমরুর কাহিনিতে কুমিরের পেটে সাঁওতাল রমণী মূল্যবান গহনা পরে তরিতরকারি বিক্রি করে; ডমরুর কাটা পড়া অর্ধাংশ শরীরের সঙ্গে গরুর শরীরের অপরাংশ যুক্ত হয়ে অপূর্ব জটিলতার সৃষ্টি করে; ছাল ফেলে ভয়ভীত মাংসের বাঘ পলায়ন করলে সূক্ষ্ম শরীর ডমরুর বাঘ-ছালে প্রবেশ ঘটে এবং আরও নানা অকল্পনায় আজগুবি ব্যাপার ঘটতে থাকে। ডমরুর বলা সন্ন্যাসী-সঙ্কটের কাহিনিতে সমস্যা অতি জটিল। সন্ন্যাসীর ক্ষমতাবলে ডমরুধরের শরীরে সন্ন্যাসীর প্রবেশ ঘটেছে এবং নিজের শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ডমরুর সূক্ষ্ম শরীরকে বাধ্য হয়েই সন্ন্যাসীর জরাজীর্ণ শরীরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ডমরুর শরীরে অধিষ্ঠিত সন্ন্যাসী ডমরুর গৃহে অতি বিলাসব্যসনে দিনযাপন করেছে, এমন কি তার তৃতীয়পক্ষের নির্বাচিত কন্যাকে বিবাহ করতে চলেছে নির্ধারিত দিনে। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে সূক্ষ্মশরীরে ডমরুধর কীভাবে সমস্যার সমাধান করে সে কাহিনী অতি মনোরম। সন্ন্যাসীর শরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্ম শরীরের ডমরুধর অত্যন্ত মনোকষ্টে সুন্দরবনের আবাদে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং আকুলভাবে তার আরাধ্যা দেবী জগদম্বাকে স্মরণ করতে থাকে। কাছেই কর্মরত কাঠুরেদের মাঝখানে অকস্মাৎ বিশাল একটি বাঘ এসে পড়ে একটি কাঠুরেকে মেরে পিঠে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। অন্য একটি কাঠুরে গাছের পাশে পড়ে থাকা বাঘের ল্যাজটি কী খেয়ালে গাছের সঙ্গে পাক দিয়ে জোরে টেনে ধরে। ঘটনার আকস্মিকতায় ''বাঘের ভয় রইল।...পলায়ন করিতে বাঘ চেষ্টা করিল।....অসুরের মত বাঘ যেরূপ বল প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইল যে, যাঃ! লেজটি বা ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু দৈবের ঘটনা একবার দেখ! এত টানাটানিতেও বাঘের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া গেল না। তবে এক অসম্ভব ঘটনা ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষ কালে যেমন এক হাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি মাংসের দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম নাই! পাকা আমের নীচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটা সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল।... মাংসের বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল।... বাঘশূন্য ব্যাঘ্রচর্ম সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। আমার কি মতি হইল, গরম গরম সেই বাঘছালের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। ব্যাঘ্রচর্মের ভিতর আমার সূক্ষ্ম শরীর প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ছালটা সজীব হইল। গা ঝাড়া দিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।'' তারপর বরযাত্রের মাঝখানে পড়ে কীভাবে ভীত সন্ন্যাসীর পলায়ন ঘটে এবং

নিজের শরীর ফিরে পেয়ে ডমরু কীভাবে বিবাহ করে ফিরে আসে সে কাহিনীও অতি কৌতুকপ্রদ।

ডমরুধরের বলা এই ছাল ছাড়ানো বাঘের গল্পটির প্রায় অনুরূপ একটি গল্প যোগীন্দ্রনাথ সরকার আরও আগেই শুনিয়েছিলেন 'আষাঢ়ে স্বপ্ন অথবা জানোয়ারের মেলা' (১৯০০) গ্রন্থে। লেখকের স্বপ্নে চতুর্ভূজ নামের উল্লুকটি জানোয়ারের রাজ্যের পরিচয় দিতে দিতে তার নিজের একটি অপূর্ব শিকার কাহিনী বর্ণনা করেছে.....একবার শিকারে বার হয়ে আমি একটি রাঙা হরিণ দেখতে পাই। তার সর্বাঙ্গ ঠিক যেন মখমলে ঢাকা। এমন সুন্দর চামড়াখানির উপর কার না লোভ জন্মে? কি উপায়ে ওটা আস্ত পাওয়া যায় তাই ভাবতে লাগলাম। যদি গুলি করে হরিণটি মারি, তাহলে তো চামড়ার দফারফা।...হরিণ খুব মোটা একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি পকেট থেকে একটা পেরেক বার করে, বন্দুকে পুরে তার লেজে গুলি করলাম। ... পেরেক ঠিক হরিণের লেজ ফুঁড়ে গাছে বিঁধে গেল। অনেক টানাটানিতেও সে পালাতে পারল না। তখন আমি একখানি ধারাল ছুরি দিয়ে তার নাকের মাঝামাঝি খানিকটা চিরে দিলাম; আর এক গাছা বেত নিয়ে খুব জোরে তাকে মারতে লাগলাম। মারের চোটে ছটফট করতে করতে বেচারা হরিণ সেই চেরা নাকের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে পালিয়ে গেল। আস্ত চামড়াখানা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম।" বলা বাহুল্য যোগীন্দ্রনাথের গল্পে একটি ছেলেমানুষী নিষ্ঠুরতা আছে, তুলনায় ত্রৈলোক্যনাথের গল্পটি অনেক বেশি পরিণত।

সুবিনয় রায়চৌধুরীর সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'গপ্পিদাসের গপ্পে' ও এই জাতীয় গল্পের সন্ধান মেলে। ১৩২৯ সালের সন্দেশ পত্রিকায় রাজা গপ্পিদাস (বৈশাখ), গপ্পিদাসের গল্প (জ্যৈষ্ঠ), গপ্পিদাসের খুড়ো (আষাঢ়) এবং গপ্পিদাসের ঘোড়া (আশ্বিন) শিরোনামে আজগুবিপুরের রাজা গপ্পিদাসের জীবনের দশটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। ক্ষুদ্রকায় এই গল্পগুলি পরম উপভোগ্য। একবার নেকড়ের পাল্লায় পড়ে, রাজা গপ্পিদাস তার মুখের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পেটের মাংস টেনে বার করেছিলেন। পায়ের থেকে মোজা বার করার মত নেকড়ের চামড়ার আবরণ থেকে ভিতরের মাংস বেরিয়ে এসেছিল। আর একবার ঠিক যোগীন্দ্রনাথের বর্ণনানুয়ী পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি সোনালি রঙের শেয়ালের নিখুঁত চামড়া নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফেরেন। রাজা গপ্পিদাসের গোড়া যেমন অসাধারণ, তাঁর বলা পাগলা কুকুরের গল্পটিও তেমনি অতুলনীয়।

Rudolph Erich Rapse-এর লেখা The Adventures of Baron Munchhausen গ্রন্থটির দ্বারা সম্ভবত এঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জার্মান লেখকের এই বইটি ১৮৭৬ সনে ইংরেজি ভাষায় লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয়। জনপ্রিয় এই বইটি বহুসাহিত্যিককে প্রেরণা দিয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতীতে এই বইটির প্রচ্ছন্ন প্রভাব থাকতে পারে। কিন্তু নিজস্ব রচনাকৌশল বা অসাধারণ মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির গুণে ত্রৈলোক্যনাথের রচনাগুলি একান্তভাবে তাঁরই নিজের সৃষ্টি।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ভূতপ্রেতের জগতের কৌতুককাহিনিগুলি তাঁর মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তিরই পরিচায়ক। স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে অলীক রাজ্যে ভ্রমণ, চাঁদের শিকড়, বাঘ জামাই, এক টাকার ভূমিকম্প, ব্যাঙ সাহেব, নরমুণ্ড নিয়ে লাওমুখী নারিকেলমুখীর ভাঁটা খেলা, ভূতেদের কোম্পানী খোলা, সাবান মেঘে সভ্য ভব্য নব্য ভূত হওয়া ইত্যাদি নানা উদ্ভট, অভাবনীয় ব্যাপারগুলি ত্রৈলোক্যসাহিত্যের পাঠকদের চমৎকৃত করে। কঙ্কাবতী, লুল্লু, বীরবালা, মুক্তামালা, মজার গল্প প্রমুখ আখ্যানগুলিতে এর সরস দৃষ্টান্ত আছে। যুক্তিবাদী ত্রৈলোক্যনাথ নিজে ভৌতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ভৌতিক রস সৃষ্টি করতেও তিনি চাননি। নানারূপ ভূতের অবতারণা করলেও তিনি লৌকিক রসই পরিবেশন করেছেন, মানবজগতের কথাই বলেছেন। তাঁর ভূত্যরা মানুষের মতই হাসে, কাঁদে, ভয় পায়, ভালবাসে, বিয়ে করে, অসুখ বাধায়, আবার চণ্ডুর নেশাও করে। তাদের স্বভাব ও আচরণে মানবসমাজেরই কৌতুককর বিসদৃশতা বা বিকৃতি উচ্ছ্বাসিত হাসির জন্ম দেয়। তাঁর ভূতেরা প্রধানত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরই প্রতিনিধি। গোঁগো ভূতকে সংবাদপত্রের সম্পাদক করে রুচিহীন, মিথ্যাশ্রয়ী সাংবাদিকতাকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি, ভারতীয় ভূতের কাঁচা ধর্মের প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজে বিলাতযাত্রাজনিত জাতিচ্যুতির ভয়কে উপহাস করেছেন। থিয়েটারী ভূত, ভুততত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও অন্যান্য ভৌতিক প্রসঙ্গগুলিতেও সাধারণত মানুষের অসংগতিকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যঙ্গের ঝাঁঝ ম্লান, কৌতুকই প্রধান।

তবে ভূতের গল্পে ভৌতিক রসসৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথ যে অপারগ ছিলেন না তারও দুটি-তিনটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।মুক্তামালায় কেন এত নির্দয় হইলে গল্পটিতে গা-ছমছম অলৌকিক ভৌতিকরস সৃষ্টি করা হয়েছে। পূজার ভূত গল্পের ভৌতিক কাহিনীটিও বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ। পিঠে পার্বনে চীনে ভূত গল্পটিও প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এই গল্প তিনটিতে ভৌতিক পরিবেশ ও প্রকৃত ভূতের অস্তিত্ব কল্পনা করলেও এগুলি ব্যতিক্রমী রচনা।

সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের বিশিষ্ট রীতিটি হল গল্পকথকের। ভারতীয় বা ব্যাপক অর্থে প্রাচ্য গল্পরীতির সুযোগ্য অনুগামী ছিলেন তিনি। প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যে, যেমন, কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, পঞ্চতন্ত্র, দশকুমার রচিত, কাদম্বরীতে, এমন কি মহাভারত মহাকাব্যে অথবা সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনিমালায় বা আরব্য উপন্যাসের গল্পশৃঙ্খলায় সংযোজিত হয়েছে বহু স্বতন্ত্র কাহিনি। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য এই ঐতিহ্যের অনুসারী। গল্পকথক ত্রৈলোক্যনাথ একটি গল্পের সূত্রে অনেক স্বতন্ত্র কৌতূহলোদ্দীপক গল্পের অবতারণা করে গল্পের মালা গেঁথেছেন। ডমরুধর, নয়নচাঁদ, লুল্লু, সুবলচন্দ্র গড়গড়ি প্রমুখ চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে বহু গল্পের অবতারণা করা হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এগুলি অখণ্ড গল্প হিসাবে যেমন, সরস পৃথক গল্প হিসাবেও তেমনি সম্পূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ।

তাই প্রমথ বিশী এগুলিকে ''টানা গল্পের ফ্রেমে বাঁধানো ছোটগল্পের সমষ্টি'' বলেছেন। কঙ্কাবতী, ময়না কোথায়, পাপের পরিণাম ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতেও ত্রৈলোক্যনাথের ভূমিকা গল্পকথকের। মুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে বসে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে সহজ সরল ভাষায় কৌতূহলোদ্দীপক গল্পের মজলিসি আসর বসিয়েছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ত্রৈলোক্যনাথের প্রায় সমকালে হিন্দীসাহিত্যেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন কাশীর দেবকীনন্দন খত্রী তাঁর প্রথম উপন্যাস চন্দ্রকান্তা (১৮৮৮) এবং ৬ খণ্ড চন্দ্রকান্তা সন্ততি - তে। এই গল্পকথকের গল্পের আকর্ষণ এত প্রবল যে অহিন্দিভাষীরা এবং অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হিন্দিভাষীরা ব্যাপক ভাবে হিন্দি ভাষা শেখায় প্রবৃত্ত হন এবং এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা এত প্রসারিত হয় যে চন্দ্রকান্তা কথাটি উপন্যাস শব্দের সমার্থক হয়ে পড়েছিল। চন্দ্রকান্তা মূলত প্রেমকাহিনি। কিন্তু নানা অলৌকিক, অভাবিত, কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা; কাহিনি-বিন্যাসের অদ্ভুত ক্ষমতা; বিস্ময়কর, উদ্দাম কল্পনাদির বৈশিষ্ট্যে মূলকাহিনীটি এমনভাবে সম্পৃক্ত যে উৎসুক পাঠকদের শেষ পর্যন্ত তা আকৃষ্ট করে রাখে। সমকালীন যুগ পরিস্থিতি, নৈতিক মূল্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও অপ্রত্যক্ষভাবে বর্তমান এখানে।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এই গল্পের আসর ভেঙে গেছে, কিন্তু গল্পকথক ত্রৈলোক্যনাথ যে কথা বার বার বলতে চেয়েছিলেন, তা বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার শেষে মুক্তামালা গ্রন্থের সুবলচন্দ্রের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন — ''ভালরূপ লেখাপড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে, সত্য ও পরোপকার-ইহাই ধর্ম, ইহাই কর্ম।'' এই আন্তরিক উক্তি বা উপলব্ধি বস্তুত ত্রৈলোক্যনাথেরই জীবনসঞ্জাত নিজস্ব উপলব্ধি। নিজের কর্মজীবনে বা সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এই মনুষ্যধর্মের প্রচার প্রসারই তিনি চেয়েছিলেন।

যুক্তি তর্কের বৃত্তান্ত ও লালন

মোনালিসা দাস* ও অরিজিৎ ভট্টাচার্য**

লালনের গানে যেমন মুক্ত মানুষের বন্দনা আছে তেমনি জাতপাত সম্পর্কিত প্রশ্নও আছে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা যেমন ভাবেন তেমন ফর্মুলা তাঁর পন্থায় খাটেনি। জাতপাতের বিরোধী আন্দোলন গড়তে গিয়ে প্রতিবাদী মানুষেরা প্রথমে দলে বা সম্প্রদায়ে সংঘবদ্ধ হয়, তা পরে অপর আরেকটি জাতেরই সৃষ্টি করছে, যাদের মধ্যে নীতি-নিষেধ দ্বারা সংকীর্ণতা এসে যাচ্ছে। জাতের বাঁধন দুর্বল করতে গিয়ে এঁরা শেষ পর্যন্ত একাধিক জাতের পুনর্জন্ম দিয়েছে।

এই ধরনের সম্প্রদায় পরবর্তীতে অবলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন বাংলায় সাহেবধনী, কর্তাভাজা প্রভৃতি সম্প্রদায়। কিন্তু লালন ও বলরাম পরবর্তীদের জন্য একটি বড় সত্য রেখে গেছেন। কবীরের মতো তাদেরও বলবার কথা এই যে, "It is difficult to change social customs, and that is generally necessary to respect them, but the true human reality is a different one, one in which each human being is judged on his own merits, not those of his birth in a particular family." (The Kabir-panth and social protest, David N. Lorenzen, pg. 292-303)

বাংলা তথা নদীয়ায় গৌণধর্মগুলি উদ্ভবের কারণ স্বরূপ অনুমান করা যায়, হয়তো অন্ত্যজ ব্রাত্য মানুষ গ্রামের পরিমণ্ডলে সমাজ ও অর্থনীতির বিপন্ন সময়ে বড় ধর্মের বা উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের কাছে আশ্রয় পাননি, এমনকি জোটেনি মানবিক স্বীকৃতি। ফলত এঁরা অনেকগুলি সমান্তরাল অবস্থান ও বিকল্প ধারার সন্ধানে গড়ে ওঠে, যেমন ব্রাহ্মণদের বদলে শূদ্র, শাস্ত্রের বদলে গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা, মূর্তির বদলে মানুষ ভজন, ভাববাদের বদলে দেহবাদ, মন্ত্রের বদলে শূদ্র নেতৃত্ব, শাস্ত্রের বদলে গুরুবাদের প্রতিষ্টা, মূর্তির বদলে মানুষ ভজন, ভাববাদের বদলে দেহবাদ, মন্ত্রের বদলে গান ইত্যাদি এইসব সম্প্রদায়ের সাধারণ লক্ষণ। এই সময়ে সন্নিহিত জনপদ জীবনে চৈতন্য প্রভাবিত উদার জীবনবোধ হয়তো তাঁদের প্ররোচনা দিয়েছিলো মূর্তিবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি এবং ভেতর ভেতর কাজ করেছিলো ইহজীবনের বিফলতা বিষয়ে বৌদ্ধচিন্তার বীজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর অন্য একটা দিক ভেবেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, - ''কৃষিজীবী জনসাধারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে মর্মাহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছে, বৌদ্ধ কিংবা ব্রাহ্মণ্য যুগে তাদের সামাজিক স্থান যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। ... মানবিকতাবাদ ধর্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে, ঐ ধর্ম প্রত্যয়ই সমাজ জীবনে বঞ্চনার জন্য সান্ত্বনা জুগিয়েছে, ঐ ধর্ম প্রত্যয়ই ক্ষতিপূরণের সান্ত্বনা এনেছে মানবিকতার পথে। ... যে কৃষি

*বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও **সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মানকর কলেজ

অতীতে তাদের স্রোতের উৎস, সেখানে তাদের অবস্থান নয়, আর যেখানে তাদের অবস্থান সেখানে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব নেই, লোকজ ধ্যান-ধারণায় তাদের জীবন জড়ানো, অথচ ঐ ধ্যান-ধারণা তাদের প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে না তাই... দেহ তরণীর হাল ধরে সংসারে জীবনযাপনের তাদের মুমূর্ষু চেষ্টা।" (বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ, হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

বলরাম তাঁর গোষ্ঠীর মানুষদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে, সংস্কৃতশাস্ত্র আর তার রক্ষক ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে। বলরামের মৃত্যুর পর তাঁর সাধনসঙ্গিনী ব্রহ্মমালোনীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁতে তাঁর মনে হয়েছিল,

"The most important feature of this cult was the hatred that the taught his followers to entertain towards Brahmins."

(নদীয়া জেলার সিদ্ধযোগী, আর্য্যাবর্ত, ১ম বর্ষ, ৫-৬ সংখ্যা, ১৩১৭)

তিনি আরো লক্ষ করেছিলেন,

"They are known not only by the absence of sect marks on their person, but also by their refraining from mentioning the name of any God or Goddess at the time of asking for alms."

(নদীয়া জেলার সিদ্ধযোগী, আর্য্যাবর্ত, ১ম বর্ষ, ৫-৬ সংখ্যা, ১৩১৭)

একথা বলা যেতেই পারে যে, বাউলের সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত নিশ্চিত হয়নি। রাঢ় অঞ্চলের বাউল বলতে মূলত বৈষ্ণব জাতিদের বোঝায়। তাঁরা রাঢ়ের জনজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। ভিক্ষা করেন ও মেলা মহোৎসবে বৈষ্ণব সমাবেশে আসেন। অথচ নদীয়া - মুর্শিদাবাদে এঁরা প্রধানত নিম্ন বর্ণের দরিদ্র কৃষিজীবী। রাঢ়ের বাউলদের বাউল-বৈষ্ণব বলে যেমন, তেমনি মধ্য-উত্তর পূর্ববঙ্গে বলা হয় বাউল-ফকির। বাংলার বাউলের স্বরূপ, স্বভাব, জীবনযাপন, ক্রিয়াকরণ বিচিত্র ও জটিল। নানাধারার সন্নিপাতে বর্ণময় ও বিভাজিত। মধ্যযুগের বাংলার নানা লোকায়ত ও সহজিয়া, নাথ পন্থ, তন্ত্র ও সুফিবাদ মিলে মিশে তৈরি হয়েছে বাউল-ফকির-দরবেশিদের রহস্যময় জগৎ। নানা বিশ্বাস ও ভাবনার সংকলিত ভাষ্য। লোকায়তিক সমৃদ্ধ পরম্পরার এক সম্পন্ন উদ্ভাস বাংলার বাউল।

লালনের রচিত পদাবলিতে 'বাউল' শব্দটি বিশৃঙ্খল সাধনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুফী শব্দ বা সুফী গোষ্ঠীর ঐতিহ্য তাঁরা দাবী করেননি। এ পন্থার সাধনায় তত্ত্বজ্ঞানের জন্য এবং সাধনার প্রয়োজনে গুরু গুরুত্বপূর্ণ। এঁরা গুরু পারম্যবাদী, গুরুই গৌর, মুর্শিদই নবী, খোদা। এঁরা আত্ম তত্ত্বে বা সিদ্ধ হবার সাধনা করেন তাই জাত-পাত-গোষ্ঠীর স্থান নেই।

বাউল সাধনা মূলত দেশজ ও সুফীতত্ত্বের সমন্বিত সাধনা। কিন্তু ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে বাউলের সাধনসংগীতে দেশীয় তত্ত্বের বিয়োজন ঘটে। এ গানে হেদায়েতি বিষয়ক ভাব ও সুফীতত্ত্বের অবতারণা করা হয়। এই সময় থেকেই বাউল গানের বিচার শাখার সূচনা হয়। বাউলের মধ্যে সাধন-ভজনে মৌলিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সেগুলোর

সুচারু ব্যাখ্যারই অপর নাম বিচারগান। ঢাকা ও এর সন্নিহিত অঞ্চলে বাউল গান বিচারগান নামে পরিচিত। আবার টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের পশ্চিমাঞ্চলে এ জাতীয় গান ফকিরালী এবং পূর্ব সিলেটে বাউলা গান নামে পরিচিত (ভাবসংগীত, ধুয়াজারি, শব্দগান ও ফকিরীগান বাউল গানেরই বিভিন্ন রূপ)। বিচারগান বলতে আত্মতন্ত্র, পরতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব বোঝায়। এখানে বিচারের সিদ্ধান্ত হল আত্মতত্ত্ব অবলম্বন করে গুরুতত্ত্বে পৌঁছাতে হবে, কিংবা ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ গুরুর নির্দেশে চললে আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব স্বচ্ছভাবে ধরা পড়বে। শরিয়তে গুরু বা মুর্শিদ অগ্রহনীয়। মারফৎ একান্তভাবে গুরুকেন্দ্রিক। লালনপন্থা ইহজীবনেই কেবল বিশ্বাসী, পূর্ব ও পূর্জন্মে আস্থাহীন। তাই ইহজীবনের সুখ ও দেহ জীবনের নিয়ন্ত্রণ তাঁর সাধনার মূলকথা (এর সাথে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্বের তথা সহজিয়া পন্থার মিল লক্ষ্যণীয়)।

"বাউল সাধনার লক্ষ এবং উদ্দেশ্য বিচার করতে গেলে তাদের জীবনবাদের প্রসঙ্গকে জানতে হয়। বাউল তত্ত্বে বলা হয় যে সর্বজন রজে-বীজ জাত, মরণশীল এবং সমদুঃখ সুখ সম্পন্ন। কিন্তু অহং চেতনায় মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে; অন্যাপেক্ষ অধিকতর ভোগ করতে চায়। সমাজে সৃষ্টি করে স্বার্থের সংঘাত। কিন্তু তৃপ্তির তত্ত্ব না জানায় মানুষ অতৃপ্ত থাকে। অধিকতর ধন, ভূমিস নারীর উপর সে নিজের দখলদারি প্রসারিত করে। মৃত্যু, ব্যক্তির এরকম মালিকানাসমূহ মুছে দেয়। কিন্তু অধিকারবোধের আচ্ছন্নতায় এবং সুখের মরীচিকার পশ্চাদধাবনে মানুষ জীবনের সুখ আনন্দের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তার পিপাসা মেটে না। ভারতীয় দর্শনের অনুরূপ বাউলের নেতিবাচক এ বক্তব্য।" (শক্তিনাথ ঝা, গুপ্ত দেহ-সাধনা এবং তার সমাজতত্ত্ব, বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা ৯৬)

লালনকে যদি বাংলার বাউল-ফকির সাধনা পরম্পরার সবচেয়ে বড় তত্ত্ব বলা হয় তাতে বিতর্কের সম্ভাবনা কম। তাঁর গানে প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, যুক্তির অস্ত্র শাণিত ও উজ্জ্বল। ব্যক্তিগত উপলব্ধি আর আত্মস্থ অভিনিবেশ, জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে বোধের গভীরে নিয়ে গিয়েছিল ও নিজের ধর্মীয় অবস্থানকে যুক্তি তর্ক দিয়ে মজবুত করেছিলেন। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ছত্রছায়া ছেড়ে তিনি দরবেশ বা ফকিরি মতে খিলাফৎ নিয়েছিলেন বাস্তববোধ থেকেই। ভাববাদ গৌণ করে প্রতিবাদী যুক্তি দিয়ে সমর্থক বা শিষ্য টানতে হয়েছিল দলে। এই কাজ সহজ ছিল না। এই ভাব-আন্দোলনের আগে, আঠারো শতক থেকে 'নসিহত' নামা জাতীয় নীতিশাস্ত্রের রচনা লেখা রীতি চালু ছিল এবং 'বেশরা' কাজের বিরুদ্ধে শরিয়ৎবাদীরা গ্রামে গ্রামে ব্যাপক প্রচার করতেন। আবার আধা-মুসলমানরা (যাঁদের মধ্যে শীতলা, দেওয়ালি, হোলি, ভাই দ্বিতীয়া, পালাপার্বণ, লক্ষীবার মানা, গরুপূজা-এসব প্রথা ছিল) এবং মুসলমানদের একটা বড় অংশ পীরের দরগায় হত্যা দিতেন, মানত করতেন, বাতি দিতেন। পীরের মুরিদ (শিষ্য) হবার ব্যগ্রতা ছিল এবং ইসলামি রীতিকৃত্য অনেকে জানতেনই না। রফিউদ্দিন আহমদের লেখা 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে'

(১৯৮৭) থেকে জানা যায়, বহু চেষ্টাতেও গ্রামের নিম্নবর্গের মুসলমানদের ইসলামি আচরণবাদে দুরস্ত করা যায়নি।

কুসংস্কার ও অলৌকিক অন্ধবিশ্বাসে লালনের এবং দুদ্দুর গানে হত্যা দেওয়া, কবচ বেচা, তাবিজ দেওয়া, শুষ্ক বৈরাগ্য, পাথরপূজা, লিঙ্গপূজা, সিন্নি দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লৌকিক কুসংস্কার ও ধর্মহীনতার প্রতিবাদ আছে। কারণ লালনপন্থা বিকল্প এক সুদৃঢ় মানবতাবাদে দীপ্ত। জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, তীর্থ-ব্রত, সত্য-মিথ্যা, সবই মানবদেহে সাধ্য এমন সাধনার তাঁরা প্রচারক।

"না জেনে ব্রহ্মের করণ / নোড়াপূজার করে প্রচলন।
না জেনে পুরুষ প্রকৃতি / শিবলিঙ্গ পূজে হয় সতী।।"

অথবা,

"মানুষ রেখে পূজে মলি খড়ের বোন্দা।"

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের বহুঘোষিত উচ্চবর্গীয় আত্মতুষ্টির পাশে গ্রামীন নবজাগরণের যে ইতিহাস লালন প্রমুখের মানবপন্থায় জারিত ছিল তার প্রচার, বাণী যথার্থ মূল্য আজও পেলো কি?

বাউল ফকিরদের মানবতাবাদের ভিত্তি এই প্রসঙ্গে চার্বাক বা লোকায়তের শিক্ষা তাঁদের সঞ্জীবিত করেছে কিনা দেখা যায়। ঈশ্বরের রূপ না দেখে এঁরা কোনো ভজনায় রাজি নন।

তাঁদের প্রশ্ন-

"যাহা দেখিনি নয়নে / তাহা ভজিব কেমনে?"

তাঁদের বিশ্বাস -

"পাবে সব বর্তমানে / প্রাপ্তি যাহাও জীবনে।"

চার্বাকপন্থীদের মতো এঁরা বলেন প্রত্যক্ষই একমাত্র অনুমান। তাঁদের চলতি কথা হল-

"আমাদের অনুমানের পথ নয়, বর্তমানের পথ।"

"অনু - মান - অনুমান। সহজ কথায় পরবর্তী জ্ঞান - অন্য কোন জ্ঞানের পরবর্তী জ্ঞান। অর্থাৎ কোনো পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল আরেকরকম জ্ঞান। 'চরক সংহিতা' অনুসারে অনুমান ছিল তিন প্রকার - কারণ অনুমান, কার্য অনুমান ও সামান্যদৃষ্ট অনুমান।"

(বাউলদের যৌনজীবন ও জন্মনিয়ন্ত্রন, গণস্বাস্থ্য, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১)

তবে লালনগীতির অনুমানের তাৎপর্য ভিন্ন। তাঁর কথায় 'বর্তমান' আর 'অনুমান' বিশ্বাসের দুটি আলাদা মার্গ। বর্তমান হল - ইহজীবন, দেহ, শ্বাস-প্রশ্বাস, জন্ম-মৃত্যুর চাবি, বৃন্দাবন-রাধা, কৃষ্ণ ইত্যাদি। অনুমানের আরেক নাম আন্দাজি পথ। বাউলদের কথায়,

"যেও না আন্দাজি পথে"

বরং দেহের মধ্যে উপলব্ধি কর এই সব অনুমানকে, সেটাই প্রত্যক্ষ।

"কাগজে চিনি শব্দ লেখা যায় / সেও কাগজ চাটিলে কি মুখ মিষ্টি হয়?"

এইসব বিতর্ক ও প্রশ্নবাণ লালনপন্থার পক্ষ থেকে বারবার ওঠে। যুক্তি এর মূল অস্ত্র যা যেকোনো যুগে প্রাসঙ্গিক। সচেতন সমাজ-ইতিহাসে যারা আগ্রহী তাঁদের অনেক উপাদান উপকরণ মিলবে এর থেকে। লালনপন্থার মূলকথা মানুষ আর জীবন রহস্যের সমাধান-নিয়ন্ত্রণ তাঁর পন্থা। লালন দুটি গানে স্পর্ধিত অহংকার দেখিয়েছেন -

১। ''দেব দেবতার বাসনা যে / মানুষ জন্মের লাগিয়ে।''

২। ''অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই / শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই।''

এই মানবজন্মের যে মূল বস্তু সেই জীবনরস বা বীজ আমাদের বাউল-ফকির-সহাজিয়ারা বহুদিন থেকে পালন করেন। তাকে বলে চারিচন্দ্র সাধনা। এই চারচন্দ্র হল - মল, মূত্র, রজ, বীর্য। এই বর্গের সাধকরা সাধনার এক বিশেষ পর্যায়ে চারিচন্দ্র একত্রে গ্রহণ করেন। এই অভ্যাসকে মৌলবীরা 'ঘৃণ্য', 'কদর্য', 'জঘন্য' বলেছেন। সভ্যরুচি ও উচ্চ সমাজ মঞ্চ থেকে সবকিছুর মীমাংসা করা কঠিন, কারণ চারিচন্দ্র সাধনা খুব প্রাচীন প্রথা, তবে অবশ্যই গোপন এর পদ্ধতি ও প্রকরণ। খানিকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি থেকেও জারিত। এর স্বপক্ষে বলা যায়- ''একটি সত্য এই যে, মানুষের শরীরে দুটি চেতক এন্টিজেন আছে যা শরীরের প্রতিরোধ পদ্ধতির () অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দুটি হল চোখের জলের জলীয় পদার্থ বা অশ্রু এবং বীর্য। এই দুটির অংশ কোনক্রমে রক্তে মিললে বিশেষ এন্টিবডি উৎপন্ন করতে পারে। সম্ভবত ঐ বীর্যপানরত পুরুষ নিজের বীর্য দ্বারাই শরীরে এন্টিবডি উৎপন্ন করবে এবং তাতে শুক্রাণুর উৎপাদন অবশ্যই অল্প হবে। তাই দেখা যায়, বাউলদের সন্তান সংখ্যা অল্প। তবে স্মরণযোগ্য, নারী কখনও এই বীর্য পান করে না।'' (বাউলদের যৌনজীবন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, গণস্বাস্থ্য, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১)।

তবে এর থেকে বোঝা সহজ হয় সাধনার প্রয়োগগত দিক নিয়ে মৌলবীরা যে বস্তুকে অপবিত্র বলেছেন তা পবিত্র, কেননা তা-ই জীবনের উৎস। এখানেই লালনের মানবজীবনের পবিত্রতা বিষয়ে যুক্তি অকাট্য হয়ে যায়। ''বাউলমতের প্রসার ও সাধনার পথ কোনোকালেই সুগম ছিল না। শাস্ত্রাচারী হিন্দু আর শরীয়তপন্থী মুসলমান উভয়ের নিকট থেকেই বাউল অবজ্ঞা-নিন্দা-নিগ্রহ-বিদ্বেষ-অবিচার অর্জন করেছে। মুসলমানদের চোখে তাঁরা বেশরা, বেদাতি, নাড়ার ফকির আর হিন্দুদের কাছে ব্রাত্য, পতিত, কদাচারী, হিসেবে চিহ্নিত। শিক্ষিতজনের ধারণাও অনুকূল ছিল না। নদীয়া-কাহিনীর লেখক কামরিপুর চরিতার্থতা সাধনা'ই বাউল সাধনার উদ্দেশ্য বলে মন্তব্য করেছেন। বিষাদ সিন্ধু খ্যাত মীর মশাররফ হোসেনও বাউলদের সম্পর্কে ঘৃণার সুর চড়িয়ে বলেছেন, এরা আসল শয়তান, কাফের, বেঈমান/তা কি তোমরা জান না' (সঙ্গীত লহরী)। এ ছাড়া বাউল-ফকিরদের বিরুদ্ধে রচিত হয়েছে নানা পুঁথি পুস্তিকা। প্রদত্ত হয়েছে নানা বিধান আর ফতোয়া।'' (আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলাদেশে বাউলদের চালচিত্র, বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা-২১৪)।

আজকের বর্তমান পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বাউল গানের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় তা অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা লক্ষ করি যে, যুক্তি - তর্কের নিরন্তর খেলা এই সময়ের শিক্ষিত মানুষকে আজও ভাবিয়ে তোলে। প্রাবন্ধিক আহমদ মিনহাজ-এর সাথে আমরা একমত হয়ে বলতেই পারি যে, ‘‘আমরা জানি আধুনিক মানুষের মনে জগৎ সম্পর্কিত বহুরকমের স্ববিরোধ স্থান পায়, স্ববিরোধ পরিত্যাগ করে কোনো একটি মতে বিশ্বাসে স্থির করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, যদিও বা তা সম্ভবপর হয়, তার মনের আধুনিকত্ব তার চেতনার প্রাগ্রসরতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই - যুক্তির হেত্বাভাস এখন এত প্রবল যে নিঃসংশয় বিশ্বাস অচল...।” (আহমদ মিনহাজ, বাউলগান - একটি মধ্যবিত্ত ভাবনা, বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপণি, পৃষ্ঠা-১৫৭)।

পরিশেষে তাই আমরা আজ বলতেই পারি যে, বাংলার ভাব আন্দোলনের যে প্রধান ধারা সম্পর্কে আমার কথা বলছি তার বিদ্রোহ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে। লালনের পথ জাতপাত মানে না, হিন্দু-মুসলমান ভেদ করে না, বরং প্রজ্ঞার সাধনার দিক থেকে তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সাধনার পথে মানুষ কতদূর অগ্রসর হতে পারলো তা বিচার করতে পারার ক্ষমতা তৈরি করতে পারা। একথা তাই আমরা আজ বলতেই পারি-

‘‘জাগো বাংলার বাউল
তত্ত্ব গানে মত্ত হয়ে ভেঙ্গে দাও মনের ভুল।”

এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ ও পত্রিকাগুলি ছাড়াও অন্যান্য যেসব গ্রন্থাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো -

ক) আবু তালিব সঃ, লালন শাহ ও লালন গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০১।

খ) সুধীর চক্রবর্তী, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৪।

গ) সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার বাউল ফকির, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৯।

ঘ) শক্তিনাথ ঝা, ফকির লালন - দেশ কাল শিল্প, বর্ণ পরিচয়, কলকাতা - ২০০৭।

ঙ) ফরহাদ মজহার, সাঁইজির দৈন্যগান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৬।

কদমতলায় কে?

সৌরভ মিত্র*

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে? হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে।

এই বহুল প্রচলিত ছড়াটির অর্থ নিয়ে একটু তলিয়ে ভাবা যাক। -পদ্মা, সন্ধ্যামালতি, রজনীগন্ধা, গ্ল্যাডিওলাস, মুনফ্লাওয়ার জাতীয় কিছু প্রজাতির ফুল রাতে ফুটলেও তার সাথে 'চাঁদ ওঠা'র বা শুক্লপক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। আবার হাতি বা ঘোড়ার একমাত্র সার্কাসের মঞ্চ ছাড়া নাচিয়ে হিসেবে তেমন নামডাক নেই। হঠাৎ তারা কদমতলাতেই বা যাবে কেন! ....মোট কথা, এই পথে ভেবে বিশেষ সুবিধে হয় না।

বিদ্বজ্জনেরা বলেন, 'প্রচলিত ছড়াগুলি থেকে আমরা প্রধানত যেমন পাই দৈনন্দিন আচার-আচরণ-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সুখ-দুঃখ, আশা-বেদনার লৌকিক সংবাদ - তেমনি কতকগুলি সংক্ষিপ্ত সামাজিক ইতিহাসও।'[১] -এই নজরে ছড়াটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বিদ্বজ্জনেরা আরও বলেন যে, আপাত-আজগুবি লালকমল-নীলকমল, সাত ভাই চম্পা, ডালিমকুমার বা শিয়াল পণ্ডিত জাতীয় রূপকথাগুলিও যেখানে আজগুবি নয়, বরং সেগুলির মাধ্যমে ধরা রয়েছে শাসক-প্রজা, নারী-পুরুষ, ইত্যাদি সম্পর্ক, লৌকিক ইতিহাস ও তৎকালীন সামাজিক মূল্যবোধের মনগ্রাহী ছবি।[২] অতএব এই 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে' গোছের একটি অর্থহীন ছড়া শুধু লঘু হাস্যরসের কারণে এতদিন টিকে আছে, -মানতে কষ্ট হয়।

তাহলে কী? -যদি বলা হয়, এই আপাতভাবে ছেলেভোলানো ছড়া আদতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিশা পরিবর্তনের ইতিহাস, তাহলে সে'কথা মার্জিত ভাষায় মনে হয় কষ্টকল্পিত আর স্পষ্ট ভাষায় মনে হয় গাঁজাখুরি। কিন্তু, সত্যিই কি তাই? পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ইতিহাসকে ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ করার রীতি দেখা যায়। যেমন, ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের (১৬৪২-৪৯) সময় কোলচেস্টার শহরের দুর্গ-প্রাচীরে হাম্পটি ও ডাম্পটি নামক দুই বিশালাকার কামান স্থাপন ও ১৬৪৮ সালে সেই দুর্গ-প্রাচীন ধ্বংস হলে কামানদুটির গড়িয়ে পড়া, -এই ঘটনা থেকে 'হাম্পটি-ডাম্পটি' ছড়াটির সৃষ্টি। 'জ্যাক্ অ্যাণ্ড জিল' ছড়াটি সৃষ্টি হয়েছিল ফ্রান্সের রাজা ষোড়ষ লুই ও রাণী মারীর কাহিনী থেকে। মোৎসার্টের এক বিরহগীতি থেকে সৃষ্টি হয় 'টুইংকল্ টুইংকল্' ছড়া। ১৬৬৫-৬৬ সালের ভয়াবহ প্লেগে লন্ডনে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। এই প্লেগে আক্রান্তদের শরীরে গোলাকার ফুসকুড়ি উঠত। এক বিশেষ ধরণের ফুল ব্যবহার করা হত এর প্রাথমিক চিকিৎসায়। -এই কাহিনী থেকেই 'রিংগা রিংগা রোজেস্' ছড়াটি।...

---

*পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, নেশায় সাহিত্যিক।

'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে' ছড়াটির প্রধান বিশেষ্য পদগুলির তৎসম রূপ হল চন্দ্র (চাঁদ), পুষ্প (ফুল), কদম্ব (কদম), হস্তী (হাতি), অশ্ব (ঘোড়া), স্বর্ণ-মাণিক্য (সোনামনি) ও বিবাহ (বে)। এই শব্দগুলির ক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে ছড়াটির প্রকৃত অর্থ। কিন্তু, তাদের moon, flower, elephant, horse... বুঝলেই গণ্ডগোল। (যা হল বলেই সমস্যা!) যাই হোক, ইতিহাসের কথা যখন উঠল, সে'পথেই হেঁটে দেখা যাক।...

বিদেশী পণ্ডিত ও (বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত) কিছু ভারতীয় পণ্ডিতের সৌজন্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস আজও এক গোলকধাঁধা। সিন্ধু সভ্যতা আর বৈদিক বা আর্য্য ('আর্য' নয়) সভ্যতার ইতিহাসকেই দেখা যাক। বলা হল, সিন্ধু সভ্যতা অনেক উন্নত ছিল, সেই তুলনায় 'বহিরাগত' আর্য্যরা নাকি ছিল অনুন্নত। প্রথমটি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা, আর আর্য্যরা নগর বিরোধী। বলা হল, আর্য্যদের ঝটিকা আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়। আর এই সম্পূর্ণ বিভাজনের অন্যতম প্রধান যুক্তি হিসেবে ইতিহাসবিদদের মনে রইল - ঘোড়ার ব্যবহার জানা আর না জানা।

দুঃখজনকভাবে গোটা বিশ্লেষণটিই পরস্পরবিরোধিতায় পূর্ণ। ভেবে দেখুন না, দারুণ উন্নত সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্নানাগার, ইত্যাদি পাওয়া গেল অথচ কিছু দুর্বোধ্য লিপি ছাড়া একটিও সাহিত্যকীর্তি পাওয়া গেল না! আর বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত যাদের রচনা, - সেই আর্য্যরা নাকি 'অনুন্নত'! তারা নাকি নগর বিরোধী ছিল, অথচ তাদের রচনায় অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, দ্বারকা, ইত্যাদি নগরের (কাল্পনিক ধরলেও) বর্ণনা বেশ স্বতঃস্ফূর্ত। এমনকি বেদেও নগর-মহত্বের উদাহরণ নেহাৎ কম নয়। সেখানে কখনও বলা হচ্ছে - 'হে অগ্নি! তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিভাজন, কারণ তুমি অতিথির ন্যায় আমাদিগের প্রিয়, নগরীস্থিত হিতোপদেষ্ঠা বৃদ্ধের ন্যায় আশ্রয়যোগ্য এবং পুত্রবৎ পালনীয়' বা 'হে অগ্নি, তুমিও সেরূপ অমিত তেজবলে অপরিমিত অয়োনির্মিত (নিরাপত্তা দানকারী অংশ দ্বারা নির্মিত) নগরী দ্বারা আমাদের রক্ষা করো', কখনও বলা হচ্ছে- 'নগরের ন্যায় সমুজ্জল মহাপর্বতের চারিদিকে প্রবাহিত বারিরাশি আমাদের বাক্যে কর্ণপাত করুন'[৩], ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপরেও আর্য্যদের তথাকথিত নগর-বিরোধিতার প্রসঙ্গ উঠলে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের ঢঙে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, - এটা যদি বেড়াল হয়, তাহলে মাংস কোথায়? আর এটা যদি মাংস হয়, তাহলে বেড়াল কোথায়!?

আসলে সিন্ধু সভ্যতা আর বৈদিক সভ্যতাকে গোড়াতেই আলাদা ধরে নেওয়ার পর যখন বৈদিক সভ্যতার কোনও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেল না, তখন জবরদস্তি তাকে গ্রামীণ বলে দাগিয়ে দেওয়া হল। নইলে যে জাতিকে পৃথিবীর প্রায় সবকটি উন্নত সভ্যতার জনক বলা হয়, তারা কখনও নগর বিরোধী হতে পারে?

'ঘোড়ার নাচ' থেকে আলোচনার শুরু যখন, ঘোড়ায় চড়ার গল্প না শুনলে নটেগাছ-টি মুড়োবে না।...

বাবু নতুন ঘোড়া কিনে নিজের হাতে তাকে সাজ পরাতে গেলেন। সমস্ত সাজ কোনওমতে ঘোড়ার গায়ে এঁটে দেওয়ার পর, এক চাকর বলে উঠল - 'বাবু, সাজ উলটো হলো যে!' বাবুরও সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু তাই ব'লে সামান্য চাকর ভুল ধরবে! - তিনি চটে গিয়ে বললেন - 'উল্টো হবে কেন রে ছোটলোক?' চাকর বলল - 'আজ্ঞে, এ দিকটা থাকবে আপনার মুখের দিকে, ও-দিকটা থাকবে পিঠের দিকে।' বাবু ধমকে বললেন - 'ব্যাটা মূর্খ। তুই কী করে জানলি, আমি কোন দিকে মুখ ক'রে বসব?'...

ভৃত্যের জ্ঞান, ইতিহাস বা ঐতিহ্য প্রভুর থেকে মহানতর হলে প্রভু তা কোনওদিনই মেনে নেয় না। এদেশের একদা প্রভুরা এদেশের ইতিহাস লেখার সময় তার যথেষ্টই পরিচয় রেখেছেন। বস্তুতঃ, আর্য্য আগমণ তত্ত্বের বিপক্ষে সহস্রাধিক প্রমাণ ও শতাধিক গ্রন্থ আছে। পারস্যের সম্রাট দারায়ুসের সমাধি আবিষ্কার হলে দেখা যায় সেখানে তার পরিচয় হিসেবে লেখা আছে 'একজন পারসীক, একজন পারসীকের পুত্র, একজন আর্য্য, আর্য্যবংশোদ্ভূত'। -আর্য্য আগমণ তত্ত্বেও ছিল একটি বড়ো ধাক্কা। হাল আমলের গবেষকরাও এই তত্ত্বকে নাকচ করেছেন। যদিও মেক্‌ল সাহেবের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় বহু ভারতীয় আজও সত্যটি মানতে চান না।

'আর্য্য' শব্দটি জাতিবাচক নয়, গুণবাচক। ঋগ্বেদ (১.৫১.৮) অনুসারে এর অর্থ 'বিদ্বান্‌, অনুষ্ঠাতা'। অমরকোষ টিকা অনুসারে এর অর্থ 'উপজীব্যতা হেতু উপগম'। সহজ করে বললে, জীবিকার জোরে সমাজের উপরিভাগে উঠে আসা মানুষজন। (আজকের সমাজের সাপেক্ষে অফিসের মেজবাবু ছোটবাবুর থেকে বেশি আর্য্য, আবার বড়বাবু মেজবাবুর থেকে বেশি আর্য্য।) এই 'আর্য্য' থেকে 'আয্যি', আর 'আয্যি' থেকেই সম্মানীয় ব্যক্তিদের নাম বা সম্বোধনের শেষে 'জী' যুক্ত করার রীতি।[৪]

সাম্প্রতিক কালে সরস্বতী নদীর প্রাচীন গতিপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেছে তথাকথিত 'সিন্দু সভ্যতা'র অধিকাংশ পুরাতাত্ত্বিক স্থান সিন্ধু নয়, সরস্বতী নদীখাত বরাবর অবস্থিত। ঋগ্বেদ জুড়ে নদী সরস্বতীর বন্দনাকে বিবেচনা করলে বোঝা যায় - দুটি সভ্যতা আসলে একই। (এই তত্ত্বের আরও অসংখ্য যুক্তি আছে। নিবন্ধটিকে প্রসঙ্গে বাঁধার উদ্দেশ্যে সেই আলোচনা সংযত করা হল।)

এরপর, 'আর্য্য আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার পতনে'র কথা। মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত তেত্রিশ বা সাইত্রিশটি কঙ্কাল বিশ্লেষণ করে ইতিহাসকার হুইলার সাহেব সর্বপ্রথম এই গুজবটি রটিয়েছিলেন। মহেঞ্জোদারোর আয়তন প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বর্গ ফুট, সেখানে বাড়ির সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ হাজার। এর জনসংখ্যা ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজারের মধ্যে।[৫] সেখানে মাত্র গোটা তিরিশেক কঙ্কাল কোন যুক্তিতে 'large scale destruction and abolition of Indus Valley Civilisation' -এর প্রমাণ হয়ে ওঠে, - তা সত্যিই বিস্ময়কর। ('জামা কিনিতে গেলাম, পাইলাম একপাটি মোজা; এখন ভাবিতেছি, ঐটেকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া কোনো মতে জামা করিয়া পরিব'। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

রইল পড়ে ঘোড়ার ব্যবহার জানা আর না জানা। যেহেতু বৈদিক সাহিত্যে অশ্বের উল্লেখ আছে, আর সিন্ধু সভ্যতায় ঘোড়ার কংকাল পাওয়া যায় নি, তাই 'ঘোড়ার ব্যবহার'কে দুই সভ্যতার বিভাজন রেখা ধরে বসা হল। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে তো দেবতা, অসুর, দৈত্য, দানব, হস্ত পদবিশিষ্ট নাগ, গরুড় পক্ষী, ছাগমুণ্ড, দক্ষ, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, গন্ধর্ব, পারিজাত পুষ্প - এদেরও উল্লেখ আছে এবং তাদের কারুর-ই জীবাশ্ম পাওয়া যায় নি (পাওয়ার কথাও নয়)! এদিকে গুজরাতের সুরকোডাটায় সিন্ধু সভ্যতার পুরাতাত্ত্বিক সাইটে ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া যাওয়ায় 'অশ্বের ব্যবহার'-তত্ত্বেও দুলুনি লেগেছে বইকি। তাহলেও, যাবতীয় বোঝা ঘোড়ার-ই পিঠে চাপল কেন? - উত্তরের খোঁজে বরং 'লাগাম হাতে' বৈদিক সাহিত্যে ঢুকি।

বৈদিক রচনায় 'ঘোড়া' বা 'ঘোটক' নেই, আছে 'অশ্ব'। বেদের বুৎপত্তি গ্রন্থ নিরুক্ত। সেই নিরুক্ত বলে, - 'ব্যাপ্ত্যর্থক অশ্ ধাতুর উত্তর ক্বন্ প্রত্যয়ে অশ্ব শব্দের নিষ্পত্তি।[৬] অশ্ব নাম কোথা থেকে হল? অশ্ব পথ ব্যপ্ত করে। অশ্ব মহাভোজন হয়। অশ্ব চলনপটু হয়। অশ্ব পথের কুটিল প্রদেশসমূহে অনায়াসে যাতায়াত করে। অশ্ব নিজের আকৃতির দ্বারা পরের ভীতি উৎপাদন করে। অশ্ব চালকের প্রজ্ঞা বর্ধিত করে।' -এখানে একবারের জন্যও ঘোটক বা কোনও ইতর জীবের ইঙ্গিত নেই, আছে কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সংকলন। বাংলায় 'অশ্ব' শব্দের আরেকটি অর্থ পাওয়া যায়, - 'চার জাতি পুরুষের চতুর্থজাতি'[৭]! - অশ্ব তাহলে পুরুষ! কিন্তু, এ কেমন 'পুরুষ'?

অশ্ব = অশ্ + ব। অর্থাৎ 'অশ্' বা প্রাপ্তি, উপভোগ, লাভ, ব্যাপ্তি, রাশীকরণ (রাশ করা, পুঞ্জীকরণ)[৮] ইত্যাদির ক্রিয়ার 'বহনকারী' (ব)। সহজ করে বললে, 'অশ্ব' বিশেষজ্ঞ ও উচুঁ পদের কূটনীতিকগণ, -যারা বুদ্ধিবলে কুটিল প্রদেশসমূহে অনায়াসে যাতায়াত করে। সে তার কৃতকর্মের আকার (আকৃতি) দ্বারা পরের ভীতি উৎপাদন করে। পরামর্শের মাধ্যমে চালকের (রাজার) প্রজ্ঞা বর্ধিত করে। সংঘাত বা কূটনীতির মাধ্যমে পররাজ্য গ্রাস করে, স্বরাজ্যের রাজকোষ ধনসম্পদ পুঞ্জীভূত করে, রাজ্যের সীমা ব্যপ্ত করে...। -এই প্রক্রিয়াকেই 'অশ্বমেধ[৯] যজ্ঞ' বলে। (আর যেহেতু ঘোড়ার মধ্যেও অতিভোজন, চলনপটুতা, ইত্যাদি গুণ দেখা যায়, তাই সেই প্রাণীকেও 'অশ্ব' নাম দেওয়া হয়।)

এবার হাতির খোঁজ।... কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, 'দিগগজ তোমার কিঙ্কর স্থানে'। আবার এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মৃত্যুর পর জনৈক উত্তর-ভারতীয়কে বলতে শুনেছি 'শর্মাজী বহৎ বড়ে হস্তী থে'। কে বা কারা এই গজ আর হস্তী? - দিক থেকে দিগগজ। অষ্টদিগগজ পুরাণ অনুসারে অষ্টদিক রক্ষাকারী হস্তীগণ। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, নৈঋত ও অগ্নি - এই আটদিক রক্ষাকারী হস্তীরা হলেন ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক। -এদের পরিচয় খুঁজে দেখা যাক।[১০]...

দিকনাম	তাৎপর্য	হস্তীনাম	হস্তীনামসমূহের অর্থ ও ক্রিয়াভিত্তিক ব্যাখ্যা
পূর্ব্ব	যে স্থান/কাল/পাত্র থেকে বর্তমান স্থান/কাল/পাত্র উদ্ভূত হয়েছে। (স্মর্তব্য - পূর্বদিক, পূর্বকাল, পূর্বপুরুষ)	ঐরাবত	'ইরাবৎ' হইতে জাত/উদ্ভূত। (ইরাবৎ থেকে ইরাবতী। ইরাবতী = জনধারা, জলধারা, পণ্যধারা।) 'গণ-পতি' বা 'গণ-ইশে'র দেহে-এর মস্তক বিদ্যমান। সর্দ্দার, মজুরদের দলপতি।
পশ্চিম	যা পশ্চাতে বা পরে	অঞ্জন	কাজল। সমুচিত বিদ্যাবুদ্ধির জনন (অঞ্) চলমান (অন) যাহাতে। দক্ষজ্ঞানী।
উত্তর	উচ্চভাবের (উত্) তাড়ন (ত) রহে (র) যাহাতে। জবাব, শ্রেষ্ঠত্ব।	সার্ব্বভৌম	সর্ব্ব বা সর্ব ভূমি হইতে জাত। সর্ব্বভূমির অধিপতি। সম্পদ সৃজন ও বিতরণ করেন যিনি।
দক্ষিণ	(জ্ঞান নয়,) 'দক্ষ'তা সক্রিয় (ই) ভাবে 'অন' থাকে যেদিকে। সূর্য্য বা রাষ্ট্রপুঁজির 'মুখাপেক্ষী' হলে যেদিকে অধিক মজুরী বা দক্ষিণা জোটে।	বামন	খর্বাকৃতি। প্রচলিত প্রথার বিপরীতে (বাম) যারা চলমান (অন)। নষ্ট বা অধঃপতিত ব্রাহ্মণ।
ঈশান	উত্তর ও পূর্ব্বের তাৎপর্যদুটির সংযোগ স্থান/কাল/পাত্র। নিয়ন্তা। ঐশ্বর্যশীল। প্রভুত্বশীল। ঈশ্বর। (ঈশ্বর = জ্ঞানী, স্বকার্যকরণক্ষম।)	সুপ্রতীক	উত্তম/সাধু (সু) প্রতীক যাহার। (প্রতীক = 'প্রতি'/সৃষ্টি/পদার্থকে সক্রিয়কারী যে শব্দ, চিহ্ন, চিত্র, ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্টজগৎকে মনোজগতে সক্রিয়/চিহ্নিত করা হয়।)

বায়ু	উত্তর ও পশ্চিমের তাৎপর্যদুটির সংযোগ স্থান/কাল/পাত্র। যে প্রবাহিত সত্তা প্রবাহ পথের সংবাদ বহন করে। সংবাদ মাধ্যম। ('বাতাস' অর্থে বায়ু সংবাদ বহন করে গন্ধ, তাপ, গতি .... এর মাধ্যমে।)	পুষ্পদন্ত	পুষ্পের ন্যায় দন্ত যার। বিদ্যাধর বিশেষ। জৈনধর্মের নবম তীর্থঙ্কর। তিনি 'সুবিধিনাথ' নামেও পরিচিত। একজন সিদ্ধ ও অরিহন্ত। (দন্ত = দমনক্রিয়া তাড়িত যাতে। পুষ্প-শব্দটি পরে ব্যাখ্যা করা হবে।)
নৈঋত	দক্ষিণ ও পশ্চিমের তাৎপর্যদুটির সংযোগ স্থান/কাল/পাত্র। ন্যায় সম্মত বা প্রচলিত রীতি রহে যেদিকে।	কুমুদ	পদ্ম। কু-তে (পৃথিবীতে) 'মুদ' যিনি। সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে নতুনের উদ্ভদ করেন যিনি।
অগ্নি	দক্ষিণ ও পূর্ব্বের তাৎপর্যদুটির সংযোগ স্থান/কাল/পাত্র। কর্মযজ্ঞে সর্বপ্রথমে যাকে প্রয়োজন। শক্তি। শ্রম।	কুমুদ	শ্বেতপদ্ম। নাগবিশেষ। পুণ্ড্ + ঈক। ভোগদ্রব্য প্রস্তুতকারীর (পুণ্ড্র)-এর অধিপতি।

হাতি তো দূরে থাক, তার লেজ-ও আর চোখে পড়ে না। বরং দেখা যাচ্ছে, এই 'বড়ে হস্তী'-রা রীতিমত 'মহা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি'! আমাদের ছড়াটিতে তাহলে এই গণ্যমান্যরা রাষ্ট্রের কূটনৈতিকদের সাথে 'নাচ' করছিল! (যদিও এদের ওজন বুঝে 'নাচ' শব্দটি ব্যবহার করতে সঙ্কোচ হচ্ছে।)

কিন্তু, কেন? আর দক্ষিণদিকের রক্ষাকারী হস্তী যদি বামন হয়, তাহলে 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' স্পর্ধার বিষয়-ই বা কেন? - জটিল প্রশ্ন। তার জন্য আগে 'চাঁদ'কে জানা দরকার। তারও আগে উত্তর-দক্ষিণের সংঘাতটা বোঝা যাক। অগত্যা, 'পশুপতি'র স্মরণ ভিন্ন গতি নেই।

বঙ্গীয় শব্দকোষ 'পশু' শব্দের অর্থ হিসেবে সবার প্রথমে যা আছে তা 'জীব-জন্তু' নয়, 'যে অবিশেষে দেখে'! 'পশু' সম্বোধন যে মোটেই তুচ্ছার্থে নয়, অশ্ব আর হস্তীর পরিচয়ে তা ইতিমধ্যে টের পাওয়া গিয়েছে। পশুদের আচার বা 'পশ্বাচার'-এর অর্থ জানলে পশু-পরিচয় পাওয়া যায়। আচারভেদতন্ত্র অনুসারে বৈদিক আচারকেই পশ্বাচার বলে।[১১] মহানির্ব্বাণতন্ত্র অনুসারে, -'...ত্রিসন্ধ্যা জপ ও পূজা, নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান, বেদশাস্ত্রে দৃঢ় জ্ঞান, গুরু ও দেবতাতে ভক্তি, মন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস, পিতৃ ও দেবপূজা, শুদ্ধি ও নিত্যকার্য্য, ইত্যাদি আচার-কে পশ্বাচার বলে।' -এগুলি আর যাই হোক, হাতি-ঘোড়া বা গরু ছাগলের কম্ম নয়।

'পশু'র সেই 'অবিশেষে দেখা'-কে এবার বোঝার চেষ্টা করা যাক। -ঘরভর্তি ছাত্রের মধ্যে শুধু প্রথম স্থানাধিকারীকে বেছে নেওয়া হল 'বিশেষ ভাবে দেখা'। আর প্রথম-দ্বিতীয়-অকৃতকার্যের মধ্যে ভেদ না রেখে, সকলকেই ছাত্র হিসেবে দেখা হল অবিশেষে দেখা। -এককথায়, সকলকে সমান দেখা। এই 'সাম্যপন্থী'দের অধিপতি (পশু-পতি) ছিলেন জ্ঞানের শিখা (শি) বহনকারী (ব) বা জ্ঞানবাদী 'শিব'-শ্রেণীর মানুষজন। শুরুতে এই দর্শন-ই ছিল সমাজের নিয়ম। তখন দক্ষতাপন্থীরা ছিল জ্ঞানপন্থীদের অনুগামী। কোনও ব্রাহ্মণের পক্ষে (উৎকৃষ্ট) জ্ঞান ছেড়ে (নিকৃষ্ট) দক্ষতায় চর্চা করে মজুরী বা দক্ষিণা গ্রহণ ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিপরীত আচরণ। তাই তাকে বামন বলা হত। কিন্তু, একসময় (পুরাণ বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের সময়) সামাজিক নিয়মগুলি পাল্টে গেল। এবার শিবতা-এর দিশার পরিবর্তে 'দক্ষতা ও দক্ষিণা-নির্ভর' দিশা কে 'সঠিক' বা 'right' (দক্ষিণ / ডান) বলা হল। পুরোনো দিশাটি হল 'পরিত্যক্ত' বা 'left' (বাম)। 'জ্ঞানবাদী সাম্যতার পন্থা' এক সময় পরিত্যক্ত হয়েছিল বলে তার নাম হয় 'বামপন্থা'। আজও যে'কারণে (প্রতীক হিসেবে, হয়তো না বুঝেই) সমাজ বা সংসারের মধ্যে (মূলস্রোতে) থাকা মানুষ 'দক্ষিণাকালী'র পুজো করে, 'বামাকালী'র পুজো হয় সমাজের বাইরে।[১২]

এই হস্তি বা গজগণের উত্থানপথ কি সম্পূর্ণ মসৃণ ছিল? -না। পুরাণ বা মহাভারত অনুসারে দীর্ঘদিন ধরে 'গজ-কচ্ছপের দ্বন্দ্ব' চলেছিল। এরা ছিল একই গোত্রের মুনি। এদের বিরোধের সূত্র হিসেবে কাশীদাসী মহাভারত বলে, 'ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ'। গজ-এর পরিচয় আমরা পেয়েছি। কে এই কচ্ছপ? -'কচ্ছ' কে পালনকারী (প)। কচ্ছ-এর অর্থ 'সত্ত্বাকে (সাদৃশ্যে, কাছিম) বা সৃষ্টিশীল সত্ত্বাকে (সাদৃশ্যে, লিঙ্গ-যোনি) রক্ষাকারী। এককথায় সৃষ্টিকে বা সৃষ্টিশীলতাকে রক্ষাকারী জ্ঞান। ('সরস্বত্যাস্ত কচ্ছাপী'-বৈজয়ন্তী)। সে'যুগে জ্ঞান মানে বেদ, - যা জীবন ও সমাজকে চতুর্বেদ, চতুরাশ্রম, চতুবর্গ, চতুবর্ণ ইত্যাদি 'চতুর্পদে' (পদ = পালন দানকারী) পর্যায়ভুক্ত করেছিল। এই 'চতুর্পদ বিশিষ্ট রক্ষাকারী জ্ঞান' (কচ্ছপ বা কূর্ম্ম)-কে ভিত্তি করে আদিতে 'সমুদ্রমন্থন' বা সামাজিক পুনর্গঠন / পুনর্বিন্যাস করা হয়। (স্মর্তব্য : জনসমুদ্র, গণসমুদ্র ইত্যাদি শব্দে 'সমুদ্রে'র ব্যবহার)।...

যাই হোক, 'গজ-কচ্ছপের দ্বন্দ্ব' বা সমাজের গণমান্যদের সাথে বেদজ্ঞানীদের দ্বন্দ্ব অমিমাংসিত অবস্থাতেই তাদের 'আইন রক্ষার গুরুভার বহনকারী সত্ত্বা' বা 'গরুড়' গ্রাস করে নেয় (গরুড় : গুরুং ভারং সমাসাদ্য উড্ডীনঃ।... কথিত আছে, ধর্মের বা আইনের অধঃপতন তথা অধর্মের বা অন্যায়ের অভ্যুত্থান হলে আইনব্যবস্থার বা ধর্মের পুনঃস্থাপন করতে ''আইনব্যবস্থার ধ্বজাধারী'র বা 'গরুড়ধ্বজে'র আবির্ভাব হয়।[১৩])

জ্ঞানচর্চা হ্রাস পেলে নিত্যনতুন আবিষ্কারের গতি রুদ্ধ হয় ঠিক, কিন্তু ক্রমাগত দক্ষতার চর্চার ফলে সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে। আর প্রয়োজনের বাড়তি বা উৎবৃত্ত উৎপাদন পরিণত হয় পণ্যে। পণ্য হল 'পুষ্প'। - নিরুক্তে যাকে বলা হয়েছে 'যাজ্ঞ' বা 'যজ্ঞ (কর্মযজ্ঞ) হইতে জাত / বিকশিত'। ফুল ফুটলে বা 'পুষ্পের বিকাশ' হলে বাতাস বা বায়ু গন্ধের মাধ্যমে তার সংবাদ এনে দেয় ('অষ্টদিক ও অষ্টদিগগজ' তালিকা-টি দেখুন), ঠিক যেমন আজও নতুন পণ্য এলেই সংবাদমাধ্যম তার খবর আনে। যে পুষ্প বা পণ্য সীমান্ত 'পেরিয়ে' যাওয়ার জন্য জন্মেছে (জাত) সেই 'রপ্তানিযোগ্য পণ্যে'র নাম 'পারিজাত'। উৎকৃষ্ট পণ্য বা পুষ্প মানুষের মনে পণ্যটির প্রতি 'কামনার উদয়' ঘটায়, তাই সে 'কাম-উদিতি' (যা বহু মুখ ঘুরে ইংরেজীতে 'commodity' হিসেবে থিতু হয়েছে।) পুষ্পের সাথে 'কামনা'র সম্পর্ক আছে বলেই কামদেবের ধনুর নাম 'পুষ্পধনু'। প্রাণীগর্ভে (উৎপন্ন) সন্তার যার মধ্যে থাকে সেই 'placenta' বা গর্ভপরিস্রবকে আজও গ্রামাঞ্চলে 'ফুল' বলা হয়। আর উদ্ভিদের নিজস্ব 'কর্মযজ্ঞ থেকে জাত' হয়ে তার 'পুষ্প'।

যে কোনও পণ্য আবার জন্মসূত্রেই অন্য কোনও পণ্যের সঙ্গে শুধু তার আত্মারই নয়, শরীরেরও বিনিময় করতে প্রস্তুত, - তা সে অপর পণ্যটি উত্তম বা অধম, যা-ই হো'ক না কেন। পণ্যের এই বাস্তববোধের অভাব, পণ্যের মালিক তা পূরণ করে পণ্যের 'মূল্য' নির্ধারণের মাধ্যমে। পণ্যের (পুষ্পের) বিক্রয়মূল্য দ্বারা সম্পদ অর্জিত হয়। তাই সম্পদের দেবতা কুবের-এর রথের নাম 'পুষ্পক'। 'সোনামণির বে' আসলে সোনা-মানিক ও নানাবিধ মূল্যবান বস্তুর বিনিময় পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয়ের 'বিবাহ', মানে 'সামাজিক চুক্তি রচনা'।

তাহলে বোঝা গেল, পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় শুরু হয়ে সমাজের গণ্যমান্যরা ও রাষ্ট্রের কূটনৈতিকগণ 'তালবাদ্য অনুসারে (প্রয়োজনমত, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে) গাত্রনিক্ষেপ' বা নৃত্য করছিল। এই কর্মের স্থান কদমতলা বা 'কদম্ববৃক্ষে'র তল। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, 'পদক্ষেপ' অর্থে 'কদম' শব্দের বুৎপত্তি অন্য। এই নিবন্ধের ক্ষেত্রে তা অপ্রাঙ্গিক। 'কদম্ববৃক্ষে'র কদম্ব-শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'কদি + অম্ব (অম্বচ)'। 'কদি', অর্থাৎ 'কদ'-এর সক্রিয়তা ৯ই)। 'কু' এর সাথে 'অ' যোগ করলে 'কদ' হয় (উদাহরণ : কু + অন্ন = কদন্ন)। 'কদ্' গুণের ধারক/বাহক সত্তা তার দর্শকের কাছে হয় খুব ভাল অথবা খুব খারাপ, - দর্শকের গ্রহণযোগ্যতার সীমার বাইরে।

কিন্তু, 'খুব' কোনও আকার বা আকৃতি বাচক শব্দ নয়। অঙ্কের ভাষায়, তার বিস্তার ভাল-এর দিকে ধনাত্মক অনন্তরাশি বা খারাপের দিকে ঋণাত্বক অনন্তরাশি অবধি। (অনন্তরাশিকে হিন্দুগণিত দর্শনে 'খহর' বা 'শূন্য হর' বলে। খ = মহাশূন্য, আকাশ) এক কথায়, সে ভাল বা খারাপ - কোনও একটি দিকে অসীম। -এ আবার কেমন কথা! কোনও বাস্তব সত্তার তো এমন অসীমতা থাকতে পারে না। বিষয়টিকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা যাক,-

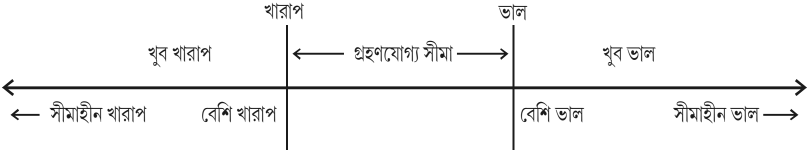

এবার 'অম্ব'-এর পালা। অসীম আকাশের যতটুকু অংশ আমাদের চোখে বা বোধে ধরা পড়ে, তাকে 'অম্ব-র' বলে। এর অর্থ, অস্তিত্বন (অ) -এর সীমায়ন (ম্) কে বহন (ব) করে যে/যা। তার মানে, 'কদ'-তে অসীমতার আভাস থাকলেও 'অম্বে'র কারণে সেই সেই দশা ঘুচল। গ্রহণযোগ্যতার সীমার বাইরে হলেও 'কদম্ব' একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার। উদ্ভিদ কদমগাছ বা কদম্ববৃক্ষের ফুল (পুষ্প!) পুজোয় লাগে না বা 'গ্রহণযোগ্যতার বাইরে'। আর সামাজিক উৎপাদন সে' দেশের মানুষের জন্য নয়, রপ্তানির জন্য।[14] (স্মর্তব্য : কাহিনী অনুযায়ী, সমসাময়িক সমাজে অগ্রহণীয়, অকাম্য ও নিন্দিত রাধা-কৃষ্ণের 'রাসলীলা'র জন্য কদমতলাকে বেছে নিতে হয়েছিল।) অনুমান করা যায়, একসময় সমাজের বিত্তবানরা রপ্তানিমানের মহার্ঘ পণ্য বা 'কদম্ববৃক্ষের পুষ্প' ক্রয় ও প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের প্রাচুর্য বা আভিজাত্য জাহির করত। -সম্ভবতঃ, এই প্রথা থেকে, পুজোয় না লাগলেও, মণ্ডপসজ্জায় বা ক্ষেত্রবিশেষে অঙ্গসজ্জায় 'কদমফুল' ব্যবহারের রীতির সূত্রপাত।

কিছু আগে দর্শনকে 'অংকের ভাষা'য় বা 'রেখাচিত্রের মাধ্যমে' প্রকাশ করার যে চেষ্টা করা হয়েছে, - একনজরে তা অদ্ভুত ঠেকতেই পারে। কিন্তু, mathematics-এর ছাত্র মাত্রে জানে - বিষয়টি আদ্যোপান্ত philosophy বা দর্শন।[15] mathematics-এর গণনা-সংক্রান্ত অংশের নাম 'গণিত' ও তার দর্শন বা philosophy হল 'অংক'। 'অং' থেকে অংক। সেই 'অং' থেকে 'অংরূপীনি' অর্থাৎ, 'যে রূপ অতিসূক্ষ্ম ও রহস্যময়'। 'অ'-এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ 'রহস্যময়তা'। 'ং' কে -দেবনগরী হরফে লেখা হয় 'বিন্দু'র মাধ্যমে (উদাহরণ : অহংকার - अहंकार)। এই 'বিন্দু' অংকের ভাষায়, 'দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতাহীন রহস্যময় অস্তিত্ব'। স্মর্তব্য : 'অংরূপীনি'-র আরেক নাম 'বিন্দুবাসিনী'।

'ং' ছাড়াও ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম -কে (বর্ণগুলির সংশ্লিষ্ট বর্গের অন্য কোনও বর্ণের সাথে যুক্ত হলে) দেবনগরী লিপিতে 'বিন্দু'র মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ : সঙ্ঘ – संघ, রঞ্জন – रंजन, অণ্ড – अंड, সন্ত – संत, সম্ভব – संभव ইত্যাদি। ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম

ধ্বনিগুলিরও ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে রহস্যময়তা বিদ্যমান। ঙ = কারীরহস্য, ঞ = চয়নরহস্য, ণ = টঙ্কাররহস্য, ন = নাকরণ-অনাকরণ রহস্য ও ম = সীমায়ন রহস্য। তাই 'অংক' শব্দের যে বিকল্প বানানবিধি 'অঙ্ক', -সেখানেও তার রহস্যময়তা বা দর্শন উবে যায় না। -এ তো গেল অংকের দর্শন। আর দর্শনের অংক? সেই কারণেই দর্শনের চিরাচরিত আধার, -কাব্য, নাট্য, উপন্যাস ইত্যাদি হামেশাই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়... 'অংকে' 'বিভক্ত' বা 'বিভাজিত' হয়।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি, রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় শুরু হলে সমাজের গণ্যমান্যরা এবং রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ ও কূটনৈতিকগণ এই প্রক্রিয়ার তালে তাল মেলাচ্ছিল। কিন্তু, তার সাথে 'চাঁদ ওঠা'র কী সম্পর্ক?-এই চাঁদ খুঁজতে আকাশে নয়, 'মহাকাব্যিক' ইতিহাসে যেতে হবে।...

শুরুতে গোষ্ঠীবদ্ধ জীব মানুষের যাবতীয় উৎপাদন ছিল সামাজিক সম্পত্তি। দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন বাড়তে থাকে। পাশাপাশি, বিনিময় প্রক্রিয়ার পরিবর্তে কেনা-বেচা চালু হয়। এর ফলে সৃষ্টি হয় উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ। আদি মুদ্রা ছিল গরু, তাই তাকে বলা হত গো-ধন। পরে মুদ্রা হিসেবে সোনা, রূপা, তামা, কড়ি, প্রভৃতি ব্যবহার হতে থাকে। ধনসম্পদ যে রূপেই থাকুন না কেন, তার মালিক ছিল সমাজ, কোনও ব্যক্তি নয়। সকলের তাতে সমান অধিকার। ততদিনে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় সামাজিক ধনসম্পদ পরিণত হল রাষ্ট্রীয় ধনসম্পদে। বর্ণাশ্রম প্রথা চালু হল, -গোড়াতে তা ছিল কাজ-ভিত্তিক, জন্ম-ভিত্তিক নয়। তখন মানুষ তার কাজ অনুসারে সেই ধনসম্পদের অধিকার পেত, (মালিকানা নয়)। তখন ব্যক্তি-মালিকানা বিষয়টি লুকিয়ে চুরিয়ে লালিত হতে শুরু করলেও সমাজ তাকে 'দুর্গন্ধ' হিসেবে দেখত। ধীরে ধীরে তা 'সুগন্ধে'র মর্যাদা পেতে শুরু করে।[১৬]

পুলস্ত গোত্রের মানুষদের দায়িত্ব ছিল সামাজিক ধমসম্পদ রক্ষা ও সমৃদ্ধ করার। 'রক্ষামঃ ইতি যরুক্তম রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ। যক্ষামঃ ইতি যরুক্তম যক্ষা এব ভবন্তুবঃ।।' (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ।) কিন্তু, সমৃদ্ধকারী বা যক্ষরা (যক্ষরাজ = কুবের) সম্পদের সামাজিক কল্যাণকারিতা ভুলে শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য সম্পদ বাড়িয়ে চলে। ('যখের ধন' কথাটির উৎপত্তি সেখান থেকে।) এদিকে রক্ষাকারীরা (রক্ষরাজ = রাবণ) রক্ষিত ধন নিজেই খেয়ে ফেললে, অর্থাৎ 'রক্ষক-ই ভক্ষক হয়ে' পড়লে, তাকে 'নি-ধন' করার প্রয়োজন হয়।

রামায়ণের আদি নাম 'পৌলস্ত-বধ কাব্য'। এই মহাকাব্যে 'লাঙ্গলের ফলায় যার জন্ম'[১৭] - সেই 'কৃষি-উৎপাদন' কে হরণ করে 'রাবণ' নামের সত্তা। যাকে বধ করার পর 'রাম' নামক সত্তা বলছেন, - 'তোমাকে উদ্ধারের কারণ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। তোমাতে আমার আর কোন আসক্তি নেই। যেখানে ইচ্ছা যাও। চাইলে লক্ষণ বা ভরত - যাকে পেলে তোমার সুখ, তাকে বরণ কোরো।'[১৮] এই উক্তি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, রাবণবধের উদ্দেশ্য পত্নিপ্রেম - এই ধারণাটি প্রতীকী।

রক্ষরাজের প্রসঙ্গ যখন এল-ই, তখন বলে রাখা ভাল 'রাক্ষস' আর 'অসুর' কিন্তু এক নয়। তাই বলে সাম্যপন্থী 'অসুর'কে আবার 'দৈত্য-দানব' বুঝে বসলে, 'লৌকিক ইতিহাস' পরিণত হয় 'অলৌকিক কাহিনী'তে।... 'অসুর' শব্দের অর্থের সন্ধানে 'নিরুক্ত' সহ বিভিন্ন শাস্ত্র খুঁড়ে যা পাওয়া যায়, তা হল - 'যার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য, 'যে সুর মানে না', 'যে ইন্দ্রবিরোধী', 'যে সর্বদা অস্থির', 'ইন্দ্রের দ্বারা বিতাড়িত', ইত্যাদি। এরা সেই আদি সাম্যবাদী, যারা অবশ্যই প্রাণশক্তিতে ভরপুর, কেনাবেচা-নির্ভর সমাজের 'সুর' মানে না, মালিকানার (প্রভুত্বের) বিরোধী। কোনও তরল যেমন তার 'সাম্যপন্থা' (সমোচ্চশীলতা) রক্ষার জন্য সবসময় গতিশীল, এরাও সামাজিক সাম্য বজায় রাখতে সদা অস্থির। স্বাভাবিক ভাবেই তারা 'মালিকানায় বিশ্বাসী প্রভু' বা 'ইন্দ্রে'র দ্বারা বিতাড়িত। তারা বারবার প্রভুত্বের 'স্বর্গে' আঘাত হানতে যায়। মজার কথা হল, ঋগ্বেদের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলে প্রায় ত্রিশ বার অগ্নি, রুদ্র, মিত্র-বরুণ, বায়ু, প্রমুখকে অসুর বলা হয়েছে! অসুরদের শ্রদ্ধা-ও প্রদর্শন করা হচ্ছে।[১৯] ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে শুরু হয়েছে ইন্দ্র-অসুর বিরোধের কথা। প্রভুত্ববাদীদের সাথে এই লড়াই-এ অসুরগণ হেরে যায়। ফলে যুদ্ধজয়ীর কাছে পরাজিত মাত্রেই 'বর্বর', তেমনই তারা 'বর্বর, নৃশংস, ভয়ঙ্কর'-জাতীয় ইতিহাসকারের 'blasphemy' -এর শিকার। সম্ভবতঃ, গুপ্তযুগে রচিত 'অমরকোষ'-টিকিয়ে 'অসুরে'র অর্থ হিসেবে সর্বপ্রথম দেব-বিরোধী[২০], দৈত্য, দানব, দনুজ, দৈতেয় - শব্দগুলি লিপিবদ্ধ হয়। প্রশ্ন হল, 'অসুর'গণ 'অ-সুর' কেন?

'সুর' বলতেই মাথায় আসে 'সপ্তসুরে'র কথা। সেই সপ্তসুরকে 'সা-রো-গা-মা-পা - ধা-নি'র মাধ্যমেই কেন প্রকাশ করা হয়, 'ঘা-টে-চ-লে-ধো-পা-নী বা 'বো-মা-ফে-লে-জা-পা-নী' বা অন্য কোনও ধাঁচে নয় কেন?-এই সপ্তসুরের স্বরূপ নীচে দেওয়া হল।-

ষড়জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি

আরও কিছুটা গভীরে যাওয়া যাক[২১];-

সূত্র	প্রচলিত অর্থ	সংশ্লিষ্ট সত্তা	সত্তা-নামের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ / সত্তা-নামের তাৎপর্য	সামাজিক অর্থ (সত্তার গুণধারী মানুষ)
ষড়জ	ময়ূরের ডাক	ময়ূর	সর্প-দের {'সর' বা ধনসম্পদ (cream of society) পালন/ পান (প)-কারীদের} হিংসা করে যে। দেবসেনাপতির বাহন।	সুসজ্জিত সেনাবাহিনী।

ঋষভ	ষাঁড়ের ডাক	বৃষ/ ষণ্ড	বৃষ = বীজ বা সৃজনশীলতা বর্ষণকারী। ষণ্ড = সৃজনশীলতা থাকলেও যে অলস। (বলদের মতো খাটতে চায় না।)	আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, সৃষ্টিশীল সত্তা।
গান্ধার	ছাগলের ডাক	অজ	যে সত্তার সৃজনশীলতা বা 'জনন' নেই, শুধু পুনরুৎপাদনের দক্ষতা আছে। দক্ষ। অধঃপতিত শিব বা শংকর।	পণ্য উৎপাদনকারী দক্ষগণ (experts)।
মধ্যম	বকের ডাক	ক্রৌঞ্চ	যে সত্তা কর্মফল চয়ন করে।	ধনলোভী জ্ঞানবাদী/ ব্রাহ্মণ।
পঞ্চম	কোকিলের ডাক	পিক	যে সৃষ্টি করলেও (ডিম দিলেও) পূর্ণতা দান করে না। পূর্ণপাচিত নয়, অর্ধপাচিত পানের রস।	কাঁচামাল প্রস্তুতকারী।
ধৈবত	ঘোড়ার ডাক	অশ্ব	'অশ' (প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জ্ঞানসার) বহনকারী।	নানাবিধ বিশেষজ্ঞ ও কূটনৈতিকগণ।
নিষাদ	হাতির ডাক	হস্তী	যারা তাদের বিশাল ও নিপুণ 'হস্ত' দিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিক রক্ষা করে।	নানাবিধ গণ্যমান্যগণ।

কল্কিপুরাণ অনুযায়ী ধর্মের রথের সাতটি অশ্বের নাম ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এখানে ধর্ম শব্দটি 'রিলিজিয়ন' অর্থে নয়, সামাজিক নিয়ম বা আইন-শৃঙ্খলা অর্থে। স্মর্তব্য : আজও বিচারককে 'ধর্মাবতার' সম্বোধন করা হয়। 'আইন'-এর ফারসি প্রতিশব্দ 'কানুন'। মজার কথা, 'কানুন' শব্দের আরেকটি অর্থ বীণা-জাতীয় একপ্রকার সুরযন্ত্র![২২] 'সা' থেকে 'নি' স্বর ক্রমশঃ চড়ার দিকে যায়। অর্থাৎ, 'সুর' হল এমন এক 'আইন ব্যবস্থা', -যেখানে সেনাবাহিনীর 'গলার জোর' সবচেয়ে কম। আবিষ্কারক বা উদ্ভাবকদের চেয়ে দক্ষদের স্বর বেশি 'চড়া'। তার চেয়েও চড়া স্বর ধনলোভী জ্ঞানবাদী আর কাঁচামান প্রস্তুতকারীদের আর সবচেয়ে চড়া স্বর বিশেষজ্ঞ-কূটনৈতিক ও নানাবিধ গণ্যমান্যদের।

-এ যেন এক পণ্যবাদী সমাজের আদর্শ চিত্র! এই সমাজ ছিল 'দেবতা'দের অনুকূল। তবে, বৈদিক দেবতা ও পৌরাণিক দেবতা কিন্তু এক নয়। বেদের প্রধান দেবতা হলেন ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য, রুদ্র, মিত্র-বরুণ, বায়ু ইত্যাদি। 'সোম' নামক এক দেবতার উল্লেখ পাওয়া গেলেও সে চন্দ্রদেবতা নয়। চন্দ্র পৌরাণিক দেবতা।... বেশ, তাহলে 'অ-সুর' কারা? তারা থাকতই বা কোথায়? -উত্তর খোঁজার পথে ভারতবর্ষের সামাজিক ক্রমবিকাশের অধ্যায়গুলি বোঝা দরকার;-

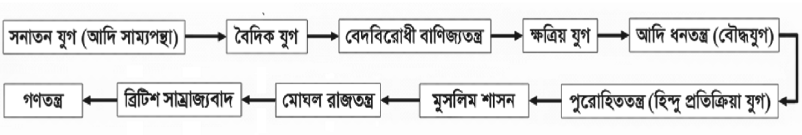

ভারতবর্ষের সামাজিক ক্রমবিকাশ

এবার স্মরণ করা যাক, পারস্যের সম্রাট দারায়ুসের সমাধির কথাগুলি, 'একজন পারসিক, একজন পারসীকের পুত্র, একজন আর্য্য, আর্য্যবংশোদ্ভূত'। এই দারায়ুস তথা আদি পারসিকদের ধর্মের নাম 'মাজদা য়াস্ন/য়ন্স',-যে ধর্মের প্রচারক ছিলেন জরাথুষ্ট। জরাথুষ্ট্রের গোত্রের নাম 'স্পিতামা'। আবার অথর্ববেদের ভার্গব সংহিতা অনুসারে অসুর-গুরু শুক্রাচার্যের গোত্র-ও স্পিতামা!

ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূত্রে 'প্রভুত্বকারী' বা 'ইন্দ্র' নামক সত্তার সাথে 'পার্শব' নামক এক জনগোষ্ঠীর মতবিরোধ, যুদ্ধ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের শেষদিকে এই পার্শবরা একসময় নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়। এই পার্শবগণই আদি পারসিক। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'আবেস্তা' বা 'আর্য্যদের স্থান'। আবেস্তা অনুযায়ী তাদের জন্মস্থানের নাম 'হপ্তহিন্দু' (সপ্তসিন্ধু বা উত্তর ভারত)[২৩]। ইন্দ্রকে তারা শয়তান বলে (আবেস্তা, ১০/৯)। আবেস্তায় সমস্ত কর্মের দুটি চালিকা শক্তির নির্দেশ পাওয়া যায়, -'আহুর মাজদা' (শুভ শক্তি) ও 'অঙ্গর মইন্যু' (অশুভ শক্তি)। আবেস্তা ও বেদ, দুটি পৃথক ভাষায় রচিত হলেও এই ভাষাদুটির উৎস এক। যে'কারণে এই দুটি ভাষার অজস্র শব্দে ধ্বনিগত বা 'ফোনোটিক' সাদৃশ্য দেখা যায়। আবেস্তার 'আহুর' ও 'অঙ্গর মইন্যু' - ঋগ্বেদের 'অসুর' ও 'অঙ্গিরা মুনি'। অঙ্গিরা মুনি নামক সত্তা ছিলেন দেবপূজারীদের গুরু, স্বভাবতই তার /তাদের আদর্শ পার্শবদের কাছে ছিল অগ্রহণীয়।

সুতরাং, শুভ-অশুভের বিচারে আবেস্তা ও ঋগ্বেদের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বৈপরীত্যের কারণ কী? — কথিত আছে, ইন্দ্র ও তার অনুগামীরা ছিলেন 'সমাজভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির' জন্য পশুবলি বা পশুমেধ-এর পক্ষে, পার্শব বা আদি পারসিকরা ছিলেন এই প্রথার বিপক্ষে। কিন্তু এই সামান্য কারণে এত বিশাল এক জনগোষ্ঠী নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে পারে? — এই নিবন্ধে আলোচিত 'অশ্ব', 'হস্তী', 'অজ', 'বৃষ' ও 'মেধ' শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলি বিবেচনা করলেই বোঝা যায় এই বিরোধের মূল কারণ পশুহত্যা নয়, সমাজের সামগ্রিক রীতিনীতি।

পরশুপুরী (পেশোয়ার), মাদ্র (মিডিয়া), পৃথু (ফার্থিয়া), কুরুশ্রাভন (খোরাসন), বহ্লীক (বল্খ), পারস্য (ইরান) ইত্যাদি স্থানে পার্শবেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শুধু পার্শবগণ একমাত্র 'অ-সুর'? পুরাণ অনুসারে অসুররাজ বলির পাঁচ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। তাদের নামেই তাদের দেশের নামকরণ হয়। অঙ্গ মানে পূর্ব বিহার, বঙ্গ মানে দক্ষিণ বাংলা, কলিঙ্গ মানে উড়িষ্যা, পুণ্ড্র মানে উত্তর বাংলা ও সুহ্ম - দক্ষিণ-পশ্চিম

বাংলা। ইন্দ্র-বিরোধীদের একদল চলে গিয়েছিল আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমে আর আরেকদল গিয়েছিল পূর্বে। একদিকে জরাথুস্ত্রীয় ধর্মের উত্থান হলে অন্যদিক তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান হয়ে ওঠে।

দেবতা মানেই 'শুভ' আর অসুর মানেই 'অশুভ'—এই পূর্বকল্পিত ধারণা ছেড়ে প্রাচীন ভারতীয় রচনাগুলিতে উঁকি দিলে দেখা যায় যে, শুভ-অশুভের সমীকরণ মোটেই একরৈখিক নয়। যেমন, গুরুপত্নীর সাথে লিপ্ত হওয়া 'গুরুতর' পাপ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এর শাস্তি সর্বাধিক। মোটামুটি দ্বিতীয় নিকৃষ্টতম পাপ 'ব্রহ্মহত্যা'। কাহিনী অনুসারে ইন্দ্র এই দুই পাপেই দুষ্ট। অহল্যার আখ্যান ও ধ্যানমগ্ন বিশ্বরূপের (বিশ্বকর্মার পুত্র) হত্যার কাহিনী স্মরণীয়। অন্যের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য স্বর্গবেশ্যাদের নিয়োগ করার উদাহরণ-ও ইন্দ্রের কম নয়। অন্যদিকে প্রহ্লাদ, বলি প্রমুখ অসুরের ধর্মপরায়ণতা বিখ্যাত। তারকাসুরের তিন পুত্র বা মহিষাসুরের তপস্যাও স্মরণীয়।...

ঋগ্বেদে কয়েকশো (হাজার-ও হতে পারে) বার প্রভুত্বকারী বা ইন্দ্র-সত্তার সোমরস প্রেমের কথা বা তাকে সোমরস উৎসর্গ করার নির্দেশ পাওয়া যায়। ('সোম' শব্দের একটি অর্থ 'চন্দ্র') সোমরস মাদকতা আনে। প্রভুত্বকারীর মাদকতা কিসে হয়? - প্রভুত্বে বা ব্যক্তিমালিকানায়। (জরাথুস্ত্রীয়রা 'হাওমা' বা সোম-পানের বিরোধী।) বেদে 'সোম' সোমরস। কিন্তু, বাণিজ্যতন্ত্রের যুগে ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিপুঁজির বিকাশের সাথে সাথে এই সোম 'চন্দ্রদেবতা' হিসেবে উল্লেখিত হতে থাকেন। চন্দ্রের ষোলটি কলা। দেখা যাক কী কী[২৪];-

কলা	কলা-নামের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ / তাৎপর্য
অমৃতা	অমরত্ব দানকারী 'অমৃতে'র 'আধার' (আ)। যজ্ঞশেষের পুরোডাশাদি (মনুসংহিতা), ধন, ঘৃত, অন্ন বিষমাত্র, সুরা, অতিবিষ ইত্যাদি। (বণিকের নাম 'অমরত্ব' পায় তার পণ্য, সম্পদ ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে)।
মানদা	মান দান করে যা / যে। কৌলীন্য, পরিমাপ, গোঁসা / গুমোর ইত্যাদি দান করে যা / যে।
পূষা	'পূষ'-এর (প্রদানকারীর দিশাগ্রস্ত শক্তির) আধার (আ)। ('পূষ' থেকে আধুনিক 'পোষা') ধনসম্পদ বা জ্ঞানসম্পদের কেন্দ্র।
তুষ্টি	সন্তোষ বা প্রীতির সক্রিয়তা (ই) যা'তে।
পুষ্টি	সম্পূর্ণতা, সন্তুষ্টি, পূর্ণতা ইত্যাদির সক্রিয়তা (ই) যা'তে।
রতি	রত + ই (সক্রিয়ন)। কর্মে নিযুক্ত/লিপ্ত/অর্পিত (invested) বা 'রত' হওয়া। (স্মর্তব্য : আরতি, বিরতি, অবিরত, কর্মরত ইত্যাদি শব্দগুলি।)

ধৃতি	সুখ, আশ্রয়, শরণ, ব্যভিচারভাব বিশেষ। মানসিকতার বন্দিত্বের (ধৃত) সক্রিয়তা (ই) যা'তে।
শশিনী	'শশ-গুণ' বা দ্রুত / আকস্মিক / (লাফিয়ে লাফিয়ে) আকার বৃদ্ধির / হ্রাসের গুণ সক্রিয় যা'তে। ('শশক বা খরগোসের চিহ্ন বুকে ধারণ করে বলে চাঁদের আরেক নাম শশধর', -এই জোর করে মিলিয়ে দেওয়া ব্যাখ্যাটি আধুনিক যুগের সংযোজন। চাঁদের পিঠে আলো-ছায়ার খেলাকে শুধু খরগোস কেন, আরও অনেক কিছুর-ই আবয়ব হিসেবে কল্পনা করা যায়। আশৈশব 'চাঁদের বুড়ি'র গল্প শোনানোর পর, একমাত্র এই 'শশধর' শব্দটির ন্যায্যতা 'প্রমাণ' করার সময় সেই বুড়ি হঠাৎ খরগোসে পরিণত হয়!)
চন্দ্রিকা	আনন্দদায়িনী, বিশদব্যাখ্যা ইত্যাদি।
কান্তি	'কান্ত' (কাম তাড়িত হয় যা'তে বা যা'কে সবাই কামনা করে) - এই সক্রিয়তা (ই) যা'তে।
জ্যোৎস্না	জ্যোতির্যুক্ত কাল। নিজস্ব নয়, '-জনিত' বা প্রতিফলিত আলো।
শ্রী	অভ্যুদয়, বৃদ্ধি, উদয়, ঐশ্বর্য্য, প্রভুভাব, অধিকার ইত্যাদির প্রকাশ।
অক্ষদা	'অক্ষ' দান করে যা / যে। অক্ষ = যা ব্যাপ্ত করে।
পূর্ণা	'পূর্ণ' (আরক্তি, সামগ্রিকতা, আকর্ষণ ইত্যাদি) - এর আধার (আ)।
পূর্ণামৃতা	পূর্ণ + অমৃতা, বা 'অমৃতা' - কলার পূর্ণ রূপ / ভাব।

একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, চন্দ্রের ষোলোটি কলা ব্যক্তি-পুঁজির বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট-বাচক। উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে মধ্যবিত্তের আতঙ্ক উদ্রেককারী শব্দ 'চাঁদা'-র দিকে খেয়াল করলেই ব্যক্তি-পুঁজির সাথে 'চাঁদে'র সম্পর্ক হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়া যায়! বহুক্ষেত্রেই এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করা হয় 'চন্দ্রাতপ' বা 'চাঁদোয়া'র তলায়। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের আতপ বা রৌদ্র থাকে না। এই প্রথার তাৎপর্য হল — ব্যক্তি পুঁজির ছত্রছাত্রায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা। যাই হোক, আদিতে এই ব্যক্তি-পুঁজির কারবারীরা নিজের নামে 'চাঁদ' বা 'চন্দ্র' শব্দগুলি প্রয়োগ করত।[২৫] (স্মর্তব্য : 'চাঁদ সদাগর' নামটি।) 'প্রচলিত প্রথার বিপরীতে চললে' বা 'বামন' হলে ব্যক্তি-পুঁজির বা বণিক-পুঁজির নাগাল পাওয়া যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ব্যক্তি পুঁজিকেই বণিক পুঁজি বলা হচ্ছে কেন? — পুঁজির উৎসের কারণে। বিক্রয়যোগ্য বিষয়টি 'পণ্য'ই হোক কি 'শ্রম' অথবা 'মেধা', পুঁজি উপার্জনের সময় কোনও না কোনও রূপে যে কর্মটি সম্পাদন হচ্ছে তা হল বাণিজ্য। এমনকি আজও যার শ্রম আছে সে শ্রম বিক্রি করে, যার মেধা আছে সে বিক্রি করে মেধা আর বাকিরা বিক্রি করে এই দুই পক্ষের শ্রম ও মেধার প্রয়োগে উৎপাদিত পণ্য।

চন্দ্র যেমন ব্যক্তি-পুঁজির প্রতীক, তেমনি সূর্য্য রাষ্ট্রীয় পুঁজির প্রতীক। পতাকায়, মুদ্রায় বা বিভিন্ন প্রাসাদে রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে 'সূর্য্যে'র ব্যবহার অতীতে তো বটেই, আজও দেখা যায়। পুরাণ ও মহাকাব্যদ্বয় অনুসারে প্রথমে সূর্য্যবংশের (ইক্ষ্বাকু) রাজত্ব ছিল, পরে চন্দ্রবংশের (যাদব ও কুরুবংশ)। অর্থাৎ, আদি ভারতবর্ষে প্রথমে 'পরিকল্পিত-অর্থনীতি' - (Planned Economy) জাতীয় কোনও ব্যবস্থা চালু ছিল, কিন্তু পরবর্তিকালে 'বাজার-অর্থনীতি (Market Economy) - জাতীয় ব্যবস্থা চালু হয়।

মহাভারত অনুসারে রামচন্দ্রের (সূর্য্যবংশ) ঊনত্রিশতম পুরুষ বৃহদ্বল কৌরবপক্ষে যোগ দেয় এবং যুদ্ধে তাকে 'নি-ধন' করা হয়। —এর তাৎপর্য হল, রাষ্ট্রের পুঁজি একসময় বাজার-অর্থনীতিতে প্রবেশ করলে তা 'নি-ধন' বা ধনহীন হয়ে পড়ে। এদেশের প্রাচীন অর্থনীতিতে ব্যক্তি / বণিক-পুঁজির রমরমা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বৌদ্ধযুগে শ্রেষ্ঠী-শ্রেণীর উত্থানের মাধ্যমে তা চরমে ওঠে। বৌদ্ধযুগের পতনের পর পুরোহিততন্ত্রের কালে হিন্দুযুগের প্রতিষ্ঠার সময় সেই রমরমা কমে যায়। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা বা 'কালাপানি' ধর্মীয় ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মধ্যযুগে শুরু হওয়া বৈষ্ণব আন্দোলনকে গোঁড়া হিন্দুরা মোটেই ভাল চোখে নেয় নি। ঘটনাচক্রে, সংখ্যাগুরু বৈষ্ণবদের জীবিকা ছিল বাণিজ্য।

আমাদের ছড়াটি তাহলে বণিক বা ব্যক্তি-পুঁজির ছত্রছায়ায়, বিশেষজ্ঞ-কূটনৈতিক ও নানাবিধ গণ্যমান্যদের পৌরোঃহিত্যে রপ্তানি বা বৈদেশিক বাণিজ্যের 'গৌরবগাথা'। কিন্তু, এই ছড়াটির আরও দুটি পাঠান্তর পাওয়া যায়।- যেখানে 'সোনামণির বে' শব্দবন্ধটির পরিবর্তে একটি ক্ষেত্রে 'খেঁকশিয়ালের বিয়ে', ও আরেক ক্ষেত্রে 'ঘোমটা তুলে দে' শব্দবন্ধগুলি দেখা যায়। -কেন?

শেয়াল/শিয়াল/শৃগাল অপরের শিকার বা পরিশ্রম লব্ধ ফল চুরি করতে অভ্যস্ত। স্বভাবশতঃ, সে 'চাঁদ উঠলে' (ব্যক্তি / বণিক পুঁজির উদয় হলে) হাঁকডাক শুরু করে। এছাড়া 'শৃগাল' শব্দটি চিরকাল-ই ধূর্ততার সাথে সম্পর্কিত। লৌকিক ছড়া লৌকিক ইতিহাসের গাথা, লোকমুখেই তার সৃষ্টি, লোকমুখেই তার প্রচার। লোকজীবনের কোনও রকম উত্থান-পতন, ধারা বদল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে না। বেদবিরোধী বাণিজ্যিক সমাজতন্ত্রে বাণিজ্যকর্মে ধূর্ততার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ফলে বাণিজ্যের চিত্র ও চরিত্র, দুই-ই বদলাতে শুরু করে। এই পালাবদলের ছায়া দেখতে পাওয়া যায় ছড়াটির বয়ানে।

আর 'ঘোমটা তুলে দেওয়া', অর্থাৎ 'সব আড়াল চুকে যাওয়া' বা 'দৈহিক/মানসিক ভাবে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া' যে পণ্যবাদের বড়বাড়ন্তের অবশ্যম্ভাবী ফল, -আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে তা আর নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে আধুনিক পৃথিবীতে পণ্যবাদের প্রতাপ ক্রমশঃ বেড়েছে। মানসিকভাবে উলঙ্গ হওয়া না হয় তর্কাধীন বিষয়, কিন্তু প্রতি দশকে (প্রতি বছরে না হলেও) দেহকে নিরাবরণ করার প্রবণতা

ও সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা যে ক্রমশঃ বেড়েছে — সে বিষয় সমর্থনযোগ্য নাকি নিন্দনীয়, সেই তর্কে না গেলেও 'ঘোমটা তোলা'র বাস্তবতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

মানবসমাজের হাবভাব অনেকটা রসায়নের স্বয়ংক্রিয় অনুমাপন (Titration) প্রক্রিয়ার মতো। অম্লের গাঢ়ত্ব যত বাড়ে, প্রশমনের জন্য তত কড়া ক্ষার যেন আপনা থেকেই জন্ম নেয়! যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সমাজের এক দলের আবরণ যত উন্মুক্ত হয়, আরেক দল হয়ে ওঠে ততটাই কট্টরপন্থি। তার চেহারা ধার্মিক বা রাজনৈতিক যা-ই হো'ক না কেন, তারা দাঁত-নখ বার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুঃখজনক হলেও এটিই হয়তো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ বা সাম্প্রতিকতম সংবাদপত্র, সর্বত্রই এই আঁচড়-কামড়ের দাগ! এই দুই দলের কোনও এক দলের পক্ষপাত কি নিরপেক্ষতা বা উদাসীন থাকাও একেবারেই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। কারণ, (রবীন্দ্রনাথের কথায়) 'নিজের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটানো থেকে নিজের সর্বনাশ করা পর্যন্ত পুরোটাই ব্যক্তিস্বাধীনতার এলাকার মধ্যে পড়ে।' তার পরিণতি?... লোভ-কে আকাঙ্ক্ষা আর ভোগ-কে প্রাপ্তি ভাবার ভুল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'শরীর বলতে তো হাঁ-করা মুণ্ড আর আজানুলম্বিত একটি পেট'! সমাজে আগুন লাগলে গায়ে আঁচ লাগবেই। তাই নিরপেক্ষতা বা উদাসীনতা খুব একটা কার্যকর দৃষ্টিকোণ নয়।

সামাজিক ক্রমবিকাশ ও মানুষের 'ভাগ্য' পরিবর্তন ঘটেছে একই ধারায়। সনাতন যুগের আগে মানুষ যাবতীয় সামাজিক উৎপাদন নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে 'ভাগ' করে নিত। এই 'ভাগে' পাওয়া সম্পদ ছিল তার 'ভাগ্য' { ভাগ্ + য (যাওয়ান / যোগ্যতা / যুজ্ ধাতু)}। সনাতন যুগের জ্ঞানী-কর্মীর যৌথসমাজে মানুষ নিজের কাজের (কর্মের) বিনিময়ে ও কাজের পরিমাণ অনুযায়ী ভাগ পেত। তখন 'ভাগ্য' হল 'কর্মফল'।

বৈদিক যুগে সম্পদের অধিকার ছিল বর্ণাশ্রম অনুযায়ী। চতুর্বর্ণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে সাদা, লাল, হলুদ ও কালো বর্ণের তিলক ধারণ করত। নিজ-নিজ গোষ্ঠী বা গোত্র অনুসারে সেই তিলকের নকশা পরিবর্তন হত। আজও বৈষ্ণবদের মধ্যে যে প্রথা দেখা যায়। তিলক আঁকা হয় কপালে বা ললাটে। সে'যুগে তিলক দেখে মানুষের সামাজিক অবস্থান ও সেই সাথে সামাজিক সম্পদের কতটুকু 'ভাগ' তার অধিকারে যাবে, তার নির্ণয় হত। তাই এই সময় থেকে 'ভাগ্য'-কে 'ললাটলিখন' বা 'কপালের রেখা' হিসেবে উল্লেখ করা শুরু হল।

বাণিজ্যতন্ত্রের যুগে শুরু হল 'ভাগ্য'-এ বিভিন্ন 'গ্রহ-নক্ষত্রে'র প্রভাব। এই 'গ্রহ-নক্ষত্র'রা হলেন সূর্য্য (রাষ্ট্রীয় পুঁজি), চন্দ্র (বণিক পুঁজি), বুধ (চন্দ্রবংশ বা বণিকপুঁজির পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিষ্ঠাতা), মঙ্গল (চিরপ্রচলিত আচার, যা কল্যাণকারী), বৃহস্পতি ('সুর' বা বাণিজ্যের উপযোগী আইন-ব্যবস্থার গুরুগণ), রাহু (রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও বণিক পুঁজি — উভয়কেই যে 'গ্রাস' করতে চায়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা), শনি (যার দৃষ্টি পড়লে কিছু না কিছু মূল্য চোকাতেই হয়, -জরিমানা, রাজস্ব / শুল্ক সংগ্রাহক), ইত্যাদি।[২৬]

শিকড়ছিন্ন হয়ে গাছ বাঁচে না। ইতিহাস-বিচ্যুত হলে সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারে না সমাজও। তবে 'ইতিহাস' হিসেবে সাধারণত আমরা যা মুখস্থ করি সেই সব তথ্যসমৃদ্ধ ব্যক্তিনাম ও সাল-তারিখের ভারে, এই ছড়াটি বা তার গর্ভস্থ অর্থ কোনোভাবেই ন্যুব্জ নয়। কিন্তু, সে কি অবহেলার বিষয়? অতীতকে প্রায়শঃই আমরা সুবিধাজনক রেফারেন্স ফ্রেমে করেছিলেন' - বক্তব্যটি যে মুহূর্তে মূলতঃ 'মুখস্থযোগ্য' তথ্যে রূপান্তরিত হয়, সেই মুহূর্ত থেকে বোধহয় একটি অবচেতন ধারণাও জন্মায় যে কলিঙ্গ আক্রমণ অতীতে হয়েছিল, বর্তমানে তার বিশেষ কিছু গুরুত্ব নেই। সম্রাট/বাদশাহ/রাজা/নবাব-কেন্দ্রিক কাহিনীতে বা স্থান-কাল-পাত্রের মাত্রায় ইতিহাস সীমাবদ্ধ রয়ে গেলে পুনরাবৃত্তি'র কথা জানলেও হয়তো তার অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

'কালক্রমে সব অলঙ্কার-ই ধ্বংস হয়, চিরকাল রয়ে যায় কেবল বাগ্-অলঙ্কারই।'[২৭]... বাণিজ্যতন্ত্রের নির্ধারিত ভাগ্য মোটামুটি আজও আমাদের নিয়ন্ত্রক। ফলাফলও বোধহয় অজানা বা অচেনা নয়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের উপলব্ধি বিভিন্ন রূপে লিপিবদ্ধ বা বাক্যবদ্ধ করে রেখেছেন। গতানুগতের বাইরের সেই ইতিহাস বা জ্ঞানভাণ্ডারকে এখন পুনরুদ্ধার বা হৃদয়ঙ্গম করব কিনা, সে সিদ্ধান্ত আমাদেরই।

তথ্যসূত্র :

১। সূত্র : 'বাংলা ছড়ায় সমাজ-ভাবনা' - দেবাশিষ বসু।

২। বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য পঠিতব্য : 'গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাজ : উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য' - অধ্যাপক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। অধা হি বিক্ষ্বীড্যোহসি প্রিয়ো নো অতিথিঃ। রণ্বঃ পুরীব জূর্যঃ সূনুর্ণ ত্রয়য়ায্যঃ।। - ঋগ্বেদ, ৬.২.৭।... যথা বঃ স্বাহাগ্নয়ে দাশেম পরীলাভির্ঘৃর্তবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ। তেভির্নো অগ্নে অমিতৈর্মহোভিঃ শতং পূর্ভিরায়সীভির্নি পাহি।। - ঋগ্বেদে, ৭.৩.৭।... শৃন্বন্ত্বাপঃ পুরো ন শভ্রাঃ পরি স্রুচো ববৃহাণস্যাদ্রেঃ। - ঋগ্বেদে, ৫.৪১.১২।

৪। সূত্র : Indigenous Indians : Agastya to Ambedkar by Koendraad Elst.

৫। তথ্যসূত্র : Dept. of Archaeology and Museums, Govt. of Pakistan, Oxford University ও National Geographic.

৬। 'অশ্বঃ কস্মাদশুতেহধ্বানং মহাশনো ভবতীতি বা।।' - নিরুক্ত।

৭। '...চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক। শশ মৃগ বৃষ অশ্ব সন্তোষদায়ক।...' - রায় গুণাকর ভরতচন্দ্র (রসমঞ্জরী, 'পুরুষ জাতি কথন')। কবি ভরতচন্দ্র সংস্কৃত ও পারসিক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তার পাঠ্যের বিষয় ছিল সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান।

৮। 'অশ্' শব্দের বিভিন্ন অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য : বঙ্গীয় শব্দকোষ - হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়।

৯। 'মেধ' মানেই কিন্তু নিছক 'মাথা কেটে নেওয়া' নয়। ঘটনাচক্রে, 'উৎসর্গ করা' মানেও শুধু 'বলি দেওয়া' নয়। 'মেধ্'-এর একটি অর্থ 'সঙ্গম'। (প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম - রঘুবংশ)

সঙ্গম ভাবগত ভাবে একটি সৃষ্টিশীল ক্রিয়া। তাই মানুষের সৃষ্টিশীলতা (মেধ্) এর আধার (আ)-কে 'মেধা' বলা হয়।

১০। সূত্র : নিরুক্ত, অমরকোষ, পৌরাণিক অভিধান - সুধীরচন্দ্র সরকার, বঙ্গীয় শব্দকোষ - হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ - কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, ছাত্রবোধ অভিধান, সংসদ বাংলা অভিধান, সংস্কৃত বাংলা অভিধান - অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। বেদোক্তন যাজদেবীং কামসংকল্পপূর্ব্বকর্ম্ম। স এব বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স উচ্যতে।।

১২। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রান্তে এই সামাজিক দিশা পরিবর্তন আগে-পরে ঘটেছিল। যে'কারণে দেশগুলি আলাদা হলেও তাদের মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ বা প্রাচীন লৌকিক কাহিনীগুলিতে অদ্ভূত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী বিপ্লবের সময় সে'দেশের সেই আদি ইতিহাসের পরম্পরায় রাজতন্ত্রের ও পুঁজিবাদের সমর্থকরা আইনসভার ডানদিকে, আর সামাজিক সমতার সমর্থকরা ও পুঁজিবাদের বিরোধীরা আইনসভার বামদিকে বসতে শুরু করে। সেই থেকে রাজনৈতিক মেরুদুটির নামও 'rightist' (দক্ষিণপন্থী) ও 'leftist' (বামপন্থী) হয়ে যায়। বামদিক বলতে উত্তরদিক-ও বোঝায়। উত্তর শব্দের আরেকটি অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব। যে ধারা বা পন্থা পরিত্যক্ত হয়েছে, তাকে শ্রেষ্ঠ বলা যুক্তি যুক্ত নয়। তাই 'বামদিক' বলতে 'উত্তরদিক' বোঝালেও 'উত্তরপন্থা' বা 'উত্তরপন্থা' শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় না।

১৩। 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'-শ্রীমদ্ভগবদগীতা। (বিষ্ণুর অপর নাম গরুড়ধ্বজ।)

১৪। সূত্র : বঙ্গীয় শব্দকোষ ও বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

১৫। সন্দেহের অবকাশ না হলে পঠিতব্য G. H. Hardy-এর 'A Mathematician's Apology', Edwin A. Abbott -এর 'Flatland : A Romance of Many Dimensions', Imre Lakatos-এর 'Proofs and Refutations' ইত্যাদি।

১৬। ব্যক্তি-মালিকানার দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ কী? .... 'ছিঃ, লোকটা দিনরাত শুধু টাকা-টাকা করে'! — এ হল ব্যক্তিমালিকানার দুর্গন্ধবোধ। আর 'বাহ্, লোকটা তো অনেক টাকা কামিয়েছে!'—এ হল ব্যক্তিমালিকানার সুগন্ধবোধ। ব্যক্তিমালিকানার প্রতি মনোভাবের এই পরিবর্তন মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে 'মৎসগন্ধা' থেকে 'পদ্মগন্ধা'য় পরিণত হওয়ার কাহিনীতে।

১৭। সীতার নামকরণে কৃষিকথার নির্দেশ দেখা যায়। সীতা বসুন্ধরা-কন্যা, সে হলরেখ (হল/ লাঙ্গলের রেখা।) হল বা লাঙ্গলের রেখা পড়ে জমিতে। সেই জমির মাটি ছুঁয়ে যে ফল হল, - সেই 'কুমড়ো'র আরেক নাম 'সীতাফল'। সীতাপুত্রের নাম লব ও কুশ। 'লব' শব্দের একটি অর্থ 'শস্যচ্ছেদন' আর 'কুশ' শব্দের অন্যান্য অর্থগুলি হল 'নবজাত ধান', 'বিশেষ প্রকার তৃণ ইত্যাদি (বঙ্গীয় শব্দকোষ)। ঋগ্বেদে সীতা নামটির উল্লেখ আছে। সীতা সেখানেও হলরেখ; মূর্তিমতী কৃষিশ্রী। অথর্ববেদের কৌশিক সূত্র (১৪.৭) অনুযায়ী সীতা 'পর্জন্য পত্নী' বা 'মেঘ-পত্নী। পারস্কর গুহ্যসূত্র অনুযায়ী সীতা 'ইন্দ্রপত্নী'। 'ইন্দ্র - যিনি প্রভুত্ব করেন' (বঙ্গীয় শব্দকোষ)। কথিত আছে, শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়।

অর্থাৎ, একশতবার পররাজ্য গ্রাস, নিজের রাজকোষে ধনসম্পদ পুঞ্জীকরণ, রাজ্যের সীমা ব্যাপ্তকরণ, (নিবন্ধে 'অশ্ব' শব্দের অর্থ দেখুন) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রভুত্ব লাভ হয়। কৃষিভিত্তিক সমাজে ইন্দ্রত্ব বা প্রভুত্ব লাভের উপায় কৃষি-প্রক্রিয়ার 'স্বামী'/মালিক হওয়া। সীতার 'কৃষিশ্রী'-রূপকে কেন্দ্র করে রামায়ণ রচিত হয়েছে।

১৮। 'যদর্থং নির্জিতা মে ত্বং সোহয়মাসাদিতং ময়া। নাস্তি মে ত্বয্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতি। তদস্য ব্যবহৃতং ভদ্রে ময়েতৎ কৃতবুদ্ধিনা। লক্ষণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্।।' -রামায়ণ ৬/১১৫/২১-২২।... বা 'সূর্য্যবংশে জন্ম, দশরথের নন্দন। তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন। তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে। যথা তথা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে। এই দেখ সুগ্রীব বারণ-অধিপতি। ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি। লঙ্কার ভূপতি এই বীর বিভীষণ। ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন। ভরত শত্রুঘ্ন মম দেশে দুই ভাই। ইচ্ছা হয় থাক গিয়া তাহাদের ঠাঁই।।'—কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

১৯। 'ঘৃতপ্রসত্তো অসুরঃ সুশেবো রায়ো ধর্তা বস্বও অগ্নিঃ' - ঋগ্বেদ, ৫.১৫.১।

২০। দেবতা - 'যার দানে আমরা তুষ্ট হই' বা নিরুক্ত মতে 'যে ঐশ্বর্য এবং ঈপ্সিত বস্তুগুলি দান করেন'। স্মর্তব্য : পিতৃদেব, মাতৃদেবী, পতিদেবতা, গণদেবতা, ইত্যাদি শব্দগুলি। লেখক কলমের দানে, পাঠক বই-এর দানে, গায়ক বা নর্তক মঞ্চের দানে, ক্রীড়াবিদ মাঠের দানে... তুষ্ট হয় বলে কলমকে, বইকে মঞ্চকে, মাঠকে....'দেবতাজ্ঞানে প্রণাম' করার রীতি।

২১। সূত্র : বঙ্গীয় শব্দকোষ, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ।

২২। সূত্র : 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান'-মোহাম্মদ হারুন রশিদ।

২৩। পূর্ববঙ্গীয় সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষ্যে 'শ', 'ষ' বা 'স' কে 'হ' উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন 'সকল' থেকে 'হগ্‌গল', 'সকাল' থেকে 'হকাল', 'সনে' (সঙ্গে) থেকে 'হনে' 'সড়ক' থেকে 'হড়ক্', 'সেই দিকে' থেকে 'হদিকে'... (দ্রষ্টব্য : 'বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান')। বেশ কিছু ক্ষেত্রে নতুন শব্দগুলি আভিধানিক স্বীকৃতিও পায়। - যেমন 'সপ্তাহ' থেকে 'হপ্তা'।

২৪। সূত্র : পৌরাণিক অভিধান, বঙ্গীয় শব্দকোষ, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ।

২৫। জীবিকা অনুসারে পদবীপ্রাপ্তির আরও উদাহরণ : দুই/তিন/চারটি বেদ অধ্যয়নকারীদের পদবী হয় দ্বিবেদী/ত্রিবেদী/চতুর্বেদী। কাব্য/ব্যাকরণ/তর্কশাস্ত্র/ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিতের পদবী হয় কাব্যতীর্থ/ব্যাকরণতীর্থ/তর্কালঙ্কার/ন্যায়তীর্থ। একই ভাবে সেন, সামন্ত, গোস্বামী, কবিরাজ, চক্রবর্তী, বিশ্বাস, সরকার, মণ্ডল, হালদার, মজুমদার, চৌধুরী, পুরকায়স্থ, বণিক, সদাগর, গোপ, সাঁপুই, গায়েন, গোপালন, মোদক... পার্সিদের দারুওয়ালা, স্ক্রুওয়ালা, বাটালিওয়ালা ইত্যাদি পদবীর সৃষ্টি। এমনকি, ইঞ্জিনীয়র-এর মতো শব্দও পদবীতে পরিণত হয়েছে, যথা, - ফারুখ্ ইঞ্জিনীয়র। (সূত্র : 'আমাদের পদবীর ইতিহাস' - লোকেশ্বর বসু।)

২৬। সূত্র : বঙ্গীয় শব্দকোষ, বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ।

২৭। '...বাণ্যেকা সমলঙ্করোতি পুরুষং যা সংস্কৃতা ধার্যতে ক্ষীয়ন্তে খলু ভূষণানি সততং বাগ্‌ভূষণং ভূষণম্।।' - ভূর্তৃহরি'র নীতিশতক (১৯)।

সাহিত্যে সমাজবাস্তবতা

সেলিম বক্স মণ্ডল*

Literature is the mirror of life"— সাহিত্য আলোচনায় প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যদিও বিষয়টি অত সরল নয়, এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি অন্যরকম। এ প্রসঙ্গে দুজন নোবেলজয়ী সাহিত্যিকের ভাবনা যথার্থ। একজন হলেন রবীন্দ্রনাথ (১৯১৩), অন্যজন হলেন ইতালীর লইজি পিরানদেলো (১৯৩৪)। সাহিত্য-দর্পণে সামাজিক হৃদয় নিজেকে আবিষ্কার করে। ব্যক্তির ছোট নদীর সীমানা ছাড়িয়ে ব্যষ্টির সমুদ্রে নিজেকে মেলাতে চায়। সাহিত্য সামাজিক বোধের ত্রিকাল দর্শনের প্রতীক। মানুষ তার নিজের সময়কে, সময়ের স্পন্দনকে, অতীতকে চিনে নিতে চায়, বুঝে নিতে চায়, তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সাহিত্যের। মানুষের অতীত ইতিহাসচারণা থেকে মানব সমাজের মননশীল আত্মানুশীলন- অনুধাবনের পথ ধরেই এগিয়েছে সাহিত্য, বিতরণ করেছে অপার আনন্দ। সাহিত্যকে আনন্দের সামগ্রী করে তুলতে গেলে সাহিত্য স্রষ্টাকে তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়, কল্পনার দ্বারা নতুনকে যোগ করতে হয়। প্রকৃতির রাজ্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে রেখে এবং ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে। তাই বলে সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্সি নহে।' (সাহিত্য : সাহিত্যের বিচারক, রবীন্দ্রনাথ) রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য মনে প্রতিফলিত প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রতিফলন। এই প্রতিফলনের প্রতিফলন মূল থেকে বহু দূরবর্তী। তবে তা অবাস্তব নয়। সাহিত্যের উপাদান বাস্তব হতে পারে তবে তা নেহাৎ উপাদান। সাহিত্য বাস্তবতা হল জগৎ ও জীবনকে দেখার একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি একটা বিশেষ রীতি। বাস্তব জীবনের নরনারীর জীবন চিত্র আঁকলে বা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনার হুবহু বর্ণনা করলে কিংবা তথ্যের বর্ণনা নিখুঁত করলেই যথার্থ শিল্পের মর্যাদা পাওয়া যায় না। জীবনকে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে মানুষ, ঘটনা, প্রাকৃতিক দৃশ্য— সব কিছুই যখন একটা বিশেষ জীবনবোধকে প্রকাশ করে তখনই তা হয়ে উঠে দার্শনিক মনোভাবাপন্ন শিল্পীর শিল্প। এ ধরনের শিল্পে থাকে বিশ্বজনীন মূল্য। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন 'রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে এরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলিত হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়।' 'Relaism is letirature is an attitude which purports to depictlis and to reproduce nature. in all as pecto, as facthfully as possible' (Encyclopade of leterature)। সাহিত্যের প্রচলিত বাস্তববাদকে প্রশ্নের মুখে দাঁড়

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জওহরলাল নেহেরু মহাবিদ্যালায় পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান।

করিয়েছেন ইতালীর সাহিত্যিক, নোবেলজয়ী লুইমি পিরানদেলো (১৮৪৯)। তাঁর প্রশ্ন আর্টের নামে আসলের নকল সৃষ্টি করে লাভ কি? রবীন্দ্রনাথ 'প্রাকৃত সত্য' এবং 'সাহিত্যের সত্য'-এই দুইয়ের পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। পিরানদেলোও 'দৃষ্ট বাস্তব' এবং 'শিল্পের বাস্তব'-এর পার্থক্যের কথা বলেছেন। পিরানদেলো বিষয়টিকে 'Actuabtg' ও 'Realite' শব্দের দ্বারা পৃথক করে বলেছেন, জীবনে যা ঘটে তা 'Actuality' আর শিল্পে যে জীবন প্রকাশ পায় তা 'Keality'। Art actral-কে real-এ পরিণত করে। কবি যখন প্রত্যক্ষ জীবনকে, কোনো বস্তুকে তাঁর কল্পনার দ্বারা নতুন করে সৃষ্টি করেন তখন তা আর্টে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষ জীবন actuality আর আর্ট হচ্ছে realty/actiual ঘটনাবলী কিভাবে real হয়ে ওঠে। সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে তা একটি নির্দিষ্ট সময়কাল বা বিশেষ কোনো ঘটনাকে সামনে রেখে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

ষাট-সত্তর দশক আর নকশালবাড়িকে সামনে রেখে actual ঘটনার প্রখর উত্তাপে real হয়ে সাহিত্যে কিভাবে জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে তাই-ই এ আলোচনার মূল ভরকেন্দ্র। স্বাধীনতা পরবর্তী অন্যকোনো ঘটনা বা আন্দোলনই এত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় উত্তাল হয়েছে বলে মনে হয় না। এত ব্যাপক জনমানসে প্রভাব (ভাল কিম্বা খারাপ) বিস্তার করেছিল যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল ভয়ঙ্কর উন্মাদনা। উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল গোটা দেশ। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নকে বুকে লালিত করে, তারুণ্যের অসীম শক্তিকে (সে শক্তি সৃষ্টি না ধ্বংসে ব্যয় হয়েছে তা বলবে সময়) সত্তর দশক হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের দশক, অগ্ন্যুদগীরণের দশক। সমর্থকেরা বলবেন মুক্তির দশক অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীরা বলবেন সন্ত্রাসের দশক। আমরা বলব বিশেষ দশক। নকশাল আন্দোলনের মাহাত্ম্য উল্লেখ বা নিন্দাপ্রচার কোনোটাই এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। শুধুমাত্র নিরপেক্ষ ভাষ্যকার হিসাবে ষাট-সত্তর দশকের সমাজ জীবনের পটভূমি (actiual) কেমন ছিল আর তা সমাজ দর্পণে (real) কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটিই তুলে ধরা মূল লক্ষ্য।

সামান্য একটি স্থান নাম বিশেষ পরিস্থিতিতে হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক কর্মসম্মেলনের প্রতিভার অভিজ্ঞান নকশালবাড়ি, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার একটি গ্রামের নাম। জমিদার বুদ্ধিমান তিরকি তার অধীনস্ত নকশালবাড়ির ঠিকাপ্রজা বিগল কিষাণকে ভাগচাষী বলে উচ্ছেদ করলে, বিগল কিষাণ বুদ্ধিমান তিরকির বিরুদ্ধে মুন্সেফ আদালতে মামলা করে জয়ী হয়ে আদালতের ডিক্রী নিয়ে ১৩ এপ্রিল ১৯৬৭ জমিতে চাষ করতে গেলে বুদ্ধিমান তিরকি লোকজন নিয়ে বিগল কিষাণের উপর হামলা করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। বিগল কিষাণের কথায় (আজকাল ২৪মে ১৯৯২)- 'জোতদারের গুণ্ডাদের লাঠির ঘায়ে মাঠে পড়ে গেলাম। খবর রটে গেল, জঙ্গলের নেতৃত্বে শ'য়ে শ'য়ে চাষী লাঠি হাতে রে রে করে এলে, জোতদারের গুণ্ডারা ভয়ে পালাল। জঙ্গল লাঠির দাগ কেটে আমাকে

জমির দখল দিয়ে গেল। তখন জঙ্গলের নাম শুনলেই জোতদারদের হার্ট অ্যাটাক হত। ঠিক হল জোতদারদের গ্রামে থাকতে দেবে না। কোটিয়া, লালজি, ছোট মণিরাম, ঢাকনা প্রসাদ জোত- চারিদিকেই জোতদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে পালাতে লাগল। আওয়াজ উঠলো— 'লাঙ্গল যার জমি তার।' ২৪মে সকালে খবর পেলাম হাতিখিষার বড় ঝড়ুজোতে পুলিশ এসেছে। চারদিক থেকে মাঠের পর মাঠ দৌড়ে পেরিয়ে হাজার হাজার চাষী পৌঁছল হাতিঘিষায়। জোতদারদের সাথে পুলিশ এসেছে চাষীদের ধরতে! পুলিশকে আমরা গ্রামেই ঢুকতে দেব না। প্রত্যেক চাষীর হাতে হয় লাঠি নয় তীর ধনুক। টুকুরিয়া চা বাগানের শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। খবর পেয়ে তারাও হাতিঘিষায় জড়ো হয়ে চাষীদের পাশে লাঠি হাতে দাঁড়ালেন। চাষীরা ঘিরে ফেলল পুলিশকে। হাজার হাজার চাষী-শ্রমিক, লাঠি আর তীর দেকে পুলিশরা বন্দুক ফেলে পালাল। ইন্সপেক্টর সোনম ওয়াংদি ও নকশালবাড়ি থানার একজন অফিসারের বুকে তীর বিঁধল। সোনম ওয়াংদি মারা গেল। ২৫ মে প্রসাদহোতে মহিলা সমাবেশ ডাকা হয়েছিল আন্দোলন কথা বলার জন্য। সেই সমাবশের হোতা বেভাই জোতের প্রহ্লাদ সিংহ। এখানে পুলিশ হঠাৎ গুলি চালায়। ১১ জন নিহত হন। তার মধ্যে ৭ জন মহিলা ও ২টি শিশু। একটি শিশু ছিল প্রহ্লাদ সিংহের স্ত্রীর পিঠে বাঁধা অবস্থায়। রাইফেলের গুলি প্রহ্লাদের স্ত্রী ধলেশ্বরী দেবীর বুক ভেদ করে পিঠের বাচ্চাটিকেও খুন করে।'- এই ঘটনার পর থেকেই নকশালবাড়ি আর শুধুমাত্র স্থান নাম থাকেনি, হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক কর্মসঞ্চালনের এক বিশেষ প্রবণতার অভিজ্ঞান। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ইতিহাসে নকশালবাড়ি হয়ে উঠলো এক মতাদর্শের নাম।

নকশালবাড়ি আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্বে ছিলেন জঙ্গল সাঁওতাল, চারু মজুমদার, কানু সানাল্য প্রমুখ। এরা সকলেই ছিলেন সি.পি.আই-এর গর্ভসমুথিত সি.পি.আই(এম) সদস্য। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর থেকেই সি.পি.আই(এম.)-এর অর্ন্তবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্টদের মতাদর্শগত গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চলার পর ১৯৬৪ পার্টি বিভাজিত হয়। 'সংশোধনবাদী' আখ্যা দিয়ে সি.পি.আই থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি হয় সি.পি.আই.(এম)। ১৯৬৯ সি.পি.আই (এম) এর চরমপন্থীরা 'নয়া-সংশোধনবাদী' আখ্যা দিয়ে নতুন দলগঠন করলেন সি.পি.আই (এম.এল)। দ্বিতীয় বার পার্টি বিভাজনের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ১৯৬৭ নকশলাবাড়ির আন্দোলন। ১৯৬৭ নির্বাচনে রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্টে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠন করে। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারে সি.পি.আই (এম) অংশগ্রহণ করে। নকশালবাড়ির সংঘর্ষে সি.পি.আই (এম) এর চরমপন্থীরা— চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখ শাসক সরকারের ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সি.পি.আই(এম)কে 'নয়া-সংশোধনবাদী' আখ্যা দিয়ে ২২ এপ্রিল ১৯৬৯ মাও সে-তুং-এর

চিন্তাধারায় প্রাণিত হয়ে সি.পি.আই (এম.এল)-র প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও ১মে ১৯৬৯ কলকাতার জনসভায় কানু সানাল্য আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। নকশালপন্থীরা সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ বর্জন করে আহ্বান জানায় সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের। নকশালবাড়ি আন্দোলনের সাফল্যের পর তারা কৃষি বিপ্লবের উদ্দীপনা ছড়াতে থাকে। প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত শোধনবাদ, জমিদার শ্রেণী আর আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণীকে। এদের কাছে সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র পথ হিসেবে চিহ্নিত হয়। সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়ে সমাজের হাজার হাজার উজ্জ্বল তরুণেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো নকশালপন্থীদের দিকে। তারা মুক্তাঞ্চল গড়ার ডাক দিয়ে খতম অভিযানে নেমে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এর পাল্টা হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রও সুপরিকল্পিত ভাবে এদের হত্যা (গণহত্যা) শুরু করে। তাই সংগ্রাম ভয়াবহ সংঘর্ষের রূপ নেয়। সংঘর্ষে কমবেশী প্রায় পাঁচ হাজার তরুণ-তরুণীর প্রাণ হারায়। বাংলা পরিণত হয় রক্তাক্ত বধ্যভূমিতে। বীভৎস দমননীতির ফলস্বরূপ ১৯৭২ মধ্যবর্তী সময়ে (২৮ জুলাই চারু মজুমদারের মৃত্যু) স্বপ্নভঙ্গ হয়ে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। সত্তর দশক নকশাল আন্দোলন চিহ্নিত হয়ে যায় মুক্তির সন্ত্রাসের দশক, আশা-হতাশার দশক, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের দশক। রক্তাক্ত বধ্যভূমির দশক।

নকশালবাড়ির আন্দোলনকে সামনে রেখে সংঘর্ষ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, মুক্তাঞ্চল গঠন, খতম অভিযান, বিভিন্ন মনিষীদের মূর্তি ভাঙা, দমননীতি, দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি ঘটনা মে ১৯৬৭ থেকে জুলাই ১৯৭২ এই পাঁচ বছরে যেভাবে তৎকালীন উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রের পাতায় উঠে এসেছে প্রাসঙ্গিক সেই actual mcedents গুলোকে তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের নানা সংরূপে সেগুলো কোনভাবে real হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করা যেতে পারে:—

২৪ শে মে ১৯৬৯ — নকশালবাড়িতে কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষে তিন জন সাঁওতাল মহিলা সহ ১ জন পুলিশ ইন্সপেক্টরের (সোনম ওয়াংদি) মৃত্যু হয়।

২৫ মে ১৯৬৭ — পুলিশবাহিনী প্রতিশোধ জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে অকুস্থলের চারিদিকে আচমকা আক্রমণ চালালে নারী ও শিশুসহ ১১ জনের মৃত্যু হয়।

৩০ মে ১৯৬৭ — নকশালবাড়ি ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যপদ্ধতির সমালোচনায় সি.পিআই.(এম) এর প্রস্তাব গ্রহণ।

১৫ জুন ১৯৬৭ — নকশালবাড়ির পাশ্ববর্তী ধাপাকুচিতে জোতদার বাহিনী ২ জন কৃষক হত্যা করে।

২৮ জুন ১৯৬৭ — সি.পি.আই.(এম) এর সাপ্তাহিক 'দেশহিতৈষী' দখলের

চেষ্টায় নকশালপন্থীদের সঙ্গে মূলস্রোতের পার্টি নেতৃত্বের সংঘর্ষ।

২৯ জুন ১৯৬৭ — কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ে বি.পি.এস.এফ কর্মী ও 'ছাত্র সংগ্রাম' পত্রিকার সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ও তুহীন বেরা নকশালপন্থী ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত।

২ জুলাই ১৯৬৭ — সি.পি.আই(এম) মুখপত্র 'গণশক্তি'তে মুজফ্ফর আহমেদের নাম সাক্ষরিত সম্পাদকীয়, 'বন্ধুর চেয়ে পার্টি বড়' বাক্যটি প্রবাদে পরিণত।

১৮ জুলাই ১৯৬৭ — জোতদারদের প্রতিরোধবাহিনী ও পুলিশ মিলিতভাবে প্রকাশ্যে নকশালবাড়ি বাজারে জনৈক বরকা মাজিকে পিটিয়ে হত্যা করে।

১৯ জুলাই ১৯৬৭ — নকশালবাড়ি খড়িবাড়িতে তিনশ বি.এস.এফ ও সি.আর.পি.এফ এর অভিযান।

১৪ মে ১৯৬৮ — কৃষক আন্দোলনের ৫ নেতা গ্রেপ্তার

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ — 'পুলিশের গুলি'তে নকশালবাড়ির কৃষক নেতা বাবুলাল বিশ্বকর্মা নিহত।

১ নভেম্বর ১৯৬৮ — নকশালবাড়ির কৃষক সংঘর্ষের নেপথ্যে রূপকার কানু সান্যাল গ্রেপ্তার।

৫ জানুয়ারী ১৯৬৯ — বন্দীমুক্তির দাবিতে কলকাতায় নকশালপন্থীদের মিছিল।

১৪ মার্চ ১৯৬৯ — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নকশালপন্থী ও সি.পি.আই(এম) পন্থী ছাত্রদের সংঘর্ষ—নিহত কৃষ্ণ রায় নামক ছাত্র।

১৫ মার্চ ১৯৬৯ — কফি-হাউসে নকশালপন্থীদের হামলা, কলেজস্কোয়ারে কৃষ্ণ রায়ের সভা।

২৬ মার্চ ১৯৬৯ — জ্যোতি বসু নকশাল বাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ১১৪ টা মামলার সবটাই প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন।

৩ এপ্রিল ১৯৬৯ — কানু সান্যাল সহ ২২ জন নকশালবাড়ি আন্দোলনে যুক্ত নেতার মুক্তি।

৮ এপ্রিল ১৯৬৯ — কাশিপুর গান ও শেল ফ্যাক্টরিতে নিরাপত্তা বাহিনী ৫ শ্রমিককে গুলি করে হত্যা।

৯ এপ্রিল ১৯৬৯ — কলঞ্চনগরে সি.পি.আই.(এম) নেতা এম.এল.এ অমৃতেন্দু মুখার্জী ছুরিকাহত।

১৯-২২ এপ্রিল ১৯৬৯ — বহিস্কৃত সি.পিআই.(এম) নেতাদের দ্বারা গঠিত 'All India co-ordination committiee of Communist Revolutionaries' এর গোপন প্লেনারি সেশন কলকাতায় — গঠিত হয় নতুন দল সি.পি.আই(এম.এল)।

১ মে ১৯৬৯ — শহিদ মিনারে সি.পি.আই(এম.এল) দলের আত্মপ্রকাশ—বক্তা চারু মজুমদার, বনবিহারী চক্রবর্তী(সমর), কানু সান্যাল।

৮ মে ১৯৬৯ — স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যাবন নকশালদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ঐক্য গঠনের আহ্বান জানায়। কানু সান্যাল বলেন — 'হিংসার জবাব আমরা হিংসা দিয়েই দেব।'

১৪ মে ১৯৬৯ — অন্ধ্রপ্রদেশের খাম্মাস জেলায় নকশাল সহমর্মীদের দ্বারা থানা আক্রমণে নিহত ২ ও আহত ৪*

২৫ মে ১৯৬৯ — 'পশ্চিমবঙ্গ' বিপ্লবী যুবছাত্র প্রস্তুতি কমিটির সভায় সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের ডাক।

২০ অক্টোবর ১৯৬৯ — মেদিনীপুরের ডেবরায় 'মুক্তাঞ্চল' গড়তে যাওয়া কলকাতার ছাত্র-নকশাল নেতাদের (অসীম চট্টোপাধ্যায়, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী...) পরিকল্পনার প্রথম ফলিত রূপায়ণ হিসাবে জনৈক জোতদার খুন।

১৯ মার্চ ১৯৭০ — পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের সূচনা।

২৬ মার্চ ১৯৭০ – অন্ধ্রপ্রদেশে পুলিশ ৬৯ জন নকশালপন্থীকে হত্যা করে।

২১ এপ্রিল ১৯৭০ — নকশালদের দমনে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ সেল গঠন।

২৭ এপ্রিল ১৯৭০ — সি.পি.আই(এম.এল)এর 'দেশব্রতী' ও 'লিবারেশন' পত্রিকা কার্যালয়ে পুলিশের তল্লাশি– ২৫ জনকে গ্রেপ্তার।

৫ মে ১৯৭০ — বেলুড়ের লালবাবা কলেজের ছাত্রনেতা রবি বসুকে নকশালরা হত্যা করে।

৬ মে ১৯৭০ — নকশালপন্থীরা হুগলির ভদ্রকালীতে বি.পি.এস.এফ কর্মী অমল নন্দীকে হত্যা করে।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ — কলেজ স্ট্রীটে দিনদুপুরে প্রকাশ্যে পুলিশ ৪ নকশাল নেতাকে হত্যা করে।

২৬ অক্টোবর ১৯৭০ — কলেজ স্কোয়ারে নকশালরা বিদ্যাসাগর ও প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রস্তর মূর্তির মস্তক অপহরণ করে।

১৯ নভেম্বর ১৯৭০ — বারাসাতের আমডাঙা ও অন্যান্য স্থানে হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ১১ জন মৃত যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭০ – মেদনীপুর জেলে পুলিশের গুলিতে ১৬ জন নকশাল বন্দী নিহত।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৭০ — যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কার্যকালের শেষদিনে উপাচার্য ড. গোপাল সেন নকশালপন্থীদের দ্বারা নিহত।

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ — রবিমাধব দত্ত গার্ডেন লেনে ৬ নকশালপন্থী যুবককে

পাঁচিলের মাথায় দাঁড় করিয়ে পিছন থেকে একসঙ্গে গুলিবর্ষণ করে পুলিশ নৃশংসভাবে হত্যা করে।

১৩ মার্চ ১৯৭১ — নকশাল নেতা সুশীতল রায়চৌধুরীর জীবনাবসান।

৬ এপ্রিল ১৯৭১ — বহরমপুরে শিক্ষক নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য ছুরিকাঘাতে নিহত।

১৮ মে ১৯৭১ — দমদম সেন্ট্রাল জেলে নকশালবন্দীদের সঙ্গে কারারক্ষীদের সংঘর্ষ, ৩৩ বন্দীর পলায়ন, পুলিশের গুলিতে নিহত ১৪ জন বন্দী ও ১ জন কারারুদ্ধ।

১ জুন ১৯৭১ — কোন্নগরের নবগ্রামের কানাইপুর কলোনিতে নোয়াপাড়ায় হাওড়ার নকশালপন্থী ৯ জন যুবকের মাটিতে চাপা দেওয়া গলিত মৃতদেহ উদ্ধার।

২৯ জুন ১৯৭১ — পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু

১২ আগস্ট ১৯৭১ ও ১৩ আগস্ট ১৯৭১ — বরানগরে কংগ্রেস নেতা নির্মল চ্যাটার্জী খুন, ঐদিন সন্ধ্যা থেকে কাইহপুর বরানগর অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঢুকে পুলিশ ও গুন্ডারা তাণ্ডব চালায় — শতাধিক নকশালপন্থী যুবককে খুন করে মুখে আলকাতরা মাখিয়ে প্রামাণিক ঘাট থেকে হুগলি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ — শিবপুরে নকশালপন্থীদের সঙ্গে কংগ্রেসীদের ব্যাপক সংঘর্ষ— নিহত ২ কংগ্রেসী ও ৪ নকশালপন্থী।

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ – শিবপুর ও ব্যাটরা থানা এলাকায় সংঘর্ষ—নিহত ৬ (মতান্তর ১১ জন)

২৮ জুলাই ১৯৭২ — বন্দী চারু মজুমদারকে সকালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এস.এস.কে.এম-এ বর্তি করা হয়। ঐ দিন তাঁর মৃত্যু হয়।

ক উপন্যাস - মরণজীবনের গদ্যমহাকাব্য

নকশাল বাড়ি আন্দোলনের জীবন্ত দলিল 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৬)। নকশাল বাড়ি সংঘর্ষের অন্যতম চরিত্র বিগল কিষান। সংঘর্ষের ২৫ বছর পর ২৪ মে ১৯৯২ দৈনিক আজকাল পত্রিকায় বিগল কিষানের উক্তি পূর্বেই উল্লিখিত। সেখানেই সেই চরম দিনের (২৪ মে ১৯৬৭), অকুস্থলে, সংগ্রামীদের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ইত্যাদির actual fact সামনে এসেছে। সেই খণ্ড খণ্ড ঘটনা থেকে জঙ্গল সাঁওতালকে উপন্যাসের রুহিতন কুরমির পাশে রেখে ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।*তরাইয়ের ভয়ঙ্কর দাঁতাল রুহিতন কুরমির জীবনের গদ্য মহাকাব্য এই উপন্যাস। উপন্যাসটির মূল ক্ষেত্রভূমি নকশালবাড়ি। ভূমিহীন ভূমি পায় / জনমজুরে রাজ্য চালায়— এ স্বপ্ন নিয়ে রাজনৈতিক জীবন সংগ্রামের ময়দানে

নামে রুহিতন কুরমি। কৃষকদের স্বার্থে রুহিতনের জান কবুল। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে, তাদের হয়ে লড়াই করে। গ্রাম দিয়ে শহরে ঘেরা, মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার সংগ্রামের যোদ্ধা রুহিতন কুরমি। তরাইয়ের চা শ্রমিক আর ভূমিহীন কৃষকদের নেতা দিবাকর বাগচী, ভবানী রায় প্রমুখ (আসলে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল)। কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষে বীর যোদ্ধা সংগ্রামের ময়দান থেকে রক্তাক্ত হয়ে ধরা পড়ে পুলিশের হাতে, তারপর থেকেই সে জেলবন্দী। খুন দখল লুঠ, আগুন লাগানো অরাজকতা সৃষ্টি করা। এবং সর্বোপরি রাজদ্রোহিতা বলপূর্বক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল প্রভৃতির অভিযোগে ফাঁসি হওয়ার মতো চার্জ গঠন হয়েছে রুহিতনের বিরুদ্ধে। এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তর কখনবা নির্জন সেলে বন্দী। জেল জীবনের শেষদিকে তাঁর ঠিকানা হয়েছে কলকাতার জেলখানা। এখানে রুহিতন তার নামে 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি শুনতে পেয়েছে। স্বস্তিও পেয়েছে। কিন্তু সে স্বস্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। জেলের ভিতরের ও বাইরের পরিবেশ তাকে পীড়িত করেছে। পার্টির লাইন (অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব) নেতৃত্ব সম্পর্কে নতুন চিন্তাভাবনা তাকে পীড়া দিয়েছে, জেলেও সে পুনরায় একা হয়ে যায়। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রুহিতন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখে তার চেনা জগৎ ও মানুষগুলো সব পাল্টে গেছে। এমনকি তার স্ত্রী মঙ্গলাও পাল্টে গেছে। এক সময়ের তরাইয়ের ভয়ঙ্কর দাঁতাল রুহিতন আজ কুষ্ঠরোগী, নিঃসঙ্গ, বিষাদগ্রস্ত, হতাশায় নিমজ্জিত ব্যর্থ নায়কে পরিণত। উপন্যাস সমাপ্তি দেখা যায় এক গভীর রাত্রে নিকষ কালো অন্ধকারে রুহিতন আঙুলহীন পায়ের পাতা টিপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে অনেক দূরে হেঁটে চলেছে মেচি নদীর পাশ দিয়ে দিঘির ঢালু জমির দিকে। একটা গাছের ডাল দিয়ে মাটি খোঁচাতে খোঁচাতে ডাল ব্যারেল একটা বন্দুক ও কয়েকটা টোটা বার করে ডান হাতে তর্জনীর অবশিষ্ট তিন ভাগের একভাগ ট্রিগার রেখে বুকের কাছে বাঁট চেপে তর্জনীর চাপ দিল। ট্রিগারটি নড়ল, জন্তের শব্দ হল। রুহিতন হাঁপাচ্ছে, সর্বাঙ্গে দরদর করে ঘাম ঝরছে। মুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে চলে এসেছে। সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। বন্দুকটা রইল তার বুকের পাশে মাটিতে। কাত হয়ে মাথাটা রাখল জোড়া ব্যারেলের উপর। পুচ্ছহীন লাল চোখের পাতা বুজে এলে। তার মনে এখন একটি মাত্র সান্ত্বনা, সে অপমানে তার অভিশপ্ত আশ্রয় থেকে নিজের যথার্থ জায়গায় ফিরে এসেছে, সে বুঝতে পারছে, গভীর ঘুম আসছে তার।

নকশালবাড়ি আন্দোলনকে উপজীব্য করে যে সমস্ত সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই ধারায় সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য নাম নিংসন্দেহে সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া'। নকশালবাড়ির ক্ষেত্রভূমি থেকে কাহিনী নিয়ে আশা-হতাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, সফলতা-ব্যর্থতার গদ্যমহাকাব্য এই রচনা। ১৯৬৭ পরবর্তী সি.পি.আই(এম) পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের ছবি উপন্যাসে উঠে এসেছে, সেই সঙ্গে জোতদার মোহন ছেত্রীর ডাকসাইটে ছেলে বড়কা ছেত্রীর সঙ্গে রুহিতনের বন্ধুত্ব এবং পরে শ্রেণীশত্রু হয়ে ওঠা আসলে 'বন্ধুর

চেয়ে পার্টি বড়'— এ স্লোগানকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আর ২৮ জুলাই ১৯৭২ চারু মজুমদারের মৃত্যু এবং এই সময়ে নকশাল দমন নীতির বীভৎসতায় এ আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্ন। পার্টির মধ্যেকার বিশ্বাসঘাতকতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি ও উপন্যাসে বর্তমান রহিতনরা একটা সৎ ও আন্তরিক স্বপ্ন নিয়েই সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু নিঃস্বার্থ বলিদানের কিছু দঃসাহসিক ছবি আর হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের স্মৃতি ছাড়া ব্যর্থ নায়কদের আর কিই বা থাকল? সমরেশ বসু নকশাল আন্দোলনে সংগ্রামী জীবন থেকে উপাদান কুড়িয়ে রুহিতনের জীবনের গদ্যমহাকাব্য রচনা করে actual কে real করে তুলেছেন। তবে actual art এ যেভাবে real হয়ে ওঠে সেই পথ ধরে এগোতে গিয়ে শিল্পধর্ম কতটা অক্ষুন্ন রেখেছেন তা বিচারের দায় পাঠকের। নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস-ভূগোল কেন্দ্রিক এত জীবন্ত টাটকা দলিল যেভাবে সার্থকতার সঙ্গে প্রতিচ্ছবিত করেছেন তা সত্যিই অনস্বীকার্য।

২. ২০ অক্টোবর ১৯৬৯, মেদিনীপুর ডেবরায় 'মুক্তাঞ্চল' গড়তে যাওয়া কলকাতার ছাত্র-নকশাল নেতাদের (অসীম চট্টোপাধ্যায় ও উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, স্বর্ণামিত্র প্রভৃতি?) পরিকল্পনার প্রথম ফলিত রূপায়ণ হিসাবে জনৈক জোতদার খুন — এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বর্ণমিত্র রচনা করেছেন 'গ্রামে চলো'(১৯৭২) উপন্যাস। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি আর কালোবাজারীর বিরুদ্ধে জণগণ যখন ক্ষোভে ফুঁসছে তখন নকশালপন্থীরা মনে করেছে আন্দোলনের, বিপ্লবের ক্ষেত্রভূমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, এই পটভূমিতেই কৃষি বিপ্লব সাফল্য লাভ করবে। এবং নীতি হিসেবে বিপ্লবের কর্মসূচি ঠিক করে যে, বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষক শ্রেণীকে হাতিয়ার করে তাদেরকে বুঝিয়ে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়ে 'মুক্তাঞ্চল' সৃষ্টি করতে হবে, গ্রাম দিয়ে শহরগুলোকে ঘিরে ফেলতে হবে। বিপ্লবের শত্রু তথা শ্রেণীশত্রুকে খতম করতে হবে। 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো, মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলো'— নকশালপন্থীদের ডাকে বিপ্লবের নামে সমাজে উজ্জল মেধাবী হাজার হাজার তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মদানে। সেই আত্মদানের একজন নেতৃত্বস্থানীয় উল্লেখযোগ্য সৈনিক ছিলেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী (স্বর্ণমিত্র)। তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা, বিপ্লবের ফলিত রূপায়ণ ইত্যাদিকে উপন্যাসের ফ্রেমে বন্দী করেছেন। Actual কে real এ পরিণত করতে গিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে স্থান, পাত্রপাত্রীর নাম। বিপ্লবের নামে 'গ্রামে চলো' আহ্বানে সাড়া দিয়েই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের পঞ্চমবর্ষের উজ্জ্বল ছাত্র অনিরুদ্ধ বাগচী শহর কলকাতা ছেড়ে তালডাংরা গ্রামে এসে 'রঘু' ছদ্মনামে হীরেন নায়েকের বাড়িতে গৃহশিক্ষক হিসেবে বসবাস করতে থাকে। এরপর গ্রামে মরুভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে মিশে তাদেরকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করে সশস্ত্র সংগ্রামে, শ্রেণীশত্রু খতম অভিযানে নেমে জমিদার সীতানাথ মাহাতোকে খুন করে , দলিলদস্তাবেজ পুড়িয়ে দেয়, ধানের গোলা ভেঙে চাষীদেরকে বিলিয়ে দেয়। তালডাংরার সশস্ত্র অভিযানের দুই নেতা — রঘু ওরফে অনিরুদ্ধ বাগচী

এবং সত্যবান। সফল খতম অভিযানের পর সত্যবানের উক্তি– 'কমরেডগণ ও বন্ধুগণ। মহাজনের এইসব দলিল আজ থিকি বাতিল হয়ি গেল। আজ থিকি তালডাংরার সকল সম্পত্তির মালিক সীতানাথ নয়, মালিক গাঁয়ের সকল গরীব মানুষ। আজ থিকি গাঁয়ের সকল সমস্যার বিচারক গাঁয়ের জণগণ।' রঘু সত্যবানদের সাময়িক সাফল্য পাশ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামে চাষীদেরকেও উজ্জীবিত করে। উপন্যাসের অন্য একটি ঘটনায় দেখা যায় তালডাংরা পার্টি ইউনিটের সদস্য শালবনীর ভূমিহীন চাষী খুঁড়ো। ফরেস্ট গার্ড, রক্ষী বাহিনীদেরকে গ্রামের পথ দেখিয়ে দেওয়ায় খুঁড়ো ফরেস্ট গার্ডকে বিষতীর মারলে রক্ষা বাহিনী খুঁড়োকে গুলি করে হত্যা করে। সত্যবান খুঁড়োর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছে— 'খুঁড়োর মৃত্যু মোদের জয়কে আরো নিশ্চিত করল।' কমরেড খুঁড়োর জ্বলন্ত চিতার পাশে দাঁড়িয়ে 'অশ্রু-রক্ত-স্বপ্নেভরা' সশস্ত্র জনতার গভীর নীরবতার মধ্যে রঘুর মনে পড়ে যায় চেয়ারম্যানের কথা—'বহু লোকের আত্মত্যাগের ফলেই জয়ী হয়েছে আজ আমাদের ইচ্ছা।' ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সফলতার স্বপ্নে উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে।

বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত উজ্জ্বল তরুণদের সক্রিয়তার ছবি হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। এ উপন্যাস আসলে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের দিনলিপি। রঘু ওরফে অনিরুদ্ধর উষ্ণ দিনলিপি কি স্বর্ণমিত্রের নিজস্ব দিনলিপি নয়? উৎপলেন্দু চক্রবর্তী নিজেই নকশাল আন্দোলনের নেতা সৈনিক। Implimentation of an action of Naxal squad ~ actual diary যেভাবে পাতায় উঠে এসেছে তাতে বলা যেতে পারে This is the real life of Naxal period. বাস্তব জীবন থেকে উপাদান নিয়ে নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতায় স্বর্ণমিত্র যেভাবে সমাজ দর্পণের পাতায় তুলে ধরেছেন তা এককথায় বলা যেতে পারে জীবন্ত দলিল।

৩. ৩১ মার্চ ১৯৭২ র একটি দৈনিক পত্রিকার শিরোনাম যাদবপুরে ব্যাপক সন্ত্রাস, তিন দিনে ২ জনকে হত্যা। উল্লিখিত প্রতিদেনটি হল—'গত ২৭ মার্চ থেকে কংগ্রেসীরা এলাকার সমস্ত গুন্ডাদের নিয়ে এলাকায় ভয়াবহ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। জি ব্লকের ননীশূরের বাড়ি আক্রমণ করে সমস্ত জিনিসপত্র লুঠ করে এবং বাড়ির সবাইকে তাড়িয়ে দেয়। ননীশূরের ৮৮ বছরের বৃদ্ধ পিতাকেও রেহাই দেয়নি। মেয়েদেরও কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে। অধ্যাপক কৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়িতেও তারা হামলা করে। 'কৃষ্ণ চক্রবর্তীর মুণ্ডু চাই'—বলে ধ্বনি দেয় এবং বোমা মারে। বোমায় কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ১৬ বৎসরের পুত্র আহত হয়। স্ত্রীর উপরও অশালীন ব্যবহার করে। অষ্টমশ্রেণীর ছাত্র বাবলু চক্রবর্তীকে ধরে নিয়ে গিয়ে ভীষণভাবে তাকে প্রহার করে এবং সমস্ত ছেলেকে ধরিয়ে দিতে হবে বলে, না দিলে হত্যা করা হবে। পরদিন নিজগৃহে বাবলুকে মৃতবস্থায় পাওয়া যায়। গত ২৯ মার্চ রামকৃষ্ণ উপনিবেশেকে, তপন দাশকে তুলে নিয়ে যায় এবং কুপিয়ে হত্যা করে। — এই actual ঘটনাটি ১৯৭২ নির্বাচনোত্তর (১১ মার্চ) যাদবপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

সন্ত্রাসের শিকার অধ্যাপক কৃষ্ণ চক্রবর্তী নিজেই ঐ actual ঘটনাকে real করে তুলেছেন তাঁর 'অমানবিক' (১৯৭৩) উপন্যাসে। উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক কৃষ্ণ চক্রবর্তী লিখেছেন — 'উপন্যাসটি যখন লিখছি তখন সবর্স্ব খোয়ানো অবস্থায় ঘরে আমার স্ত্রী দুবেলা চোখের জল ফেলছেন। সেই পরিস্থিতির মেধ্য দায়িত্ব ঔ কর্তব্যবোধ থেকে উপন্যাস লেখা।' 'অমানবিক' উপন্যাসটি '৭২ নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কালাপাহাড়ি দৌরাত্মের জীবন্ত দলিল। সমাজতন্ত্রী কালাচাঁদ শান্তিরক্ষা বাহিনী সৈনিক, পাড়াপাল ও তার দলবল ডাক্তার বোসের ভাইপো, অতীনকে কলেজ থেকে ধরে নিয়ে এসে হাত-মুখ বেঁধে কোমরে দড়ি জড়িয়ে কালাচাঁদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল মঙ্গলবার রাত দশটায়। এরপর কালাচাঁদ হাতে মাংস কাটা দা নিয়ে কুঠির মাঠে কাটতে যাচ্ছিল তখন কালাচাঁদের স্ত্রী তিরু বার বার বাধা দিয়েও আটকাতে না পারলে সে পাগল হয়ে যায়। ডাক্তার বোস পাগল হয়ে যাওয়া তিরুকে চিকিৎসা করতে তাদের বাড়ি গেলে কালাচাঁদের মা জানায় কাল রাত্রে তার ছেলে কুঠি মাঠে একটা পাঁঠা কাটলে তিরু রক্ত রক্ত বলে চিৎকার করতে থাকে। সাম্যবাদের সমর্থক শান্তিবাবুর সংসার সন্ত্রাসের স্রোতে ভেসে গেছে। শান্তিবাবু সাম্যবাদী, তাঁর স্ত্রীও সময় পেলে মিটিং মিছিলে যায়, বড় ছেলে কলেজ ইউনিয়ন করে – তিনজনকেই পাড়াপাল শাস্তি দিয়েছে। ছেলেকে স্ট্যাম্প করেছে, বৌকে লাথি মেরেছে, বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুর ও লুঠ করেছে। এরপর শান্তিবাবু থানায় ডায়রী করতে গেলে থানার বড় দারোগা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে শান্তিবাবুর দুই গালে চড় মেরে বলেছে—''শালাবুড়ো! ছেলেকে কমিউনিস্ট করেছো! ডাকাত বানিয়েছ! আবার এসেছ ডায়রী করতে?'' কথক ডাক্তার বোস উপন্যাসের শুরুতেই শুনিয়েছেন ভবেশের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। সঙ্গীরা পালিয়ে গেলে ভবেশও পাড়া ছাড়ে— এই অপরাধে পাড়াপালরা বন্ধুদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তাকে জ্বালাময়ভাবে হত্যা করেছে।

উপন্যাসের ভবেশকে বাস্তবের বাবলু, কালাচাঁদ, কানা অজিত আর শান্তিময়বাবু জায়গায় স্বয়ং কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে রাখলে actual কিভাবে real হয়েছে তা স্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য উপন্যাসটিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। (The Statesman-8th April 1976, colm-4, page-৩) রক্তাক্ত বধ্যভূমির স্পন্দন সমাজ দর্পণে যে কত সার্থকভাবে প্রতিচ্ছবিত হয়েছে তা এই উপন্যাস পাঠ করলেই বোঝা যায়। ডাক্তার বোস, শান্তিবাবু ও তাদের পরিবার, ভবেশ, অতীন, নাড়ু, হীরু প্রমুখ কিভাবে সন্ত্রাসের বলি হয়েছে তা যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি ভয়ঙ্কর বীভৎসতা, অমানবিকতার নিদর্শন'অমানবিক' উপন্যাস। রাজনৈতিক সংঘর্ষ, সন্ত্রাসের ফলে গোটা বাংলায় পরিণত হয়েছে 'বধ্যভূমি'তে। 'অমানবিক' সেই বধ্যভূমির স্পন্দন।

৪. ১৭ অক্টোবর ১৯৭০ বেলেঘাটায় সি.আই.টি হাউসিংয়ের ৫৫৬ টা ফ্ল্যাটে পুলিশের তল্লাশি— গ্রেপ্তার ১০০ জন, এর মধ্যে ৪ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয়। —

এ ঘটনা প্রতিচ্ছবিত হয়েছে শঙ্কর বসুর 'কম্যুনিস' (১৯৭৪) উপন্যাসে। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হয়েছে — অশোক বোস (এ.বি), গেরা, নিবারণ, সোনা, নান্টু, নরেন প্রমুখ। শাসক নকশাল দমনে বেলেঘাটা অঞ্চলে অশোক বোসকে খোঁজ করতে গিয়ে বেলেঘাটা বস্তিতে এ.বির সহযোদ্ধা সোনাকে হত্যা করেছে। সোনার হত্যার বদলা নিতে এ.বি, গোরা, নিবারণ, সুকুরা বদ্ধপরিকর। সেই বদলার ফলস্বরূপ নিবারণ ও সুকু একজন পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করেছে। উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ চিত্রও। পার্টির সম্পাদক শোধনবাদীদের নিপাত দেওয়ার কথা বলে। পার্টির লাইন, অ্যাকশনের পথ ও পন্থা সম্পর্কে বুঝিয়েছে উপন্যাসের শেষে দেখা যায়। সুকু, বুড়ো, নিবারণ সহ ১৩ বছরের এক কিশোরের নিথর দেহ পর পর শোয়ানো। গোরা, নান্টু, নরেনদা জেলবন্দী। জেলেও তারা মতাদর্শগত লড়াই চালায়, বিপ্লবের নতুন দিশা খুঁজে পায়। 'কম্যুনিস' রক্তাক্ত বধ্যভূমির টাটকা দলিল।

৫. ''সত্তর দশকের আন্দোলনের প্রচণ্ড অভিঘাত আমাকে দিয়ে ঐ বই লেখায় এ আন্দোলন আমাকে অনেক কিছু শেখায়ও''— 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাস প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর অভিব্যক্তি। — সত্তর দশকের আন্দোলনের প্রচণ্ড অভিঘাতের ফল মহাশ্বেতা দেবীর জনপ্রিয় উপন্যাস 'হাজার হাজার চুরাশির মা' এ (১৯৭৪) নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে পুত্রহারা মায়ের আত্মোপলব্ধি। 'হাজার হাজার চুরাশির মা'—উপন্যাসের মূল ঘটনা— ব্রতীর মৃত্যু হলেও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্রতীর মা, সুজাতা। নতুন সমাজ গঠনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রতী চ্যাটার্জীর মৃত্যু হয়েছে। ব্রতীই ছিল সুজাতার একমাত্র নীলমণি। ব্রতীর মৃত্যু মা সুজাতার জীবনকে বদলে দেয়। সুজাতা ব্রতীর খুনের ঘটনা জানতে পারে সমুর মার কাছ থেকে । সমুর মা জানায়, রাত বারোটার কাছাকাছি সময়ে ঘাতকরা তাদের চালাঘরটিতে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে ব্রতীর কথামতো চারজনেই হাতে হাত ধরে স্লোগান দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসলে খুনীরা সমু, পার্থ, বিজিত, ব্রতীকে খুন করে। পুত্রহারা মা সুজাতা ব্রতীর ঘর, জামা, ছবির পাশে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়। কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস হারানো, ভ্রাতৃবধ, শ্রেণীশত্রু নিধন প্রভৃতি সত্তর দশকের বাস্তব জীবন চিত্রকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী। শ্রেণীশত্রুকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বাবা দিব্যনাথ সম্পর্কে ব্রতীর বক্তব্য, – 'দিব্যনাথ চ্যাটার্জী একক ব্যক্তি হিসেবে আমার শত্রু নন। উনি যেসব বস্তু ও মূল্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলোতেও অন্য বহুজনও বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ যারা লালন করছে, সেই শ্রণীটাই আমার শত্রু। উনি সেই শ্রেণীরই একজন।' ব্রতীর কাছে বাবা শ্রেণীশত্রু। এমনকি নিধনযজ্ঞের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ব্রতীদের দৃপ্ত স্লোগান—'জিন্দাবাদ যুগ যুগ জিও।' নামকরণেই স্পষ্ট লেখিকা হাজার তিরাশি জনের পর ব্রতীর মৃত্যু সুজাতাকে 'হাজার চুরাশির মা' করে

তুলেছেন। নকশাল দমননীতির ফলস্বরূপ সত্তর দশক সমগ্র বাংলা হয়ে ওঠে বধ্যভূমি। 'হাজার চুরাশির মা' সেই বধ্যভূমিরই স্পন্দন।

নকশাল আন্দোলন, নকশাল দমন, কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ মতাদর্শ দ্বন্দ্ব, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি সামগ্রীকে ঘটনাবলীতে সত্তর দশক পরিণত হয়েছে বধ্যভূমিতে। সেই বধ্যভূমির refelect উপন্যাসে কিভাবে ফুটে উঠেছে তা পাঁচ উপন্যাস দিয়ে দেখানো হল। এক্ষণে ছোটগল্পে সেই বধ্যভূমির চালচিত্র কিভাবে ধরা পড়েছে তা কয়েকটি ছোটগল্পকে সামনে রেখে আলোচনা করা যেতে পারে —

খ. ছোটগল্প– বিন্দুতে সিন্দু দর্শন

১. নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব, নকশাল নিধন যজ্ঞের আবহে এক শহিদের মায়ের আত্মোপলব্ধির গল্প সমরেশ বসুর — 'শহিদের মা'। হরপ্রসাদ-বিমলার তিন ছেলে কৃপাল, দয়াল, বাদল। বাবা হরপ্রসাদ ও তিন ভাই কৃপাল, দয়াল ও বাদল— এই চারজন চার পার্টির লোক। নকশালকর্মী বাদলকে কারা পিটিয়ে মেরেছিল। শহিদ বাদলের মৃত্যুর পর তার পার্টির ছেলেরা স্লোগান দিয়েছিল 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন।' বাদলের মৃতদেহ ঘিরে ছিল বাদলের বন্ধুরাই, ওর পার্টির লোকেরা। দুই ভাই ও বাবা নয় ওকে ওর বন্ধুরাই শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। বাদলদের বাড়িতে চারজনের চার পার্টির কর্মসূচি, পথ ও পন্থা ইত্যাদি বিষয়ে ভাল না মন্দ তা নিয়ে চলেছে বাগবিতন্ডা, যা আসলে সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর নানা দ্বন্দ্বের ছবিই স্পষ্ট। বাদলের খুন হওয়ার জায়গায় তার পার্টির লোকেরা শহিদ বেদি তৈরি করেছে। বিমলা এখন শহিদের মা। 'কোনো না কোনো পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন পার্টি? কৃপাল, দয়াল, হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলে বলেছে, বাদলের মরণ ধরেছে। অথচ তারা বিমলার স্বামী-পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না? কৃপাল, দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পার্টির ছেলে? ওদের বিরুদ্ধ পার্টির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে কেবল বিমলারই ছেলে? তাই যদি হয় তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। তাই তো বিমলা সকলের ডাকাডাকিতেও নিরুত্তর। সাধারণ সংসারী গৃহবধূ বিমলা তার ১৮ বছরের ছেলে বাদলের মৃত্যুর পর পরিচিতি পেয়েছে 'শহিদের মা' হিসেবে। এ গল্প আসলে পুত্রহারা এক মায়ের যন্ত্রণাকাতর ক্ষমাহীনার আত্মপোলব্ধির গল্প। নকশাল দমন-নিধন যজ্ঞের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি 'শহিদের মা' গল্প।

২. মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'দৌপদী' গল্পটি রয়েছে নকশাল দমনের পাশবিক ছবি। ১০ জুলাই ১৯৭১ সরকার নকশাল দমনে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়াতে মিলিটারি প্রেরণ করে। নকশালকর্মী দোপদি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন্ মাঝি (নিহত)... মোস্ট নটোরিয়াস মেয়েছেলে। লং ওয়ান্টেড...।' জোতদার-জমিদার খতম অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে দুলন ও

দ্রোপদী মেঝেন। জোতদার জমিদার বাকুগুলির সূর্য সাউকে খুন করলে নকশাল দমনে মিলিটারি পাঠিয়ে অপারেশন বাকুগুলিতে দ্রোপদি মেঝেনরা নিহতের ভান করে পড়ে থেকে পরে বুকে হেঁটে পালিয়ে গিয়েছিল পলতাকুড়িতে। তারপর ঝাড়খণ্ড বেল্ট এ তারা কাজ করেছে। নাম পরিবর্তন করে দ্রোপদী ও দুলনার নাম হয়েছে উপি মেঝেন ও মাতং মাঝি। মিলিটারি ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল কউন করে দুলন মাঝিকে গুলি করে হত্যা করে। দুলন্-এর মৃতদেহকে টোপ হিসাবে ফাঁদ পাতলে দ্রোপদীকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। পরে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের দিক থেকে দ্রোপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হয়। একঘণ্টা জেরার পর সেনানায়কের অর্ডার—'ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নিউফুল।' বানানোর প্রক্রিয়ার পর দ্রোপদী বোঝে—'ওর দু হাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা থেকে কোমরের নিচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভিতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে জল বলে ওঠে, সেই ভয়ে দাঁত নীচের ঠোঁটে চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিয়ে এসেছিল?' চার-পাঁচ-ছয়-সাত, তারপর দ্রোপদীর হুশ ছিল না। গল্পশেষে দ্রোপদী উলঙ্গ। উরু ও যোনীকেশে চাপ চাপ রক্ত। স্তন দুটি ক্ষত। দ্রোপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয় পায়।' দ্রোপদীর ওপর পুলিশ-সেনা প্রশাসনের পাশবিক অত্যাচার, ভয়ঙ্কর, অমানবিক। গল্পশেষে বিবস্ত্র দ্রোপদীর প্রতিবাদ অন্যমাত্রা দিয়েছে। নকশাল দমনের পাশবিক্‌ভয়ংকর নিধনযজ্ঞের জীবিত দলিল 'দ্রোপদী'।

৩. ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ — কলেজস্ট্রীটে দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে পুলিশ চার নকশাল যুবককে হত্যা করে।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ — শ্যামপুকুরে (উত্তর কোলকাতা) পুলিশ সার্জেন্ট মনোরঞ্জন মুখার্জী ছুরিকাহত,

১৭ অক্টোবর ১৯৭০ — বেলেঘাটার সি.আই.টি হাউসিংয়ের ৫৫৬টি ফ্ল্যাটে পুলিশের তল্লাশি—গ্রেপ্তার ১০০ জন এর মধ্যে ৪ জনকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয়।

২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ — শ্যামপুকুরে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু নিহত।

২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ — ভোরে যাদবপুর বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্রাবাস ঘিরে ফেলে সি.আর.পি.এফ—৬০ জন ছাত্র গ্রেপ্তার, বেলেঘাটা, মিঞাবাগান, কুন্ডুবাগান, ৯৫ নম্বর চড়কডাঙা রোড বস্তি কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে তল্লাশি ও গ্রেপ্তারী অভিযান—এই সকল প্রভৃতি ঘটনার দিনলিপি গল্পের ফ্রেমে এনেছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর 'অংশু সম্পর্কে ২টো-১টা কথা যা আমি জানি' গল্পে। পাড়ার অবস্থা ভাল না হওয়ায় রাঙাবৌদি তড়িৎকে অংশুদের বাড়িতে পাঠায়। তড়িতের মুখে অংশু পাড়ার অবস্থা শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছে। পাড়ার সুবোধবাবুর ছেলে মনা নকশাল, সে কম্পাউন্ডের দেওয়ালে লিখছে—'হিংসার উত্তর আমরা হিংসা

দিয়েই দেব।' এই রাজনৈতিক আবহেই তড়িৎ মৃতবৎ, মনা নিহত। অংশু এক শেষ রাতে ছাদে গেলে —'ছাদের মাঝখানে মনার রক্তের ছাপ অংশু দেখতে পায়। দিনচারেক আগে শুকনো রক্ত ফোঁটা ফোঁটা জল পেয়ে ইতিমধ্যেই তাজা হয়ে উঠেছে। যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য অংশু রক্তের কাছে যায়। প্রকাণ্ড ক্ষতমুখের মতন সাদা সাদা চাপ রক্তে কিলবিল করছে। নকশাল দমনের বিধ্বস্ত ছবি সন্দীপনের এ গল্পটি।

৪. সিদ্ধার্থ সাহার 'ছোট বকুলপুরের পরের কথা' গল্পে নকশালকর্মী গোপাল হেমন্ত বিপ্লবের কাছে বহরমপুরে স্টেশনে নেমে উকিল যতীন মুখার্জীর কাছে দেখা করে পরবর্তী গন্তব্য রিদেপুর পৌঁছেছে। পথে তাদের প্রশাসন ও শাসক পার্টির চোখকে কিভাবে ধুলো দিয়েছে তার বর্ণনা আছে। আপাত নিরীহ গোপাল-হেমন্ত রিদপুরে গিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচী হিসেবে বাবুদের স্তূপ গেড়েছে। ডিফেন্স পার্টির লোকজন ও পুলিশ প্রশাসনকে বোকা বানিয়ে বিদেপুর সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুত। সেই উৎকণ্ঠার গল্প 'ছোট বকুলপুরের পরের কথা'।

৫. অ্যাকশন না করলেও ঘোড়েল অর্গানাইজার গৌতম বিশ্বাস। তার খবর পেয়ে পুলিশ অভিযানে নামে। গৌতম কালীমন্দিরের উল্টোদিকে যুবক সমিতির মাঠে জলসায় গান শুনছিল। নাচ-গান জলসার মাঝখানে গিজগিজ করা লোকের মধ্যে থেকে পুলিশ গৌতমকে গুলি করে হত্যা করে। '...একটা বুড়োর জুতোয় রক্ত ছিটকে লেগেছে, বুড়োটা পেচ্ছাব করে ফেলেছে। একটা মেয়ে দাঁতে দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কতকগুলো মেয়ে আর বাচ্চা কাঁদছে। এমতাবস্থায় পুলিশের লোকটা কিছুটা অর্ডারের মতো করে চিল্লায়—'শুরু করতে বলুন—জলসা ফলসা থামানো চলবে না, গান হোক, গান চলুক—আমরা লাশ বার করে নিয়ে যাচ্ছি–শুরু করতে বলুন।'—পুলিশি সন্ত্রাসের এই ছবি ফুটে উঠেছে নবারুণ ভট্টাচার্যের 'খোঁচড়' গল্পে।

গ. নাটক — সমাজজীবনের রঙ্গমঞ্চের মিশ্রিত শিল্প

১. চলো সাতারে (১৯৭০) — বিজন ভট্টাচার্য। নকশালবাড়ি সংঘর্ষে ভূমিহীন আদিবাসী কৃষকেরা পুলিশি সন্ত্রাসে বাড়ি ঘর ফেলে জঙ্গলে পালিয়ে গেলে, সেগুলোর দখল করে তাঁবু গাড়ে সশস্ত্র সরকারি সৈনিকরা। মাইকেল, বিলহন, সোম প্রমুখ আদিবাসী কৃষকেরা প্রভাত মজুমদারের নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। গড়ে তোলে প্রতিরোধ বাহিনী। জঙ্গলে অবস্থানরত প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে জনতার যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব পড়ে প্রভাত মজুমদারের স্ত্রী কালিন্দীর উপরে। জোতদারদের লোকেদের সাহায্য পুলিশ কালিন্দীকে ধরে, গুলি করে হত্যা করে। কালিন্দীর মৃত্যুর পর প্রভাত মজুমদার কেমন যেন পাল্টে যায়। সে নিজেই বলতে থাকে—'এ হয় না কালিন্দী। তুমি সামনে থাকতে আমি সেদিনও চিনতে পারিনি, আজও চিনতে পারছি না। তুমি জঙ্গলে যাও। লড়াইয়ের এখনও অনেক

বাকি।' চলোসাগরে নাটকে শুধু পটভূমি নয় সামগ্রিক নকশাল আন্দোলনই একলহমায় মঞ্চে উপস্থিত হয়েছে।

২. জোছন দস্তিদারের 'আজকের স্পার্টাকাস' (পাণ্ডুলিপি প্রথম অভিনয় ১ আগস্ট ১৯৭৭)। কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ, বিভাজন, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসহীনতা, ভ্রাতৃহত্যা—সত্তর দশকের এ সমস্ত ঘটনাবলীর বিশ্বস্ত নাট্যরূপ 'আজকের স্পার্টাকাস'। পুলিশের চর সন্দেহে পার্টির নির্দেশে স্কুল মাস্টার প্রফুল্ল বাবু খুন হন। প্রফুল্ল মাইতির খুনকে সামনে রেখে কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ নাটকে সামনে আসে। সেন্ট যোসেফ স্কুলে আগুন লাগানো, প্রফুল্ল মাইতিকে খুন করা ইত্যাদি ঘটনা সমাজপরিবর্তনকামী সৈনিক অনিরুদ্ধ মন থেকে মেনে নিতে না পারলে, সে তার পার্টির নেতৃত্বের কাছে চিহ্নিত হয়ে যায় বিশ্বাসঘাতক, পুলিশের চর হিসেবে। এরপর কিছুদিনের মধ্যে অনিরুদ্ধও খুন হয়ে যায় তারই পার্টির সহযোদ্ধাদের হাতে। অন্যদিকে অনিরুদ্ধর সহযোদ্ধা কিন্তু খতম অভিযানে বিশ্বাসী অনিরুদ্ধ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। নাটকে অনিরুদ্ধর পার্টির প্রতি সমালোচনাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ— "তোমরা বিপ্লব করবে? কে তোমাদের শত্রু, কে তোমাদের মিত্র তোমরা জান না। কাকে সঙ্গে নিতে হবে কাকে বাদ দিতে হবে , সে ধারণা তোমাদের নেই। যেপথে পার্টি চলেছে, দেশের এত বড় মেশিনারি সবাইকে টিপে মারবে!... ভবঘুরি ছেলেদের একটা অংশ যে লড়াইয়ে থাকবে আমিও স্বীকার করি। কিন্তু ওদের পরীক্ষা করার কোনো চেষ্টা নেই, সচেতন করার জন্য শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। এ পথে এশ্‌টাব্লিশমেন্ট হাজার বেনোজল ঢুকিয়ে দেবে। সেদিন তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, সেদিন আমি তুমি ভেসে বেরিয়ে যাব।"— স্পষ্ট বোঝা যায় অনিরুদ্ধ সিপিআই(এম) গোষ্ঠীভুক্ত কিন্তু আনন্দ সিপিআই(এম.এল) গোষ্ঠীভুক্ত। পার্টির মত ও পথ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলেছিল এ নাটক তারই প্রতিচ্ছবি। সমূলে উপড়ানো, খতম অভিযান করা, শ্রেণীশত্রু চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি সম্পর্কে বহু প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় নকশাল আন্দোলনকে এ নাটক।

৩. অত্যাচারিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জীবন্ত দলিল মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'পদাতিক' নাটক। সামন্ত প্রভু বৈষ্ণব হালদার ভাগচাষীদেরকে মিথ্যা ঋণের দায়ে, মামলা মোকদ্দমায় জর্জরিত করে তোলে। ভাগচাষী তারক সর্দার মাঠ থেকে ধানকে কেটে আনার সময়েই জোতদার বৈষ্ণব হলেদার সব ধান কেড়ে নিলে তারক সর্দারের বড় ছেলে কান্ত সেরেস্তায় গিয়ে প্রতিবাদ করলে জোতদারের লেঠেলরা কান্তকে খুন করে। কান্তর স্ত্রী আশা স্বামীর মৃত্যুতেও মাথার সিঁদুর না মুছে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করে যোগ দেয় লাল পার্টিতে। লালপার্টি অত্যাচারিত কৃষকদের সংগঠন করে জোতদার বৈষ্ণব হালদারের গোলাবাড়ি আক্রমণ করে এবং বৈষ্ণবকে থামের সঙ্গে বেঁধে রাখে। বৈষ্ণবের শাস্তি কি হওয়া উচিত এ আলোচনা শেষ না হতেই কান্তর স্ত্রী আশা ঝাপিয়ে পড়ে বৈষ্ণবের গলা

টিপে ধরে এমন সময়ে পুলিশ এসে পৌঁছায় এবং বৈষ্ণবকে উদ্ধার করে। সেই সঙ্গে পুলিশ গর্ভবতী আশাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারে, গুলি করে মারে কান্তর ছোট ভাই নরকে। দুই পুত্র কান্ত ও নর এবং পুত্রবধূ আশার মৃত্যুর পরে শোকার্ত তারক সর্দার প্রতিজ্ঞা করে— ''ইবার আমরা মারব। তবে শোন শোনরে রক্তখেকো পিশাচের দল—তুরা আমার ছেলেদের রক্ত খেইচিস—আমার বউমার রক্ত খেইচিস—আমার সংসার ভেঙে ছারখার করিছিস—ইবার তোদের বুকির রক্তে শেষ প্রতিশোধ নোব।'' সশস্ত্র সংগ্রামের সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের আভাসেই সমাপ্ত হয়েছে 'পদাতিক' নাটক।

৪. অনল গুপ্তের 'রক্তের রং' (১৯৬৮) একাঙ্ক নাটকটি কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত আন্তর্বিরোধের রাজনৈতিক ভাষ্য। দুই পার্টির আন্তর্বিরোধ ছবিটি নাটকে স্পষ্ট হয়েছে অর্জুনের কথায় — ''কমরেড কানু সান্যাল, কমরেড জঙ্গল সাঁওতাল আর আমরা সব এখানে নাকি আমেরিকার গুপ্তচর হয়ে গেছি। আর ওদিকে কষৃক ল্যাতা মন্ত্রী হলেন। মন্ত্রী হয়েই দশটা কৃষক মেয়েকে বাচ্চাসহ গুলিতে শুইয়ে দিয়ে সাচ্চা কমিউনিস্ট সাজলেন গিয়ে কলকাতা বিধানসভায়। খুব শিগগিরি রাইফেলগুলো চাই আমাদের সবার হাতে। আমাদের হাতের টিপগুলিও ওরা দেখুক। ভোটের বাক্সের দালালরা দেখুক জমির লড়াইয়ের সময় কখন হয়।''— বুঝতে অসুবিধা হয় না অর্জুনের লক্ষ্য সিপিআই(এম) ১৯৬৭ বিধানসভা নির্বাচনে নবনির্বাচিত অকংগ্রেসী দালালগুলোকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে, অজয় মুখার্জীকে নেতা নির্বাচন করে জ্যোতি বসু অর্থমন্ত্রী, কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হলে সিপিআইএমের বামপন্থী অংশের মোহভঙ্গ হয়। কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল বাড়িতে কৃষক সংঘর্ষ ঘটে। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুই পার্টির মতাদর্শগত অন্তর্বিরোধ ভ্রাতৃবধের নৃশংস চেহারা নেয়। পথে নকশালপন্থী বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত বলে 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো, মুক্তাঞ্চল গয়ে তোলো'র ডাক দিয়ে ..... সংগ্রামে নামে। এবং সি.পি.আই(এম)কে ভোটের বাক্সের দালাল বলে চিহ্নিত করে। 'রক্তের রং' এই সকল বাস্তব জীবন চিত্রের দলিল। জোতদার দৌলতরায় জাতীয়তাবাদী সোসালিস্ট পার্টির মুখোশ পরে কৃষকদের জমি কাড়লে নকশালপন্থীরা এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে অ্যাকশান চালায়। এ নাটক সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রখর উত্তাপের লেখা জীবন্ত দলিল।

৫. উৎপল দত্ত রচিত 'তীর' (পাণ্ডুলিপি, প্রথম অধ্যায় ১৯৬৮) নাটকটি নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি। সুকুরা টুডু এ নাটকের কথক। সেই শুনিয়েছে নকশালবাড়ির কৃষকদের মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার স্বপ্নকাহিনী। জোতদার সত্যবান সিংহ-এর কৃষক অত্যাচারের বর্ণনা নাটকে উপস্থিত। সত্যবান তার কর্মচারী বৃক্ষবাবুকে দিয়ে কলষকদের দাদনের টাকা বাড়িয়ে দিয়ে জমি কেড়ে নিয়েছে। এমনকি যে রত্নেশ্বরী সত্যবানকে মানুষ করেছে তারও জমি সত্যবান কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সত্যবানের রক্ষিতা কৃষক বিপ্লবের

সমর্থক। সত্যবানদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে তীর তৈরির পরিসরের শ্রেণীশত্রুদের (জোতদার জমিদার) প্রতি তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণায় তীর তৈরির কাজে ধৈর্যচ্যুতি এবং পুলিশের মাথা ভেবে এমন জোরে পেটাচ্ছে যে তীরের ফলাগুলো বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। শ্রেণীশত্রুদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার, তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণার প্রকাশ ঘটে তীর পেটানোর মধ্যে দিয়ে। তীর সশস্ত্র বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের নাটক। নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে কৃষকেরা যে আন্দোলন শুরু করে তার আবহে এবং ভবিষ্যৎ সফলতায় আশা এ নাটকে অন্যমাত্রা পেয়েছে।

প্রতিনিধত্বমূলকভাবে বাংলা সাহিত্যের তিটে সংরূপ থেকে পাঁচটি করে রচনাকে সামনে রেখে সাহিত্য কিভাবে বাস্তব সমাজ জীবনের দর্পণ হয়ে ওঠে তা দেখানো হল। বাস্তব ও সাহিত্য সম্পর্কে নানা তত্ববেত্ত্বাদের আলোচনা-সমালোচনা বর্তমান। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ ব্যক্তিগণ রবীন্দ্রসাহিত্য বাস্তবতাহীন— এ অভিমত ব্যক্ত করলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি জবাবে 'বাস্তব' নামের রচনাটি লেখেন। সেখানে রসবস্তুর কথায় উল্লেখ করেছেন। তবে 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'...লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণিস্পর্শে, মদের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেটা হওয়া চাই।' হয়ে ওঠাটা কতটা সার্থক হয়েছে তা নির্ভর করে 'দৃষ্টি' ও 'সৃষ্টি'র মিলনেই। নোবেলজয়ী সাহিত্যিক লুইজি পিরানদেলোও বাস্তববাদী শিল্পের আদর্শ হিসাবে মডেলের নিখুঁত চিত্রণের কথা বলেন নি, বরং তিনি মনে করেন মডেলের নিখুঁত চিত্রণের সৃষ্টি কিছু থাকে না। তাঁর অভিমত আর্টের ক্ষেত্রে সৌসাদৃশ্য সৃষ্টি করা বড় কথা নয়, দৃষ্টকে কল্পনার দ্বারা অস্তিত্বকে ভাবের দ্বারা বৃহত্তর ও মহত্তর করে তোলাই আর্ট। এখান থেকেই তিনি art এ actuality ও কথা realityর বলেছেন। actuality ও realityকে উল্লেখ করতে গিয়েই আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'নকশালবাড়ি', তাকে সামনে রেখে সত্তর দশকের বাংলার সমাজ পরিণত হয়েছে রক্তাক্ত বধ্যভূমিতে। সেই রক্তাক্ত বধ্যভূমির স্পন্দন বাংলা সাহিত্যের নানা সংরূপে দলিলায়িত হয়েছে সেটিই উপরের আলোচনায় দেখানো হল। পরিশেষে রক্তাক্ত বধ্যভূমির একটি actual ঘটনা কবিতায় কিভাবে real হয়ে উঠেছে তার উল্লেখেই এ আলোচনা সমাপ্ত করা হল। ১৯ নভেম্বর ১৯৭০ বারাসাতের আমডাঙ্গা ও অন্যান্য স্থানে হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ১১ জন মৃত যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বধ্যভূমির স্পন্দন ধরা পড়েছে সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতায়। নবারুণ ভট্টাচার্যের সেই বিখ্যাত কবিতাটি এ প্রসঙ্গে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

কবিতাটি হল-

<u>এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়</u> - নবারুণ ভট্টাচার্য

যে পিতা সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে ভয় পায়
আমি তাকে ঘৃণা করি

যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে
আমি তাকে ঘৃণা করি
যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবি কবি ও কেরানী
প্রকাশ্যে পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না,
আমি তাকে ঘৃণা করি
আটজন মৃতদেহ
চেতনার পথ জুড়ে শুয়ে আছে
আমি অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাচ্ছি
আট জোড়া খোলা চোখ আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে
আমি চিৎকার করে উঠি.......এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না
এই জল্লাদের উৎসব মঞ্চ আমার দেশ না
এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না।।

এবং প্রান্তিকের বই-

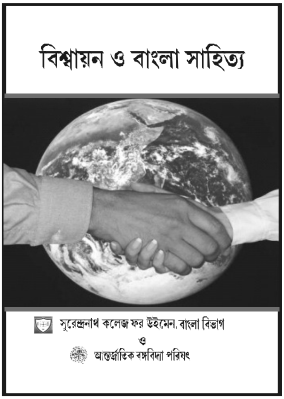

বিশ্বায়ন ও বাংলা সাহিত্য

সম্পাদক

সনৎকুমার নস্কর

মূল্য : ১৮০ টাকা

বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কী তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেননা বিশ্বায়ন হল সেই ধরনের এক আর্থ-সামাজিক - রাজনৈতিক - সাংস্কৃতিক অবস্থা, যার তুলনা চলতে পারে কেবল লতাজটিল বৃহদরণ্যের সঙ্গে। বিশ্বায়ন বর্ণচোরা সরীসৃপের মতো, ক্ষণে ক্ষণে রঙ পালটায়, ধরাই যায় না তার আসল স্বরূপটা কী। একই সঙ্গে, এর শুরুর ইতিহাসটাও অজানা। কেউ কেউ বলেন এর জন্ম হয়েছে দু'-আড়াই দশক আগে, আবার কারুর মতে বিশ্বায়নের আবির্ভাব ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক কালেই। বিশ্বায়নকে কেউ ভেবেছে আশীর্বাদ, আবার অনেকে তাদের জীবনে একে অভিশাপ হিসেবেও বিবেচনা করেছে। বিশ্বায়নের মতো বিতর্কিত বিষয় বোধহয় এই মুহূর্তে আর একটাও নেই। বিশ্বায়ন আজ তাই আমাদের, বর্তমান বিশ্বের বাসিন্দাদের, বিশেষ আগ্রহের বস্তু।

নারীবাদী ইতিহাস রচনার ধারাবাহিকতা : প্রেক্ষিত অবিভক্ত বাংলার তেভাগা আন্দোলন

এস. এম. সারওয়ার মোর্শেদ*

পুরুষ কেবল লিখিত ইতিহাসের রচয়িতা এবং কর্তাই নয় মৌখিক ইতিহাসেও সে কর্তাস্থানীয়। পুরুষের বৃত্তান্তে তো বটে-ই, এমনকি নারীর বর্ণনাতেও তেভাগার লড়াই হচ্ছে ভাগচাষী বা বর্গাচাষীর তিন ভাগের দুই ভাগ ফসলের হিস্যা আদায়ের লড়াই এবং বর্গাচাষী পুরুষ। তারা লড়াই করে পুরুষ জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে। এক পক্ষ জমির মালিক, অন্য পক্ষ ফসলের অংশের মালিক। বর্গাচাষী যখন 'লাঙ্গল যার জমি জমা তার' বা 'কাস্তে যার ফসল তার' দাবী তোলে সে শ্রমের ভিত্তিতে ফসলের ভাগের ন্যায্যতার কথা বলে এবং সম্পত্তির উপর নিছক ব্যক্তি মালিকানার ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু ভাগচাষী পরিবারের কিষাণীর শ্রমের ভিত্তিতে স্বত্ত্বাধিকার বা কর্তৃত্বের প্রশ্ন আবছা হতে থাকে। ফসলের ন্যায্য হিস্যার দাবীতে লড়াইয়ের ইতিহাস চর্চার লিখিত কিংবা মৌখিক উপজীব্য হয়, জোর করে ধান কেটে আনা, দালাল হালাল বা জোতদার খতম, জেল জুলুম সহ্য করার 'মাপে' বড় ঘটনাগুলো ঘটে। আর এই অভিজ্ঞতাগুলো একান্ত ভাবেই পুরুষের বিধায় পুরুষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণায় পুরুষ প্রধান কথক হিসাবে পাওয়া যায়। নারী তো এমন ঘটনার 'কিছুই জানে না'।

স্মৃতিচারণের ভেতর দেখা ইতিহাস : নারীর অভিজ্ঞতার স্মৃতির মধ্য থেকে আমরা যে লুকানো ইতিহাসের অন্বেষণ করছি তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত জটিল। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আগের স্মৃতি থেকে একটি যৌথ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং সেই অভিজ্ঞতা কোন গবেষক যখন নিজের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অর্থাৎ প্রত্যক্ষমূলক গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে যান-এই দুই অভিজ্ঞতার ব্যবধান থেকে নানাবিধ জটিলতার জন্ম হয়।

লিঙ্গায়িত লড়াই : একটি প্রান্তস্থ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত শ্রেণি ও লিঙ্গীয় অধস্তনতা জনমানুষের বহুবিধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই প্রতিরোধের ইতিহাস যখন লিখিত হয়, তখন একটি মতাদর্শক প্রক্রিয়ায় কিছু প্রতিরোধ ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃতি পায় আর কিছু প্রতিরোধ অদৃশ্য ও গুরুত্বহীন হয়ে ইতিহাসের অন্তরালে থেকে যায়। মার্কসবাদী ইতিহাসে 'শ্রম শোষণ' এবং শ্রমিকের বা কৃষকের প্রতিরোধ শ্রমিক বা কৃষক প্রত্যয় বিশেষভাবে পুরুষের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিষাণীর শ্রম এই ইতিহাসে অবিশ্লেষিত রয়ে যায় এবং গৃহীপনার মতাদর্শে অদৃশ্য হয়ে থাকে। শ্রম এবং প্রতিরোধ উভয় ধারনারই

*অধ্যাপক, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

লিঙ্গায়িত বিশ্লেষণের কারণে শ্রেণি অধস্তনতা দেখতে পাওয়া গেলেও লিঙ্গীয় অধস্তনতায় তাৎপর্য উন্মোচিত হয় না। বরং প্রতিরোধের ইতিহাসের অধঃস্তন লিঙ্গকে প্রান্তিক করে দিয়ে এই অসম সামাজিক সম্পর্ককে পুনরুৎপাদন করা হয়। এই ইতিহাস তাই সকল অধঃস্তন গোষ্ঠীর জন্য সমান তাৎপর্য বহন করতে পারে না। এবং তা সামাজিক সম্পর্কের অধঃস্তনতার কাঠামোকে প্রশ্ন করার জন্য খন্ডিত, একপেশে, অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত।

বৃটিশ শাসনের শেষ বছরের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন কৃষক সমিতি বর্গাদার কৃষকের হিস্যা বাড়ানোর দাবীতে তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত করে তাতে কিষাণীর শ্রম যেমন গুরুত্ব পায়নি, তেমনি সংগঠিত সংগ্রামে কিষাণীকে অন্তর্ভূক্তকরণের প্রক্রিয়াও ছিল অত্যন্ত লিঙ্গায়িত। ফলে তেভাগার সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণকে বুঝতে চাইলে তেভাগার লড়াই স্বয়ং যে লিঙ্গীয় অসমতাকে প্রশ্ন করেনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে নারীর প্রতিরোধের চৈতন্যকে অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে এবং অসম লিঙ্গীয় সম্পর্কের পরিসরেই আন্দোলন চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, সেই বিশ্লেষণই একজন নারীবাদী ঐতিহাসিকের অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

কিষাণী ও কৃষক : বর্গাদার কৃষক হিসাবে নারী ও পুরুষের শ্রমের লিঙ্গীয় বিভাজনের নারীর অংশটুকু কোন স্বতন্ত্র কৃষকের শ্রম হিসাবে গণ্য করা হয় না। পুরুষ বর্গাদার কৃষক বৈবাহিক চুক্তির মাধ্যমে নারীর শ্রমের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে এবং যাবতীয় হিসাব-নিকাশ থেকে এই কৃষিশ্রম বাদ পড়ে 'ঘরের কাজের' মতাদর্শিক পরিসরে। কৃষি শ্রমের লিঙ্গীয় বিভাজনে নারীর কাজ ভিন্ন বলে গুরুত্বহীন করে দেওয়া এর দ্বারাই সম্ভব হয়ে ওঠে। কৃষিশ্রমে নারীর এই ভিন্ন অংশগ্রহণ অথচ একই সাথে উৎপাদনের উপায় ও উপকরণে সীমিত কর্তৃত্বের মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভিন্নতর অবস্থান তৈরী হয়। একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে এই নারীকে আমরা 'কিষাণী' হিসাবে অভিহিত করি।

প্রচলিত ইতিহাসের সমস্যা : রণজিৎ গুহ প্রচলিত উচ্চবর্গ পক্ষপাতিত্ব ইসিহাস সম্পর্কে বলেন, ইতিহাস থেকে যা সবচেয়ে শেখার কথা হচ্ছে এই যে, ইতিহাস চেতনা কখনও শ্রেণি চৈতন্যের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। একই সাথে তা লিঙ্গীয় চৈতন্যের সীমায় আবদ্ধ। উচ্চবর্গ পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর বাহন ইতিহাসবিদ্যার সাধ্য নেই নিম্নবর্গ নারীর রাজনৈতিক চেতনা ও কার্যকলাপকে ব্যাখ্যা করে। কেননা, তাদের স্বার্থে ও মতাদর্শে ছাঁচে তৈরী ইতিহাসের সঙ্গে সেই সব অস্বস্তিকর সাক্ষ্য ও প্রমাণ মাপা যায় না। অথচ নিম্নবর্গীয় সংগ্রামী ভূমিকা এই স্বতঃপ্রকাশিত যে তা উপেক্ষা করা চলে না। ''সুতরাং ওই ইতিহাসে সাক্ষ্য প্রমাণ উড়িয়ে দিয়ে জনসাধারণের যা স্বতন্ত্র সৃজনী প্রতিভার ফল, উচ্চবর্গ তাকে আত্মসাৎ করে চালিয়ে দিচ্ছে নিজেরাই চিন্তা ও কাজ বলে। এক কথায়, এতই বিদ্যা ভারতবাসীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিস্তার, গভীরতা ও জটিলতাকে উচ্চবর্গের পক্ষপাতিত্ব একটা অপ্রশস্ত, অগভীর, অতি সরল কীর্তি গাঁথায় পরিণত করেছে। উচ্চবর্গের পক্ষপাতিত্ব এই ইতিহাস বিদ্যার সংকট থেকে বেরোনোর জন্য রনজিৎ গুহ সমালোচনার মধ্য দিয়েই পথ খোঁজার কথা বলেন। এজন্য নতুন তথ্যকে নতুন ভাবে পড়বার দরকার হবে। দরকার

হলে বিশ্লেষণের পুরনো কায়দা ছেড়ে নতুন কায়দা তৈরী করে নিতে হবে, আর এসব কিছুকেই সম্ভব করার জন্যেই তথ্যাশ্রিত অভ্যাসের সঙ্গে মেলাতে হবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী।

সত্তর-আশির দশকে ইউরোপে ক্রিস্টোফর হল, এডওয়ার্ড টমসন, এরিক হবসন প্রভৃতি ইংরেজ মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের ধারা অনুসরণ করে এক ধরনের র‍্যাডিক্যাল সামাজিক ইতিহাস বা তল থেকে দেখা ইতিহাস খুব গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। অনেকেই তখন ইউরোপের পুঁজিবাদ আর যন্ত্র সভ্যতার জমকালো ইতিহাস ঢাকা পড়ে যাওয়া বিস্মৃত, অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও তাদের ভিন্নতর জীবনযাত্রার কথা লিখেছিলেন। এর পরে ইতিহাস রচনায় বাদ পড়ে যাওয়া অনেক ঘটনা মতাদর্শ, স্মৃতি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ করে যে সব ঘটনা, বা আন্দোলন ছিল নিতান্তই আঞ্চলিক ও ক্ষণস্থায়ী, সেই সব পৃথক কাহিনী এবং বিশিষ্ট তাৎপর্যকে চিহ্নিত করে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মূলধারার বর্ণনাটাকে অনেক বেশি জটিল ও বর্ণাঢ্য করে তুলেছিল এই নতুন সামাজিক ইতিহাস। পশ্চিমী দুনিয়ার আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের বিশাল তল থেকে খুঁজে খুঁজে এইসব বিস্মৃত কাহিনী বের করে আনা হলেও সেই ইমারতের অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব এবং ঐতিহাসিক ন্যায্যোতা সম্বন্ধে কোন মৌলিক প্রশ্ন তোলার সম্ভবনা ছিল না। নিপীড়িত মানুষের অনিবার্য পরাজয়ের এই কাহিনীসূত্র থেকেও প্রশ্ন তোলার সুযোগ দেখা যায়।

সাব অলটার্ন স্টাডিজের প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধে রণজিৎ গুহ প্রচলিত ইতিহাসের কিছু সংকটের তাত্ত্বিক স্বীকৃতি তৈরী করেন। তাতে তিনি ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতি ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করেন। জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী উভয় ইতিহাসের ধারাই নিম্নবর্গবাদীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হয়। ভারতীয় মুষ্টিমের উচ্চবর্গের এবং উচ্চবর্গীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ইতিহাসকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়াকে ঐতিহাসিক জালিয়াতি বলে অভিহিত করেন তাঁরা। কেননা এতে জনমানুষের রাজনীতি ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত থাকে। সেহেতু তা উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে জন্ম নেয়নি এবং তার অস্তিত্বও এর উপর নির্ভরশীল নয়, তা একটি স্ব-চালিত জগত। এই রাজনীতি উচ্চবর্গীয় রাজনীতির মত উল্লম্ব রেখায় গতিশীল হয় না। বৃটিশ প্রবর্তিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর তা নির্ভর করে না। জাতিসম্পর্ক, আঞ্চলিকতা অথবা শ্রেণি ও লিঙ্গীয় সংহতির ভিত্তিতে জনমানুষের চৈতন্য কাজ করে তেভাগার ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম কিছু নয়। তেভাগা আন্দোলনের শুরু থেকে কমিউনিষ্ট পার্টি যে সব প্রচার পুস্তিকা বের করে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও সংগঠকের যে সব লেখা পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়, তাতে আমরা সর্বত্রই অনুরূপ পক্ষপাতী ইতিহাসকেই প্রত্যক্ষ করি।

কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলা পার্টির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বঙ্গীয় কৃষক সভা ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকায় যে কৃষকের দুঃসহ জীবন-সংগ্রামের হিসাব-নিকাশ ও চিত্রায়ন করা হয়েছে তা শুরুমাত্রই পুরুষের। কৃষক সমাজের অংশ হিসাবে নারীর সম্পর্কে যে দু'একটি বাক্য করা হয়েছে, তা এ রকম-''এই

অভাবের মধ্যে তাহার বোন না খাইতে পাইয়া ৩টি ছেলেমেয়ে লইয়া তাহার বাড়ীতেই আসিয়াছে, তাহারা খাইতে দিতে না পারিয়া বড় মেয়েটিকে বিক্রয় করিয়াছে, দুটি ছেলে ও মেয়ে মায়ের শুকনো বুক চুষিতে, কৃষক ও তাহার স্ত্রী সারাদিন অভুক্ত আছে, আগের দিনও উপবাস রহিয়াছে, প্রতি ঘরের গৃহিনী নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিয়া মুছিতেছে। কৃষক সভার ৭টি দাবীর একটিতেও লিঙ্গীয় প্রশ্ন কোন এজেন্ডা নেই। কৃষক সভার নেতা মুহাম্মদ আবদুল্লাই রসূলের প্রবন্ধে নর-নারী ধরণের ভীড়ের মধ্যে ছাড়া কোথাও নারী নেই। দিনাজপুরের চিরির বন্দরে ৪৭ এর জানুয়ারিতে পুলিশের নির্যাতনে শহীদ ক্ষেত মজুর সমিরুদ্দিনের নাম জানতে পারলেও তার প্রতিবাদী আহত বোনের নাম জানাতে পারেননি।

তেভাগার নেতা ও সংগঠকের স্মৃতিচারণ বা দিনপঞ্জীগুলোতে নারীকে বাস্তব ঘটনার মধ্যে দেখা যাবে আশা করা গেলেও ঘটনাও যে মতাদর্শিক হয়ে পড়ে এই লেখাগুলো তা-ই প্রমাণ করে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর শিল্পী সোমনাথ হোড় কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দেশে রংপুর যান। সোমনাথ হোড়ের ডায়েরী ও আঁকা ছবি সে সব দিনের জীবন্ত এক দলিল হিসাবে গণ্য হয়। শিক্ষিত কলকাতার বাবু কমরেডের হাতে পুরুষ কৃষকই যেখানে যথার্থ কমরেড হয়ে উঠতে পারেননি, সেখানে নারীর কথা বলাই বাহুল্য। বিন্দু বিন্দু লাল রক্ত দিয়ে যে বিরাট সোনালী ধানক্ষেত তোমরা বানিয়েচ, সে তোমরা ছাড়বে না-এ আমি জেনেছি। তোমরা ডিমলার কিষনেরা, তোমাদের মুঠো মুঠো অভিনন্দন। ধানক্ষেত বানানো এবং তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কর্তা পুরুষ। স্বাধীনতা (২৫.১২.৪৬) পত্রিকার উদ্ধৃতিকে তিনি নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেন-সুন্দর দীঘিতে পুলিশের আক্রমণের পাল্টা জবাবে জলপাইগুড়ির কৃষক মেয়েরা ধৃত স্বামী-পুত্রের স্থান গ্রহণ করিয়া মাঠের ফসল ঘরে আনিলেন। এভাবে নারী সংগঠক ও মেয়েদের হিসাব ইতিহাসে অতিরিক্ত প্রত্যয়ে পরিণত করেন। নারী কৃষকের রাজনৈতিক ভূমিকা হচ্ছে পুরুষের অনুপস্থিতিকে সামাল দেয়া মাত্র।

তথ্য নির্দেশ :

১। রণজিৎ গুহ, নিম্নবর্গের ইতিহাস, গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৮, পৃ-২৯

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৪। Ranajit Guha, On Some Aspects of the Historiography of Colonial India, In Ranajt Guha (ed) Subalterœ Studies I writing on South Asian History and Society, Oxford University Press, Delhi, 1982

৫। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা-তেভাগা লড়াই, ১৯৪৬। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা, বর্ষ-৩০, ৪২-৪৬, কলকাতা ১৪০৪ এ পুনঃমুদ্রিত, পৃ. ১৫-২৫

নবীন প্রাণের জাগরণ : বীরবলের সবুজপত্র

নন্দকুমার বেরা*

সবুজপত্রের প্রথম প্রকাশ ১৩২১ এর ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে। রবীন্দ্রনাথ তখন মাঝবয়সী। ১৯১৩ তে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সমগ্র বিশ্বের সামনে ভারতের বিশাল ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ। সে সময় ভারতের উল্লেখযোগ্য ঘটনা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাময়িক একটা সম্প্রীতি বন্ধন গড়ে উঠেছে। বৃটিশ সরকারের বিরোধিতায় পশ্চাদমুখী খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এক হয়েছে। গতি, আত্মশক্তি, দ্রোহ শুরু হয়েছে সমাজের মধ্যে — ঠিক সে সময়েই প্রকাশ পায় সবুজপত্র। যা বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের সূচনা করেছিল।

সবুজপত্র ছিল প্রবন্ধ-নির্ভর পত্রিকা। এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে ১৯শ শতকের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি লেখকদের মনোজগতে ইতিহাস-চেতনা ও সামাজিক নীতিবোধের যে ব্যাপক প্রকাশ ঘটেছিল সে ধারায় এনেছিল লক্ষণীয় পরিবর্তন। এখানে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল সামাজিক নানা সংস্কার থেকে সার্বিক মানসমুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবাদিতা, যুক্তিবোধ ও রুচিশীলতা। ‘‘এই পত্রিকায় মনোরঞ্জন মূলক কোনো বিজ্ঞাপনও ছাপা হতো না। সবুজপত্রে কখনো কোনো ছবি বা কোনো রকম অলংকরণ মুদ্রিত হয়নি, প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। প্রচ্ছদ ছিল গাঢ় সবুজ রঙের, তার ওপরে একটা সাদা তালপাতা চিত্রিত হয়েছিল। তালপাতা ছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক আর সবুজপাতা ছিল নবজীবনের বাণীবাহক।’’[১] সবুজপত্র কি ধরনের পত্রিকা হবে, কি রকমের লেখা ছাপা হবে, লেখকের ও পাঠকের কাছে তার প্রত্যাশা কি হবে, এ নিয়ে প্রথম সংখ্যাতেই (বৈশাখ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) প্রথম চৌধুরীর আলোচনা করেছেন। এই বক্তব্যই সবুজপত্রের সকল রচনার মূল সূর। তাতে চৌধুরী মহাশয় বলেছেন : ‘‘সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরুক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপরে এসে অবতীর্ণ হন, তা হলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সব চেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারই জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য

*অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্য কে ঔদাস্য বলে, শ্মশানবৈরাগকে ভুমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মা কে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্বলের বল। যে দুর্বল, সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। ''আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না — কিন্তু চাবুক মেরে বাঙালি পাঠক মনকে জাগিয়ে তোলার সার্থক স্পর্ধা করেন প্রমথ চৌধুরী।

এখানেই শেষ নয়। বাংলা সাহিত্য আর দেশজ থাকবে না, তা হবে দেবোত্তর, সে কথা ও এই ভূমিকায় বীরবল বলেছিলেন। কেবল দেশীয় প্রেরণাই যথেষ্ট নয়, চাই বিদেশী দক্ষিণা-পবন,-- ''ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নবসাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমণে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চ যেমন ফুল ফুটেছিল, ইউরোপের আগমণে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটেছে। তার ফল কি হবে, সে কথা না বলতে পারলে ও এই ফুল ফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন তাঁকেই আমরা ফুলের চাষ করবার জন্য উৎসাহ দেব।"[৩]

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রাণের যে লীলা দেখা গেছে, বীরবল তাকেই বাংলা সাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন। জাড্যলেশহীন তারুণ্যের সাধনাই যথার্থ সাহিত্য সাধনা বলে ভেবেছিলেন। ''এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন গুলিয়ে গেছে। সেই মন কে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে দিতে পারে তবেই তা পরে সাহিত্য দর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্পপরিসর প্রতিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। --ইংরাজী শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে। নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না।"[৪]

সবুজপত্রে এই তারুণ্যের সাধনা, প্রণের জয় ঘোষণা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই, মানসিক ঔদার্য ও আত্মসংযমের সাধনা, দেশ নয়, দেশোত্তর প্রেরণার আহ্বান, সংহত পরিপাটি রচনার প্রযত্ন ও যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ দৃষ্টির প্রসার লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেবল গোষ্ঠীপতির লেখায় নয়, গোষ্ঠীর ছোট-বড় সকলের রচনাতেই এই যুক্তি ও মোহমুক্তি, সংযম ও শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়, এখানেই সবুজপত্রের সার্থকতা। এই

গোষ্ঠীর প্রধান লেখক ছিলেন দুজন-প্রমথ চৌধুরী ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন - অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীরেশ্বর সেন ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী ইত্যাদি।

''বীরবল'' ছদ্মনামটি কেন গ্রহণ করেছেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন - ''আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম।''[৫] এ নাম তিনি ভেবেচিন্তেই অবলম্বন করেছিলেন তা বীরবল প্রবন্ধটি পড়লে সহজেই বোঝা যায়।

তিনি বলেছেন, ''আমি বাঙ্গালী জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি, কারণ নিত্য আমি দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য বলে ভুল করেন, এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ।''[৬]

সবুজপত্রে তিনি ইউরোপীয় যৌবন-যা চিরস্থায়ী মানসিক যৌবন-তার চর্চা এবং ইউরোপীয় প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, আমাদের মন সর্বদা ঘুমিয়ে থাকে। তাকে জাগিয়ে তোলাই প্রমথ চৌধুরীর ও সবুজপত্রের সাধনা। এ জন্যেই তিনি সাহিত্য চর্চায় নেমেছিলেন।

সংকেত সূত্র :

১। সবুজপত্র - সম্পাদক প্রমথ চৌধুরি (প্রথম সংখ্যা - ১৩২১, ২৫ শে বৈশাখ)
২। সবুজপত্র - প্রথম সংখ্যা - সম্পাদকীয়
৩। বীরবলের হালখাতা - প্রমথ চৌধুরী
৪। বীরবল প্রবন্ধ - প্রথম চৌধূরি চৈত্র-১৩৩৩
৫। খেয়ালখাতা প্রবন্ধ
৬। বীরবল প্রবন্ধ - চৈত্র ১৩৩৩

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মে জাহ্নবাদেবীর ভূমিকা

বিজলী দে*

মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজ ছিল পুরুষ তান্ত্রিক। সেই সমাজে নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বহুদিন থেকেই নারীর শিক্ষার অধিকার হয়েছিল অপহৃত। শিক্ষার অধিকার অস্বীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারের অন্ধকার কালো হাত চেপে ধরেছিল তাদের। এই পর্বে এসে রঘুনন্দনের স্মৃতিসংহিতা, বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য প্রথা এবং দেবীবর ঘটকের বিবাহ সংক্রান্ত বিবিধ বিধান ধীরে ধীরে নারীদের ঠেলে দেয় আরো সুতীব্র অনিশ্চয়তার দিকে। বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথার অজুহাতে বহু বিবাহ তথা অসমবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি প্রথার যূপকাঠে প্রতিনিয়ত বলি প্রদত্ত হতে থাকল নারী। তার সঙ্গে যুক্ত হল পর্দাপ্রথা। স্বাধীনতার সব অধিকার কেড়ে নিয়ে প্রচার করা হল - নারী বাল্যকালে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন।[১]

চৈতন্যদেব মধ্যযুগীয় এই গড্ডালিকা প্রথার বিপরীতে কিছুটা হলেও গিয়েছিলেন। নারীর অবমাননার দীর্ঘ প্রাচীরকে তিনি যে একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন তা কিন্তু নয়, তবে কিছু ফাটল রেখা সৃষ্টি হয়েছিল।

আমরা প্রথম বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেখতে পাই। বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে নারী-পুরুষ এখানেই নিহিত ছিল আধুনিকতার বার্তা। পরবর্তী পর্যায়ে বৈষ্ণব আন্দোলনে নারীজাতির সক্রিয় অংশগ্রহণ আমরা প্রত্যক্ষ করি। ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবর্গ যেখানে মহিলাদের প্রথম থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন সেখানে চৈতন্যদেব তাদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তবে সন্ন্যাস-পরবর্তী পর্যায়ে সংগঠনের শুদ্ধতা বজায় রাখার তাগিদে তিনি সংগঠনের থেকে দূরে রেখেছিলেন নারীদের। প্রাথমিক পর্যায়ে চৈতন্যদেব নারীদের যে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন তার প্রভাব হয়েছিল সুদূর প্রসারী। চৈতন্য পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকজন নারী আরোহণ করেছিলেন বৈষ্ণব সংগঠনের শীর্ষ আসনে। এঁদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্যের স্ত্রী সীতা দেবী, নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লোখযোগ্য।[২] সমগ্র মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলে নারী অবমাননার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রমী উদাহরণ নিঃসন্দেহে অভাবনীয় ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নবজাগরণের ঢেউ এসেছিল বাংলার দ্বারে এবং যার সূত্র ধরে ঘটেছিল নারী জাগরণ, তার এক পূর্বসূত্র যেন নিহিত রয়েছে সীতাদেবী, জাহ্নবাদেবী, হেমলতা ঠাকুরানী ইত্যাদি বৈষ্ণব নারীদের কার্য বিবরণের মধ্যে। এখন আমরা আলোচনা করব জাহ্নবাদেবীকে নিয়ে।

*অধ্যাপিকা, বি.এড বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ।

জাহ্নবাদেবী ছিলেন নিত্যানন্দের পত্নী। জাহ্নবাদেবী ১৪৩১ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রি:) বৈশাখ মাসে নবদ্বীপের অনতিদূরে শালিগ্রাম নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।[৩] পিতার নাম সূর্যদাস পণ্ডিত এবং মাতার নাম ভদ্রাবতী। জাহ্নবাদেবীরা দুই বোন ও এক ভাই ছিলেন। জাহ্নবাদেবী বসুধাদেবী অপেক্ষা ছোট ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন চন্দ্রশেখর।

'ভদ্রাবতী নাম শ্রী জাহ্নবার জননী।
অতি পতিব্রতা সূর্যদাসের ঘরণী।।'[৪]

জাহ্নবাদেবীর পিতা সূর্যদাস পণ্ডিত তৎকালীন গৌড়ের অধিপতি যবন রাজের অধীনে কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতার জন্য যবনরাজ তাঁকে 'সরখেল' উপাধি দেন। সূর্যদাস পণ্ডিত 'শ্রীমদ্ভাগবতে'র খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করতেন। তিনি ভক্তি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দুই কন্যা বসুধা এবং জাহ্নবার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হয়েছিল। তবে 'বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী' মতে ১৪৪১ শকে (অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রি:) নিত্যানন্দ বসুধাকে বিবাহ করেছিলেন।[৫] আর ১৪৪৩ শকে (অর্থাৎ ১৫১১ খ্রি:) নিত্যানন্দের ইচ্ছায় সূর্যদাস পণ্ডিত তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা জাহ্নবাদেবীকে নিত্যানন্দের হস্তে সমর্পন করেছিলেন।[৬]

জাহ্নবাদেবীর পিতা ও মাতা উভয়েই চৈতন্য ভক্ত ছিলেন। পুত্র-কন্যাদের জন্মের কয়েক বছর পরে সূর্যদাস পণ্ডিত সপরিবারে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিতের কাছে অম্বিকা কালনায় এসে বসবাস করেছিলেন বাল্যকাল থেকেই জাহ্নবীদেবী গম্ভীর ও তেজস্বিনী ছিলেন। পিতা ও পিতৃব্যের কাছ থেকে ভক্তিশাস্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন।

বিবাহের পর নিত্যানন্দের দুই পত্নীকে নিয়ে প্রথমে বড়গাছি ও তারপরে নবদ্বীপে এসেছিলেন এবং শ্রীবাস-পত্নী মালিনী ও শচীদেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর খড়দহে এসে পুরন্দর পণ্ডিত প্রদত্ত বাসগৃহে কুঞ্জবাটীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। এখানে বসুধাদেবীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। পরে বীরভদ্র (বীরচন্দ্র) ও গঙ্গাদেবী জন্ম গ্রহণ করে সুস্থ দেহে জীবন যাপন করেছিলেন।

জাহ্নবাদেবী বন্ধ্যা ছিলেন। 'বংশী' গ্রন্থে জাহ্নবাদেবী বলেছেন,

'আমি জন্ম বন্ধ্যা মোর পুত্র কন্যা নেই।
তেঁই তোর পুত্র এক ভিক্ষা মুঞি চাই।'

জাহ্নবাদেবীর এই উক্তিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ড. সুকুমার সেনও বলেছেন, 'জাহ্নবা নিঃসন্তান ছিলেন।'[৭]

নানা গ্রন্থ ও উক্তি থেকে আমরা মনে করতে পারি জাহ্নবাদেবী বন্ধ্যা ছিলেন। 'বংশী' গ্রন্থে জাহ্নবাদেবীর উক্তি এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকেও তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাহ্নবাদেবীর সন্তান ছিল না বলে নিত্যানন্দ তাঁর এক শিষ্য পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর শিশু সন্তানকে এনে জাহ্নবাদেবীকে পালন করতে দিয়েছিলেন।

জাহ্নবাদেবী তাকে পুত্ররূপে পালন করেছিলেন এবং পরে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর নাম রাখেন কানাই বা কানুঠাকুর। জাহ্নবাদেবী পরবর্তীকালে নবদ্বীপের বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রামচন্দ্রকেও দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। রামাই পণ্ডিত নামে উনি বিখ্যাত হয়েছিলেন।

রামচন্দ্রকেও জাহ্নবাদেবী পরবর্তীকালে দীক্ষা দিয়েছিলেন। জাহ্নবাদেবী রামচন্দ্র বা রামাইকে নিয়ে খড়দহে গিয়েছিলেন। খড়দহে যাত্রাপথে জাহ্নবাদেবী রামাইকে বিভিন্ন বৈষ্ণবপাটে নিয়ে গিয়ে, বৈষ্ণব সমাজের তৎকালীন গণমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজপুত্র রূপে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। জাহ্নবাদেবী একের পর এক বৈষ্ণবপাট পরিভ্রমণ করে খড়দহে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে বীরচন্দ্র ও গঙ্গাদেবীর সঙ্গে রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বসুধা পুত্র বীরভদ্র বীরচন্দ্র চিরকালি জাহ্নবাদেবীর একান্ত অনুগত ছিলেন এবং তাঁকেই মাতৃ-মর্যাদা দান করেছিলেন। জাহ্নবার কাছেই বীরচন্দ্র বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, অথচ এই বীরচন্দ্র দীক্ষা নেবার সময় জাহ্নবার কাছে দীক্ষা না নিয়ে অদ্বৈতের কাছে দীক্ষা নিতে শান্তিপুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু অদ্বৈত আচার্যের পরামর্শে বীরচন্দ্র শেষ পর্যন্ত জাহ্নবাদেবীর কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শচীনন্দনকেও জাহ্নবাদেবী দীক্ষা দিয়েছিলেন।

রামচন্দ্রও জাহ্নবাদেবীর কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। রামচন্দ্র শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ হলে জাহ্নবাদেবী তাকে দেশ-বিদেশে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের আদেশ দিয়েছিলেন, নিত্যানন্দের তিরোধানের পরে জাহ্নবাদেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে জাহ্নবাদেবী ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি অন্তঃপুরের বাইরে এসে রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। দীক্ষাদাত্রী 'মা গোসাই' হওয়ার সুবাদে নিত্যানন্দ-শাখার শিষ্য মণ্ডলীকে সংগঠিত করার প্রেরণায় কিংবা কোনো বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো বৈষ্ণব মহাত্মার সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য তাঁর এই পর্যটন ছিল। কাটোয়া, সাতগ্রাম, নোতাগ্রাম, মঙ্গলকোট, বুধুরি, একচক্রাস খেতুরী ইত্যাদি স্থান তাঁর পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল। তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজও তাঁকে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিল।

কেবল রাঢ়বঙ্গে নয়, সুদূর বৃন্দাবনে একাধিক বার যাতায়াত করে এবং সেখানে গোস্বামী বৃন্দাবনের সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনা করে জাহ্নবাদেবী তাঁদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু কালানুক্রমিক সমস্ত ঘটনা সংস্থাপিত না হওয়ার জন্য বিভ্রান্তি দেখা যায়, যেমন জাহ্নবাদেবীর মোট কতবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং কোন্ যাত্রায় তিনি কি কি করেছিলেন তা সঠিক ভাবে বলা দুষ্কর। তবে শ্রী নিমাই চাঁদ গোস্বামী তাঁর 'শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ শক্তি মা জাহ্নবা' গ্রন্থে যুক্তি

সহকারে নানা প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে যেভাবে ঘটনা বিন্যাস করে দেখিয়েছেন যে জাহ্নবীদেবী মোট তিনবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, এটা অগ্রাহ্য করা যায় না।

সেকালে রাঢ় বঙ্গ থেকে সুদূর বৃন্দাবনে যাতায়াত করা বেশ দুঃসাধ্য ছিল। ঊষর প্রান্তর, গভীর অরণ্যভূমি বা জলপথে 'মনুষ্য-যান', পাল্কি কিংবা নৌকা করে যেতে হত। পথে দস্যুদের কবলে পড়লে মানুষকে সর্বস্বান্ত হতে হত। সেজন্য লোকবল ও যথেষ্ট সাহস না থাকলে বৃন্দাবনে যাওয়া যেত না। এছাড়া অর্থ বলেরও প্রয়োজন ছিল। আড়াই মাস বা তিনমাস পর্যন্ত সময় লাগত বৃন্দাবনে পৌঁছাতে কিংবা সেখান থেকে ফিরে আসতে। এ রকম অবস্থায় সেখানে তিন তিন বার বৃন্দাবনে গিয়ে জাহ্নবাদেবী যে কতটা সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা চিন্তা করলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়।

জাহ্নবাদেবী নয়ন ভাস্করকে দিয়ে রাধিকা মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। তারপর ১৫০৬ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে তাঁর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার তিনজন সঙ্গী পরমেশ্বর দাস, কানুঠাকুর ও নৃসিংহ-চৈতন্যকে উপযুক্ত অর্থ, বস্ত্র ও অলংকার এবং লোকবল দিয়ে নৌকা করে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন। কিছু বিরোধ মূর্তি গোপীনাথ মূর্তির বামপার্শ্বে বসানো হয়েছিল, উপযুক্ত মর্যাদা ও উৎসব সহকারে।

জাহ্নবাদেবীর তৃতীয়বারের বৃন্দাবন যাত্রা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাকারদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী নানা উক্তি আছে। এ বিষয়ে 'ভক্তিরত্নাকার' গ্রন্থের বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায়, তা এই পরমেশ্বরী দাস শ্রী রাধিকা মূর্তি নিয়ে বৃন্দাবনে গমনের সময় শ্রীনিবাসকে বলেছিলেন,

'শ্রীঈশ্বরী পুনঃ যাইবেন বৃন্দাবন।'

আবার ফিরে আসার সময়েও তিনি তাঁকে বলেছিলেন-

'শ্রীঈশ্বরী পুনঃ শীঘ্র যাইবেন তথা।'

এই উক্তি অনুযায়ী মনে হয় ১৫০৬ শকাব্দের মাঘ মাসেই ৭৫ বৎসরের বয়সে নব প্রতিষ্ঠিত 'বংশী শিক্ষা' অনুযায়ী ১১ মাস পরে' মূর্তিকে দর্শনের জন্য এবং শেষজীবন বৃন্দাবনে কাটাবার জন্য জাহ্নবাদেবী পালকী ও নৌকাযোগে তৃতীয়বার বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তিনমাস পরে সেখানে পৌঁছেছিলেন। পাঁচ বৎসর বৃন্দাবনে থাকার পর ৮০ বৎসর বয়সে ১৫১১ শকাব্দে (১৫৮৯খ্রি:) জাহ্নবাদেবীর মৃত্যু হয়েছিল, এটা অনুমান করা যায়। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের বর্ণনা এবং রামানুজদাসের 'জননী জাহ্নবী' প্রবন্ধের বর্ণনা দেখে আমাদের মনে হয় জাহ্নবাদেবী তিনবার ব্রজধামে গিয়েছিলেন। ব্রজধামেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জাহ্নবাদেবী নিপুণতার সঙ্গে সঙ্ঘ পরিচালনা করতেন। জাহ্নবাদেবী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বৈষ্ণব মণ্ডলে আপন চারিত্রিক গুণে অর্জন করে নেন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। খেতুরীর মহোৎসবে তিনি পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি বহু বৈষ্ণব ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষা

দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর বিখ্যাত পাদকর্তা জ্ঞানদাস ছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য। তাঁর নেতৃত্ব কয়েকটি মঠ স্থাপিত হয়। শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার সাহা তাঁর 'বৈষ্ণব ধর্ম ও মধ্যযুগে নারী আন্দোলন' প্রবন্ধে বলেছেন 'এই আখড়াগুলি গোস্বামীনিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এগুলিতে ঠাকুর সেবা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ যেমন চলত, তেমনি শিক্ষাদানের কাজও চলত। তবে প্রাথমিক শর্ত ছিল বোধহয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। আশ্রম বাসিনী শিষ্যরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করত। আবার আশ্রমবাসিনী এবং গৃহী শিষ্যাদের বৈষ্ণব জগতের নতুন নতুন তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য মাঝে মাঝেই বিভিন্ন আখড়ার যশস্বী মহন্তরা পাঠ এবং ব্যাখ্যা শোনাতেন, তত্ত্বকথা আলোচনা হত ইত্যাদি।'

এর দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে সেই যুগে প্রতিষ্ঠিত মঠ বা আখড়াগুলি একই সঙ্গে মানুষের ধর্মীয় উৎকর্ষের দায়িত্ব যেমন পালন করেছিল, তেমনি গ্রহণ করেছিলেন কিছু সামাজিক দায়িত্ব যার মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার অন্যতম। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন আশ্রমের গোস্বামীদের উপর। চিত্রাদেব তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' গ্রন্থে বলেছেন -'মাইনে করা বৈষ্ণবী এসে 'শিশুবোধক', 'চাণক্যশ্লোক', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' পড়াত। আর কলাপাতায় চিঠি লেখা মক্‌শো করাত। এ নিয়ম যে শুধু ঠাকুর বাড়িতে ছিল তা নয়, অনেক বাড়িতে ছিল।'

এই ভাবে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়েও নারীশিক্ষার যে দীপবর্তিকা জ্বলছিল তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গোস্বামীনিরা। এক্ষেত্রে প্রথম পরিকল্পনাকারী হিসাবে জাহ্নবাদেবীর কৃতিত্ব অভাবনীয়। জাহ্নবাদেবীর মধ্যে ছিল এক পরিব্রাজকের সত্তা। সারা জীবন তিনি বহু স্থানে ভ্রমণ করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মে জাহ্নবাদেবীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। কৌশিক দাশগুপ্ত, মধ্যযুগীয় সাহিত্য দর্পণে নায়িকা অন্বেষণ, শ্রী ভারতীয় প্রেস, কলকাতা, আগস্ট ২০১১, পৃ. ১২০
২। প্রাগুক্ত, কৌশিক দাশগুপ্ত, পৃ. ১২১
৩। মুরারিলাল অধিকারী, বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৩২, পৃ. ৪৫
৪। নরহরি চক্রবর্তী, ভক্তিরত্নাকর, গৌড়ীয় মঠ, একাদশ তরঙ্গ, ১৯৬০, পৃ. ৪৪০
৫। প্রাগুক্ত, মুরারিলাল অধিকারী, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৯
৬। প্রাগুক্ত, মুরারিলাল অধিকারী, পৃ. ৭০
৭। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ষষ্ঠ সং, ১৯৭৮, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৪৬
৮। শ্রীনৃসিংহ রামানুজ দাস, জননী জাহ্নবা, মানব-প্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দ, সোনারতরী, সম্পাদক-উমা, বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৭, পৃ.৯০

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বদেশ-সাধনা

পদ্মনাভ বেরা*

জীবিতকালে যে-ক'জন প্রতিভাধর স্রষ্টা বাঙালির হৃদয়েশ্বর হয়ে উঠে সমগ্র জাতের Blanke cheque পেয়েছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বত্রিশ বছরের (১৮৮২-১৯১৩) সাহিত্য সাধনার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তিনি গীতিকবিতা ও গান রচনা করেছেন। হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করেছেন, লঘুরসের প্রহসন লিখেছেন, আবার গভীর রসাত্মক নাটকও লিখেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্র মানসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে তাঁর রচনাগুলির রসরীতির বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মৌলিক সমন্বয় সূত্রটি আছে, তা আবিষ্কার করা প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলালের মানস জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মূলে একটি সামগ্রিক ঐক্য ও আছে। সেই ঐক্যটি হলো গীতিধর্মিতা। এমন কি তাঁর নাটকগুলির মধ্যেও কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বিচিত্র কবি স্বপ্ন ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগই বর্ণময় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের সমস্ত সাধনার মূলে ছিল গীতি কবির প্রতিভা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক ও তাঁর জন্মভূমি গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির প্রতি, প্রীতি প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীর কতকগুলি তথ্য (১৯০৩) নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯১৩) দশবছর প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্য রচনার পর্ব। তাঁর নাটকগুলির পটভূমিকায় আছে, তৎকালীন রাজনৈতিক জীবনের উত্তেজনা। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সমসাময়িক দেশকালের আকাঙ্খাকে মিশিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্য রোমান্সগুলি রচনা করেন।[১] স্ত্রী বিয়োগের পর শূন্য হৃদয়ের বেদনা তৎকালীন গানে ও কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। আকস্মিক ভাবে দেশকালের একটি অমোঘ নির্দেশ দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনকে এক নূতন পথ নির্দেশ করেছে। ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক শোক এক বৃহত্তর জাতীয় জীবনের কলধ্বনির সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিয়েছিলেন জাতীয় জীবনের এই প্রবল আলোড়নের মূলে আছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য জীবনের শেষ দশক এই আন্দোলনের উত্তাপে রূপায়িত সেখানেই তিনি শেক্সপীয়রের অপূর্ব নাটকগুলির অভিনয়ে অভিভূত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর নাটকগুলিতে শেক্‌সপীয়রের প্রভাব একটু বেশি করে পড়েছে। তৃতীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শুধু নাট্যকার ছিলেন না, কবিও ছিলেন এবং তাঁর নাটকগুলিতে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় ক্ষেত্রেই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনি পরিচালিত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং বলেছেন - "কবিতায় আমার অত্যাধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করতে পারি নাই।"[২]

---

*অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ধূলাগড় মহাবিদ্যালয়।

নাটকে কাব্যের স্থল আছে। কিন্তু কাব্যে যেখানে নাটকের নাট্যধর্মকে ক্ষুন্ন করে সেখানে কাব্যের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ আনা যেতে পারে। কেন না নাটক নাটকই এবং নাটকের পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যই সর্বাগ্রে বিচার্য। কারন নাটকের চুড়ান্ত সাফল্য তাঁর নাট্যগুনের মধ্যেই নিহিত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে কাব্য বহু ক্ষেত্রে 'কাব্যিকতায়' রুপান্তরিত হয়েছে। যেখানে সংলাপের মধ্যে সরলতা এবং গদ্য-গুন প্রার্থনীয় সেখানেও তিনি ভাষাকে কাব্যের পোষাক পরাতে -দ্বিধা করেন নি। চরিত্র-নির্বিশেষে, ভাব-নির্বিশেষে ভাষার তুবড়ি ছুটিয়েছেন। তাঁর নাটকে এমন একটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া ভার যে তার সংলাপে উপমার পর উপমা, উৎপ্রেক্ষার যোগ করেননি। কিন্তু কাব্য সংলাপ মাত্রেই নাট্য সংলাপ নয়। যে কাব্য নাট্যধর্মে দীক্ষিত নয়, নাটকের রাজ্যে তাঁর স্থান নেই। নাটক যেহেতু নাটক সেজন্য নাটকীয় উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলার জন্যেই কাব্যের ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া আর কোনো প্রকারে শিল্প-সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, বাংলা গদ্য সংলাপের ভাষায় কাব্য রচনার সৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে আর কেউ করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি কাব্য ও নাটকের যথার্থ সমন্বয় করতে পারেন নি। বাংলায় নাটকে এই সমন্বয় যতদূর পরিণতি লাভ করতে পারে তার শেষ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের নাটকেও পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের অধিকাংশ নাটক রচনার উদ্দেশ্যর মধ্যে জাতির অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং ভারতের আধ্যাত্ম সাধনাকে আপন যুগধর্মের অনুকূলে বরণ করেছিল। ''দেশবাসীর জীবন চেতনার বহিঃ প্রদেশে যখন আপন স্বাতন্ত্র্যরক্ষার উগ্র বাসনা অগ্নিতেজে মেতে উঠেছিল, তখন দ্বিজেন্দ্রনাল দেশবাসীর সামনে তাদের বৈভবময় ইতিহাস, অতীত কীর্তি এবং বীরগাথা, ধর্মাদর্শ, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য, দারিদ্র্যের অগ্নিগর্ভ তেজস্বীকার আদর্শগুলি তুলে ধরেন।''[৩] স্বজাতির মঙ্গলের জন্য দেশের চিরন্তন ক্ষুদ্রতা, আলস্য, ঔদাসিন্য, জাতিভেদ যা জাতীয় জীবনকে অবজ্ঞেয় করে তুলেছে, তাকে দূর করাই ছিল তাঁর নাট্য সাধনার একমাত্র ব্রত। তাই 'সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন - কর্মযোগী সাধক। কর্মের নিরলস সাধনায় তিনি দেশ ও জাতির যে অক্ষয় মঙ্গলচিন্তা করেছিলেন, নাটকের বহুস্থানে তার পরিচয় দেখাতে পাওয়া যায়।'[৪]

দেশ যাতে আপন গরিমায় অধিষ্ঠিত হয়, সে জন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশবাসীর কাছে জন্মভূমির মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। জন্মভূমি ছিল তাঁর দেবী-সাধনা-স্বর্গ; আর নাটকে স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচারের মধ্যে চলেছে দেশ মাতৃকার পূজা ও বন্দনা। তাই তাঁর স্বদেশ প্রেম অনেকাংশে বঙ্গভূমি প্রীতিতেই আবদ্ধ হয়েছিল। বাংলাদেশ তাঁর কাছে আরাধ্য দেবী ছিলেন। ধ্যানে তিনি দেশমাতৃকার স্বরূপ দর্শন করেন ও স্বপ্নে চুম্বন করেন 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'র চরণ যুগল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের শ্যামলিমা তাঁর নাটক আত্মপ্রকাশ

করেছে। 'নুরজাহান' নাটকে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বঙ্গপ্রীতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মনো ভাবনার পরিচয় দেয়।

"নুরজাহান - কি সুন্দর এই বঙ্গদেশ। এর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র - যার উপর দিয়ে শ্যামলতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। এই নদ-নদী -যার অগাধ সলিল সম্ভার যেন আর সে ধরে রাখতে পাচ্ছে না। এর নিকুঞ্জবন - যেখানে ছায়া সুগন্ধ-সঙ্গীত যেন পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। সমস্ত দেশটা যেন একটা অপার্থিব সুখস্বপ্ন দেখছে।"

এমনকি 'সাজাহান' নাটকে রাজস্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাতে নাট্যকার বঙ্গদেশেরই চিত্র ও সৌন্দর্যের অবতারনা করেছেন অবচেতন মনে। বিশেষ ভাবে,

"এমন স্নিগ্ধনদী কাহার, কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়।
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে।"[৫]

বাংলাদেশকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ছিল, 'শৈশবের কুসুম শয্যা, যৌবনের উপবন ও বার্ধক্যের বারাণসী।' 'সিংহল বিজয়' (১৯১৪) নাটকে নাট্যকারের বঙ্গপ্রীতির স্বাক্ষর তুলনাহীন। মনে হয়, তাঁর লেখা পড়ে বাঙালী যেন দেশকে নতুন করে পুনরায় ভালবাসতে শিখেছিল।

'সিংহল বিজয়' নাটকে নাট্য চরিত্র বিজয় সিংহের উক্তিতে নাট্যকারের স্ব-ইচ্ছাই বিলসিত হয়েছে - বিজয় সিংহ - আগে কখন দেশ ছাড়িনি। বুঝিনি যে দেশ কি জিনিষ। ভাবতাম যে দেশশুদ্ধ মাটি আর আকাশ। কিন্তু এখন বুঝেছি যে জন্মভূমি মানুষ, সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে।

আবার, বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপে প্রবাসকালে মনে ব্যথা প্রকাশ করে স্ত্রী কুবেনীকে বলেছেন - বিজয় সিংহ - স্বদেশ কি ভোলা যায়। সুখে দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, আলোক অন্ধকারে, গৌরবে, লাঞ্ছনায়, স্বদেশ চিরকালই স্বদেশ। ... স্বদেশের তিরস্কার - সে জননীর তিরস্কার - তাও মিষ্ট। ...ঐ অশান্ত দিগন্ত-বিস্তৃত কৃষ্ণ সমুদ্রের পানে চেয়ে দেখেছি; আর আমার চিত্তপটের উপর দিয়ে বাংলার মধুর ছবি মধুর স্বপ্নের মত ভেসে গিয়েছে; - বাংলার সেই শ্যামল ক্ষেত্র। বাংলার সেই ধূসর নদী; বাংলার সেই নীল নির্মল আকাশ, সেই দীপ্ত রৌদ্র, সেই সুস্নিগ্ধ মলয় পবন হিল্লোল, সেই কোকিলের ঝংকার, বাঙালী মাঝির সেই গান, যেন অনুভব করেছি; আর চক্ষে ক্ষুদ্র বর্তমান লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। স্বদেশ কি ভোলা যায় কুবেনী। আর এ হেন স্বদেশ - যার পবনে সুগন্ধে, নিকুঞ্জে সঙ্গীত, বৃক্ষে অমৃত, নির্ঝরে জননীর স্তনধারা, গগনে দেবতার আশীর্বাদ, সেই কৃষকের ধান্যভরা প্রাঙ্গন, সতীর মুখভরা হাসি, মাতার বুকভরা স্নেহ....।"

এছাড়া 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) নাটকে সেকেন্দারের মুখে যে ভারত বন্দনা, তাতে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভারত চেতনার অন্যতম পরিচয় নিহিত আছে। "সেকেন্দার - সত্য সেলুকাস।

কি বিচিত্র এই দেশ। দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগন্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি / প্রাবৃটে ঘন কৃষণ মেঘরাশি গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য সৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাবলী পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি একটি দীর্ঘ শতাব্দীর চিন্তাকে সংহত করে আপন নাটকে রূপ দিয়েছিলেন। তাই তাঁর নাটকগুলি শুধু কেবল কাব্যকলার বিতানে ছিল না, ছিল মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় সাধনার আরাধ্যপীঠ। তিনি দেশবাসীকে জাতিয়তার ক্ষেত্রে স্বদেশচিন্তা ও দেশাত্মবোধে হাতে-কলমে দীক্ষা দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক উত্তেজনার তরল অগ্নিস্রোত দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালির প্রতি স্নায়ুতে প্রবাহিত করতে চাননি। তিনি ছিলেন জাতি সংগঠক - 'Constructive Nationalist'। তাই দেশবাসীর সমস্ত কর্ম ও ভাবনা শক্তিকে অন্তর্মুখীন করাই ছিল তাঁর সকল চিন্তার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ সৃষ্টি করে, জাতির দেশপ্রেমকে বিশ্বমানব প্রীতির মুক্তাকাশে প্রসারিত করেছেন। স্বজাতিকে সকল কলুষতা, দৈন্য ও গ্লানি থেকে উদ্ধার করে স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখেছিলেন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। তাই মনুষ্যত্ব অর্জন করা উচিত ভেবেই, তিনি সমগ্রজাতিকে 'মানুষ' হবার আশাবরী শুনিয়ে ছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১। রথীন্দ্রনাথ রায় - দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার, পৃ-৪৪৮
২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় - 'আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ' শ্রাবণ, ১৩১৭
৩। ড. প্রভাত কুমার ভট্টাচার্য : বাঙ্গলা নাটকে স্বদেশিকতার প্রভাব, ১৮০০-১৯৯৪, পৃ-৬১০
৪। ঐ, ', পৃ. ৬১১
৫। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান', ১৯০৮, পৃ-৩৭

বহুমুখী প্রতিভার আলোকে সরলাদেবী চৌধুরাণী

শুভশ্রী পাত্র*

উনিশ শতকের নারী জাগরণের অগ্রদূত সরলাদেবী চৌধুরাণী ১৮২৭ খ্রিঃ ৯ সেপ্টেম্বর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুরবাড়িতে - ''একদিন ভাদ্রমাসে ললিতা সপ্তমী তিথিতে মহর্ষির আর একটি দৌহিত্রীর আবির্ভাব হল বাড়ির সূতিকাগৃহে''[১] তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকী নাথ ঘোষালের দ্বিতীয়া কন্যা। সেকালের আর পাঁচটা ধনীগৃহের দস্তুর মত ঠাকুরবাড়িতে ''শিশুরা মাতৃস্তন্যের পরিবর্তে ধাত্রীস্তন্যে পালিত ও পুষ্ট হত, ... মায়ের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না। আমারও রইল না''[২] তাঁর মা স্বর্ণকুমারী তাঁর কাছে ছিল ''অগম্য রাণীর মত'' বা 'দেবী প্রতিমার' মত। 'গৃহটিউটরের' কাছে বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। গান শেকার হাতেখড়ি হয়েছিল বাড়িতে 'অক্তবাবুর কাছে'। সুরের জ্ঞান তাঁকে পৌঁছে দিল মা স্বর্ণকুমারীর কাছে। মায়ের ঘরে মেম পিয়ানো শিক্ষায়িত্রী তাকে পিয়ানো শেখাতেন। সাড়ে সাত বছর বয়সে বেথুন স্কুলে ভর্তি হন আর সতেরো বছরে বি.এ. পাশ করেন ১৮৯০তে ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে। তাঁর দিদি হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন ১৩০৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এরপর ১৩০৬ থেকে ১৩১৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি একক সম্পাদক ছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করার যজ্ঞের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রেরণাদাত্রী। স্বদেশী দ্রব্য তৈরী ও ব্যবহারের প্রচারের জন্য সরলাদেবী শুধু মেয়েদের জন্য লক্ষীর ভান্ডার নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। দেশপ্রেমমূলক বেশ কিছু গান তিনি রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানের সুর তৈরিতে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। ''আমার একটা নৈসর্গিক কুশলতা বেরিয়ে পড়ল - বাঙ্গালা গানে ইংরেজী রকম কর্ড দিয়ে ইংরিজি .... রচনা করা।''[৩] রবিমামা তাকে সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ ও সান্নিধ্য তাঁর জীবনের অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম'-এর প্রথম সুর দিয়েছিলেন, বাকিটি অর্থাৎ ''সপ্তকোটিকন্ঠ'' কলকল নিনাদ করালে থেকে শেষ অংশটির সুর দেন সরলাদেবী। তাঁর প্রথম লেখা 'সখা', শান্তিনিকেতনে থাকার সময় লেখা হয়েছিল। ভারতীতে বিনা নামে প্রকাশ পেয়েছিল একটি নকসা - ''আমি বিনা নামে একটা নকসা লিখলুম। মা ভারতীতে বের করলেন।''[৪] 'বালক' পত্রিকাতেও তাঁর দু-একটি রচনা বেরিয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন, কিছু প্রকাশিত হয়েছিল কিছু উৎসাহ সত্ত্বেও পাঠাননি প্রকাশের জন্য। 'রতিবিলাপ', নীলের উপোস', 'মালবিকা অগ্নিমিত্র', ... প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সংস্কৃতে এম.এ. পরীক্ষা দেওয়া তাঁর হয়নি

*অংশকালীন অধ্যাপক, মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ, দুর্গাপুর।

কিছু প্রতিকূলতার জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধীজি মহাদেব গোবিন্দ রানাডের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। একসময় ঠাকুরবাড়ির নাতনী সব প্রতিকূলতাকে জয় করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মতি নিয়ে মহীশূরের মহারাজের স্কুলে যোগ দিলেন। মহীশুর বাসের সময় এক অপূর্ব ভারতবর্ষের সঙ্গে তার পরিচয় হল 'একালে সেকালে' নামে ভারতী পত্রিকার লেখায় তার পরিচয় আমরা পাই। সরলাদেবী একসময় অনুভব করলেন শুধু শারীরিক দুর্বলতা নয় বাঙালীদের পিছিয়ে পড়ার কারণ মানসিক ভীরুতা। 'ভারতী' পত্রিকার আহ্বান অপমানের প্রতিকার নিজেদের করার জন্য। দলে দলে শুধু ছাত্র-যুবকরা নয় বয়স্করাও এগিয়ে এলেন। ভারতবর্ষের মানচিত্রের সামনে প্রণাম করে শপথ নিত তারা দেশমাতৃকার সেবার জন্য, শেষে হাতে রাখি বেঁধে দিতেন তিনি এই আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা .... হিসাবে। প্রতাপাদিত্য জীবনী পড়ে উৎসাহিত হয়ে তিনি প্রচলন করলেন প্রতপাদিত্য উৎসব। তলোয়ার খেলা, কুস্তি লাঠি খেলা, বকসিং - শেখাতে লাগলেন যুব সমাজকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য। ১৯০২ সালের শেষে অরবিন্দ ঘোষের চিঠি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি ও স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরলাদেবীর কাছে আসেন। তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। দেশের বহু মানুষ তাঁর উদ্দেশ্যে প্রশংসাবানী উচ্চারণ করলেন - ''দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরের কন্যা জানিয়া বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে।''[৫] বাউলার জাতীয় উৎসব হিসাবে 'বীরাষ্টমী উৎসবের' সূচনা করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে ''বাংলা .... দেবী চৌধুরাণী নামেও আখ্যাত হতে লাগলুম''।[৬] স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব তাঁর জীবনে গভীর ছায়াপাত করেছিল। তাঁর মধ্যে জেগেছিল আধ্যাত্মিক জীবনের আকাঙ্খা। বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজও তাঁর গুনগ্রাহী ছিলেন। ১৯০৫ খ্রিঃ পরিবারের উৎসাহে পাঞ্জাবের বিখ্যাত আইনজীবী, জাতীয়তাবাদী নেতা ও সমাজ সংস্কারক রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রী দীপক দত্ত চৌধুরী। বিবাহের পর লাহোরে থাকার সময় সরলাদেবী অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। ১৯১০ খ্রিঃ এলাহাবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি একটি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের উদ্যোগে ভারতে স্ত্রী মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ খ্রিঃ কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে আধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন হয়। 'গোত্রান্তর' কবিতায় দেখি তিনি গুরু রূপে বিজয় গুপ্তকে বরণ করে নেন। মাসিক বসুমতীতে কার্তিক সংখ্যা ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে তিনি লেখেন - ''গুরু অগ্রদূত, তিনি যাবেন তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে, শুধু অনুকরণ নয়।''[৭]

''গুরো
আমার আমিরে দেখাও দেখাও
করা অভিজ্ঞান।''

১৯৪৪ সালের ১৮ আগষ্ট এই বিরাট কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। ভারতীয় আধুনিকতার অন্তদ্বর্ন্দ্বের অন্য নাম সরলাদেবী।

সাহিত্য চর্চা

সরলা দেবী চৌধুরাণীর রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি বয়ে চলেছিল তাঁর সাহিত্যিক জীবন। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর বেশীর ভাগ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর লেখা তিনটি উপন্যাস হলে 'শতবর্ষের স্বপ্ন'। সরলাদেবী চৌধুরাণী এই উপন্যাসে এক সদ্য (বৈশাখ ১৩৩০) যুবকের মন 'উথাল পাতাল' করা -অনুভূতিকে প্রকাশ করলেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের বিস্তৃতি বা কাহিনির ওঠাপড়া তেমন না থাকলেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের একটি বাস্তবচিত্র-এ উপন্যাসের অন্তর সম্পদ। 'অনাথবন্ধু' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ সন) উপন্যাসে বলেছেন সরলাদেবী অনাথবন্ধুর মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিলাতী দ্রব্য বর্জনের উদাত্ত আহ্বান জানান। এর মধ্যে লেখিকার 'লক্ষীর ভাণ্ডার' খোলার কাহিনী ছাপ ফেলেছে।

'অপরাজিতা' (বৈশাখ ১৩৩৩ থেকে আশ্বিন ১৩৩৩, ভারতী পত্রিকা)

অন্য দুটি উপন্যাসের তুলনায় সম্ভবনাময় হলেও এটি অসম্পূর্ণ রচনা। বাঙালি কন্যার সামাজিক পরিণতির চিত্র এ উপন্যাস। সরলাদেবী কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকায়। 'বকুলের গল্প' (ভারতী, ভাদ্র ১২৯৪) দুই কিশোর কিশোরীর মন দেওয়া নেওয়ার সাক্ষী বকুলগাছ। 'বাঁশি'-বাঁশির সুর দ্বন্দ্বময় দুটি মানুষের দূরত্ব কমিয়ে কাছে নিয়ে এসেছে। 'হিন্দোল' তাঁর লাহোর বাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণার ফসল। 'অগ্নিপরীক্ষা' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)-এ বাঙালিদের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব, সাহস দেখানোর গল্প। 'পারস্যপুলক' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) কেউ কেউ একে প্রবন্ধ বলতে চাইলেও এতে গল্পরস ও গল্পের উপাদান আছে।

সরলাদেবীর কবি হিসাবে পরিচয়কে আমরা শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হই। 'ভারতী' পত্রিকায় এসব কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'একা' কবিতার ভাববস্তু ''একা আমি ভয়হীন, আত্মবলীয়ান''। 'নারীর প্রতিদান' (শ্রাবণ ১৩০২, ভারতী) - এ সব কষ্ট বেদনা, যন্ত্রনা প্রতিকূলতাকে জয় করে নারী প্রিয়জনকে স্নেহ, প্রেম, করুনায় ভরে দেয়। 'আহিতাগ্নিতা' (ভারতী, আষাঢ় ১৩০৬)-সরলাদেবীর দেশমাতার চরণে আত্মনিবেদনের কবিতা। 'হৃদয়বন, 'পাষাণের আবেদনে, 'বিশ্বজয়ী', 'কাজের বোঝা', 'বিভূতি', 'সুরসরিতে', 'প্রাণবাহিনী', 'অহংকার', 'শ্রাবণ' বিভিন্নভাবের বিভিন্ন রসের কবিতা যা সরলাদেবীর কাব্য প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে।

সরলাদেবীর বেশ কিছু গান লিখেছেন ও সুরযোজনা করেছে, সংস্কৃতে গান। 'ক্ষ্যাপার প্রতি' তাঁর গানের সংকলন। ভারতী ও বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'যুদ্ধসংগীত তাঁর এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

সমাজসেবী, দেশকর্মী, সরলাদেবী তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন 'ভারতী', 'বালক', 'বসুমতী' প্রভৃতি পত্রিকায়। 'বাঙ্গালী ও মারহাট্টী' (ভারতী ও বালক : ১২৯৯)-তে পুণা

থেকে ফিরে এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে উজাড় করে দিয়েছেন এ প্রবন্ধে। 'স্বামী বিবেকানন্দ' (ভারতী, চৈত্র ১৩১৩) স্বামীজীর প্রতি লেখিকার শ্রদ্ধার ফসল এ নিয়ে লেখিকার জিজ্ঞাসা প্রকাশিত হয়েছে। 'আমাদের উচ্চশিক্ষা' (ভারতী, ভাদ্র, ১৩১১) 'আমার বাল্যজীবন', 'বিজয়াদশমী', 'কংগ্রেস ও স্বায়ত্ব শাসন' প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ভারতী পত্রিকায়। এছাড়া 'বসুমতী'তে বেরিয়েলি 'বৈশ্বানর' - ছন্দোগ্য উপনিষদের আলোচনা। তাঁর প্রবন্ধগুলি সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। সরলাদেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' শুধু আত্মজীবনী নয়, এ যেন যে যুগের ঠাকুর বাড়ির তথা সমগ্র বাংলার আত্ম প্রকাশের এক আশ্চর্য দলিল।

'ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করার জন্যই তাঁকে সম্পাদকীয় লিখতে হয়েছে। পত্রিকার চাহিদা পূরণের ও নিজের আত্ম ভাবনার প্রকাশের জন্যই এত বিচিত্র ধরনের কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গান তিনি রচনা করেছিলেন, যা সেইযুগ, সেই সমাজ জানতে সাহায্য করে।

সরলাদেবী চৌধুরাণীর নাটক :

সরলাদেবীর অন্যান্য রচনার মতো নাটক প্রচারিত বেশী হয়নি ও তা নিয়ে কোন আলোচনাও হয়নি। তাঁর দুটি নাটক - 'লান করানোর উজীর' (ভারতী পত্রিকায় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও চৈত্র সংখ্যা, ১৩১১ বঙ্গাব্দে) প্রথম প্রকাশিত হয়। সত্যের পরীক্ষা' (প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি নাটক দু-ধরণের আঙ্গিকে লেখা।

'লান্ করানোর উজীর' মূল পারস্য থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। নাটকের শুরুতে সরলাদেবী জানিয়েছেন - ''এই আজব নাটকের সবিশেষ বৃত্তান্ত চারি অঙ্কে সন্নিবিষ্ট ও সমাপ্ত হইয়াছে''।[৮] চার অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটির অভিনবত্ব এর ঘটনা সুদূর কাস্পিয়ান সমুদ্রের উপকূলবর্তী শহর নামকরণে মির্জা হবীর উজীরের গৃহের। বাঙ্গালী পাঠক এ নাটক পাঠ করে এক অন্য সুদূর দেশের কাহিনী ও সমাজকে জানতে পারল। নাটকে মোট চরিত্র সংখ্যা ১৮, কিছু আমীর, ওমরাহ ও গোলাম পঞ্চাশ জন। প্রধান চরিত্র উজীর মির্জা হবীর, জীবাখানুম। শৈলিখানুম, নিসা খানুম, তৈমুর আকা, অন্যান্য চরিত্রগুলি স্বল্প আয়তনে আকা।

জীবা খানুম ও শোনি খানুম - মীর্জা হবীরের দুই পত্নী। এদের মধ্যে সপত্নী কোন্দলের চিত্র আছে। জীবা খানুম মনে করে তার বয়সের জন্যই শোলি খানুম উজহীর মির্জা হবীরের প্রিয় পত্নী। নানাভাবে সে উজীরকে উত্তেজিত করতে চায় শোলি খানুমের প্রসন্দা এনে। সতীনী ঝগড়া পারিবারিক ঈর্ষা এ নাটকের একটা স্থান করে নিয়েছে।-

''আদুরে স্ত্রীর জন্যে গলায় সোনার বোতামওয়ালা'' আঙ্গিয়া ফরমাইস দেওয়া হচ্ছে! .... গলায় সোনার বোতামওয়ালা সেই আঙ্গিয়া যেন তোমার স্ত্রীর পয়মন্তর হয়। আহা তৈমুর আকার চোখ কি রোশনাই হয়ে উঠ্বে।.... সেই জামা পরে তৈমুরের সাম্নে কত

হাবভাব করবে।"[৯] এ যেন বাংলা সমাজের দুই পত্নীর দ্বন্দ্ব। সপত্নী বিদ্বেষের এই জ্বালা উজীরের কাছে 'কাঁটা' ও 'বিষ' বলে মনে হয়েছে - "তুমি আমাকে এত কাঁটা আর বিষ খাইয়েছ যে আর এক মাস কিছু না খেলেও আমার পেট ভরা থাকবে।"[১০] এটি একটি ভিন্ন স্বাদের নাটক। নিসা খানুম (শোলি খানুমের বোন) ভালবাসে সুদর্শন সাহসী রাজ্যহারা শাহজাদা তৈমুর আকরকে। নিসার সঙ্গে দেখা করতে এসে তৈমুর ধরা পড়ে লুকিয়ে পড়া সত্ত্বেও। তৈমুর উজীরকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায়। উজীর নালিশ করে তৈমুরের কাকা খাঁ সাহেবকে। তৈমুরকে সভায় বন্দী করে আনলে সে পিস্তল দেখিয়ে পালিয়ে যায়, উজীর নিসা খানুমের বিয়ে দিতে চায় খাঁ সাহেবের সঙ্গে। খাঁ সাহেবও বিয়ের স্বপ্নে মগ্ন। হঠাৎ নৌকা উল্টে খাঁ-সাহেব মারা যায়। তৈমুর তাঁর পিতার রাজ্য ফিরে পায়। তৈমুরের সঙ্গে বিয়ে হয় নিসা খানুমের। উজীরকে কর্তব্যচ্যুতি ও অন্যায়ের জন্য উজীর পদ ছাড়তে হল। সৎ, যোগ্য মানুষরা তৈমুরের রাজসভা অলংকৃত করবে কল্যাণকর কাজ করে।

নাটকটির পরিণতি মিলনাত্মক। নাট্যদ্বন্দ্ব এ নাটকে তেমন নেই। কাহিনীটিও আজব কল্পনাজাত। তবে এ নাটকে পারস্যের গৃহজীবন, রাজ্য শাসন, শাসনব্যবস্থা, পোশাক-পরিচ্ছদের নিপুন বর্ণনা আছে। এ নাটকের শেষে সরলাদেবী দেখালেন অন্যায়, অধর্ম, পাপ চিরদিন রাজত্ব করতে পারে না, শেষে জয় লাভ করে সত্য, কল্যাণ, মঙ্গল, সততা ও নিষ্ঠা। তাই খাঁ সাহেবের মৃত্যু, তৈমুরের রাজত্ব লাভ। উজীর ক্ষমতালোভী রাজকর্মচারীদের যোগ্য প্রতিনিধি। পারস্যেও সেদিন মহিলারা ছিল পর্দানশীল ও অন্তঃপুর বাসিনী। পুরুষের ইচ্ছার ক্রীড়নক মাত্র, এই সব নারীরা মা-স্ত্রী-শ্যালিকা সবাই। নিসা খানুমের মধ্যে কিছুটা আত্মপ্রত্যয়, স্বাতন্ত্র্যতা ও ব্যক্তিত্ববোধের প্রকাশ আছে। নাট্যদ্বন্দ্ব ক্ষীন হলেও উজীর, নিসা খালুম, শোলি খালুম ও জীবা খালুম সার্থক চরিত্র। যদিও চারিত্রিকদ্বন্দ্ব ততটা স্পষ্ট নয়। সরলাদেবী সত্য ও ন্যায়ের জয়ের একটা শুভবার্তা পাঠককে দিতে চেয়েছেন বিষয় বৈচিত্র্য ও পরিবেশের নতুনত্বের দিক থেকে এ নাটক উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত: এ নাটক শুধু পত্রিকাতেই প্রকাশ পেয়েছিল, কোন অভিনয়ের সংবাদ পাইনি।

দ্বিতীয় নাটক "সত্যের পরীক্ষা"। পাঁচ অঙ্কের নাটক। সত্যবোধ ও বন্ধুত্বের প্রকৃত পরীক্ষালব্ধ সত্য এ নাটকের মূল বিষয়। এ নাটকে বেশ কয়েকটি গান আছে তা নাটকটি জনপ্রিয়তা পেতে সাহায্য করেছে। ঠাকুরবাড়ির নাটকে অজস্র গান ব্যবহৃত হত। তার প্রভাবে হয়ত এসেছে। তাছাড়া সরলাদেবী নিজে গান রচনা ও সুর রচনায় দক্ষ ছিলেন। তাই এই নাটকে গান এসেছিল। নাটকটি শুরু হয়েছে স্বর্গের দেবতা, গন্ধর্ব ও শিবানুবেদের নিয়ে। মায়াদেবী, তিনজন সখী ও সত্যদেবের কথোপকথনে জানা যায়, মায়াদেবী সংসার থেকে সত্য, ধর্মকে মোহে আচ্ছন্ন রেখেছেন, সত্যদেব তা জানতে চান না। শুরু হয় পরীক্ষা শঙ্কর ও ভাস্করকে আশ্রয় করে। এরপর শুরু হয়েছে মুল নাটক। মনিপুরের রাজা বিক্রমাদিত্যের কন্যাকে লাভ করার ইচ্ছা নিয়ে পত্র দেয় হেরম্বদেশের চন্দ্রসেন। শক্তিতে রাজা একে পরাভূত করতে পারবেন না। তাই প্রতিষ্ঠা করেন যে চন্দ্রসেনকে পরাজিত করবে তার

সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন। যশোধর মন্ত্রীর পুত্র শঙ্করকে সেনাপতি করা হয়। রাজ্যের সাধারণ মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য মাত্র কয়েকটি উক্তিতে সরলাদেবী তুলে ধরেছেন সবাই রাজকন্যার লোভে নিজের অক্ষম পুত্রদের যুদ্ধে পাঠাতে চায়। শেষ পর্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে শঙ্কর চন্দ্রসেনকে বন্দী করে। শঙ্কর, ভাস্কর দুজনে যুদ্ধে যায় - কে বন্দী করেছে তা জানার জন্য ও তাদের বন্ধুত্ব ও সততা পরীক্ষার জন্য রাজা পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। রাজকন্যার সঙ্গে শঙ্করের বিয়ের দিন জানা যায় ভাস্কর বন্দী হয়েছে। ভাস্কর একদিন সময় চেয়ে নেয়। শঙ্কর তার প্রতিনিধি হয়ে বন্দীত্ব বরন করে। ভাস্কর একদিনের মধ্যে না ফিরলে সে মৃতুদণ্ড নেবে। ভাস্কররের পিতামাতার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরতে দেরী হয়, শঙ্কর বধ্যভূমিতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, ভাস্কর এসে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রাজা বিক্রমদেব সব সত্য স্বীকার করেন। মায়াদেবী বলেন - ''দুই শক্তির পরীক্ষা হল, মায়ার পরাজয় সত্যের জয় হল।''[১১] নাটকটির রুদ্ধশ্বাস গতি পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। নাট্যদ্বন্দ্ব এ নাটকের সার্থকতার মূল সুর। কাহিনীর মনঘন উঠাপড়া নাট্যগতিকে পূর্ণতা দিয়েছে। প্রাচীন নাট্য কাহিনীর মোড়ক ও নাটকটিকে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছে। নাটকটির চরিত্র বিশ্লেষণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ততটা গুরুত্ব পায়নি, যতটা গুরুত্ব পেয়েছে নাট্যদ্বন্দ্ব ও কাহিনী বিস্তারের কৌশল। এ নাটকে সরলাদেবী চৌধুরাণী দেখিয়েছেন সত্য, ন্যায় সততার বিজয়বার্তা। সরলাদেবী দেশ, জাতি, ধর্মের যে উচ্চ আদর্শের অভিলাক্ষী ছিলেন, যা তাঁর সমগ্র জীবনের প্রত ছিল এ দুটি নাটকেও সেই চিন্তা ও বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে।

নাটক দুটি হয়ত নাটক হিসাবে সর্বাংশে সার্থক হয়ে ওঠেনি কিন্তু সে যুগের মহিলারা যে নাটক রচনা করতেন তার নিদর্শন হিসাবে এ দুটি নাটকের উল্লেখ করতে পারি। সরলাদেবীর অন্যান্য সাহিত্য রচনার মধ্যে নাটক তেমন গুরুত্ব দাবী করতে না পারলেও মহিলা রচিত নাটকের নিদর্শন হিসাবে এগুলি বাংলা নাট্য সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে আমাদের মনে হয়। উনবিংশ শতকের বাংলা নাট্য সাহিত্যে যে সব মহিলাদের কৃতিত্বের কথা জানতে পারি সরলাদেবী চৌধুরানী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে সরলাদেবী চৌধুরানী অসামান্য কৃতিত্ব আজও যে কোন ভারতীয় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

পাদটীকা :

১। জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী চৌধুরাণী, দে'জ সংস্করণ (প্রথম), জানুয়ারি ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা ১৩

২। জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী চৌধুরাণী, দে'জ সংস্করণ (প্রথম), জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৩

৩। জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী চৌধুরাণী, দে'জ সংস্করণ (প্রথম), জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৩৮

৪। জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী চৌধুরাণী, দে'জ সংস্করণ (প্রথম), জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৯৩

৫। জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী চৌধুরাণী, দে'জ সংস্করণ (প্রথম), জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ১১২
৬। জীবনের ঝরাপাতা : সরলাদেবী চৌধুরাণী, দে'জ সংস্করণ (প্রথম), জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৩৫
৭। সরলাদেবী চৌধুরানী : সংকলন ও সম্পাদনা, রচনা সংকলন ড. শঙ্করীপ্রসাদ চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১ (মাঘ ১৪১৭), পৃষ্ঠা ৩৪০
৮। লানকরানের উজীর : সংকলন ও সম্পাদনা, ড. শঙ্করীপ্রসাদ চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১ (মাঘ ১৪১৭), পৃষ্ঠা ১১৯
৯। লানকরানের উজীর : সংকলন ও সম্পাদনা, ড. শঙ্করীপ্রসাদ চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১ (মাঘ ১৪১৭), পৃষ্ঠা ১২১
১০। ঐ : পৃষ্ঠা ১২৩
১১। সত্যের পরীক্ষা : সংকলন ও সম্পাদনা, ড. শঙ্করীপ্রসাদ চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১ (মাঘ ১৪১৭), পৃষ্ঠা ১৬৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১। চৌধুরানী সরলাদেবী : জীবনের ঝরাপতা, দে'জ সংস্করণ (প্রথম), জানুয়ারি ২০০৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
২। চক্রবর্তী, ড. শঙ্করীপ্রসাদ (সম্পাদিত) : সরলাদেবী চৌধুরানী রচনা সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১।
৩। চৌধুরী দর্শন : বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ (জানুয়ারি)।

এবং প্রান্তিকের প্রকাশিত

অপরূপা
পার্থ খাঁ
মূল্য : ১০০ টাকা

জীবনের 'ছন্দ' ছাড়া যেমন গতি হয় না, ঠিক তেমনই 'বই' ছাড়া শিক্ষার বলয় পূর্ণ হয় না। এবং প্রান্তিকের প্রকাশনায় 'অপরূপা' কবিতা সংকলনখানিতে রয়েছে শিশুদের নির্যাস মনোবিদ্যার কবিতাগুচ্ছ, যৌবনের আবেগে প্রেমের কবিতা, জীবন 'পারাপারের' শেষ পরিণতি, কবিতার বুৎপত্তি থেকে 'লোকগীতি' ও 'প্রকৃতি পর্যায়ের' গানের উৎস সমন্বয় সাফল্যের শীর্ষে, 'অপরূপা'র প্রকাশ এক অনবদ্য প্রয়াস। এই প্রয়াসের সম্পূর্ণ সফলতায় ঝরে পড়ুক- প্রিয় ভালোবাসার মানুষদের অকৃপণ আর্শীবাদ।

সত্তর দশকের বুদ্ধিজীবী : উপন্যাসে, জীবনে

যশোদা বেরা*

সত্তর দশক বাংলার পরিবর্তনের দশক। কী কৃষি-বিপ্লবে, কী বাংলা দেশের যুদ্ধে, কী ইন্দিরা-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সত্তরের দশক, তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমানের ভাষায়, কেউ বুদ্ধিজীবীদের 'দাবায়ে রাখতে' পারেনি। কোন দল চাক বা না চাক, তাঁরা মহৎ উদ্দেশ্যে বার বার মিলিত হয়েছে, কিংবা অন্তত মুখ খুলেছেন। সরোজ দত্ত তাঁদের বড় একটা আমল দেননি, তবু তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে গেছেন। ইন্দিরা-পুত্র সঞ্জয় গান্ধী সেই সময় বলেই দিলেন, বুদ্ধিজীবীর কোনো দরকার নেই। তবু কলকাতায়, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সঞ্জয় গান্ধীকে সাহায্য করার জন্যই তাঁরা সমবেত হয়েছিল। আর বাংলাদেশের যুদ্ধ? এই যুদ্ধে বাংলাদেশের তৎকালীন জনদরদী দেবদুলালের ডাকে হাজার হাজার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তারা বেশির ভাগই ছিল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। যার তুলনা নাকি একমাত্র স্পেনের গৃহযুদ্ধ। সেই সময় আমাদের দেশের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজভবনে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানুষদের সাথে নিজে দেখা করতে চাইলেন। এবং তাঁর এক ডাকেই সাড়া পেলেন। যাকে এক কথায় বলা যায় অভূতপূর্ব।

সুতরাং একথা বলা যায়, বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এসেছিলেন গত দশকে তা কারো ডাক শুনে বা না শুনে নিজেদের তাগিদেই, যাই হোক না কেন। কে অস্বীকার করবে? তবু কেন যে বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে দলটা এতটা খুঁত খুঁত ভাব দেখিয়ে এলো বোঝা মুস্কিল।

প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া — এই উভয় শিবিরেই ছিলেন ভুরি ভুরি বুদ্ধিজীবী — শরিক, তবু গোষ্ঠী হিসেবে তাঁদের সম্বন্ধে সংশয় যেন যায় না। সারা দেশে একটা নতুন কথা ছড়িয়ে পড়ল — 'আঁতেল'। চল্লিশের দশকে কেউ কেউ বুদ্ধিজীবীদের এই নামে চিহ্নিত করেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে সত্তরের দশকে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী ছোকরাদের মুখেমুখে শোনা যেত এই কথাটি। একটু পড়াশোনো করলেই সে আঁতেল হিসেবে পরিচিত। সেই সময়ে নক্‌শালরা তো 'যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়' এই ফর্মুলায় প্রায় এক ধরনের সাক্ষরতা দূরীকরণের আন্দোলন চালিয়ে বুদ্ধিজীবীদের বাপ-বাপান্ত করে ছেড়েছিল, — অথচ বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রগতিশীল আঁতলেমি তাদের কাজেই লেগেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মজবুত বামপন্থী সংগঠন সি.পি.এম অবশ্য কোনো বুদ্ধিজীবী-বিরোধী শ্লোগান দেয়নি, কিন্তু কি যেন আছে তাদের রাজনীতিতে, যার ফলে বুদ্ধিজীবীরা একদিকে নকশাল, অন্যদিকে সঞ্জয় পন্থীদের তাচ্ছিল্য সহ্য করেও সি.পি.এম গা ঢাকা দেয়নি। জনশ্রুতি

---

*গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়।

এই যে, বুদ্ধিজীবীদের নীরবে একবার গেলা ও বেমালুম হজম করার ফলিত বিদ্যাই নাকি গত দশকে সি.পি.এম-এর মেদ বৃদ্ধির কারণ। এস.ইউ.সি.-র কোটা সীমিত ছিল — শিবদাস ঘোষ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের পর সেখানে অন্য কোনো বুদ্ধিজীবীর স্থান নেই। তারা এই গণ্ডীটির বাইরে যাবার পক্ষপাতী নয়।

শুধু সি.পি.এম.আই দলটি ব্যতিক্রম—গোটা সত্তরের দশকের দশ দশটি বছর ধরে বুদ্ধিজীবীদের তা দিয়ে দিয়ে তাঁদের বংশবৃদ্ধি করে শুধুই বুদ্ধিজীবীদের দল বলে খ্যাতি অর্জন করে গেছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে বুদ্ধিজীবীদের যে কম ধকল সইতে হয়নি আমাদের তা ভোলাটা ঠিক নয়। যাদের গেলাও যায় না অথচ ফেলাও যায় না, যারা বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পেটের মধ্যে ঢুকবার জন্য ছটফট করে, — এরও তারিফ করার ক্ষমতা থাকা চাই।

বুদ্ধিজীবীরা কোনো আলাদা অর্থনৈতিক শ্রেণী নয়, পেটি-বুর্জোয়ারই একটি অংশ, এবং তার কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞাও নেই। একটা ব্যবহারিক ধারণা এই — যাঁরা সংস্কৃতি চর্চা করেন ও স্বাধীনভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে পারেন তাঁরাই বুদ্ধিজীবী। এই স্বাধীন ভাবনা-চিন্তা করার ক্ষমতাই বুদ্ধিজীবীকে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার একটি উপাদান করে তোলে, আবার পেটি বুর্জোয়ার শ্রেণীগত যত অস্থিরতা, দোমনাভাব, পলায়নবৃত্তি সে-সবই তাঁকে বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এই দ্বৈততার জন্যই বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া উভয় তরফেই এত টানাটানি, আবার উভয়ক্ষেত্রেই তাঁদের নিয়ে এতটা অবজ্ঞা, এতটা অবিশ্বাস। লেনিনের সঙ্গে গোর্কির মতবিরোধ, তার মূলে ছিল বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতার প্রশ্নটি। স্তালিনের আমলে গোটা পশ্চিমী দুনিয়া সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধিজীবীদের প্রতি স্তালিনের অনমনীয় মনোভাবের কদর্য অপব্যাখ্যা করে মদত জুগিয়েছে অসংখ্য রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী। আবার পঞ্চাশের দশকে আমেরিকায় নির্যাতিত হয়েছেন অসংখ্য বুদ্ধিজীবী তাঁদের কমিউনিস্ট-প্রীতির জন্য। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেই যখন বুদ্ধিজীবীর প্রশ্নটি এখনও এতটা জটিল ও অপ্রীতিকর, তখন আমাদের মত দেশে বুদ্ধিজীবীর নেতিবাচক ভূমিকাকে ঠিক ততটাই বড় করে দেখিয়েছেন। নকশালপন্থীরা শুধু উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের মূর্তিই ভাঙেননি, সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের ভাবমূর্তিও তছনছ করে দিয়েছেন।

বাংলা উপন্যাসে সত্তর দশকের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীর সন্ধান পাওয়া যায়। বেশ কিছু উপন্যসে তা লক্ষ্য করা যায়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১) উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। ''একদিকে শীতলক্ষা, অন্যদিকে মেঘনা, আবার একদিকে লাঙলবন্ধর, অন্যদিকে গোয়ালন্দ — এই সীমানার মধ্যে গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ এবং অসংখ্য মানুষের সমাবেশ ও তাদের জীবনযাত্রা। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-নির্ধন, মধ্যবিত্ত

হিন্দু, গরীব মুসলমান প্রভৃতিদের জীবনচিত্র কাহিনীটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। ঢাকা থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদের এক সুন্দর 'এ্যালবাম' এই উপন্যাস। ''জীবন থেকে কলকাতা-বিচ্ছিন্ন হওয়া নীলকন্ঠ পাখিরা ফিরে এসে আবার একাকার হয়ে যাক— এই অন্তরঙ্গ বাসনা লেখক এখানে রেখেছেন।''[১]

উপন্যাসটির কাহিনীর শুরুতে চন্দ্রনাথের পুত্রসন্তানের জন্মসংবাদ শোনা যায়। চন্দ্রনাথ মণীন্দ্রনাথের সেজ ভাই। তাদের একান্নবর্তী পরিবারের প্রধান মহেন্দ্রনাথ অশীতিপর বৃদ্ধ, অন্ধ ও স্থবির। তাঁর চার পুত্রেরা হল — মণীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ ও শচীন্দ্রনাথ।

মহেন্দ্রনাথের পরিবার ও তাঁর পারিবারিক কাহিনী নিয়ে উপন্যাসের বিষয় বিশ্লেষিত নয়, মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার তীরে ঘর বাঁধা অসংখ্য মানুষের কথা এখানে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ''তরমুজ খেতের পাহারাদার ঈশান শেখ, মুসলিম লিগের নেতা সামাসুদ্দিন, ফেলু শেখ, ফতিমা, হাজি সাহেব, রঞ্জিত, জমর, লালটু, পল্টু, অমলা, কমলা, রামসুন্দর, আন্নু আকালুদ্দিন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শশিভূষণ প্রভৃতি অসংখ্য মানুষকে একসূত্রে গেঁথে লেখক আমাদের তা উপহার দিয়েছেন।''[২] উপন্যাস মধ্যে প্রধান শশিভূষণ বাবুর মতো বুদ্ধিজীবী মানুষের যেমন অবস্থান দেখা যায়, পাশাপাশি সাধারণ কৃষক খেটে খাওয়া মানুষদেরকেও তুলে ধরতে ভুলেননি।

দেশ বিভাগের কথা স্পষ্ট ভাবে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। দেশবিভাগের বিরোধিতার জন্য শচীন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। দেশবিভাগের পর ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে সামসুদ্দিন লিগ সরকারকে 'ফ্যাসিস্ট' হিসাবে বর্ণনা করেন। ''এই উপন্যাসে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জীবনধারার বিচিত্র কাহিনী ফ্রেমে বাঁধা ছবির মত উজ্জ্বল।''[৩]

সত্তর দশকের একজন্য প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাঁর এই দশকের বিখ্যাত উপন্যাস 'শেষ বিচার' (১৯৭৭)। উপন্যাসটির মধ্যে পুরানো মূল্যবোধের অবসান ও মধ্যবিত্ত সমাজের নীতিহীনতার ছবি ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বঙ্কিম দত্ত অবসরপ্রাপ্ত জজ। তাঁর দুই পুত্র - অমিয় ও সুপ্রিয় এবং দুই কন্যা - কনক ও পারুল। পুত্র-কন্যা-নাতি-নাতনীদের নিয়ে তাঁর সাজানো সংসার। এখানে প্রধান চরিত্র বঙ্কিমবাবু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। কারণ তিনি একজন জজসাহেব। তাঁর জীবনের এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। ''প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফেরার সময় নিজের তৈরী সুন্দর বাড়িটি দেখে তৃপ্ত ও উৎসাহে বিভোর এই বৃদ্ধ পরিবারের সকলকে নীতির শিক্ষা দেন। পরে একদিন প্রাতঃভ্রমণের পথে তিনটি অপরিচিত ছেলে এই জজের ঘড়ি ও আংটি ছিনিয়ে নেয়। বঙ্কিমবাবু অস্পষ্ট দেখতে পান এই তিন ভদ্রবেশী দস্যুকে দূর থেকে যে প্রেরণা দিচ্ছে, সে তাঁর নাতি রঞ্জু। অতঃপর তিনি ভাবতে থাকেন তাঁর এই দৃষ্টি কী স্বচ্ছ,

না আন্দাজের মধ্যে ভুল আছে? তিনি যা দেখেছেন-সব ভুল - এই ভেবেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন তিনি। এই সমীক্ষার মধ্যে দিয়েই এই উপন্যাসের প্রসার।"[৪]

সত্তর দশকে প্রফুল্ল রায়ের অসাধারণ উপন্যাস 'জন্মভূমি' (১৯৭১)। উপন্যাস মধ্যে বুদ্ধিজীবী মানুষের কথা ব্যক্ত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের নিদারুণ দারিদ্র্য চিহ্নিত। একদিকে জন্মভূমির প্রতি নাড়ীর টান, অন্যদিকে এদেশের অসহনীয় দারিদ্র্য বুদ্ধিজীবীদের মনে এ সময় উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীনতার পর এ দেশের যুবকেরা পাশ্চাত্যে গিয়ে কেউ বা হয়েছে ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা বিজ্ঞানী। তাঁরা পিছনে রেখে গেছেন তাঁদের দারিদ্র্য ভরা সংসার। বিদেশে তাঁরা পেয়েছেন পর্যাপ্ত ভোগসুখ ও সচ্ছলতা। কিন্তু দেশের দারিদ্র্য, নোংরা পরিবেশ ও নীচতা তাঁদের মনকে পীড়া দেয়। এ কারণেই দেশে ফেরার ইচ্ছা তাদের প্রায় লুপ্ত। টেলিগ্রামের খবরে মৃত্যুপথযাত্রী আত্মীয়কে দেখতে তাঁরা আসেন ঠিকই, কিন্তু পরমুহূর্তেই বিদেশে ফিরে যাবার ব্যাকুলতায় তাঁরা অধীর হন। পরিবার, পরিবেশ ও জন্মভূমির প্রতি তাঁরা একটা টান অনুভব করলেও এখানকার জীবনযাত্রার নিম্নমান এই মানুষদের দেশ থেকে দূরে নিয়ে যায় - "বাবা বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? এবার - বাড়ি ফিরার ব্যবস্থা করতে হয়। চল, বাসস্ট্যাণ্ডে যাই।'

কলকাতার বাস মানেই বিভীষিকা। সন্দীপ বলল, 'আমি এই বাসে চেপে যেতে পারব না'

'তবে কিসে যাবি?'

'ট্যাক্সিতে'।

মাকুরীর হাত ছেড়ে দিয়ে সন্দীপ একটা ট্যাক্সি ডেকে আনল। তারপর এতগুলো লোককে গুনে নিয়ে বলল, 'একটা ট্যাক্সিতে তো হবে না, আরেকটা ডাকি।'

বাবা ব্যস্তভাবে বলল, একটাতেই হবে। পয়সা খোলামকুটি নাকি, এ্যাঁ, বলেই ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে গাদিয়ে গাদিয়ে সবাইকে ভরতে লাগল।...

কিছুক্ষণ দূরমনস্কের মতো বসে থেকে ডাইনে ঘাড় ফেরাতেই সন্দীপ দেখতে পেল, গৌরী আর রমা তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই ওরা তাড়াতাড়ি মুখ নামিয়ে নিল। সন্দীপের একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, ওরা এখন কী করছে। পড়াশোনা অথবা অন্য কিছু। বিয়ে যে হয় নি, সাদা সিঁথি দেখে তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করতে গিয়ে থমকে গেল সন্দীপ। দাদা, হারু বা পটলার বিপজ্জনক কিছু হয়তো ওদের সম্বন্ধেও বেরিয়ে পড়বে।

ভি.আই.পি. রোড পেছনে ফেলে ট্যাক্সি একসময়ে ডাইনে ঘুরল, তারপর রেল ব্রিজের তলা দিয়ে সেই অজন্মের চেনা পুরানো কলকাতা।..."[৫]

ভারতের প্রায় দু'শো বছরের স্বাধীনতার কালে এ দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী "ব্রিটিশ এস্টাবলিস্টমেন্ট"-এ আত্মসমর্পণ করেছেন। এই শাসনে ব্যক্তিগত সম্পদ, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা

অটুট থাকার স্বার্থেই তাঁরা এ কাজ করেছেন। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী এই ঔপনিবেশিক কাঠামোর তীব্র বিরোধিতাও করেছেন। কারণ, ব্রিটিশ শাসনে নিজেদের ব্যক্তিগত প্রগতি সংকুচিত হওয়ার প্রবল সম্ভবনা তাঁরা দেখেছেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীগণ বিদেশী শাসন ও শোষণ মনে প্রাণে দূর করতে চেয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, একমাত্র 'স্বরাজ' দেশীয় মানুষের প্রগতি ও সমৃদ্ধির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ''পরাধীন ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিমণ্ডলেই মানুষ হয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতেও অবস্থা বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি।''[৬]

পরাধীন ভারতে যাঁরা উদারনীতি, জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদে বিশ্বাসী ছিলেন — তাঁরাও নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ তোষণ করেছেন। এই ভাবে নিজেদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে মননের স্বাধীনতা তাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭১) অবশ্যই আলোচিতব্য। শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জী ছিল মেধাবী ছাত্র, পাটনা কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক, মাসিক বেতন একশ নব্বই টাকা। সে হলো কলকাতার হিন্দুস্থান পিটার্স লিমিটেডের সেলস্‌ম্যান, বেতনে সাড়ে আটশ টাকা। সেই শুরু — তারপর ধাপে ধাপে চাকুরিতে উন্নতি ও ধাপে ধাপে চারিত্রিক অবনতি। কভেনেন্টেড অফিসার শ্যামলেন্দুর উন্নতি চমকপ্রদ কাহিনী 'সীমাবদ্ধ'। শেষ পর্যন্ত শ্যামলেন্দু হল কোম্পানির সর্বক্ষণের ডিরেক্টর, মাসিক বেতন সাড়ে সাত হাজার টাকা, সঙ্গে অনেক সুখসুবিধা। এই অত্যাশ্চর্য উন্নতির পিছনে আছে শ্যামলেন্দুর কয়েকটি কাজ, দুয়েকটি সিদ্ধান্ত, যার 'লিগ্যালিটি' আছে, 'ম্যার‍্যালিটি' নেই। নৈতিক ভালোমন্দ বোধকে বিসর্জন দিয়ে উচ্চাশাকে কীভাবে সফল করা যায় 'সীমাবদ্ধ' তারই কাহিনী। উঁচুতলার মানুষদের নিচু কাজের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ 'সীমাবদ্ধ'। উপন্যাসটির গুরুত্ব সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ''বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অন্যায়ের সঙ্গে গোপন আপসের জ্বলন্ত ছবি শংকরের সীমাবদ্ধ।''[৭]

বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে লেখা দুয়েকটি উপন্যাসে লেখকদের সমাজ সচেতনতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। শংকরের 'সীমাবদ্ধ' ও প্রফুল্ল রায়ের 'জন্মভূমি' (১৯৭১) এ প্রসঙ্গে আলোচ্য।

'সীমাবদ্ধ' উপন্যাসের শ্যামলেন্দু শুধু 'অ্যাম্বিশন'-কেই গুরুত্ব দিয়েছেন, ভালো-মন্দ জ্ঞান ও বিবেক-বিবেচনার অনুশীলন করেননি। 'সীমাবদ্ধ' উপন্যাসে শংকর বুদ্ধিজীবী মানুষ কিভাবে ব্যক্তিস্বার্থের জন্য অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় — তাই প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন : ''শ্যামলদা'? সুদর্শনা ডাকছে। ''আলো না জ্বালিয়ে একলা এই অন্ধকারে ব্যালকনিতে বসে কী ভাবছেন?''

''বোসো'', গম্ভীরভাবে বললেন শ্যামলেন্দু। নাথিং পার্টিকুলার — আসলে কিছুই ভাবছি না টুটুল।...''

উপন্যাসের শেষে শ্যামলেন্দুর বিবেক দংশনের কিছু পরিচয় রয়েছে। এ সময় তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে নিজের কলঙ্কিত অতীতের স্মৃতিচারণা করেছেন।

শিক্ষিত শ্যামলেন্দুর উচ্চাশার মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক সমর্থন থাকতে পারে না। মানুষের দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সংকীর্ণ পথে তাঁর রথের ঘোড়া তাঁরই স্বার্থ বহন করে চলেছে — যেখানে সমষ্টির স্বার্থ বারে বারে পদদলিত হয়েছে। এখানেই শিক্ষিত মানুষের অপদার্থতা, ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা।

প্রফুল্ল রায়ের 'জন্মভূমি' উপন্যাসটির আর একটু বিস্তারিত আলোচনা এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। উপন্যাসটির মধ্যে স্বাধীন ভারতের বুদ্ধিজীবীদের আর এক সমস্যা রূপায়িত। স্বাধীনতার পর দেশের যুবকেরা গেছে পাশ্চাত্য দেশে। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী। তারা পিছনে ফেলে রেখে গেছে দারিদ্র্য, অভাব আর কষ্টের সংসার। পাশ্চাত্ত্যের ভোগসুখ আর সচ্ছলতায় পেয়েছে জীবনের প্রাচুর্য। তারপর এদেশে ফিরে আর মন বসে না। পদে পদে নীচতা, দারিদ্র্য আর নোংরা পরিবেশ মনকে পীড়া দেয়। দেশে ফেরার আদৌ ইচ্ছে থাকে না। নেহাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে মৃত্যুযাত্রী নিকট আত্মীয়কে দেখতে আসা। তারপরই ফিরে যাওয়া। কিন্তু ফিরে যাওয়া যায় কি? পরিবার, পরিবেশ, জন্মভূমির কোনো আকর্ষণ কি নেই?

এই সমস্যা নিয়ে রচিত 'জন্মভূমি'। সন্দীপ দশ বছর জার্মানি-প্রবাসের পর মায়ের আসন্ন মৃত্যুসংবাদে কলকাতায় ফিরে এলো। বাবা-মা-ভাই-বোন, পুরনো বন্ধু, চেনা পাড়া, লোকজন, কলকাতা, এমনকি পুরনো প্রণয়িনী-তার কাছে অসহ্য। বাড়িতে নিজেকে মনে হয় আগন্তুক। সে কি কোনোদিন এখানকার একজন ছিলেন? এই দশ বছরে জন্মভূমিকে, নিজের শহরকে সন্দীপ ভুলে থাকতেই চেয়েছে। কিন্তু জার্মানিতে টেলিভিশনে দারিদ্র্যপীড়িত জন্মভূমির চেহারা বারবার দেখেছে। ফিরে এসে যা দেখে সবকিছুই তাকে পীড়িত করে। দিদিকে তার স্বামী পরিত্যাগ করেছে। দাদা আর শোধ করতে না পেরে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মায়ের ক্যান্সার হয়েছে, বেকার ভাই হারু বাধ্য হয়ে রাজনীতি করে, দুই বোন গৌরী ও রমা কারখানায় কাজ করে, তার প্রণয়িনী মল্লিকার চাকরি তাদেরই সংসারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দাদার ছেলেমেয়েগুলো অর্থাভাবে স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি। ছোট ভাই পটলা জেল হাজতে আছে। সন্দীপের দম বন্ধ হয়ে আসে, পালাতেই হবে এ নরক থেকে। সে ফিরে যাবে জার্মানিতে যেখানে প্রচুর অর্থ, প্রচুর ভোগ আর স্বাচ্ছন্দ্য। পরিবারের সবকিছু তাকে বিরক্ত ক্ষিপ্ত করে তুলছিল। তবু মনে মনে এই সব ভবিষ্যৎহীন ডুবন্ত মানুষগুলির অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। এদেশে তার যোগ্য চাকরি, নেই, পরিবারের প্রতি স্নেহাকর্ষণ খুব তীব্র নয়, বরং দিন দিন শিথিল হচ্ছে। সন্দীপ আজ কোন পথে যাবে? কার কাছে সে হার মানবে—পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধের কাছে, না জার্মানির সুখ সচ্ছল জীবনের কাছে? সুখ, আরাম, ভোগতৃষ্ণার নিবারণ, না, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন? শুধুই কি দায়িত্ব পালন? না, আরো কিছু?— এই আমার দেশ-এর প্রতি কি আমার কোনো ভালোবাসা নেই? নেই কোন আনুগত্য, মমতা? সন্দীপ কি জানে তার সত্তার মূল আছে জন্মভূমির গভীরে? তাকে সে শিকড় উপড়ে ফেলে চলে যাবে? শেষ

পর্য্যন্ত অনেক আঘাতে সংঘাতে জেনেছে এই জন্মভূমিকে সে ছেড়ে যেতে পারে না, পারবে না। তার মা মরেছে ক্যান্সারে কিন্তু জন্মভূমি-মা আছে তারই তরে। এখানেই জয় হয়েছে বিশ্বাসের, প্রেমের, শুভ বুদ্ধির।

''মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর আর-এক প্রতিনিধি সাহিত্যিক, যিনি তাঁর চারপাশের জগৎ ও জীবনকে দেখেন ও তার ছবি আঁকেন। তাঁর জীবনেও বুদ্ধিজীবীর সংকট দেখা দিতে পারে। তা দেখা দিলে তিনি কী করবেন? চারপাশের অন্যায় ও সুখের সঙ্গে আপস, না, সব মিথ্যাকে ছুঁড়ে ফেলে জীবনের সত্যান্বেষণ? ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'নুনের পুতুল সাগরে' উপন্যাসের নায়ক প্রতিষ্ঠিত লেখক অনাদিপ্রসাদের জীবন এমন এক মুহূর্তে যখন তিনি আর আত্মপ্রতরণায় রাজি নন। এখানেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সংকট উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।''[৮]

ইতিহাসের করুণ পরিহাসে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী কিন্তু নকশাল আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে তাঁদের সাধ্যমত ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে নকশালপন্থীদেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। যে সমর সেন সম্বন্ধে 'দেশব্রতী' অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিল; তাঁর পত্রিকা 'ফ্রন্টিয়ার'ই শেষ পর্বে নকশালপন্থীদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে। ফ্রন্টিয়ার ছাড়াও, 'অনীক', 'পূর্বতরঙ্গ', 'অনুষ্টুপ', 'প্রস্তুতি', 'স্পন্দন', 'নক্ষত্রে রোদ', 'মাটির কাছে', 'ম্যানিফেস্টো' ইত্যাদি পত্রিকাগুলিতে যেসব বুদ্ধিজীবীরা নকশালপন্থী আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে লিখলেন তাঁদের মিলিত প্রভাব আজ কট্টর নক্‌শালরাও অস্বীকার করতে পারবেন না। অর্থাৎ আদি নক্‌শালরা চাক বা না চাক, বুদ্ধিজীবীদের অবজ্ঞা করলেও অবশেষে সেই বুদ্ধিজীবীরাই নকশাল আন্দোলনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রচারক হিসাবে তরুণদের মনে স্থান করে নিয়েছেন। পুঁথিপড়া আঁতেলদের এই সগৌরবে পুনর্বাসনের রাস্তাটা এতই মনে ধরল বিপ্লবীদের যে, তাঁরাও ধীরে ধীরে নিজের নিজের বৈপ্লবিক কর্মক্ষেত্রে ছেড়ে গল্প-উপন্যাস, নাটক লেখা বা ফিলম্ তোলার মত এককালের বহু নিন্দিত শোধনবাদী কাজে পুরো সময়টাই দিতে থাকলেন।

অন্যান্য বামপন্থী দল সত্তরের নির্বাচনে সাফল্যলাভ করলেও আজ পর্যন্ত তাঁদের নিজেদের হাতে গড়া পেটি বুর্জোয়া মনোভাবের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। সেখানেও বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান সঠিক এমন দাবি করা সম্ভব নয়। শ্রমিক-কৃষকদের মতো বুদ্ধিজীবীদের কিছু পাইয়ে দেবার নীতি নিয়েই তাঁরা তাঁদের আগলানোর চেষ্টা করে চলেছেন। তা না হলে একই দলের সমর্থক হয়েও জনসমক্ষে সুধী প্রধান ও উৎপল দত্ত এত কাদা ছোঁড়াছোঁড়ি করবেন কেন? আর সুভাষ মুখোপাধ্যয়ের আনন্দবাজারের সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি দেখে অমিতাভ দাশগুপ্ত সেই আনন্দবাজারেই তাঁর মুখোশ খুলে দেবেন কেন? এইসব দলের একটি পত্রিকা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোথাও আমরা ঋত্বিকের এই নীলকণ্ঠকে দেখতে পাইনি। এমন কি সমর সেনের 'বাবু বৃত্তান্ত'-এ আমরা এমন আত্মসমীক্ষা পাইনি। আবার বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ভূমিকা পালন করতে পারেন বলেই তাদেরই সমাজের

সমস্ত বিষ কণ্ঠে ধারণ করে 'নীলকণ্ঠ' হয়ে থাকতে হবে। অন্যান্য মানুষ, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতারা, শুধু অমৃতদের স্বাদ গ্রহণ করবেন, এই একদেশদর্শী মনস্তত্ত্বের প্রকৃত সমালোচনাও হয়নি। পেয়েছি তা মূলত চালুনি ও ছুঁচের বিবাদ। সেটাই যেন বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশের ব্রতকথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গত শতকে।

এ দশকে অর্থাৎ সত্তরের দশকে সাহিত্য ও দর্পণে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র বেশ স্পষ্ট ভাবে আমাদের সামনে ফুটে উঠেছিল। বিশেষ করে উপন্যাসের পাতায় এই বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু সাতের দশকেই নয় আটের দশকেও এদের কথা বারবার দেখতে পাই। ব্রেখট বলেছিলেন, 'সবাই ভুল করে, কিন্তু বুদ্ধিমান সেই, যে ভুল সংশোধন করতে পারে। আশির দশকে বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত প্রমাণ করা যে, তাঁরা অন্ততঃ বুদ্ধিমান।'

তথ্য সংকেত :

১. রাজনৈতিক উপন্যাস : সেকাল ও একাল, প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ.-১৫৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৫৪
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৫৭
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. - ১৫৮
৫. 'জন্মভূমি' (দে'জ সংস্করণ), প্রফুল্ল রায়, পৃ. ১৭-১৯
৬. কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. - ২৩৫
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. - ২৩৬
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. - ৩৩৯

এবং প্রান্তিকের বই-

না প্রেমের কবিতা

সুজয় সরকার

আদবখেকো বেড়ালের মত যে কবিতা জন্মায় তারা বড্ড বেশি কোলকাতুরে, পাতিকাক ভোরে কুয়াশায় ভেজা প্রেম গায়ে মেখে টুপটাপ ঝরে পড়ে যে অক্ষরেরা, তারা কোনদিনই আগুন অক্ষর নয়। কিন্তু সময়ের খড়কুটো দিয়ে নিজস্ব বসত গড়ে তুলেছে যে 'আগুন পাখি' তার নাম 'না প্রেমের কবিতা' বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীর চোখে চোখ রেখে প্রশ্নের পসরা সাজিয়েছেন সুজয় সরকার আর সেই প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্নের এক অনন্য সৃষ্টি 'না প্রেমের কবিতা'।

মূল্য : ৪০ টাকা

অনুরূপা দেবী

সোমা দত্ত*

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপা দেবীর দান অনস্বীকার্য। তিনি মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে স্মরণীয় তাঁর বহুমুখী সাহিত্যসৃষ্টির জন্য। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ভ্রমণকাহিনি, কবিতা-সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন তিনি। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি প্রধানত: সামাজিক, গার্হস্থ্য, ঐতিহাসিক, হিন্দুধর্ম ও ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ক। মনে হয় তাঁর গ্রন্থগুলি যেন সমাজ-সংস্কারক পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের প্রতিভূ স্বরূপ। তিনি যেন পিতামহের আদর্শনিষ্ঠাকে পাঠকের সম্মুখে পরিবেশন করবার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের কাজেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি। আবার পারিবারিক বা গৃহকর্মের দায়িত্বও নৈপুণ্যের সঙ্গে সমানভাবে পালন করেছেন।

অনুরূপা দেবীর জন্ম হয় ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার শ্যামবাজারে, মাতুলালয়ে। তাঁর পিতার নাম মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম ধরাসুন্দরী। অনুরূপা দেবী মুকুন্দদেবের দ্বিতীয় কন্যা। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দিরা দেবী। মাত্র দশ বছর বয়সে অনুরূপা দেবীর বিবাহ হয় উত্তরপাড়ার শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আইন ব্যবসায়ী শিখরনাথ ব্যবসা উপলক্ষে পরবর্তীকালে মুজঃফরপুরে বসবাস করেন।

সাহিত্যিক পৃষ্ঠভূমিতে অনুরূপা প্রতিপালিতা হন। মাতামহ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তৎকালীন বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মাতা ধরাসুন্দরী দেবী 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় মাঝে মধ্যে লিখতেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দিরা দেবীরও যথেষ্ট সাহিত্যপ্রীতি ছিল। সাহিত্য রচনা, পরোপকার ও সেবাকর্ম তাঁদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এসবের প্রভাব পড়েছিল অনুরূপা দেবীর উপর। সমাজ-সংস্কারক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বারাও অনুরূপা দেবী বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া চিরকালীন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। পিতামহের কাছে রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের কাব্য গল্পাকারে শুনতেন তিনি ছোটবেলায়।

শিশুকাল থেকে লেখাপড়ার প্রতি অনুরূপা দেবীর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। পাশ্চাত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। বিভিন্ন মনীষীদের গ্রন্থও তিনি অধ্যয়ন করতেন। যার প্রভাব তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে শিক্ষিকাসুলভ বক্তৃতা দেওয়ার প্রবণতাও দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত 'সৃষ্টি ও স্রষ্টা' অভিভাষণটি তাঁর বক্তৃতা ক্ষমতারই পরিচায়ক।

---

*অধ্যাপিক, বাংলা বিভাগ, মহিলা মহাবিদ্যালয়, বারাণসী।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁর প্রথম রচনা একটি কবিতা। কবিতাটি ঋজুপাঠ অবলম্বনে লেখা। কুন্তলীন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে লেখা তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রানীদেবী' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'টিলকুঠী' (১৩১১ বঙ্গাব্দ) নবনূর পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে অনুরূপা দেবীর খ্যাতির সূত্রপাত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পোষ্যপুত্র' (১৩১২ বঙ্গাব্দ) উপন্যাস থেকে। 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা মোট তেত্রিশটি।

অনুরূপা দেবী নানা জাতীয় অনুষ্ঠানে বা উৎসবে যোগদান করতে ভালোবাসতেন। তাঁর বিভিন্ন রচনাতে অনেক ব্রত-উৎসবের উল্লেখ আছে। ঈশ্বরভক্ত অনুরূপা দেবী অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ব্রতাদি পালন করতেন। তাঁর প্রারম্ভিক রচনাগুলি পূজাপার্বণ, সামাজিকতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা। অবসর সময়ে তিনি সপরিবারে বেড়াতে গেলে, সেখান থেকেও উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করতেন। শেষ বয়সে তিনি নিজের কয়েকটি লেখার স্মৃতিচারণা করেছেন। আত্মজীবনীও লেখা আরম্ভ করেছিলেন তিনি, তবে তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপা দেবী বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। কাশী ও কলকাতার বহু বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও পরিচালনা ছাড়াও অনুরূপা দেবী মহিলা সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে)। তিনি নারীর অধিকারজনিত বহু আন্দোলনেরও নেত্রী ছিলেন। বারাণসীর হিন্দু মহিলাশ্রম, আর্য বিদ্যালয়, মাতৃমঠ প্রভৃতির তিনি অধ্যক্ষা ছিলেন। তিনি কলকাতার বাণীপীঠ নারীকল্যাণ আশ্রম, হিন্দু মহিলাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সমাজসংস্কারে বিশেষত: নারীকল্যাণার্থে তাঁর যোগদান প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে তিনি একজন পরিশ্রমী কর্মী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার সঙ্গেও একত্রে অনেক কাজ করেছেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন, উচ্চশিক্ষা ও যথার্থ সাহিত্য-সাধনার জন্য ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। মুজঃফরপুরে মহিলাদের জন্য একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা।

শুধু নারী-কল্যাণই নয়, বহু বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যও করেছেন অনুরূপা দেবী। বিহার ভূমিকম্পে (১৫ জানুয়ারী ১৯৪৪) নিজে গুরুতর আহত হয়েও তিনি বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য করার জন্য কল্যাণব্রত সংঘ স্থাপন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু বিপদগ্রস্ত মানুষের চিকিৎসা, আশ্রয় ও অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয়। তিনি পণপ্রথা উচ্ছেদের জন্য বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার উদ্দেশ্যে বহু সভাসমিতি করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কোডবিল-এর বিপক্ষে তিনি নিজের মত প্রকাশ করেন এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে আন্দোলনও করেন। তিনি নারীর যথাযোগ্য অধিকার রক্ষার জন্যও তীব্র

আন্দোলনের পথে অগ্রসর হন। এজন্য ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীভারত মহামণ্ডল তাঁকে 'ধর্মচন্দ্রিকা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অনুরূপা দেবী কয়েক বছরের জন্য আই.এ. পরীক্ষায় বাংলা সাহিত্যের প্রশ্নপত্র রচয়িত্রী ও পরীক্ষামণ্ডলীর সদস্যা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন 'সরস্বতী' উপাধি দান করেন তাঁকে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁকে 'ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধিও প্রদান করেন। ১৯৩৫ ও ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিনী' ও 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' -এর দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন অনুরূপা দেবীকে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে 'লীলা বক্তৃতা' দিতেও আহ্বান জানানো হয়েছিল।

ভারতীয় সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে অনুরূপা দেবীর বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচনাগুলিতেও। এ বিষয়ে তিনি যথার্থই একজন আত্মসচেতন শিল্পী ছিলেন। তবে পারিবারিক ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের মহিমা, দেশী-বিদেশী ভাষার সাহিত্যদর্শনের প্রভাব তাঁর উপন্যাসকে প্রায়শঃই ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তাঁর রচনায় একটি প্রধান দুর্বলতা অতিভাষণ। তাঁর গল্প, উপন্যাসে কোন-কোন স্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় বিবরণও এসেছে। ফলে গল্প হয়ে উঠেছে জটিল, শ্লথগতিপূর্ণ, সেইসঙ্গে তত্ত্বকথা, আদর্শবাদ ও আবেগের মিশ্রণে, কান্নার স্রোতে অনেক গল্প রসোত্তীর্ণ, সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলির নাম 'চিত্রদ্বীপ', 'উল্কা', 'রাঙাশাখা' (১৯১৫), 'মধুপল্লী' (১৯১৭), 'ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলনকথা' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত)।

অনুরূপা দেবীর কিছু উপন্যাসেও শিল্পগত দুর্বলতা রয়েছে। আবার অনেকগুলি উপন্যাস উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯) ও 'পথহারা' প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসেরই অন্তর্গত। আবার 'মা' ও 'বাগদত্তা' উপন্যাস দুটি জনপ্রিয়তা লাভ করলেও বহু বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ। কোন কোন উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাসের জটিলতা চরিত্র বিশ্লেষণকে অতিক্রম করেছে। যেমন, 'চক্র' ও 'হারানো খাতা'। 'পোষ্যপুত্র' ও 'জ্যোতিহারায়' ঘটনার চাপে চরিত্র বিকাশের সতেজস্ফূর্তি ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু অনুরূপা দেবীর দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাল্যকাল থেকেই এঁদের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির তিনি একনিষ্ঠ পাঠিকা ছিলেন। তাই সামাজিক উপন্যাসের প্রতি অনুরূপা দেবীর স্বাভাবিক প্রবণতা থাকলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনারও প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি। 'রামগড়' ও 'ত্রিবেণী'তে তাঁর এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক না হলেও, উপন্যাস দুটিতে প্রাচীন যুগের উত্তেজনাপূর্ণ সংঘাতের টানাপোড়েন এ যুগের পাঠকও অনুভব করবেন। 'রামগড়' উপন্যাসটি বৌদ্ধযুগের প্রবল সম্রাট কোশলপতির সঙ্গে লিচ্ছবি ও শাক্য

রাজবংশীয়দের বিরোধেরই ইতিহাস। 'ত্রিবেণী'তে লেখিকার বিষয় বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়।

অনুরূপা দেবীর সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'পোষ্যপুত্র'তে কিছুটা অপরিণতির ছাপ আছে। উপন্যাসের নায়ক ও অন্যান্য চরিত্রগুলি তাই পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে নি। উপন্যাসের নামকরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধেও সংশয় থেকে যায়। শরৎচন্দ্র প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ 'নারীর লেখা'য় (যমুনা, ফাল্গুন ১৩১৯) অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র' সম্বন্ধে কঠিন সমালোচনা করেছিলেন - '...বইখানি জ্ঞানগর্ভ। বেদ, কোরাণ, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত, এথিক্স, মেটাফিজিক্স, রামপ্রসাদী, তন্ত্র, মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ সমস্তই আছে। এছাড়া সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী কালিদাস, সেক্সপিয়র, টেনিসন যাহা কিছু শিক্ষা করা প্রয়োজন একাধারে সমস্তই।...অন্তপুরবাসিনী স্ত্রীলোক হইয়াও সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্যের বহরে লোকজনের তাক লাগাইয়া দিব এই স্পিরিট্টাই নিন্দার্হ।" অনুরূপা দেবীর 'জ্যোতিহারা' (১৯১৫), 'হারানো খাতা' ও 'চক্র' উপন্যাসেও পরিপূর্ণ সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধিত হয় নি। 'জ্যোতিহারা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'চক্র' উপন্যাসটি রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত। চরিত্রগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল নয় এবং উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাসের প্রাধান্য ঘটেছে।

অনুরূপা দেবীর অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস 'মা' (১৯২০)। তবে এই উপন্যাসটিতেও অতিরঞ্জনের দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। 'বাগদত্তা' উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস অত্যন্ত জটিল, ফলে কৃত্রিমতা দেখা দিয়েছে। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস বসুমতী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। 'জোয়ার ভাঁটা', 'উত্তরায়ণ', 'পথের সাথী' উপন্যাসগুলি বসুমতী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় নি। এই তিনটি উপন্যাসে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতাও প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

অনুরূপা দেবীর সাহিত্য প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে 'গরীবের মেয়ে', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' ও 'পথহারা' এই চারটি উপন্যাসে। আবার এর মধ্যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫)। 'মন্ত্রশক্তি'তে শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' গল্পের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসটিতে যদিও তাঁর বিশ্লেষণ শক্তির সামান্য দুর্বলতা বর্তমান, তবে তা উপন্যাসে ঘটনার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেনি। উপন্যাসের গতি সরল, স্বচ্ছন্দ ও বাহুল্য বর্জিত। উপন্যাসটির বিশেষত্ব হল — বাস্তব জীবনে বেদমন্ত্রের প্রভাব ও বাস্তব জীবনের সঙ্গে রোমান্সের সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা।

অনুরূপা দেবী কয়েকটি নাটকও রচনা করেছিলেন। দুটি বড় নাটক 'বিদ্যারত্ন' (১৯১৯) ও 'কুমারিল ভট্ট' (১৯২২) এবং চারটি ছোট নাটক একত্রে 'নাট্যচতুষ্টয়' (১৯৩৩) নামে

পরিচিত। তাঁর কয়েকটি উপন্যাসও নাট্যরূপে পরিবেশিত হয়েছে। 'মন্ত্রশক্তি', 'পোষ্যপুত্র' ও 'মা' এই তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ নটনাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শেষ জীবনে আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেছিলেন তিনি, কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেন নি। অসম্পূর্ণ গ্রন্থটির নাম 'জীবনস্মৃতি লেখা'(১৯৫২)। 'সাহিত্যে নারী : স্রষ্টা ও সৃষ্টি' (১৯৪০) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া অনুরূপা দেবীর বক্তৃতার গ্রন্থরূপ।

অনুরূপা দেবী সাধারণত: তাঁর গ্রন্থগুলির নামকরণ করেছেন কাহিনির মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করে, যা অনেকাংশে সার্থক হয়েছে বলেই মনে হয়। তাঁর লেখনীর গঠনরীতিতে যথার্থ শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। যদিও রচনারীতি কোন কোন স্থানে ত্রুটিযুক্ত। যেমন, দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগের ফলে সময়ে সময়ে রসাস্বাদনে বাধা ঘটেছে। তবে তাঁর ভাষা সহজ, স্বচ্ছন্দ, সরল গতিতে অগ্রসর হয়েছে। তাঁর ভাষায় সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। তিনি কালিদাস, ভবভূতি, বাল্মীকি, মাঘ, বাণভট্ট প্রমুখ কবিদের উদ্ধৃতি দিয়েও নিজের বক্তব্য বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। 'মা' উপন্যাসে শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করেছেন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গিও উৎকৃষ্ট। নিসর্গ জগতের বর্ণনাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

বিহারের বিরাট ভূমিকম্পে অনুরূপা দেবী আহত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। সেখানেই ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে (৬ই বৈশাখ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন তিনি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাহিত্যসৃষ্টি কর্মে অবতীর্ণ হন অনুরূপা দেবী এবং মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁর রচনাকর্ম অব্যাহত থাকে। সাহিত্য রচনা এবং বিশিষ্ট জীবনচর্চার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়েছেন।

জাদুবাস্তবতা এবং অস্তিত্বের সংকট : সন্ধানী আলোয় শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'

তিলক মণ্ডল*

জার্মানিতে চিত্র আন্দোলনই প্রথম জাদুবাস্তবতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। জার্মান শিল্পসমালোচক ফ্রানজ রো (১৮৯০-১৯৫৫) তাঁর 'Nach-Expressionsmus' গ্রন্থে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' কথাটি ব্যবহার করেন ১৯২৫ সালে চিত্রকলার আলোচনায়। তাঁর রচনাটির নাম ইংরেজি অনুবাদে 'After Expressionism : Magic Realism : Problems of the Newest European Painting.; তবে তিনি এই শব্দটি বাস্তবের মধ্যে রহস্যময়তার নিহিত ব্যাঞ্জনা অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কারপেন্তিয়েরকেই লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তবতার প্রবক্তা বলা হয়। প্রথম যে লাতিন আমেরিকান লেখক সাহিত্য বিষয়ে এই অভিধাটি ব্যবহার করেন তিনি ভেনেজুয়েলার সাহিত্যিক Arturo Pictri. ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'Men and Letters of Venezuela' গ্রন্থে ভেনেজুয়েলার ছোটোগল্পের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শব্দটি প্রয়োগ করেন। ''এই আখ্যাটি সম্ভবত জার্মান Magischer Realismus থেকে এসেছে, তারপর এটি ডাচ ভাষায় অনূদিত হয় Magisch-realisme, এই পথ বেয়ে স্পেনীয় Realismomagico এবং ইংরেজি 'magic realism' ব্যাপারটা চালু হয়ে গেছে।''[১] অ্যাঞ্জেল ফ্লোরেন্স পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 'Magical Realism' কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তববাদী লেখক হিসাবে আলহো কারপেন্তিয়ের এবং বিশেষ করে মার্কেজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতি পাওয়ার পরে একটি ধারণা করা হয় যে জাদুবাস্তববাদ মানেই লাতিন আমেরিকান ধারণা। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। কেননা জাদুবাস্তববাদের উৎসই হচ্ছে পীড়নের বিরুদ্ধে নব নির্মাণের মধ্যে। জাদু বাস্তব উপন্যাসে প্রান্তিকায়িত মানুষের কথা থাকে। দেশ-কাল ব্যতিরেকে এই পীড়ন আছে সর্বত্র। তাই জাদুবাস্তববাদ আছে ভারত, বাংলাদেশ, কানাডা, আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের কথা সাহিত্যিকদের রচনায়।

জাদুবাস্তববাদ আখ্যার জাদু বলতে বোঝাই অ-সাধারণ সংঘটন বা বিজ্ঞান ব্যাখ্যাতীত কোন ঘটনা। ''কিন্তু জাদু বাস্তববাদে জাদু কথাটি জীবনরহস্য অর্থেই আসে, ভূতের আবির্ভাব, লোকজনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অলৌকিক ব্যাপার, অ-সাধারণ ক্ষমতা, অদ্ভূত আবহ, এ-সবই আনা হয় বাস্তবকে বোঝানোর জন্য। জাদুর খেলা, জাদুকরের কারসাজি-জাদু

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।"[২] অনেকেই জাদুবাস্তবতার সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। কার্লোস ফুয়েন্তেস বলেছেন —১) "Lo real maravilloso Americano— The marvelous beings to be unmistakably marvelous when it arises from an unexpected alternation of reality(the miracle),from a privileged revelation of reality an unaccustomed insight that is singularly favored by the unexpected richness of reality or an amplification of the scale and categories of reality perceived with particular intensity by virtue of an exaltation of the sprit that leads it to a kind of extreme state, To begin with, the phenomenon of the marvelous presupposes faith."[৩]

Margaret Drabble 'The Oxford Companion to English Literature .(১৯৯৭) গ্রন্থে জাদু বাস্তবতা সম্পর্কে বলেছেন —

২) "Magic Realist Novels and stories have, typically, a strong narrative drive in which the recognizably realistic magic with the unexpected and the inexplicable, and in which elements of dream, fairy-story, or mythology combine with the everyday, often in a mosaic or keleidoscopic pattern of refraction and recurrence."[৪]

বাংলায় জাদুবাস্তববাদের এবং লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের আলোচনায় মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই পথপ্রদর্শক। তার 'বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব' (২০১৩) গ্রন্থটির নাম উল্লেখ্য। ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক হাসান আজিজুল হক 'কথাসাহিত্যের কথকতা' (১৯৮৯) গ্রন্থে জাদুবাস্তবতা সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। হাসান আজিজুল হক মার্কেজের নোবেল বক্তৃতাকে স্মরণে রেখে জাদুবাস্তবতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

"...সমগ্র মহাদেশের যে ছবি তুলে ধরেছেন তা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নকেও অতিক্রম করে যায় অথচ তা বাস্তব, মোটেই ঠাট্টা নয়। এই যে দুঃস্বপ্নের চেয়ে বহুগুণে আতঙ্কজনক বাস্তব—এই বাস্তবকেই তো বলতে পারি অতি বাস্তব, কুহকী বাস্তব-একে প্রকাশ করার জন্যেই লিখন শৈলীর জাদু বাস্তব কৃৎকৌশল।"[৫]

তারপরে অনেকেই জাদুবাস্তবতার সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন —

"অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি যুগপৎ সত্য হয়ে ওঠে প্রকল্পনার মায়াবী অনুবিশ্বে। এই সত্য স্পষ্টত বাস্তববাদের 'সত্য' নয়..দ্বিবাচনিক অস্তিত্বের আলো-ছায়াযে প্রতিবেদনে তৈরি করেছে, তাকে ব্রায়ান ম্যাকহেল চমৎকারভাবে 'ontological poetics' বা সত্তা জিজ্ঞাসার নন্দন বলে বর্ণনা করেছেন। একেই 'ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা' এর অভিধা দেওয়া হয়েছে।" আমরা যাকে বাস্তব বলি সব আকাঙ্ক্ষা তাতে পূরণ হয় না? প্রত্যাশার অনেক দিগন্ত মিলিয়ে যায় চোরাবালিতে। মানুষ তার নিজের জন্যে ক্ষতিপূরণের

আয়োজন করে কল্পনায়; ক্রমশ যে-বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলে, অন্য এক বিকল্প পৃথিবী তৈরি করে সেইরিক্ততা থেকে নিস্তার পেতে চায় যেন। মানবিক অস্তিত্বকে প্রতিদিনের বাস্তব আবৃত করে রাখে, মর্যাদার বদলে দেয় গ্লানি, তখন সেই ভেঙে দিতে পারে শুধু মানুষেরই অপরাজেয় সত্তার গভীর থেকে উঠে আসে। এর অভিব্যক্তি লক্ষ করি বাস্তবাতিযায়ী অপরতারনির্মাণে। বুদ্ধি দিয়ে যেহেতু তার ব্যাখ্যা মেলে না, একে বলি জাদুবাস্তবতা, বলি অলৌকিক বিস্ময়ের ভুবন, বলি ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা।"[৬]

জাদুবাস্তবতায় থাকে বাস্তবতাকে আরও গভীরভাবে বোঝা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানোর কৌশল, এখানে থাকে সমাজ ও প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় পর্যবেক্ষণ; এখানে অসম্ভব সবকিছুই সম্ভব হতে পারে। জাদুবাস্তব উপন্যাসে বাস্তবতা এবং অবাস্তবতাকে একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়। একটি সাক্ষাৎকারে জাদুবাস্তবতা সম্পর্কে লেখক শহীদুল জহির নিজেই বলেছেন —

"জাদুবাস্তব বাস্তবই, বাস্তবের একটা ভিন্ন তলমাত্র। জাদুবাস্তবতা অবশ্যই সামাজিকরূপকথা নয়।"[৭]

সর্বোপরি 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' হল সাহিত্যের নান্দনিক আঙ্গিক বা প্রায়োগিক কৌশল বা নির্মাণশৈলী বা বয়নকৌশল, একটি টেকনিক; যার দ্বারা জাদু বা মায়াবী উপকরণ বাস্তবের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে মিশিয়ে দেওয়া যায় এবং গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি হয়। এইগুলি এমনভাবে বর্ণনা করা হয়, যেমন ভাবে আমরা সাধারণত কথা বলি। আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের শোনার মধ্যেই, বোঝার মধ্যেই অবাস্তব ঢুকে গেছে এবং কাল্পনিক জগতে আছি। ঐন্দ্রজালিকতার দ্বারা বাস্তবকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয় কেবল। ঐন্দ্রজাল মানে যা কখনও ঘটতে পারে না, যা কখনও হতে পারে না, যা থাকতে পারে না। অথচ তাই হবে এবং ঘটবে কেবল মাত্র তখনই; যখন বাস্তবের বিধিবিন্যাস এবং কার্যকারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করলে তখনই। জাদুবাস্তব উপন্যাসে থাকে মিথ, স্বপ্ন, অলৌকিকতা, সংস্কার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, রূপকথা ইত্যাদি। এই সব দিয়েই বিশেষ এক বাস্তবতাকে অর্থাৎ ইতিহাসকে উপস্থাপিত করা হয়। এই ইতিকথা কোন সরকারি নথিভুক্তি থাকে না। এই ইতিহাস মানুষের ইতিহাস, মানুষই এখানে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে দেবাশিস দত্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"এই অভিধার প্রয়োগ একধরণের রাজনৈতিক কৌশল। সমালোচকগণ শাসকের কৌশলদ্বারা প্রভাবিত হয়ে মার্কেসের লেখার মূলক স্বরূপকে যেন গোপন করতে চান।"[৮]

জাদুবাস্তবতা প্রকৃতপক্ষে কঠিন এবং মাটি থেকে ছেঁকে তোলা এক বাস্তব। পাঠককে মহাদেশের ভিতরের খবর জানানোর জন্য এমন এক ভাষা নির্মাণ করেন যা শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-বিধিনিষেধ-খবরদারীর বাইরে তার জায়গা। জাদুবাস্তব উপন্যাসে থাকে গ্রামীণ আবহ অথবা রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র, আর থাকে এক কাল্পনিক অঞ্চল। জাদুবাস্তব

উপন্যাসে থাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বঞ্চিত মানুষজন, গল্প তৈরি হয় ক্ষমতাহীন প্রান্তিক মানুষ, উত্তর ঔপনিবেশিক দেশের মানুষ যারা পূর্বতন শাসকদের বিরুদ্ধে লড়ছে। "অনেকে মনে করেন অপ্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিরোধের শক্তিশালী ফর্ম হিসাবে জাদুবাস্তবতার সম্ভাবনা অনেক বেশি।"[৯] পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক বিকল্প এবং নতুন পাঠকৃতি নির্মাণ করা হয় লোকসমাজের স্বপ্ন-আকাঙ্খা-বিশ্বাস প্রত্নকথা-আদিকল্প-কিংবদন্তির দ্বারা এবং অপরাজেয় জীবনের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এখানে নিপীড়িত এবং মূক মানুষগুলির মুখে ভাষা ফোটে এবং তারা অর্থহীনতা থেকে অর্থপূর্ণতার দিকে যাত্রা করে। এই যাত্রায় সমস্ত প্রান্তেবাসী মানুষ, নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী, পুঁজিবাদী এবং ঔপনিবেশিক শাসনে দলিত মথিত প্রান্তিক জাতি এই নতুন জগতে এবং কুহকী বাস্তবতায় বেঁচে থাকার পথ ও পাথেয় খুঁজে পায়। 'জাদুবাস্তববাদের সঙ্গে উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ, বিনির্মাণবাদ, আধুনিকোত্তরবাদ, রাজনৈতিক অবচেতনা, পরাবাস্তববাদ এবং পাঠক প্রতিক্রিয়া যুক্ত হয়ে বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে।[১০]

এবার জাদুবাস্তববাদের কয়েকটি আঙ্গিকতা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। J.A. Cuddon জাদুবাস্তবতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে যথার্থভাবে নির্ণয় করেছেন —

"Some of the characteristic features of this kind of fiction are the mingling and juxtaposition of the realistic and the fantastic or bizarre, skillful time shifts, convoluted and even labyrinthine narratives and plots, miscellaneous use of dreams, myths, and fairy stories, expressionistic and even surrealistic description, arcane erudition, the element of surprise or abrupt shock, the horrific and the inexplicable."[১১]

'বুদ্ধিজীবির নোটবই'-এ সৌগত মুখোপাধ্যায় জাদুবাস্তবতার বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় বলেছেন —

"ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কল্পনা আর সত্যের সংমিশ্রণ ছাড়াও রয়েছে আঁকাবাঁকা এবং গোলক ধাঁধাময় কাহিনীক্রম ঃ দক্ষ কালপরিবর্তন, স্বপ্ন আর রূপকথার মিলিজুলি ব্যবহার, অভিব্যক্তিবাদী, কখনও বা পরাবাস্তববাদী বর্ণনা; চমক, এমনকী আকস্মিক শক, বীভৎস আর ব্যাখ্যাতীতের উপস্থিতি।"[১২]

এধরণের রচনায় থাকে —

(ক) বাস্তব, ফ্যান্টাসি, উদ্ভটের পাশাপাশি অবস্থান।

(খ) প্লটের বিভিন্ন অংশ গোলক ধাঁধায় পাকানো।

(গ) স্বপ্ন, মিথ, প্রত্নতত্ত্ব, রূপকথার ব্যবহার।

(ঘ) সহসা চমকের উপস্থিতি।

(ঙ) আতঙ্কময়, অমূলক, অসম্ভব ও কার্যকারণহীন ঘটনার উপস্থিতি।

(চ) ভাষার দ্বারা এক মায়াময়, বিভ্রান্তিকর, জটিল আবহ নির্মাণ করা হয়।

(ছ) এই ধরণের চরনায় কেন্দ্রীয় কাহিনির কোন কার্যকারণগত সম্পর্ক থাকে না।

(জ) উদ্ভট-অবাস্তবের আড়ালে থাকে কঠিন, চরম এক বাস্তব। সেই চরম সত্যেরসন্ধান-ই প্রধান বিষয়।

(ঝ) অনেক সময় থাকে একটি কাল্পনিক নগর, তার সমাজ এবং এখানের মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য।

(ঞ) জাদুবাস্তববাদী সাহিত্যে পরাবাস্তববাদী বর্ণন কৌশল থাকে।

(ট) সহসা সময় বদলের নৈপুণ্য।

(ঠ) সাধারণত এই ধরণের রচনায় থাকে এক মহাকাব্যিক মাত্রা।'[১৩]

এখন বাংলা ভাষায় জাদুবাস্তববাদের চর্চার কথা প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। অনেকেই ভারতীয় রূপকথার মধ্যে অর্থাৎ 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠানদির থলে', 'ইত্যাদির মধ্যে কিংবা মৈমনসিংহ গীতিকায় জাদুবাস্তবতা আছে বলে মনে করেন। মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে বিশেষ করে ধর্মমঙ্গলকাব্য জাদুবাস্তবতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে জাদুবাস্তবতার লক্ষণ খুঁজে পান। তবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী', 'ডমরু চরিত', 'ভূত ও মানুষ' আখ্যানের মধ্যে জাদুবাস্তবতার লক্ষণগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্নর রায়ের 'স্বপ্ন পুরাণ' (২০০২) কিংবা রমানাথ রায়ের 'কাঁকন' (২০০১) উল্লেখযোগ্য জাদুবাস্তব রীতির উপন্যাস। 'স্বপ্ন পুরাণ' উপন্যাসে এক আধ্যা গ্রামের পটে সাম্প্রদায়িক সংকট, ওসামা বিন লাদেন এসে পুকুর পাড়ে জেহাদের ডাক দেয়, বুনো বেড়ালের উকিলে রূপান্তর, বোমা বৃক্ষের আবির্ভাব দেখান হয়েছে। রমানাথ রায়ের 'কাঁকন' উপন্যাসের যুবতী কাঁকন হাসতে ভুলে গেছে, তাকে হাসাতে চেষ্টা করে একে একে দুই ভাই, অর্ধমানব ও অর্ধপক্ষী গরুড়, এমনকি তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী যুবক প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত। শেষে কাঁকন গরুড়ের সঙ্গে উড়ে যায় স্বর্গের দিকে এবং হেসে ওঠে সে। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হার্বার্ট', 'কাঙাল মালসাট', 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক' ইত্যাদি রচনাগুলি উত্তর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণে অবশ্যই জাদুবাস্তবধর্মী রচনা। অভিজিৎ সেনের 'রহুচণ্ডালের হাড়', 'দেবাংশী', 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী'-লখিন্দর' ইত্যাদি উপন্যাসে জাদুবাস্তবতা লক্ষ করা যায়। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সেলিনা হোসেন, দেবেশ রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র প্রমুখের রচনায় জাদুবাস্তবতা লক্ষ করা যায়। আলোচনায় শহীদুল জহিরের — 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' (১৯৮৮) উপন্যাসটি রাখা হয়েছে।

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (১৯৮৮)

উপন্যাসের কাহিনি বিশ্লেষণের পূর্বে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসের কাহিনি সংক্ষেপে বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। উপন্যাসটিতে নির্দিষ্ট সুগঠিত কোন কাহিনি নেই। টুকরো টুকরো কাহিনির কোলাজ নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসটির কাহিনির সূচনা ১৯৮৫ সালে। কাহিনিটি শুরু হয় আবদুল মজিদের স্যান্ডেলের ফিতে

ছিঁড়ে যাওয়ার মাধ্যমে। আর তার চোখের সামনে কাক উড়তে থাকে তারা উইপোকা ধরে খায়। কাকগুলি উইপোকার পিছনে হুটোপুটি শুরু করে দেয়। তাতে কাহিনি দ্রুত একাত্তরের দিনগুলিতে ধাবিত হয়। একাত্তরের অনুসঙ্গেই বদু মওলানার মতো রাজাকারের কথা আসে উপন্যাসে। যে একসময় নবাবপুরের আকাশে কাক ওড়াত এবং নরম করে হাসত। বিকেল বেলায় থালায় করে মাংস নিয়ে ছাদে উঠে যেত এবং আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিত মানুষের মাংস। টুকরো টুকরো মাংসখণ্ডগুলি গিয়ে পড়তো কারো চালের হাড়িতে কিংবা কারো কুয়োতলায়। টুকরো টুকরো মাংসখণ্ড নিয়ে নৃশংসতা চলে উপন্যাস জুড়ে। কাটা পুরুষাঙ্গ দেখার অপরাধে বদু মওলানা তার স্ত্রী লতিফাকে তিন তালাক দেয়। মহল্লায় বদু মওলানার কল্যাণে মিলিটারি আসে এবং প্রথমদিন ১৭ বছর বয়সি আলাউদ্দিন নিহত হয়। কারণ সে দাঁড়িয়ে প্রসাব করেছিল। আর মহল্লায় তুলসীগাছ তুলে ফেলতে ব্যস্ত থাকার সময় জবাফুল গাছ কাটতে উদ্যত হলে মোমেনা এক রাজাকারের গালে চড় মারে। সর্বোপরি মোমেনা গান করতো এবং খ্রিস্টান বাসন্তী গোমেজের সঙ্গে তার 'ভাব' ছিল, সেই কারণে তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। একসময় যে আজিজ পাঠান এবং বদু মওলানা একে অপরের শত্রু ছিল; ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তারাই হাতে হাত রেখে সরকার বিরোধী আন্দোলনে রত হয়। তখন মহল্লার লোকেরা বিভ্রান্তি বোধ করে। রাজনীতিতে নাকি চিরশত্রুবলে কিছু নেয় — তাই আবদুল মজিদ দেখে বদু মওলানা ও তার পুত্ররা একই রাজনীতির চর্চা করে এবং বদু মওলানার পুত্র আবুল খায়েরের জোব্বার ভিতর থেকে কাক বের হয়।

উপন্যাসটিতে উপরি পাওনা হল মায়ারানী মালাকার এবং মোহাম্মদ সেলিমের পবিত্র একটি প্রেম কাহিনি। সেলিম মায়ারানীর জন্য পাগল হলেও মায়ারানী তাকে কোন পাত্তা দেয়নি। সেলিম মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে আর ফেরেনি। এদিকে মায়ারানীর বয়স চলে গেলেও অবিবাহিত থেকে যায়। একদিন মজিদ মায়ারানীকে সেলিমের দেওয়া একুশটি চিঠি ফিরিয়ে দিলে মায়ারানী চিঠিগুলি পুড়িয়ে পুরনো তুলসীগাছ তুলে তুলসীর বেদিমুলে চিঠি পোড়া ছায় রেখে সেখানে নতুন তুলসীগাছ লাগায়। কিন্তু মায়ারানী কেন এমন করল তার কোন উত্তর নেই উপন্যাসে। বদু মওলানার একটি হিজড়ে সন্তান ছিল। লোকে যাতে তাকে পুত্রসন্তানই ভাবে তাই ইসমাইল হাজামকে ডেকে এনে খতনা করানোর অভিনয় দেখানো হয়। এই সত্য যাতে প্রকাশিত না হয় সে জন্য ইসমাইল হাজামকেই হত্যা করা হয়। আর এদিকে বদু মওলানা যে তুলসীগাছ হিন্দুরা পূজা করে বলে সমস্ত তুললীগাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়, সেই তুলসীগাছের পাতাচিবুনিতে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে পাকবাহিনী। উপন্যাসের কাহিনির একেবারে শেযে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাওয়া মোমেনার ভয়ানক ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয় বালুচরে আবদুল মজিদের মাধ্যমে।

'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসের বাহ্যিক ঘটনা অতি সামান্য। যুবকের নাম আব্দুল মজিদ, সে লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরীলেনের বাসিন্দা। একদিন রায়সা

বাজারের দিকে যেতে যেতে নবাবপুর সড়কের উপর উঠতেই ফট করে পায়ের স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায়। আর, উপন্যাসের শেষে ঠিক বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার পরে আব্দুল মজিদ 'দৈনিক ইত্তেফা'কে একটি বিজ্ঞাপন দেয় এবং বসত বাড়ি বিক্রি করে লক্ষ্মীবাজার থেকে বাস উঠিয়ে চলে যায়। উপন্যাসের শুরুতে এবং শেষে দুটি মাত্র তথ্য রয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে খবরটি অতি তুচ্ছ, গুরুত্বহীন, রংহীন এবং কিছুটা উদ্ভটও বটে। স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যাওয়া আর বসত বাড়ি বিক্রি করে অন্যত্র বসবাসের জন্য চলে যাওয়ার ঘটনা প্রায়শই ঘটে। এই অতি তুচ্ছ ঘটনার আড়ালে বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় দুটি ঘটনার মাঝে ঘটে যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। গোটা বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকার একটি মহল্লায় ন' মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ ঘটনার অতি নির্মম বাস্তব উঠে আসে — তারই দুঃসহ যন্ত্রণা বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় রূপায়িত হয়। সমগ্র বাংলাদেশ-ই রক্তক্ষয়ী রণাঙ্গন হয়ে ওঠে। ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব ঐ মহল্লার ক'হাজার মানুষের জীবনে যেভাবে নেমে আসে এবং তারাই প্রকৃত অর্থে হয়ে ওঠে সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। যুদ্ধ আর রক্তের বাস্তব মূর্ত হয়ে ওঠে মহল্লায়। যুদ্ধের বাস্তব মহল্লার প্রতিটি বাসিন্দাকে নাড়িয়ে দেয়, আর তার ফলেই আব্দুল মজিদ বসত বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেয়। বসত বাড়ি বিক্রির গভীরে মিশে থাকে মুক্তিযুদ্ধের কান্না, যন্ত্রণা, হাহাকার। নারীর উলঙ্গ শরীর, ধর্ষণ,কাকে খাওয়া নরমাংস, ঝলসানো শরীর-খণ্ড, বেয়নেট আর বুলেটের নির্মম বাস্তব বাক্যের বাঁধনে, ভাষার সর্পিল বয়নে উপন্যাসটি নতুন রূপ পায়। ক্লান্ত, ধ্বস্ত, রিক্ত বাংলাদেশের জলন্ত বাস্তব ঐ টুকরো মহল্লার রূপকল্পে উপন্যাসে উঠে আসে। জহিরের সযত্ন লেখনীতে সমাজ বাস্তবতার প্রতিটি স্তর উন্মোচিত হয়।

স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যাওয়ার মাধ্যমে ১৯৮৫ সালের সমগ্র বাংলাদেশকেই যেন মূর্ত করে তোলেন লেখক। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা এবং মানুষের জীবনশৈলী সবেতেই ঐ স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। একদিকে স্বৈরাচারী শাসকের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত এবং দমন-পীড়ন নীতি চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। অন্যদিকে তেমনি সরকার বিরোধী আন্দোলন ও চরম আকার নিয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো রাজনৈতিক দলগুলি স্বৈরাচারীর পতনের লক্ষে একজোটে আন্দোলন শুরু করেছে। এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই, কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপারটি তখনই ঘটে যখন এই স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি স্বাধীনতার সপক্ষের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে হাতে হাত রেখে রাজপথে গণ আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই দৃশ্য দেখে আবদুল মজিদের মতো একাত্তরে যারা কেউ মা, কেউ বোন, কেউ স্ত্রী, কেউ পিতা, কেউ পুত্র হারিয়েছে; তাদের হৃদয়ের তন্তু স্যান্ডেলের ফিতের মতো ছিঁড়ে যায়। আবদুল মজিদ পুনরায় একাত্তরের আবির্ভাব দেখে —

''সে দেখে, নবাবপুরের উপর অপরাহ্নের ম্লান আকাশ উইপোকায় ছেয়ে আছে আর

পলায়নপর উইয়ের পেছনে অসংখ্য কাক হুটোপুটি করে। তার মনে হয় যেন কাকের চিৎকার এবং উইপোকার নিঃশব্দে পলায়ন-প্রচেষ্টার দ্বারা নবাবপুর রোডের ম্রিয়মান বিকেলের ভেতরে এক ধরনের নীরব সন্ত্রাসের অনুভব ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার ইন্দ্রিয় আর একটি বিষয়ে সচেতন হয়, সে খুব নিকটে লাউডস্পিকারের শব্দ শোণে। নবাবপুর রোডে সে সময় অবস্থানকারী প্রতিটি লোকের মতো সে এই শব্দের উৎস সন্ধান করে এবং তার সামনে, রাস্তার উল্টো দিকে পুলিশ ক্লাবের কাছে মাইক্রোফোন হাতে আবুল খায়েরকে দেখতে পায়। আবদুল মজিদ দেখে, আবুল খায়ের একটি দাঁড় করানো রিকশায় বসে মাইক্রোফোন মুখের কাছে তুলে কথা বলে আর রিকশার হুডের উপর বসানো চোঙের ভেতর থেকে তার কথা বিস্ফারিত হয়ে ছাড়িয়ে পড়ে। আবদুল মজিদ তখন, সেই কটি মুহূর্ত, কাক এবং ইউপোকার ওপর চোখ রেখে আবুল খায়েরের কথা শোণে। আবুল খায়ের কি বলে তা নবাবপুরের উপর দিয়ে চলমান সকলেই বুঝতে পারে। আবুল খায়ের বলে আপনাদের ধ্যনবাদ! সকলেই তার এই কথা তেমন বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই বুঝতে পারে, কারণ যারা তার কথা শুনতে পায় তারা সকলেই জানে কোন প্রসঙ্গে আবুল খায়ের এই কথা বলে। তারা জানে আগের দিন বিভিন্ন দলের আহ্বানে যে হরতাল হয়েছিল, পরদিন, কাকের চিৎকার এবং যান্ত্রিক শব্দের ভেতর আবুল খায়ের তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেয়। আবদুল মজিদের মনে হয়, তার হৃদয়টি বহুদিন থেকেই বিদীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এইদিন, উইপোকার হত্যাযজ্ঞের বিষণ্ন বিকেলে আবুল খায়েরের কথা শুনে তার হৃদয়ের তন্তু তার স্যান্ডেলের ফিতার মতো পুনরায় ছিন্ন হয়।"[১৪]

এই বর্ণনার মধ্যে কোথাও একাত্তরের উল্লেখ নেই; কিন্তু প্রতীকময়তা, সাংকেতিকতা এবং বীভৎসতা আছে। নবাবপুরের সমস্ত আকাশ ইউপোকা আর উইপোকার পিছনে অসংখ্য কাক হুটোপুটি শুরু করেছে। এই উই আর কাকের কী ভয়ানক আবির্ভাব হয়েছিল একাত্তরের দিনগুলোতে। সমালোচক হাসান আজিজুল হক যুক্ত করেন —

"সময়ের ক্রমকে বারবার ভেঙে দেয়, সময় হয়ে যায় ব্যক্তিগত, আমাদের সুবিধে মতো বেঁধে দেওয়া সীমানা, নির্দিষ্টতা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে।, সময় হয়ে ওঠে চিরবর্তমান। অসীম তার ধারণ ক্ষমতা। চোখের নিচে ভেসে ওঠে মানব সংসারের একটির পর একটি পরত — গুঢ় রহস্যময় লুকনো জীবনের সমস্ত তন্তুগুলি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসের নাম 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' ছাড়া আর কী-বা হতে পারত তখন আর ভেবে পাই না।"[১৫]

১৯৮৫ সালের দিকে শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেনের বাসিন্দা আব্দুল মজিদ একাত্তরের রাজাকারদের প্রিয়পাত্র বদু মওলানার পুত্রের মুখে শোনে 'আপনাদের ধন্যবাদ', আর তা শুনে আব্দুল মজিদ কিছু ক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং স্যান্ডেলের ফিতে ছিঁড়ে যায়।

'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা'য় শহীদুল জহির মুক্তিযুদ্ধের নিদারুণ বাস্তব অভিজ্ঞতা অত্যন্ত নির্মোহ ভাবে তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের বর্ণনা নয়, যুদ্ধের মনস্তত্ত্বকে তিনি তুলে ধরেছেন। যুদ্ধাকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী পর্বকে তিনি ধারাবাহিক চক্রাবর্তনে গেঁথেছেন, যেন কিছুই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নয়, সবই প্রবাহ এবং যুদ্ধের ফল। ফলে ১৯৮৫ তে ও উপন্যাসের প্রকাশের দিনেও মুক্তিযুদ্ধ সমান প্রাসঙ্গিক থাকে এবং মুক্তির সন্ধান তখনও চলে। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে ছড়িয়ে দেন সর্বত্র — সেই সিরাজগঞ্জের সুহাসিনীই হোক কিংবা মৈশুন্দি, ভূতের গলি, নবাবপুর, লক্ষ্মীবাজার, রায়সাবাজার, নারিন্দা সর্বত্র। লেখক তাঁর অবস্থান শক্ত করে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি সারাক্ষণ যুদ্ধের মধ্যেই রয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় ন'মাসে। কিন্তু শহীদুল জুহিরের উপন্যাসে চিত্রিত যুদ্ধ তাঁর চেয়েও দীর্ঘ। সে যুদ্ধ চলে সারা সময় এবং আজও। যুদ্ধের কপটতা, ক্ষুদ্রতা, হিংস্রতা, নৃশংসতা, বর্বরতা নিয়ে যুদ্ধ আজও বিরাজমান। যুদ্ধ চলে মহল্লায়, মহল্লায়। যুদ্ধে সকল অংশ গ্রহণকারীদের পক্ষ নিয়ে সমগ্র জনমণ্ডলীর মুখপাত্র হয়ে লেখক হাজির। জনগণের হয়ে বলার দায়িত্বটা লেখক নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি যা কিছু বলেন তারসমস্তটাই মহল্লার সবার জানা এবং তা একটু বিস্তারিতভাবে বলার জন্য লেখকের যুদ্ধসংবাদ উপস্থাপন। ফলে লেখকের গল্প কিংবা বর্ণনা একরৈখিক নয়, তা বহুমাত্রিক ও বহুস্বরিক। গল্পের মধ্যে থাকে অসংখ্য গল্প, একটি গল্পের রেশ থেকে শুরু হয় অন্য একটি গল্প। আর গল্পে থাকে অসংখ্য বাঁক, বাঁকের ঢালে ঢালে থাকে পাত্রমিত্র, পট, প্রকৃতি। স্থান-কাল পাত্রের ওপর লেখকের অতি সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়ের রহস্যময় প্রহরা থাকে। উপন্যাসে উপস্থিত মানুষগুলিও রহস্যময়, কুহকী। রহস্যময়তার আবেশে চারপাশে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে কিংবা ঘটনার কথা শোনা যায়। এই রহস্যময় বাস্তবতার মধ্যেই ১৯৭১-এর ছায়া পড়ে ১৯৮৫র-ঘটনায়। চিত্রকল্প রূপকল্পের আধারে উপন্যাসে জুড়ে চলে ভাবকল্প-প্রতিকল্পের খেলা। কুয়োর রূপকল্প আসে উপন্যাসের অনেক জায়গায়; কুয়োর তলদেশ একাত্তরকে আর তীরে দাঁড়িয়ে সমকালের মানুষজনকে বোঝায়। পঁচাশির আবুল খয়েরকে দেখে মহল্লার লোকজন, অন্য সবার সঙ্গে আব্দুল মজিদ শঙ্কিত চোখে দেখে আকাশে যত কাক ওঠে সেগুলো আবুল খয়েরের জোব্বার ভিতর থেকে যেন বের হয়ে আসে' আর তারপর কাহিনি পঁচাশি হয়ে আবুল খয়ের হয়ে দ্রুত ধাবিত হয় একাত্তরের দিকে, আর সঙ্গে কাকও থাকে —

"তার পিতা বদরুদ্দিন মওলানার সে এক অজ্ঞাত রহস্যময় ভালোবাসা ছিল কাকের জন্য। লক্ষ্মীবাজারের লোকেদের মনে পড়ে একাত্তর সনে বদু মওলানা নরম করে হাসত আর বিকেলে কাক ওড়াত মহল্লার আকাশে। এক থালা মাংস নিয়ে ছাদে উঠে যেত বদু মওলানা আর তার ছেলেরা। মহল্লার তখনো যারা ছিল, তারা বলেছিল বদু মওলানা প্রত্যেকদিন যে মাংসের টুকরো গুলো আকাশের দিকে ছুড়ে দিত, সেগুলো ছিল মানুষের মাংস।"[১৬]

অভিনব এবং এক স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার সময়ের চিত্র তুলে ধরে শহীদুল জহির পাঠককে বাস্তবতার এক কুহকী জগতে দাঁড় করিয়ে দেন। অসংখ্য কাক বদু মওলানার আলখাল্লা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। কাক উপন্যাসটিতে জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। অবশ্য কাক উপন্যাস রূপক। যেন কাকেদের অনেক খবর জানা আছে, যা আমাদেরও অজ্ঞাত। কাকেদের চোখেই দেখা যায়, কাকেদের মাধ্যমেই একের পর এক রোমহর্ষক ঘটনা প্রকাশিত হয়। কাকের ঠোঁট থেকেই ছিটকে পড়ে মানুষের মাংসের টুকরোগুলো। কোনোটা পড়ে ফুটপাতে, কোনটা কুয়োর ধারে; কারো পায়ের আঙুল, নখে 'লাল নখরঞ্জক' লাগানো। সেটা করে — হয়তো মেয়ের, হয়তো ছেলের হয়তো কোন হিজড়ের —

''আঙুলটির নখ খুব বড় ছিল এবং নখের ওপর ঘন এবং মোটা লোম ছিল। নখে লাগানো ছিল টকটকে লাল নখরঞ্জক। রঞ্জকের কথা শুনে সবাই ভেবে ছিল সেটা একটি মেয়ে মানুষের পায়ের আঙুল, তারপর ঘন মোটা কেশের কথা শুনে সবাই ভেবেছিল, সেটা পুরুষের। তারপর সবাই ভেবেছিল সেটা একজন হিজড়ের হবে।''[১৭]

কুয়োতলায় পড়েছিল 'একটা কাটা পুরুষাঙ্গ'। এই নর মাংস খণ্ড ছড়ানোর মাধ্যমে ভায়োলেন্সকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় দ্রুত। গোটা বাংলাদেশেই তখন মাংস বিতরণ করেছে বদু মওলানারা, মানুষের মাংস। যার উপরই রোষ পড়ত, তাকেই টুকরো টুকরো করে ফেলত এবং সেই মাংসের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিত শহরময়। এই যে হত্যা মানুষের মাংস নিয়ে নির্মমতা — এই অবস্থাকেও তীব্র উইটের মাধ্যমে বর্ণনা করেন —

''একটি টুকরো গিয়ে পড়েছিল জমির ব্যাপারীর বাড়ির কুয়োতলায়, বিকেলে ভাতের চাল ধোয়ার সময়, হাঁড়ির ভেতর। এটা ছিল একটা কাটা পুরুষাঙ্গ। হাঁড়ির ভেতর এসে পড়তেই জমির ব্যাপারীর কিশোরী কন্যাটি চমকে উঠেছিল, কিন্তু হাঁড়ির থেকে বের করে এনে সে বস্তুটি চিনতে পারেনি। সে সেটা তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলে ব্যাপারীর স্ত্রী অভিজ্ঞতার কারণে জিনিসটা চিনতে পারে। কাটা লিঙ্গটি খত্না করানো, মুণ্ডিত। ব্যাপারীর স্ত্রী সেটা দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়ে।''[১৮]

একাত্তরে যেভাবে নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটেছিল, তা বাংলাদেশে এর আগে পরে কখনই হয়নি। রাজাকার ও আলবদরদের প্রত্যক্ষ মদতে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী নারীর যেভাবে সম্মান হানি ঘটিয়েছিল তা অজ্ঞাত থাকেনি কোন মা-মেয়ের কাছে, হাঁড়ির ভেতর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। বদু মওলানা তার দ্বিতীয় স্ত্রী লতিফাকে কাটা পুরুষাঙ্গ দেখার অপরাধে তিন তালাক দেয় এবং সারারাত লতিফার একটানা করুণ আর্তনাদে সবাইকে জাগিয়ে রাখে। মহল্লার মোমেনার প্রতি ও বদু মওলানা ক্ষুব্ধ কারণ সে একমাত্র মুসলমানের মেয়ে যে গান করত এবং খ্রিস্টান বাসন্তী গমেজের সঙ্গে তার 'ভাব' ছিল। প্রথম যে দিন মহল্লায় মিলিটারি আসে সেদিন বদু মওলানার অন্য এক সত্তা আবিষ্কৃত হয় বদু মওলনার কারণেই —

"সেদিন এক ঘন্টায় মিলিটারি প্রতিটি বাড়িতে প্রবেশ করে, মহল্লায় নিহত হয় সাতজন, তিনজন নারী তাদের শ্লীলতা হারায়। নিহত সাতজনের নাম মহল্লাবাসী একটু পরে জানতে পারলেও ধর্ষিতা তিনজন নারীর নাম কেউ জানতে পারে না।"[এ]

একাত্তরের প্রথম দিনের চেহারার সঙ্গে তার বাড়িতে নারীকণ্ঠের কান্না মহল্লাবাসী প্রথমে মেলাতে না পারলেও পরে তারা একই সঙ্গেই ক্ষুব্ধ ও উল্লাসিত হয় —

"বদু মওলানার বাড়িতেই কেউ দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদছে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে মহল্লার মানুষের প্রথমে অবিশ্বাস হয়, তারপর তারা তাদের শোকের ভেতর উল্লাসিত হতে থাকে। একজন খাকি পোশাক পরা লোকের সঙ্গে ধূসর রঙের পপলিনের জোব্বায় আবৃত বদু মওলানা লক্ষ্মীবাজারের রাস্তায়, ঘরে, আঙিনায়, কুয়োতলায়, বাড়ির ছাদে শিকারোৎসব করেছিল। এখন এই কান্নার শব্দে মহল্লার লোকেরদের ক্ষোভ এবং উল্লাস একত্রিত হয়ে তাদেরকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যায়, যখন তাদের মনে হয় যে, বদু মওলানার রক্তের রমণীকে কাঁদতে না দেখলে তাদের এই শোকের এশস হবে না, তাদের এই উল্লাস পূর্ণ হবে না।"[২০]

মহল্লায় প্রথম নিহত হয় সতেরো বছরের আলাউদ্দিন, তাকে নিহত হতে হয় দাঁড়িয়ে প্রসাব করার অপরাধে। আর মোমেনাকে গান করার জন্য ধর্ষণ করে খুন করা হয় —

"তার একটি স্তন কেটে ফেলা, পেট থেকে উরু পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, ডান ঊরু কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে তরমুজের মতো হাঁ করে রাখা; সে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল, তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো দেহের নিচে পড়ে ছিল, মুখটা ছিল আকাশের দিকে উত্থিত।"[২১]

আলাউদ্দিন এবং মোমেনা দুজনেরই খুন হওয়ার পিছনে ধর্মীয় অজুহাত যুক্ত আছে। মোমেনা এবং আলাউদ্দিনের দুজনেরই মৃত্যু উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক নৃশংস। কেন্দ্রীয় চরিত্রের দিক থেকে অবশ্যই মোমেনা। রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে দুটি হত্যায় সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং দুটি হত্যাতেই বেশ ভালোই সাদৃশ্য আছে। বদু মওলানা দুজনেরই হত্যাকারী। তাদের দুজনকে হত্যা করার অনেক আগে থেকেই হত্যা করার অজুহাত দিয়ে রেখেছে।

বদু মওলানা একাত্তরে মানুষের মাংস ছড়িয়ে দিত কাকেদের জন্য। আর সেই কাক নবাবপুরের মানুষের মাংস নিয়ে সমস্ত আকাশ জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে বেড়াত। প্রতীকের পর প্রতীক মাত্রায় পাঠক ধাবিত হয় একাত্তরের গহন অন্ধকারে। ফলত বাংলাদেশের মানুষের সেই কালো অতীত, ৮৫-র বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সংশয়ে অনিশ্চিত হয়ে ওঠে —

"আমরা ক্রমান্বয়ে দেখতে পাই যারা একাত্তরে পাকিস্তানি আর্মিদের সহযোগিতা করেছিল, তাদের গাড়ির পতাকায় জাতীয় পতাকা উড়ছে, তারা প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে, শিল্পমন্ত্রী

হচ্ছে, কৃষিমন্ত্রী হচ্ছে, বাংলা বিভাগে ঢুকে ছদ্মবেশী বুদ্ধিজীবী হচ্ছে, তারা সুকৌশলে' ৭১ এ বুদ্ধিজীবী হত্যার মন্ত্রণালয় শিল্প-সাহিত্য-আধুনিকতা-মানবিকতার বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে কুঠারাঘাত করে যাচ্ছে, হুমায়ুন আজাদকে বাংলা একাডেমীর মতো মননচর্চার প্রতীকী জায়গাতে প্রকাশ্যে কোপাচ্ছে, রমনার বটমূলের অনুষ্ঠানে বোমাবাজি করছে....আমরা আবিষ্কার করি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সপরিবারে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের সেনানীর একে একে নিহত হয়েছে, যেন আবার বদু মওলানা মাংস ছিটাতে শুরু করেছে বাংলাদেশব্যাপী এবং সেই মাংসের লোভে নেমে এসেছে কাক।"[২২]

এই কারনেই আবদুল মজিদ লক্ষ্মীবাজারে থাকার সাহস করে উঠতে পারে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার বদু মওলানা ফিরে আসে এবং নিজের প্রতাপ পরিপুষ্ট করে তোলে। যে বদু মওলানা অপ্রয়োজনে আবদুল মজিদের সঙ্গে কথা বলে না। সেই বদু মওলানা একদিন তাকে রাস্তায় থামিয়ে বাচ্চা মেয়ের কুশল জানতে চায় এবং বলে —

"বইনের নামে নাম রাকছো, বইনেরে ভুলো নাইকা? আবদুল মজিদ যে মোমেনার কথা কোনো দিন ভুলবে নাসেটা তো আবদুল মজিদের জানাই আছে। কিন্তু বদু মওলানার কথা শুনে তার যা মনে হয়, তা হলো এই যে, বদু মওলানা জানে আবদুল মজিদরা একাত্তরের নয় মাসের কথাভোলে নাই। বাদু মওলানার কথা শুনে আবদুলমজিদ চিন্তিত হয়ে থাকে।"[২৩]

আবদুল মজিদের লক্ষ্মীবাজারের বাস উঠিয়ে চলে যাবার পিছনে কতকগুলি কারণ বর্তমান। আবদুল মজিদ কোনভাবেই চাইবে না তার মেয়ে একই ভাবে তার বোন মোমেনার মতো বদু মওলানা কিংবা তার ছেলেদের লালসার শিকার হোক। তার মনে হয় বদু মওলানা একাত্তরের একই রাজনীতির চর্চা করে আজও এবং বদু মওলানা জানে যে মজিদের পরিবার তাকে মোমেনার মৃত্যুর জন্য এখনও ঘৃণা করে। আর এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বদু মওলানা এবং তার দল সুবিধে করতে পারলে তারা আবদুল মজিদকে এই ঘৃণার জন্য ছেড়ে দেবে না। এই সিদ্ধান্তের পরিণতিতে ৮৬ সনের ৭-ই জানুয়ারি 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় আবদুল মজিদের বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে বদু মওলানা একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। স্বাধীন বংলাদেশকে যারা ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় বদু মওলানা। বদু মওলানার অন্তঃসারশূন্যতাকে লেখক দেখিয়েছেন অসংখ্য উইটের ব্যবহার করে। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের প্রসাব করার দৃশ্যটি সে গভীর মনোযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখে, যেন বাংলার মাটিকে ধন্য করে দিচ্ছে পাক ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন তার প্রসাব লাগা হাতটি বদু মওলানার আলখাল্লার ওপর আদর বুলিয়ে দিয়েছিল বলে পোশাকটি সে যত্ন করে বাড়িতে সংরক্ষণ করে রেখেছে। ফলে বদু মওলানার পোশাকটি আর শুধু পোশাক থাকে না, এটি নষ্টভ্রষ্ট আদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠে। বদু মওলানার নিষ্ঠুর হৃদয়ের পরিচয়

ব্যক্ত হয়, যখন প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয় যে তার ছেলে হিজড়ে নয়; তা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য একজন হাজামকে ডেকে এনে খতনা করার অভিনয় দেখানো হয় এবং শেষে এই সত্য যাতে কোন ভাবে প্রকাশ না পায় সে জন্য হাজামকেই সত্য করা হয়। হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি তার অসাড় দৃষ্টি ব্যক্ত হয়, যখন তুলসী গাছের পূজা হিন্দুরা করে বলে কোন বাড়িতে তুলসী গাছ রাখা যাবে না এই মর্মে আদেশ দিলে। কিন্তু তুলসী গাছ সম্পূর্ণ নিধন করতে অক্ষম থাকে বদু মওলানার ঘাতক বাহিনী। আর পাক সৈন্যরা তুলসীপাতা চিবুনিতে আসক্ত হয়ে পড়লে বদু মওলানা ঘাতক বাহিনী। আর পাক সৈন্যরা তুলসীপাতা চিবুনিতে আসক্ত হয়ে পড়লে বদু মওলানা যে প্রকৃতি এবং সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এই শাশ্বত সত্যটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

উপন্যাসটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এর ব্যাপ্তি সুবৃহৎ। উপন্যাসে মায়ারানী এবং মোহাম্মদ সেলিম নামের দুজন ভিন্ন ধর্মের নরনারীর প্রণয় সম্পর্কের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের জাতিসত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেলিম মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে আর ফেরে না অন্যদিকে মায়া চিরকুমারী থেকে যায়। একদিন সেলিমের লেখা চিঠিগুলি পুড়িয়ে পুরনো তুলসী গাছকে তুলে ফেলে পোড়া চিঠির ছাই রেখে নতুন তুলসীর চারা পুঁতে জল দেয়। প্রেমপত্র গুলি পুড়িয়ে তার প্রেমকে শেষ করে দিয়েছে ভাবলে ভুল হবে। মায়া তাদের প্রেমকে নতুন রূপদান করে তুলসীর বেদিমূলের মতো পবিত্র জায়গায় স্থান দিয়ে; প্রতিদিন তাকে জলসিঞ্চনে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে হৃদয়ে তাকে মহীরূহ করার বাসনা ব্যক্ত করে। রাশিদা সুলতানা এর মধ্যে লেখকের ব্যক্তি জীবনের ছায়া দেখেছেন —

‘‘তাঁর জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাসে মেট্রিক ফেল করা কোন এক মুসলিম কিশোর পাড়ার একহিন্দু কিশোরীর প্রেমে পড়ে কিন্তু বিনিময়ে কিশোরী উপহার দেয় নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা। কিশোরটিযুদ্ধে গিয়ে আর ফেরে না। মেয়েটির উদাসীনতা ততদিনে খুচে যায়। ধীরে ধীরে সে বয়সী হয়, তার চিরককৌমার্যের কারণ কেউ জানে না এবং বোঝে না। মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো এমন কোন কারণ ছিল শহীদুল জহিরের একা থাকার সিদ্ধান্ত নেয়ার পিছনে।’’[২৪]

ফয়জুল ইসলাম এতে লেখকের ব্যক্তি জীবনের ছায়া আছে বলেই নিজেকে প্রশ্ন করেছেন —

‘‘একটি ছোট কাগজে আয়না নামে আমার গল্পটা বের হলে আমি পত্রিকার কপি নিয়ে শহীদুল জহিরের কাছে গেলাম। প্রতিক্রিয়া তিনি পরে জানিয়েছিলেন। গল্পটা ছুঁয়ে গিয়েছিল তাঁকে। একজন যুবক শেফালী নামের একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাবার পর যুবক আর কোন মেয়ের কাছে যায়নি; বিয়েও করেনি। তার ভেতরে অস্বাভাবিকত্ব দেখা দেয় এবং সে সুযোগ পেলেই ছোট পকেট আয়নাতে নিজের চেহারা দেখতে থাকে। আয়না কেন ভাল লেগেছিল শহীদুল জহিরের? সেখানে কি তিনি তাঁর নিজের ছবি দেখতে পেয়েছিলেন?’’[২৫]

উপন্যাসটিতে আরেকটি ছোট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল আজিজ পাঠান। আজিজ পাঠান বিজয় অর্জিত হওয়ার পর চোরের মতো ফিরে আসা বদু মওলানাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল এবং বদু মওলানাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে নতুন করে জীবন শুরু করতে সাহায্য করেছিল। যার ফলে অসংখ্য আবদুল মজিদ, যারা একাত্তরে কেউ মা হারিয়েছে, কেউ বোন হারিয়েছে, কেউ পিতা হারিয়েছে কিংবা কেউ সন্তান হারা হয়েছে; তারা পুনরায় ভিটেমাটি উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছে।

শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' একটা অসহনীয়, ভয়াবহ স্মৃতি বিভ্রান্ত জাতির গল্প। এই স্মৃতি মুক্তিযুদ্ধের,যুদ্ধের ভয়াবহতা ভুলে থাকার এ এক ভয়ানক ক্ষত যেন। উপন্যাসটিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও বর্তমান বাস্তবতার মিশ্রণে এমন এক গল্প শোনান যা পাঠককে চমৎকৃত করে। উপন্যাসটি যেন মুক্তিযুদ্ধের সমষ্টিগত মানুষের দ্রোহ ভাবনার এক ভাষিক ও প্রামাণিক ভাষ্য। রাজাকার, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তা বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী সংযোজন। মুক্তিযুদ্ধে বদু মওলানাদের ভূমিকা, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পুনর্বাসন এবং আস্তে আস্তে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে প্রবেশ করার এক কলঙ্কিত অধ্যায় বাংলাদেশের ইতিহাসে। পঁচাশি সালে লক্ষ্মীবাজারের শ্যামাপ্রসাদ লেনের বাসিন্দা আব্দুল মজিদের পায়ের স্যান্ডেলর ফিতে নবাবপুর রোডে যখন ছিঁড়ে যায়; তখন এবং তার আগে থেকেই আবুল খায়ের কিংবা তার বাবার জোব্বার ভিতর থেকে কাক বের হয় এবং এরা উইপোকা খায়। এই প্রক্রিয়া চলে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকেই। এই বিভ্রম বা এই সিম্বল উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এই অপশক্তি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে শুধু ক্ষমাই পায়নি, রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বদু মওলানদের গায়ে পপলিনের ধূসর আলখাল্লা দেখতে পাওয়া যায়। পপলিনের ধূসর আলখাল্লা বিস্তৃত হতে হতে একদিন সমগ্র বাংলাদেশ গ্রাস করে ফেলে এবং বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। জাদুবাস্তব কথাশিল্পী মার্কেজ নোবেল বক্তৃতায় লাতিন আমেরিকানদের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছিনে —

"....বিশ্বাস করবার অধিকার আমাদের আছে যে এক নতুন ধরণের কল্পরাষ্ট্র গঠনের কাজে লেগে পড়া যায়, এখনও খুব দেরি হয়ে যায়নি। গড়ে উঠবে জীবনের এক নতুন ও চূড়ান্ত কল্পরাষ্ট্র, যেখানে কে কীভাবে মারা যাবে তা অন্যেরা ঠিক করে দেবে না, যেখানে প্রেম সত্য হবে, সম্ভব হবে সুখী হওয়া, আর যেখানে যে-সবজাতির দণ্ডিত হয়ে ছিলো একশো বছরের নিঃসঙ্গতায়, তারা অবশেষেও চিরকালের মতো, দ্বিতীয় সুযোগ পাবে পৃথিবীতে।"[২৩]

কিন্তু শহীদুল জহির বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যতে কোন রকমের আশার আলো দেখেননি, দেখাননি। এখানে আবদুল মজিদদেরই পরাজয় হয়, তারা পলায়নপর এবং বদু মওলানাদের

জয়জয়কার। উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য —

''এ বইটি থেকেই মূলত শহীদুল জহিরকে জাদুবাস্তবতার লেখক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যদিও অস্তিত্ববাদী দর্শনই এ লেখায় অনেক জোরালো ভাবে প্রকাশিত। জাদুবাস্তবতার ফর্মকে নির্ভরকরে অস্তিত্ববাদী সাহিত্য কতটুকু বিকশিত হতে পারে বাংলা সাহিত্যে এরকম একটি প্রাণবন্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত এ বইটির মধ্যে দিয়েই দেখা দিয়েছে।[২৭]

এক প্যারাগ্রাফে রচিত উপন্যাসটি সম্পর্কে ২৮ শে মার্চের দৈনিক 'প্রথম আলো' সাহিত্য সাময়িকীতে শাহাদুজ্জামান লেখেন —

''নব্বইয়ের এক সন্ধ্যায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর টিকাটুলির বাড়িতে আমাকে শহীদুলের এই বইটি এগিয়ে বলেছিলেন, 'পড়ে দেখো'। নেহাত নিম্নমানের ছাপায়, সাদা মলিন প্রচ্ছদে 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' নামের এই চটি বই হাতে নিয়ে ভাবলাম কোন রাজনীতির প্রবন্ধের বই হয়তো-বা। পড়তে গিয়ে স্তম্ভিত হই। জাদুকরী ভাষা আর নির্মাণের সৌকর্যে শহীদুল আমাকে টেনে ঢুকিয়ে ফেলেন তাঁর উপন্যাসের রহস্যময় গুহায়।''[২৮]

উপন্যাসটির নাম পড়ে অনেকেই ভুল করে রাজনৈতিক প্রবন্ধের বই বলেই মনে করতে পারে। উপন্যাসটির এই ধরণের নামকরণের কারণ সম্পর্কে শহীদুল জহির শাহাদুজ্জামানকে বলেছিলেন —

''যখন উপন্যাসটি লিখছি তখন দেশে স্বাধীনতা বিরোধীরা ভয়ংকরভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত ছিলাম, আমি মুক্তিযুদ্ধের সেই ভয়ংকর সময়টির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম, নাম নিয়ে কোন কাব্য আর রস করবার মানসিকতা ছিল না।''[২৯]

উপন্যাসটির প্রধান শক্তি ভাষা নির্মাণ কৌশল। ভাষা নির্মাণ কৌশলের দৌলতে পাঠক এক ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, এক গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খায় এবং চমৎকৃত হয়ে ওঠে। জাদুকারী ভাষার দ্বারা পাঠক কাহিনির গহীনে ডুবে যেতে বাধ্য হয়। এমন ভাষা ব্যবহার, এমন উপস্থাপনা, এমন কৌশলী বর্ণনা বা শহীদুল জহিরের একান্তই নিজস্ব এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তা বিরল। শহীদুল জহির বাংলাদেশের জাতীয় জীবন প্রবাহের সঙ্গে জড়িত লোকভাবনা ও লোকবিশ্বাসকে ভাষাবুননের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। ফলে তৈরি হয়েছে নতুন এবং এক স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী। তিনি কোনো অবিশ্বাস্য বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে একাধিক বার 'হয়তো' শব্দের ব্যবহার করেছেন। কাহিনি বর্ণনায় তিনি জাদুবাস্তবধর্মী বয়নকৌশলটিকে প্রয়োগ করেছেন। সেজন্য তাঁকে 'বাংলাদেশের মার্কেজ' বলা হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র :

১) সেন নবেন্দু (সম্পা); পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা (রবিন পাল, জাদু বাস্তবতা বাস্তবতার ভিন্ন স্বর), রত্নাবলী, কলকাতা ২০০৯, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ২০৩।

২) তদেব পৃষ্ঠা - ২০৫।
৩) Carpentier Alejo; On the Marvelous Real in America, Magical Realism, Ed-zamora and Faris, Montevideo, Area, 1967, P-85-86.
৪) Margaret Drabble (Ed)/ The Oxford Companion to English Literature (3rd Impression, Great Britain, 1997, P-616.
৫) হক হাসান আজিজুল; কথাসাহিত্যের কথকতা; সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৪, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ১১৫।
৬) ভট্টাচার্য তপোধীর; উপন্যাসের প্রতিবেদন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ২০০৫, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৩৬-৩৯।
৭) শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর (সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় শালুকবিশেষ সংখ্যা শহীদুল জহির, বর্ষ নয়, সংখ্যা ১০ (সম্পাঃ ওবায়েদ আকাশ); অক্ষর ঢাকা, ২০০৮, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-১৯৩।
৮) দেবাশিস দত্ত; গাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেস (কবিতীর্থ; সম্পাদক-উৎপল ভট্টাচার্য;কলকাতা, ২০১৫), প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৩৪৮।
৯) নবেন্দু সেন (সম্পা); পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা (রবিন পাল; জাদু বাস্তবতা বাস্তবতার ভিন্ন স্বর); রত্নাবলী, কোলকাতা, ২০০৯, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ২০৮।
১০) তপোধীর ভট্টাচার্য; উপন্যাসের প্রতিবেদন; বঙ্গীয়-সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ৩৬।
১১) Cuddon J.A. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory; penguin, London, 1999, P - 488.
১২) মুখোপাধ্যায় সৌগত; ম্যাজিক রিয়ালিজম (বুদ্ধিজীবীর নোটবই; সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত; ধ্রুবপদ, বার্ষিক সঙ্কলন-৪, কৃষ্ণনগর, ২০০০, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ২২০)
১৩) সেন নবেন্দু (সম্পা); পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা (রবিন পাল; জাদু বাস্তবতা বাস্তবতার ভিন্ন স্বর); রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৯, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা - ২০৮।
১৪) শহীদুল জহির, জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (সম্পাঃ রশীদ মোহাম্মদ আবদুর; শহীদুল জহির সমগ্র) পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ২০১৩, পৃষ্ঠা ২৯৭।
১৫) হক হাসান আজিজুল; সোনামোড়া কথাশিল্পী শহীদুল জহির; 'শালুক' বিশেষ সংখ্যা শহীদুলজহির, বর্ষ নয়, সংখ্যা দশ, (সম্পা; ওবায়েদ আকাশ)' অক্ষর, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা - ১৩।
১৬) শহীদুলজহির; জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (সম্পাঃ রশীদ মোহাম্মদ আবদুর; শহীদুল জহির সমগ্র) পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ২৯৮।
১৭) তবেদ, পৃষ্ঠা - ২৯৮-২৯৯
১৮) তবেদ, পৃষ্ঠা - ২৯৯
১৯) তবেদ, পৃষ্ঠা - ৩০৩
২০) তবেদ, পৃষ্ঠা - ৩০৫

২১) তবেদ, পৃষ্ঠা - ৩৩৬

২২) হামিদ কায়সার; শহীদুল জহিরের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা; পৃষ্ঠা ৮৯৭ (শহীদুল জহির সমগ্র)।

২৩) শহীদুল জহির; জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (সম্পা রশীদ মোহাম্মদ আবদুর; শহীদুল জহির সমগ্র)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ৩৩৬।

২৪) রাশিদা সুলতানা : শহীদুল জহিরের সাথে আর দেখা হল না; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা ২০১০, পৃষ্ঠা - ৫১৪।

২৫) ফয়জুল ইসলাম : আমাদের বন্ধু শহীদুল জাহির; পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১০, পৃষ্ঠা - ২৫১।

২৬) মার্কজের নোবেল বক্তৃতা (শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ); বিজ্ঞাপনপর্ব মার্কেজ বিশেষ সংখ্যা : কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা - ১৭।

২৭) ইমতিয়ার শামীম : সেদিন হঠাৎ তুষার ঝরেছিল; শালুক, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা - ৪১।

২৮) শাহাদুজ্জামান : থেমে গেল দক্ষিণ মৈশুন্দি আর ভূতের গলির গল্প; শালুক ঢাকা ২০০৮, পৃষ্ঠা - ৬২।

২৯) তবেদ, পৃষ্ঠা - ৬২।

প্রজ্ঞা বিকাশ প্রকাশিত

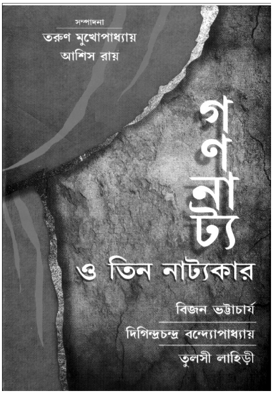

গণনাট্য ও তিন নাট্যকার
সম্পাদনা
তরুণ মুখোপাধ্যায়
আশিস রায়
মূল্য : ৮০ টাকা

বাংলা নাট্যধারায়, গণনাট্য এক অবিস্মরণীয় নাটক ও নাট্যপ্রযোজনা। যা চারের দশকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আলোড়ন এনে দিয়েছিল। বাংলা নাট্য-আন্দোলনে নতুন রক্ত সঞ্চার করেছিল। যে-প্রবাহের অভিঘাতে আমরা পেয়েছি নবনাট্য, সৎনাট্য, পিপল্‌স্ থিয়েটার, থার্ড থিয়েটার ইত্যাদি নতুন ভাবনার নাটক। সেই গণনাট্য এবং নবনাট্যের অগ্রণী তিনজন নাট্যব্যক্তিত্ব - বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী। যাঁদের নাটক, নাট্যভাবনা নিয়ে কিছু আলোচনা, গবেষণা স্বতন্ত্রভাবে হয়েছে, হবে। তবু এক মলাটে তিন নাট্যকারকে বেঁধে ফেলে প্রায় নখদর্পণে দেখে নেওয়ার প্রচেষ্টা সম্ভবত এটাই প্রথম। নাট্যপ্রেমী যেসব পাঠক ও পাঠার্থী বিস্তৃত পড়ার অবকাশ পান না, তাঁরা এই সংকলন পাঠে সমৃদ্ধ হবেন, আশা রাখি।

ঈশ্বরদর্শন, মায়া, তন্ত্র ও 'অন্তর্জলী যাত্রা'

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়*

অন্তর্জলী যাত্রা'র অন্তিম বাক্য 'কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল' এবং কথামুখ অংশে 'এই গল্প সেই গল্প ঈশ্বর দর্শন যাত্রার গল্প'র মাঝখানে অন্তর্জলী যাত্রা'র ঠাসবুনুনি শিল্পরূপ পাঠককে বিহ্বল করে, হতচকিত করে, মুগ্ধ করে এবং বিভ্রান্তও করে। ঠিক ততটাই বাধ্য করে, লেখকের প্রবণতা স্রোতে ভেসে যেতে। লেখক যেন পাঠকের চোখে কাপড় বেঁধে দিয়ে পার হতে বলছেন 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বন্ধুর পথ, লেখকেরই হাত ধরে। চারদিকে অন্ধকার নির্মাণ করে 'আলো **ক্রমে** আসিতেছে'র আশ্বাস দিয়ে তমসা অতিক্রমণের সাহসও জোগাচ্ছেন — আমরাও ক্রমে 'মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ'র ভরসায় বুঝতে পারছি 'আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্ব্বার আমরা প্রাকৃতজনেরা, পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব।' কারণ '**ক্রমে** আলো আসিতেছে'। এক আদিমতার উন্মোচন করে ক্রমে ঘোর আদিম মায়ার দিকে নিয়ে যাওয়ার লেখক প্রবণতাটি স্পষ্ট প্রথম অনুচ্ছেদেই। উপন্যাসটির আকৃতির মধ্যেও লেখকের প্রবণতা আরো স্পষ্ট। গীতার মত সোনালি অক্ষরে মুদ্রিত এবং সামান্য একটু আলপনা, সারা জমিটাই লাল, রক্তিম — উপন্যাসটিকে গীতাজ্ঞানে পাঠ করতে বলার স্পষ্ট ইশারা — কারণ **আমাদের** দেশ এখনও অমরতাকে স্পর্শ করে তাই 'সকলেই আমাদের গল্প বুঝিবেন'। লেখক জেনেবুঝেই বহুবচন ব্যবহার করছেন, অর্থাৎ এ গল্প সকলের বোঝা উচিত, সকলেরই এবং সাবধানও করে দিচ্ছেন সাথে সাথে, 'ভগবতী-তনু লাভ না হলে ঈশ্বর দর্শন হয় না'। তাহলে যাদের 'ভগবতী-তনু' লাভ হয়নি তাদের 'অন্তর্জলী যাত্রা' পাঠে বিরত থাকা উচিত নাকি 'ভগবতী-তনু' লাভের সহজিয়া মার্গের কথা এই উপন্যাস নামক গ্রন্থটি? ভক্ত-কমলকুমার প্রণাম জানাচ্ছেন তাহলে কোন পাঠককে? নাকি পায়ে পড়ে আপামর পাঠককেও, যাঁরা 'ভগবতী-তনু' লাভ করেন নি, করবার গা-গোছও যাঁদের নেই তাঁদেরকেও বলছেন 'গল্প বুঝিবেন'। পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় এই জাতীয় একটি কথামুখ দেওয়া কতটা সঙ্গত হয়েছে, শিল্পগত-ভাবেও তা কতটা সঠিক, ভেবে দেখার। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, কমলকুমার পাঠকের স্বাধিকারে কোন উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করছেন, বিনীত বিনম্র নিবেদন হলেও তা কি পাঠককে বিভ্রান্ত করছে না? পাঠকের পাঠ-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লেখক কমলকুমার কি দ্বিধাগ্রস্ত?

পাঠক বলতেও কমলকুমার ঠিক সেই সময় কাদের বুঝছেন, সে সময় তাঁর পাঠক সংখ্যাই বা কত? একেবারে নতুন লেখক, মাত্র ৫-৬ টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে ততদিনে,

---

*প্রাবন্ধিক ও কথা সাহিত্যিক।

এমন লেখকের পাঠক সংখ্যা অনির্ণেয় একটি সংখ্যা—তা শূন্যও হতে পারে, এক'শ-ও হতে পারে — (কমলকুমার হয়ত একশ'ই ধরেছিলেন; 'নহবৎ' পত্রিকার পাতা থেকে একশটি খণ্ড সেলাই করে নিলেও একশটির অনেক কম খণ্ড তিনি বিলিয়েছিলেন।) ভক্ত-অনুগত, বন্ধু-বান্ধবরাই এই পর্যায়ে পাঠক - সমালোচক — কমলকুমারের লক্ষ্য তবে কি তাঁরাই?

'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশ পেলে সমকালীন লেখক শিবির কমলকুমারোচিত বলে মজা পেয়েছিলেন, ম্লেচ্ছ মানুষটির হঠাৎ ধার্মিক হয়ে ওঠার মধ্যে খোরাক পেয়েছিলেন রঙ্গ-রসিকতার। তখনো 'অন্তর্জলী যাত্রা' কথামুখ-হীন 'নহবৎ' পত্রিকার দু-মলাট থেকে ছিঁড়ে নেওয়া একশ খণ্ড সেলাই করা পাতা, বিতরণের জন্য। কথামুখসহ বই বেরলে রঙ্গ-রসিকতার মাত্রা দশগুণ বেড়ে যায়। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র পাঠ প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন: ''কমলবাবু আলোচনার কেন্দ্রে আসতে চাইছিলেন। 'অন্তর্জলী যাত্রা' রচনার পেছনে এমন মানসিকতা কাজ করেছিল বলে আমার তখন মনে হয়েছিল।" এখনো তা মনে করেন কিনা-র জবাবে সত্যজিৎ মন্তব্যটি হল, ''না। কমলবাবু বাংলার রসে জারিত হয়ে ফিকশনটি লিখেছিলেন। বই আকারে যখন 'অন্তর্জলী যাত্রা' বেরল, কভার আর প্রিফেস দেখে মনে হল কমলবাবু মস্করা করছেন আমাদের সঙ্গে। কিন্তু এর টেক্সচার, সময়টা উপস্থাপনের আর্ট, ওইসব— ঈশ্বর ব্যাপারটাকে আরোপিত মনে হবে। কমলবাবু ওটাকেই মূল করতে চাইছেন..."। অশোক মিত্র, আই সি এস ঠারেঠোরে এই জাতীয় কথাই বলেছিলেন। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''কমলবাবু নিজের ইমেজটাকে ভাঙতে চাইছিলেন, — ভাষায়, বিষয়ে....ভাঙনের প্রস্তুতিটা চলছিল চিঠিপত্রের ভেতর।...তাঁর গল্পের ভাষা তো চলিত, হঠাৎ করে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় সাধু....হঠাৎ হল? চিঠির ভাষা সাধু গদ্যে, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র অনেক আগে থেকেই চিঠির সাধুগদ্য পড়ে মজা লাগত। আসলে উনি তখন চিঠির পাতায় মকসো করছেন, পথ খুঁজছেন...." আর রামকৃষ্ণ — মাধব? ঈশ্বরদর্শন ভগবতী তনু? ''কমলবাবু ভগবতী তনু লাভ করেছিলেন। এই সময় তন্ত্রসাধনায় মেতে ছিলেন; ছবিতে, স্কেচে...অন্তর্জলী যাত্রা'য় তার কথা আছে তো। ওসব বাদ দিয়েও ত বইটা পড়া যায়। যায় না?" অর্থাৎ ভগবতী তনু লাভ না করলেও 'অন্তর্জলী যাত্রা'র পাঠে অসুবিধা হবার কথা নয়। তবুও ত প্রশ্ন ওঠে, ওই কথামুখটিকে গ্রাহ্যের মধ্যে না ধরে 'অন্তর্জলী যাত্রা'র রসগ্রহণে কি কোথাও অসুবিধে হবে, নাকি কথামুখটিকে ধরেই 'অন্তর্জলী যাত্রা পথে যেতে হবে?

পাঠক হিসেবে বলা যেতে পারে ওই কথামুখ অংশটি আমাদের বেশ বিব্রত করে, বিভ্রান্তও করে। 'অন্তর্জলী যাত্রা' তুলনামূলকভাবে কমলকুমারের অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে বেশি পরিচিত, বহু পঠিত — এর সরল ভাষা-কাঠামোর জন্য। খানিকটা বঙ্কিমী ভাষাভঙ্গির ওপর আধুনিকতার পরত টেনে মাঝেমধ্যে দেশাড়ি শব্দর চুমকি বিছিয়ে দিলেও বেশ

সহজবোধ্য এর ভাষা। সংলাপে ২৪ পরগণার কথ্যভাষা — পাঠককে খুব বেশি অসুবিধায় ফেলে না। ক্ষয়ে যাওয়া সময় এবং তার অনিবার্য পতন অসাধারণ প্রগলভ ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র ভাষাভঙ্গিতে। ভাষার শিল্পসংহতি এই উপন্যাসে বেশ শিথিল। ‘পিঞ্জরে বসিয়া শুক’ উপন্যাসের ভাষা-ঐশ্বর্যের কাছে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র ভাষা খুবই দরিদ্র। উপন্যাসের ভাষা শিথিলতা উপন্যাস-শিল্পের চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ছোটগল্প লিখলে তার ভাষা তার উপন্যাসের চেয়ে আরও গতিশীল হতো কি না তা জানার উপায় নেই, কিন্তু তিনিই বাংলা উপন্যাসে সবচেয়ে টানটান গতিময় উপন্যাস-ভাষার লেখক। বঙ্কিমের ভাষাবৈশিষ্ট্যর উপর ভিত্তি করে উপস্থাপনের সারল্যে, প্রতীক বৈপরীত্যের অপূর্ব ব্যবহারে, কথ্য সংলাপের সাহসী প্রয়োগে, সংস্কৃত অসংস্কৃত শব্দর পাশাপাশি প্রয়োগে ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ এক মহান সৃষ্টি—এমনকী বৈজুনাথ, শ্মশানের মহাটোলে শিক্ষিত চণ্ডাল রামপ্রসাদী গান গায়, ‘বিদ্যাসুন্দর’ও আওড়ায়, রামকৃষ্ণের বাণীও বলে কখনো আবেগে, কখনও শ্লেষে, ব্যাঙ্গে, খুশিতেও; তান্ত্রিকের মত শব-সাধনাও করে — সবই ঠিক। পাঠকের মনে প্রশ্নও জাগত না বৈজুর স্বশিক্ষার ব্যাপ্তিতে কতটা বৈজু তার স্বাভাবিকতায়, কতটা আরোপন ঘটেছে তার ওপর। কোন্ সময়ের কোন্ সমাজের মুখ সে, কিংবা কোন্ মুখোশ খোলার স্বেচ্ছাদায়িত্বে সে নিয়োজিত সবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার এই উপন্যাসে — তবুও সমস্যাটা তৈরি করে ওই কথামুখ। তবে কি কমলকুমার জেনেবুঝেই বিভ্রান্তির বলয় নির্মাণ করছেন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসে?

‘অন্তর্জলী যাত্রা’ উপন্যাসের পূর্বে কমলকুমার মোট আটটি উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছিলেন— তার মধ্যে পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয় ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ প্রকাশের পূর্বে, পরে তিনটি। চূড়ান্ত ও খসড়া পাণ্ডুলিপি পাঠে দেখা গেছে গল্পগুলির বিষয় সাজুজ্যে একটি সূত্র উঠে আসে, কমলকুমার একটি বক্তব্যে থিতু — তা হল প্রতিবাদ। প্রতিবাদের ধরণ তাঁর সমকালীন লেখকদের সঙ্গে এক নয়, তিনি তাঁর মত করে, প্রতিবাদটাকে জারি রেখেছিলেন অনুভূত সমস্যার বিরুদ্ধে। তাঁর একেবারে প্রথম দিকের গল্পেও (মধু, প্রিন্সেস) প্রতিবাদ আছে, তবে তা খানিকটা আবেগ তাড়িত। পরবর্তী গল্পে প্রতিবাদ, আবেগ, ভাষা সবেতেই তিনি সংহত, সংযত। সমকালীন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনা পাঠে তিনি স্থির করে নিতে পারছেন আপন অবস্থান। কিন্তু তা যে যথেষ্ট নয়, ভাষার দিকটা বাদ দিলে বিষয়গতভাবে সব গল্পগুলিতেই সমকালীন গল্পধারার বিশ্বাস ও ভাবনারই অনুবর্তন কমলকুমার তা অনুভব করতে পেরেছিলেন তাঁর আড্ডার বন্ধুদের প্রতিক্রিয়ায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ‘পথের পাঁচালী’ চলচ্চিত্রের সাফল্য। দিশেহারা কমলকুমার দিশা পেয়েছিলেন জনগণনা বিভাগের গ্রাম পরিক্রমার কাজটির মাধ্যমে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনগণনা-পূর্ব দেশ দেখার অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে আউল-বাউলদের সঙ্গে ঘোরাফেরা। বিচিত্র বাংলার বিচিত্র রূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করলেন স্বকর্ণে স্বচক্ষে, অনুভব করলেন স্বহৃদয়ে। ‘পটকথা’ রচনায় এমনই

এক গা ছমছমে অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, পটশিল্পী বাইরী দাসের অনুভবে : ''আমরা তো গো সবাই মড়া কোলে ভাসছি। যে যার মড়া লিয়ে, বেজার লেই, তাই লয়?'' এ নব যৌবনে মড়া নিয়ে জলে ভাসার মধ্যে আছে পুনর্জন্মের প্রতিজ্ঞা। পুনরায় প্রাণ পাওয়ার তেজ ও ধ্যান। বাইরীদাসের উপলব্ধ অভিজ্ঞতায় কমলকুমার অনুভব করলেন প্রকৃত বাংলাদেশ বিলুপ্তির পথে। লুপ্ত হতে থাকা বঙ্গদেশের ভেতর হাতড়ে তিনি খুঁজে পেলেন গুপ্তধন।

গুপ্তধনের আর একটি ভাণ্ডার খুঁজে পেলেন আউল-বাউল তন্ত্রসাধনার ভেতর। লালসা রসনা অবধুতী — তিন হটযোগ, তার যাচাই-এর জন্য পঞ্চকুল পন্থা—ডোম্বী শুণ্ডিনী, রজকী, চণ্ডালী, ব্রাহ্মণী, । স্কন্ধক পঞ্চভূতে গঠিত মনুষ্যদেহের সাধনামার্গ-এ সমগ্র বঙ্গদেশ জারিত। বর্তমানের ভাষ্যে অতীতকে ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা তাই কমলকুমারের সমগ্র সাহিত্যে।

কমলকুমার বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন সতীদাহ, পটভূমি নিলেন গঙ্গার তরঙ্গপ্রবাহ, তাই বা কেন, গঙ্গাতরঙ্গের ওপরই যেন ভাসমান উপন্যাসে বর্ণিত বিষয়-আশয়; গঙ্গা-তরঙ্গে ভেসে যাওয়া পঞ্চমুণ্ডি, তার ওপর গর্বিত হঠযোগ-তান্ত্রিক বৈজু প্রথমে চণ্ডালী কৌলমার্গ পরে ব্রাহ্মণী কৌলমার্গে স্কন্ধক পঞ্চভূতে গঠিত মনুষ্যদেহ, আর টলোমলো স্থবির ব্রাহ্মণ্যসমাজ, সতীদাহের আয়োজন — কেবল চাঁদ লাল হবার অপেক্ষায়, কালস্রোত বেয়ে পতিত হবে মহাকালের অতলান্তে। তারপর নবজন্ম। গঙ্গাকে কমলকুমার দেখতে চেয়েছেন সেই কালস্রোত হিসাবে যা অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারা, শুধু বয়েই যাচ্ছে না বিবৃত করছে অতীতকে, ভাষ্য পাঠ করে চলেছে বর্তমানের, ভবিষ্যৎ চাপা স্বরে কথা বলে চলেছে — কমলকুমার একেই বলেছেন 'মায়া', 'ফলে কোথাও এখনও মায়া রহিয়া গেল'। কারণ ''সমস্তই প্রবহমান কালচক্রে ঘূর্ণ্যমান কালচক্রই সর্বজ্ঞ এবং সকল বুদ্ধের জন্মদাতা। কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জন্মক্রিয়া সফল করে। কালচক্রযানী কালের ঊর্দ্ধে যেতে চান। কার্যপরম্পরা বা গতির প্রবহমানতা সাক্ষাতেই কাল নির্ণিত হয়।'' গতির প্রবহমানতায় মায়া বা লীলার নিরন্তর প্রকাশ, ক্রম-প্রকাশ। গঙ্গাই তাই এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা-খলনায়িকা—তাকে ঘিরেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার উদ্ভব আর তাকে ঘিরেই তার বিলয়। সৃষ্টি স্থিতি লয়ের বিরাম নেই, বিনাশ নেই, বেজার নেই। কেবল পুনর্জন্মের জন্য মড়া নিয়ে ভেসে যাওয়া।

উপন্যাসটির গঠনের মধ্যেও অনিঃশেষ জলপ্রবাহ — একটি মাত্র পরিচ্ছেদে শুরু আর শেষ। অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারার মতন উদার বিশাল প্রবাহিনী গঙ্গার জলচ্ছল ধ্বনি কত ঢেউ ত হারিয়ে যায় কালগর্ভে, সেই কালগর্ভ থেকে কমলকুমার একটি চলমান স্রোতকে ক্ষণিকের জন্য নিয়ে এসে স্রোতের প্রকৃতিতে স্রোতেই মিলিয়ে দিয়েছেন। খণ্ড সময়ের জলোচ্ছ্বাসে অশ্রুপাত করছে প্রাকৃত চোখ, সে চোখও পবিত্র, সে চোখ 'সিঁদুর অঙ্কিত', সে চোখ

'মিলন অভিলাষিণী নববধূর জীবন নিজস্ব পথে প্রবাহিত' করার ইশারায় করুণ, করুণ বলেই অশ্রুপাতক্ষম, তাই এ জল লোনা। গীতায় মৃত্যুকে বিনাশ বলেনি, বলেছে দেহবদল; তন্ত্রে, কালচক্র প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জন্মক্রিয়া সফল করে বলেছে। — মৃত্যুর এই মহত্ত্ব ভারতীয় ধর্মপ্রাণ জীবনযাপনের বহু গভীরে। আজও আধুনিক ভারতবর্ষে, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠবাক্য আত্মার শান্তি কামনা — অবিনাশী আত্মা অন্য দেহে কিংবা স্বর্গে শান্তি লাভ করুক এই কামনা চির শাশ্বত। গঙ্গাতীরে সৎকার, সৎকার সম্ভব না হলে গঙ্গায় অস্থিবিসর্জন — গঙ্গালাভেরই কামনা। আবহমানের গঙ্গালাভের এই গল্পটিকে কমলকুমার 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় তুলে ধরলেন আধুনিক মন নিয়ে। বিচার বিশ্লেষণ করে স্থাপন করলেন আর্য সভ্যতার পাশে অনার্য তন্ত্রচর্চার জোর। তিনি দেখে নিতে চাইলেন স্খলন ও পচনটার স্বরূপ। অন্তর্গত সত্তার গভীরে বহমান ধর্মবোধ ও ধর্মভীরুতাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ সচেতনে লুকিয়ে রেখে যুক্তিবাদের যে রামধনু রঙিন বাস্তবতার দিগন্ত রচনা করেন, অন্তত কমলকুমার তাঁর সমকালীন কবি-সাহিত্যিক - বুদ্ধিজীবী - তাত্ত্বিকদের মধ্যে লক্ষ্য করছিলেন — তাকে তিনি ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু মনে করেননি। কমলকুমার ভণ্ডামির ওপর আঘাত হানলেন নিজের প্রতিষ্ঠিত ইমেজকে ভেঙে দিয়ে, একটু ঘুরপথে, একটু রহস্য সৃষ্টি করে। 'অন্তর্জলী যাত্রা'-পরবর্তী লেখায় 'মাধব' 'রামকৃষ্ণ', 'তারা ব্রহ্মময়ী' দিয়ে আরম্ভের সূচনা প্রকৃত প্রস্তাবে 'অন্তর্জলী যাত্রা' থেকেই — সমস্ত রচনার কথামুখ ওই 'মাধব-রামকৃষ্ণ' বন্দনা। কেউ কেউ একে 'চিমটি কাটা' বলে মনে করেছেন, আসলে তা ছিল ধাক্কা, সচেতন ধাক্কা, প্রবল বিক্রমপূর্ণ ধাক্কা। ভণ্ডামি দিয়েই ভণ্ডামিকে আঘাত।

জনগণনা বিভাগে কাজ করতে গিয়ে সরকারি প্রয়োজনকে ছাপিয়ে জ্ঞানপিপাসু মানুষটি ঢুকে গেছলেন বাংলার গহন-গভীরে। 'পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ, বাণিজ্য, হস্ত ও নানাবিধ ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্বন্ধে কমলকুমার ও চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রামাণ্য দলিল ও তথ্য উদ্ধার করেন।' (অশোক মিত্র/তিন কুড়ি দশ) সেই দলিলগুলি নিয়ে রচিত রচনার বিষয় ছিল 'আদিম লৌকিক প্রাথমিক ও দরবারি শিল্প ও শিল্প বিষয়ক।' গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে থাকা এই সব বিষয় ও বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানকে নানা কার্ডে ও ডাইরিতে লিখে রাখতেন কমলকুমার — তার মধ্যে সতীদাহ ও অন্ত্যেষ্টি রীতি - সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যও ছিল। তথ্যের সাথে নিজস্ব ভাবনার রসায়নে কমলকুমার একটা বিশ্বাসে এসে থিতু হতেন সেই বিশ্বাস থেকেই পরে পরে 'অন্তর্জলী যাত্রা'র জন্ম। নেপথ্য-প্রস্তুতির ছোট্ট একটু নমুনা দেওয়া যেতে পারে, যা একটি কার্ডে লেখা, যা পরবর্তীকালে 'ফাৎনা মনস্কতা' প্রবন্ধে সংযুক্ত হয়েচে, ''লালবিহারী দে তাঁহার গোবিন্দ সামন্ত - তে সতীদাহের বর্ণনা চমৎকার দিয়াছেন। মৃত্যুকে গ্রহণ! প্রস্তুত মৃত্যুর সময় এক বিকট দশনা দৃশ্য ঘোর কৃষ্ণবর্ণা রমণী দেখিতেন, অথচ বা কতো আ! কি আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু যে তারিখ আমাদের জানা তাহা ঠিক নহে; এ বিষয়ে আমি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ বাবুকে অনুরোধ করি, তিনি

যদি দয়া করিয়া এইগুলি দেখেন, যে গেজেটিয়ার ও ইংলিশ করসপনডেন্স যা আমি শ্রী অশোক মিত্র মহাশয়ের, ইনি আই সি এস, নিকট কাজ করিতাম — যাহার দয়াতে আজও সসম্মানে আছি — তখন যাহা আমাকে পড়িতে বলেন; ঐ গেজেটিয়ার মধ্যে ২৪ পরগণার যে খানি তাহাতে আমার নোট সকল খোয়া গিয়াছে, যতদূর তারিখ মনে পড়ে, ১৮৩৮ অবধি পুলিশ সাক্ষাতে সতীদাহ হইয়াছে; পরম্পরা একজনের নাম ব্রহ্মময়ী; এবং ইন্ডিয়ান এন্টিকুয়ারিতে ১৮৭২-৭৫ মধ্যে, দক্ষিণ ভারতে সতীদাহ ক্ষেত্রে দুটি স্তম্ভের ছবি আছে। সতীদাহে প্রমাণিত যে আমরা এক জঘণ্য পর্য্যায়ের" আলোকিত দুনিয়ার কাছে সতীদাহ-এর ব্যাখ্যা পৌঁছে দিলেন দোভাষী কেনসিংটৌনিয়ান' বাবুরা যাঁরা 'ধর্ম্ম কিছু জ্ঞাত না হইয়া' পৌত্তোলিকতা, আচার বিধি, শাস্ত্রকে নিজে নিজের জ্ঞানমত চাপিয়ে দিলেন নব্যবঙ্গদের ওপর, ফিরিঙ্গি ঐতিহাসিকদের ওপর। তাঁদের ভাবনাই হাতফেরতা হয়ে আজ এই সমকালীনেও ছদ্ম-ঔপনিবেশিকতার রূপ ধরে বয়ে যাচ্ছে। কমলকুমারের প্রতিবাদ এই ছদ্ম-ধারণার বিরুদ্ধে। 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় প্রাচীন এবং পরিবর্তিত নতুন ও তার যুক্তিবাদকে যুযুধান করেছেন যশোবতী-বৈজু বনাম ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এপিসোডে। তাঁর সমস্ত লক্ষ এই দ্বন্দ্বে; তাই দ্বন্দ্বভূমিটি নির্মাণে তিনি লোকেসান হিসেবে বেছে নেন নির্জন গঙ্গা, গঙ্গাতীরবর্তী শ্মশানভূমি।

উপন্যাসটির সূত্রপাতেই আদিমতা, তার বাকল খসে পড়ছে কালের নিয়মে। পাঠক দাঁড়িয়ে বর্তমানে অথচ লেখক তাঁকে নিয়ে যান বহু বছর আগের এক ভূখণ্ডে, সহস্র বছর অতীতের জীবনচর্যায় — যে সমাজের ওপরে স্বর্গ, সম্মুখে বহমান মর্ত্য, গঙ্গা যেন স্বয়ং স্বর্গের সিঁড়ি, তার গভীরে লুক্কায়িত নরক — স্বর্গ-নরকের মাঝখানে মর্ত্যভূমে শায়িত অন্তর্জলী-নিমিত্ত সীতারাম চট্টোপাধ্যায়। কিছু পরে তার সামনে আনীত হবে সালঙ্কারা কন্যা, মৃত্যু-মুহূর্তেও কুলীন সীতারাম কুলরক্ষা করে যাবেন এবং নিয়তি-নিয়ন্ত্রিতভাবে তিনি দোসর নিয়ে যাবেন স্বর্গে। মাটিতে সীতারামের ভাগ্য লতিয়ে আছে গণনার ছকে। কিন্তু 'ক্রমে আলো আসিতেছে' এবং 'আলো ক্রমে আসিতেছে' — সমাজের কেউ কেউ ফিরিঙ্গি ভাষা শিখছে, নিজ স্বার্থে প্রশাসনকে ব্যবহারের ফন্দিফিকিরও রপ্ত করেছে, সতীদাহ-নিষিদ্ধ আইনকে কলা দেখাতেও শিখেছে, সতীদাহের মধ্যে পুণ্য 'নাই' কন্যার পিতাও বুঝেছে — তবু অস্বীকারের মধ্যে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে — অর্থাৎ অন্ধকার যুগ শেষ হয়ে এক নব্য অন্ধকার জাঁকিয়ে বসছে। একটুই শুধু আশার মত আলো 'আসিতেছে' ব্রাহ্মণ্যবাদের ভেতরই যুক্তিবাদ মাথা তুলছে — ব্রাহ্মণদের ভেতর থেকেও, অব্রাহ্মণদের ভেতর থেকেও। শাস্ত্রের শস্ত্রেই ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে শাস্ত্রের বজ্রবন্ধন। এবং তা সম্ভব হচ্ছে শাস্ত্রের শিথিলতায়, শাস্ত্র রক্ষকদের দুর্বলতায় কিংবা বলা ভাল কালচক্রে ঘূর্ণ্যমানতা জনিত। বৈজু চণ্ডালের প্রয়োজনটা পড়ে ঠিক এখানেই। আচরিত ধর্ম ও বিশ্বাসের ধর্ম-র দ্বন্দ্বটি রচিত হয় বৈজুকে দিয়ে। 'রাত্রের অন্ধকার দিয়া তন্তু প্রস্তুত করে' যুক্তি যেখানে 'কুসুমাদপি

কোমল, অবশ' সেই বিশৃঙ্খলায় বৈজু অনুভব করে ''এ বিশ্ব সংসারের ঊর্দ্ধে, নভে, জ্যোতিমণ্ডলে কোথাও যদি সে পাচন হস্তে স্থিতবান হইতে পারিত, তবে ভালবাসার এই পৃথিবীকে অন্যত্র, আরেক ঘরে লইয়া যাইত; ইহাতে তাহার ঔদ্ধত্য প্রকাশ হইত না এবং নিঃসন্দেহে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেন।'' এক অসম্ভব সম্ভব চিন্তা, বৈজুও বোঝে, বোঝে বলেই সে কেবল ভেতরে ভেতরে ফুঁসে ওঠে। তার সক্রিয়তার জন্য দরকার হয় 'দেহে দেহে কালের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন অসংখ্য ঘুণাক্ষর, হিজিবিজি' একটি শরীর, যে দেহের 'পাপ অথবা পুণ্য কিছুই করিবার যোগ্যতা নাই' এবং একটি নারী, যার কাছে পৃথিবী 'শূন্যতার, সৌন্দর্য্যের, বাস্তবতার আধিভৌতিক সমস্যা' ও নির্জন শ্মশানভূমি। বৈজুর একক সক্রিয়তা, বলা ভাল অতিসক্রিয়তা 'অন্তর্জলী যাত্রা'র আপত্তির চড়া রং—লেখক তাকেই সামনে ঠেলে দেন। ব্রাহ্মণ সমাজের ভেতর থেকে উঠে আসা আপত্তিটাকে লেখক গুরুত্ব দিলেন না, বৈজু উঠে এল প্রধান হয়ে। সমাজটা এতই জীর্ণ, যশোবতী বৈজুর সঙ্গে দেশত্যাগ করলেও ব্রাহ্মণরা অসহায় হয়ে তা কেবল দেখত হয়ত — যশোবতী ত দেশত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিল। সালঙ্কারা যুবতীকে শ্মশানভূমে অরক্ষিত রেখে দেওয়ার মধ্যেও ত ব্রাহ্মণ্যসমাজের অক্ষমতাকে দ্যোতিত করেছেন লেখক। বস্তুতপক্ষে যশোবতীকে রক্ষা করেছে বৈজুর তান্ত্রিক সততা।

জ্যোতিষী অনন্তহরির ভবিতব্য গণনা দিয়েই বৈজুর সঙ্গে স্থবির ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রকৃত সংঘাত শুরু হয়ে গেছে — অসম সংঘাত যদিও, তখনো, তার লাঠির চেয়ে ব্রাহ্মণের খড়মের জোর বেশি — বৈজু জানে তা। তবু সে কটাক্ষ কটূক্তি করে শাস্ত্রকে ধরেই শাস্ত্রের ভেতরই তার বিরোধ জারি রাখে — যদি ব্রাহ্মণেরা ঘা খেয়ে জেগে ওঠে, যদি চোখ ফোটে। চোখ থাকতেও যে অন্ধ তাকে জাগাবে কে, সে জঞ্জাল সাফ করতে মোড় ফেরাতে হবে গঙ্গাকেই, অন্তে তাই হয়েছে, জেগে ওঠা গঙ্গার তোড়ে ঘুনলাগা সমাজ ভেসে গেছে 'মূর্তি ও কাঠামো' সহ। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা লক্ষ্মীনারায়ণও বোঝে ''ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এক এবং ব্রাহ্মণ আর এক, ইহা ভাবিবার মত ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তথাপি কেন যে অতর্কিতে এ হেন শূন্যতা — মীন হইতে মানুষ যাহার আধার মাত্র — সেই শূন্যতা বাক্য দেহ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া উপছাইয়া পড়িয়াছিল; তাহা আংশিকভাবে কল্পনা করিতে পারিলেও লক্ষ্মীনারায়ণ স্বীয় জিহ্বায় অন্য এক স্বাদ পাইবার চেষ্টা করিলেন, এবং অপ্রয়োজনে এদিক-সেদিক চাহিয়া মনে হইল, কোথাও কেহ নাই, ভয়াবহ নির্জ্জনতায় এস্থান পূর্ণ আর এ শ্মশানভূমি আপনার শায়িত ভৈরব রূপ, শবাসন পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্টির সমক্ষে অতিকায় প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান।'' প্রাচীর এবং প্রাচীর ভেঙে ফেলার দ্বন্দ্বটি 'অন্তর্জলী যাত্রা'-য় সর্বত্র—অথচ তারা বড় দুর্বল, কোনো না কোনো দুর্বলতায় ক্ষীণ। শ্মশানভূমেও তারা সবাই আল দেওয়া জমির মত টুকরো টুকরো, জমি ত সব এক — এই সংগঠিত বোধের উন্মেষ ঘটানোই 'অন্তর্জলী যাত্রা' রচনার সময়কার বাংলাদেশের মানসিকতা। এ উপন্যাসে যেন

'তেইশ' গল্পেরই বিস্তার। বৈজু একাই আলমের মত খেপে উঠতে চায়। প্রতিবাদের রকমটাও 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় সবাই অনুভব করছে, এমনকী জ্যোতিষী অনন্তহরি পর্যন্ত, সময় ও সমাজটাকে সবাই প্রত্যাখ্যান করছে কিন্তু তার প্রকাশটা স্বোচ্চার একমাত্র বৈজুর কণ্ঠে। কিন্তু বৈজুও হতাশ, সে জানে তার দৌড়, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সে একেবারে বাইরের লোক; 'একটু উঁচুজাত না হলে শালা আমি লাঠি ঘুরাতাম....', প্রাণে লাগলেও সে অসহায়। শবের পাটছোঁয়া লোকটিও শ্মশাণে সতীদাহের নিমিত্ত 'দোসর' আসছে দেখে 'ওগো খুড়ো গো' বলে কেঁদে ওঠে। দুর্বলেরা, গরিবেরা হুট করতেই কেঁদে ওঠে। 'যেন সত্য-যুগেই আছি' বললেও অনন্তহরিও জানেন, 'সহমরণে যে পুণ্য আছে একথা কেউ বিশ্বাস করে' না, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ যে ঈশ্বরের লিখন এ বিশ্বাসেও চিড় ধরেছে, যশোবতীও গঙ্গাতীরে শায়িত তার হবু স্বামী সীতারামকে দেখে বুঝে যায় সেটি একটি 'গলিত শবমাত্র, যার ওপর শকুন বসিয়া মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহারই পার্শ্বে চক্রাকারে ঘুরিয়া কাক তাহাকে বিরক্ত করে।' বৈধব্য নিয়েই যশোবতীর বিবাহযাত্রা।

সব দিক বিবেচনা করে, সমকালীন রচনা-প্রবণতা দেখে বলা যেতে পারে বৈজু, এমনকী যশোবতী, কবিরাজ বিহারীলাল চরিত্র চিত্রণে কমলকুমার মোটামুটি বামপন্থী আন্দোলন এবং মার্কসবাদ দ্বারাই চালিত, তাঁর মত করে; কিন্তু মূল ভিত্তি সর্বহারার কিছুই হারাবার নেই, শৃঙ্খলটুকু ছাড়াটি। কমলকুমার মার্কস, লেনিন দুই-ই মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন, করেছিলেন বলেই সাহিত্য-শিল্প ও মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক দিকটি নিয়েও সচেতন ছিলেন। 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় তাই একমাত্র বৈজুই প্রলেতারিয়েত তেজে মরীয়া, তার তেজে যশোবতীও বাকিরা স্বপ্ন জগতের বাসিন্দা, স্বীয় স্বীয় 'জিহ্বায় অন্য এক স্বাদ পাইবার' চেষ্টায় পাতি-বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষায় ব্যাপৃত। বৈজু-যশোবতী শৃঙ্খল হারাবার জেদে প্রায় জিতে যাবার মুহূর্তে লেখক প্রতিমা ও কাঠামো সহ তাদের বিসর্জন দেন অন্তিমে। হয়ত এটাই স্বাভাবিক বাংলাদেশের প্রগতিশীল বাম আন্দোলনের বাস্তবতায়। 'তেইশ' গল্পের আলমও জেতেনি। বৈজু ও 'কয়েদখানা'র সাজাদ জিতেও হেরে গেছে।

খাঁটি মার্কসবাদী গল্প লেখা কমলকুমারের পক্ষে সম্ভব ছিল না — কলকাতার আঁতেল সমাজে চলতি হাওয়ার পন্থী হওয়াও তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব — অথচ ভেতরটা জ্বলছে চর্চিত উপলব্ধ তত্ত্বে আর প্রতিবাদে — ফলত তাঁকে একটু আড়াল নিতে হল এবং সে আড়ালটাও মার্কসবাদকে ধরেই। তিনি আবহমানের বাঙালি হিন্দু মানসিকতার দ্বন্দ্ব ও তার প্রকৃতিকে প্রতিস্থাপিত করলেন যশোবতী আর বৈজুর মধ্যে। চরিত্রভ্রষ্ট নখদন্তহীন প্রতিপক্ষের স্বরূপকে খুঁজে নিলেন নিজের ঐতিহ্যে নিজের অনুভবে। ''ঠাকুর (রামকৃষ্ণ) বলিয়াছেন, ঐ তামসিকতার মোড় ফিরাই দাও। হায় তাহাও আজ নাই আমার তেমন কোন পুরুষকে দেখিতে ইচ্ছা হয় যে আমার হইতে অনেক উর্দ্ধে। যে অজামিল যে পুতনা কংস ইহারা কোথায়! সমাজের সৌন্দর্য্য ত গিয়াছে নৈতিকতাও নিশ্চিহ্ন — বস্তু সকলের গুণ এই যে

তাহা ভাঙ্গিলে, তাহার ভাঙ্গা হইতে রূপের কিছু টের পাওয়া যায়...." ভাঙা থেকেও রূপের টের পেতে অজামিলকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার একটা প্রয়াস আছে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য়। এখানেও কমলকুমার এক রহস্য তৈরি করলেন, — অজামিল কে বৈজু, না সমগ্র অথর্ব ব্রাহ্মণ সমাজ? কে কাকে বধ করতে চায়, কে প্রবল? ব্রাহ্মণরা ত যুদ্ধে জিতে ফিরে গেছে যে-যার রাজ্য পাটে; শ্মশানভূমে তবে কার সঙ্গে লড়াই বৈজুর? তার প্রতিপক্ষ তবে ব্রাহ্মণেরা নয়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নয়, কেবলমাত্র যশোবতীর সতী হওয়ার মানসিকতা? যে ভাবে হোক তার তামসিক ভাবনাকে (বৈজুর দৃষ্টিকোণে) হটিয়ে দিয়ে জিতে যাওয়া? বৈজুর দুর্বলতা তার বর্ণ, ব্রাহ্মণদের দুর্বলতা তাদের লালসাপূর্ণ সুযোগ সন্ধানী মনোভাব। আসলে, এ উপন্যাসে অজামিলের ভূমিকাটি পালন করছে সময়, তরঙ্গায়িত গঙ্গা। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সমাজদেহের অনিবার্য অঙ্গচ্যুতি, তার করুণ রূপটি কমলকুমার ফুটিয়ে তোলেন বৈপরীত্য দিয়ে, এমবিগুইটি দিয়ে। বৈজুর গোঁফ চোমরানো গানের বিপরীতে বাসরে যশোবতীর বেহাগ রাগিনী সীতারামের কাছে হয় 'হরিধ্বনি', বিয়ের মালা ছাগলে খায়, সালঙ্কারা কন্যার দলে ঢোকে চিতার কাঠ বয়ে আনা লোক, 'মঙ্গল কাজের সময় চোখের জল ফেলতে নেই' বলে সতী-হতে-যাচ্ছে মেয়েকে সান্ত্বনা, জ্যোতিষির লতিয়ে ওঠা অঙ্কের ছকে জীবন্ত ব্যাঙের লাফিয়ে চলা — এ সবই এক অর্থে প্রতিবাদ। যে-কোনো সৎ লেখকই শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদটা চালিয়ে দেন লেখায়, আর কমলকুমারের সাহিত্য-মানসটাই হল প্রতিবাদী।

কমলকুমার লিখেছেন, "কুমারীরা তাহাদের বরের জন্য আগেভাগে ভেলভেটের পাম্প সুতে সুন্দর নকশা কেয়ারি করিত তাহাতে গোলাপ কখনও সবুজ। তাহারা বরকে গোপনীয় চিঠি দিবার জন্য অনেক দিব্যি ৭৪।। ত বটেই...তাহারা বৈশাখ মাসে বড় সাবধানে শিব গড়িত...শিবলিঙ্গ যাহাতে সুন্দর হয় তাহার জন্য কি নিষ্ঠুর কেন না বেঁকা শিব গড়িলে বেঁকা বর হয়। বর গড়া তাহাদের হাতে ছিল।....দর্শন তো মিথ্যা নহে — তাহাতে আছে লুপ্ত যাহা তাহা অদৃশ্য মাত্র। কোথাও না কোথাও তাহা আছে।" — বাঙালি কুমারীর চিরায়ত বিশ্বাসে ভরপুর যশোবতীর বর বৃদ্ধ সীতারাম স্বভাবতই তার নিজহাতে গড়া, তার অনুতাপ থাকার কথা ত নয়। তার অনুতাপ থাকার কথা ত নয় ক্ষণিক-দাম্পত্যজীবনের জন্য, এমনকী সতী হওয়ার জন্যও — সবই ত প্রবহমান কালচক্রে ঘূর্ণ্যমান, পূর্বোল্লিখিত ভাগ্য। শ্মশানের ধূম সে কারণে সত্যিই যশোবতীকে 'মলিন করিতে পারে নাই' বরং তার 'সর্ব্বদেহে বিদ্যুৎ খেলিতেছিল'। মহামায়ার অংশ যশোবতী 'সাধক রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন', যশোবতী নিজেই। যশোবতী 'লক্ষ্মীমূর্তি' তার একহাতে 'প্রস্ফুটিত পদ্ম' অন্যহাতে 'পঞ্চপল্লব', অন্যহাতে 'বরাভয়'। সে 'চম্পক ঈশ্বরী' — সতীদাহ তার কাছে স্বর্গে যাবার চাবিকাঠি।

যশোবতীর দৈবীভাব হটে যেতে একটু সময় লাগে ব্রাহ্মণদের রচিত 'সত্যযুগ' কলিযুগে ফিরে না আসা পর্যন্ত। যে - যার স্বার্থ চরিতার্থ করে ঘরে ফেরে। সতীদাহের প্রস্তুতি সমাপ্ত

করে 'সাধারণ কথাবার্ত্তায় কলহরত খানকিদের আওয়াজ' তোলা সমাগত ব্রাহ্মণেরা, পিতার সঞ্চিত মোহর-লোভী দুইপুত্র বিদায় নিলে কেবলমাত্র পড়ে থাকে ত্রিতাপহারিনী গঙ্গা আর চিতার ধোওয়া, নরবসারের গন্ধ, ঊর্ধ্বে অম্বর আর নিচে 'পুষ্পের অজ্ঞতা' নিয়ে যশোবতী আর 'কারণ সলিলে একটি ক্ষুদ্র পল্লবিত শাখাবৎ' কিন্তু রূপরসগন্ধের সত্যতা মানিয়া নির্ভীক' বৈজু চণ্ডাল — তারপরই 'অন্তর্জলী যাত্রা'র প্রকৃত আততির নির্মাণ, প্রকৃত 'তামসিকতা' দর্শন। গঙ্গাতীরে রচিত হয় আরোপিত ধর্মের সঙ্গে নতুন ধর্মচেতনার দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বভূমিটি নির্মাণ করতে কমলকুমার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রচনা করেন কৃষ্ণপ্রাণ কথিত 'সত্যযুগ' টিকে, চলচ্চিত্র - অভিজ্ঞ কমলকুমার চলচ্চিত্রীয় ডিটেলে :''বেলাতটে বিবশকারী উদ্বিগ্নতা ক্ষুদ্র একটি জনমণ্ডলী' 'অগণিত বহুর মধ্যে' সীতারাম চট্টোপাধ্যায়, তাঁর 'শিয়রের নিকটে কুলপুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ, কণ্ঠলগ্ন চেলিতে নারায়ণ শিলা, অত্যন্ত সন্তপর্ণে কুশী হইতে গঙ্গাজল (চরণামৃত) বৃদ্ধের ওষ্ঠে ঢালিতেছেন। সীতারামের মস্তক তাঁহারই জৈষ্ঠপুত্র বলরামের ঊরুউপরে ন্যস্ত। দক্ষিণে কনিষ্ঠপুত্র হরেরাম। ইহারা সকলেই বৃদ্ধের আত্মার সদ্‌গতি নিমিত্ত 'গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম' পদটি আবৃত্তি করিতে যত্নবান।

''মধ্যে একপার্শ্বে কবিরাজ বিহারীনাথ হাতের নাড়ী টিপিয়া অনন্য মনে বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া আছেন।...কবিরাজের পিছনেই একজন সর্বাঙ্গ চাদরে আবৃত করিয়া, অথচ মুখটুকু খোলা, দুলিয়া দুলিয়া গীতাপাঠ করিতেছে। লোকটির সম্মুখে পুঁথি, কিন্তু দেখিবার আলো নাই, প্রয়োজনও নাই এ কারণে যে লোকটির গীতা কণ্ঠস্থ। কখনও বা ঘুম বিজড়িত স্বরে শ্লোক পরম্পরা ব্যাখ্যাও শোনা যায়....সীতারাম ও নিকটবর্ত্তী সকলকে পরিক্রমণ করিয়া একটি আধো ঘুমন্ত কীর্ত্তনের দল মণ্ডলাকারে ঘুরিতেছে। দলটি ইহাদের পরিক্রমণ করিতে গঙ্গার উপর দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, যেহেতু সীতারামের পদদ্বয় গঙ্গা স্পর্শ করিয়া আছে। কীর্ত্তনের দল শ্রান্ত, তাহারা উৎসাহহীন, তাহারা ক্ষুধার্ত্ত, তাহারা শিথিল গতিতে মনে হয় যেমন বা পালাইতেছে...।

''এই গোষ্ঠীর কিছু দূরে; জ্যোতিষী অনন্তহরি উবু হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন তাঁহার মন তখন সৌরজগতে বিচরণ করিতেছে, বিরাট অনৈসর্গিক জ্যোতির্মণ্ডলে তিনি যেন হারাইয়া গিয়াছেন।''

অনৈসর্গিক এমন বাতাবরণে 'পুথিগত মস্তক' অনন্তহরি যখন ঘোষণা করেন বৃদ্ধের মৃত্যুর বিলম্ব এবং যাবে 'দোসর' নিয়ে — তারপরই জীর্ণ সেই যুগটি মুখোশ সরিয়ে একে অপরের গা চাটাচাটি করে। কুলরক্ষার তাগিদে সালঙ্কারা কন্যা আনীত হয় শ্মশানভূমে, রচিত হয় বিবাহবাসর, বিবাহের পুঙ্খনাপুঙ্খ আচারবিধি, পাশাপাশি রচিত হয় সহমরণের চিতাও। প্রতিবাদটাও সমান্তরালে চলে, ভেতরে বাইরে — দু দিকেই। কবিরাজ বিহারীনাথ সাধ্যমত প্রতিবাদ জারি রাখে, তুঙ্গে তোলে বৈজু। প্রাথমিকভাবে সে আক্রমণটা শানায় 'পুথিগত মস্তিষ্ক' ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে, হেরে গিয়ে সে চাঁদমারি করে যশোবতীকেই।

বৈজুর যশোবতীকে টার্গেট করার পেছনে মানবিক দিক যতোটা তার চেয়েও বেশি তাকে সাহস জুগিয়েছে সে যুগের সামাজিক স্খলন। যে সমাজ থেকে উঠে এসে যশোবতী পৌঁচেছে সতীদাহের দ্বারপ্রান্তে তার রূপ ত এমনি : ''কলকাতায় কত বাবু ঝিয়ের হাতে জল খাচ্ছে.. পৈতে গলায় লোক পেলে বামুন রাখছে....সে হয়ত আগে রাঁড়ের বামুন ছিল.... লোক, ঝাঁটা মার...ব্রাহ্মণ যা করবে তাই মানতে হবে....নে নে তিনবার শিব শিব বললে অজামিল উদ্ধার হয়.....'' ('সুহাসিনীর পমেটম)। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যার কেচ্ছা প্রকাশ্যে আসছে : ''ঘোমটা তাহার (ঊষার) মাথায় থাকে না, লংঘন করে, জানালায় অসংযত বস্ত্রে দাঁড়ায়.....আপনার যৌবনভরা দেহকে বিবস্ত্র করত শুইয়া থাকে....''(ঐ) ব্রাহ্মণের ঔরষে জাত সন্তান লখাই সমাজে সম্মানের সঙ্গেই ঘোরেফেরে। যশোবতী কি এ সব জানে না? সে - ত সমাজ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়। বালবিধবার শরীরজনিত সমস্যা ও সমাধানের ঘাতঘোঁত তার অজানা থাকার কথা নয়। এর সঙ্গে তার মস্তিষ্কে রয়েছে সমাজ-নির্মিত বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতায় রয়েছে স্বার্থের ঘৃণ্য যোগসাজশ। 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় কমলকুমার এই বুর্জোয়া সমাজকাঠামোটির কথা বলতে ভোলেন নি। লক্ষ্মীনারায়ণ তামা-তুলসী-গঙ্গার কথা তুলে জানায় তার মেয়ে তেমন নয়, অর্থাৎ সম্পত্তির লোভে সে মামলা রুজু করবে না, ব্রাহ্মণের দায় উদ্ধারের জন্য সে কৃতজ্ঞ। ঘোর কলিতে সহমরণে কেউ বিশ্বাস করে না — পুণ্য আছে, অল্পবয়সী বিধবার ভার কেউ নেয় না, এক বেলা খাওয়া, উপোষ, চুল কপচে দেবে তবু সন্দেহ ঘোচে না, থানাদাররা ঘুষ খোর, জ্যোতিষী, পুরোহিতের সতীদাহ হলেই লাভ, 'সকলেই প্রয়োজন বুঝিয়াই বিবাহ করে'। কবিরাজ বিহারীনাথ যেন চ্যালেঞ্জ করেন, সংশয়পূর্ণ তার মন, জ্যোতিষবিচার যে ভ্রান্ত, তা যে স্বার্থপ্রণোদিত তা তিনি জানেন, প্রশ্নও করে বসেন, 'সত্যি কি কন্যার বৈধব্যযোগ আছে? না...', লক্ষ্মীনারায়ণও জানেন এসব, তবু তিনি বাধ্য কন্যা সম্প্রদানে, সতীদাহেও — এ ত কেবল ধর্মের সংকীর্ণতা নয়, অর্থনীতিও জড়িত। অনন্তহরি সমাজ-অর্থনীতির প্রকৃত চেহারাটি টেনে তোলে, 'বলি আপনি (বিহারীনাথ) ত জ্ঞানী সাজ্‌ছেন, কেন আপনারা বংশ পরম্পরায় ওষুধ এত্যাদি দেন না....' 'ওষুধ' অর্থাৎ গর্ভপাতের ব্যবস্থা।

— ''দেব না কেন, না দিলে ঘর দোর জ্বালাবে বলে....

— ''বলে ঘর রাখতে আপনি যেমন উপায়হীন তেমনি লক্ষ্মীনারায়ণ আপনার ধর্ম্ম....আপনার সঙ্গে বাক্য নিষ্প্রয়োজন, এ ক্ষেত্রে ওঁদের কুলপুরোহিত, পুত্ররা বর্ত্তমান .... অমত নেই....ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা করতে ব্রাহ্মণেই আছে''। অর্থাৎ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ্যে গতি — পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা। যুগটা নিজ ভঙ্গুরতার প্রকৃতিতেই ভাঙছে। তাহলে বৈজুর প্রয়োজনটা কোথায়? এতবড় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈজু কি করতে পারে, কেবল ওই ভঙ্গুরতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া?

সারা উপন্যাসে বৈজু কোনো শক্তিই নয়, সে নিমিত্তমাত্র—কথার আড়ে কথা দিয়ে সে কেবল ধিকিধিকি জীবনাকাঙ্ক্ষার সলতের শিখাকে উসকে গেছে — অবশ্য তা যশোবতীর

আজন্ম-বালিকাজীবনভরই ছিল, উপন্যাসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ছিল, সব বালিকার যেমন থাকে। বৈজু তার দুর্বল মুহূর্তগুলিকে ব্যবহার করেছে তার তন্ত্রসাধনায়। তান্ত্রিক বৈজুনাথ চণ্ডাল।

প্রকৃত প্রস্তাবে বৈজুকে সক্রিয় করেছে যশোবতী না, সীতারাম। তার কামনার, দেহজ বাসনার কলসীকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছে সীতারাম, আগুন দিয়েছে বৈজু। শ্মশানভূমে মরনোন্মুখ কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল বৃদ্ধ সীতারামের কামকলাপূর্ণ কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গি, কবিগান, খেউড়, অক্ষম যৌনতা, ফুলশয্যার ইচ্ছা — সব মিলিয়ে ‘মিলনের অভিলাষে নববধূ পূর্ণাঙ্গ’ যখন, যশোবতী অনুভব করে সত্যিই সে ‘কাঠের বিড়াল দিয়ে ইদুঁর’ ধরতে চাইছে। যশোবতীর আবাল্য বিশ্বাস চিড় খায়, শ্মশানকে তার ‘মহৎ বোধ হইল না’। বর্তমানকে, যা যশোবতীর মনে হয়েছিল জন্মজন্মান্তরের ধারাবাহিক বাস্তবতা তাই কঠোর বাস্তব হয়ে ওঠে মরনোন্মুখ বৃদ্ধের ঈর্ষাপূর্ণ সন্দেহপ্রবণ ইতর শব্দে : ‘হারামজাদী নষ্ট খল খচ্চর মাগী... রাক্ষুসী ন্যাওনী মাগী — লেথিয়ে তোর মুখ ভাঙ্গি...’।

পুরুষশাসিত সমাজের নোংরা ইতর কঠিন মুখটি যশোবতীর কাছে স্পষ্ট হয়, সে বুঝতে পারে ‘মানুষের কখনই কেহ নাই একথা সত্য, নিকটে কেহ নাই একথা ভয়ংকর সত্য।’ এই ভয়ংকর সত্য যশোবতী প্রকাশ করে বৈজুর কাছে, যখন সে ‘এক প্রহরের শ্বাসটানা শব’। যশোবতী বলে, ‘এখন না মরে আমার কি উপায় বলতে পার...আমায় ফেন দেবার লোক কই....

‘তোমার কেউ নাই...তোমাদের জাতে কুটুম...

‘আমাদের কেউ থাকে না...’

বালবিধবার অসহায় জীবন, মরণের অভাবে বেঁচে থাকা; পালিয়ে যাবার পথটুকুও নেই। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে নয়, আত্মত্রাণে নয়, বিশ্বাসের অন্ধকারে অন্ধকারের মতই সে, যশোবতী, যে সীতারামের জন্মজন্মান্তরের স্ত্রী, ‘জাল ছিঁড়ে যাবে, পুকুর ছেড়ে ত যাবে না’ জেনেও যশোবতীই বলেছিল, ‘মরুক’ — অর্থাৎ ওই বৃদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হোক সব বন্ধন, উন্মুক্ত হোক নতুন পৃথিবী, যে পৃথিবীটা অনেক বড়, স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। ‘‘ইন্দ্রিয়াসক্ত সমগুণপ্রধানা যশোবতী বেপথুমানা; মহা আবেগে মুষ্ঠিতে দূর্ব্বাদল আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নিঃশ্বাসে অজাগর ঠিকরাইতেছে। নীহারধূমার্কানিলয়লাল খদ্যোৎ বিদ্যুৎ স্ফটিক শশীসম্ভব আলো আপনার কপালে খেলিতে লাগিল।

‘‘কনেবউ...কোটাল।

‘‘কপাল কুঞ্চিত করিলেন, সুখশয্যা ত্যাগ করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। ‘কোটাল কোটাল’ বলিয়া যেমন সে উঠিতে যাইবে, কনেবউ তাহার হাত বজ্রজোরে ধরিলেন। তিনি দেহাভিমানী, কেননা সম্ভবত অষ্টপাশ ছিন্ন হয়।’’ বাস্তবের সত্যি সুখশয্যায় শুয়ে যশোবতী জ্যান্ত বিড়াল দিয়েই ইঁদুর ধরেছে তার আবাল্য বিশ্বাসের জগৎকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলতে পেয়েছিল বুড়ো সীতারাম ঘাটের মড়া, ‘মরুক!’

যশোবতীর বোধোদয়ই এই উপন্যাসের ঈশ্বরদর্শন ঈশ্বর বলতে যদি প্রকৃত জ্ঞান, পূর্ণতা কিংবা আত্মদর্শন কিংবা সত্য কিংবা সুন্দর কিংবা জীবন যা-ই বোঝাক — যশোবতী তা উপলব্ধি করেছে বৈজুকে ঘিরে, প্ররোচনা জুগিয়েছে সীতারাম। জীবনের মূল্য ও মূল্যহীনতা, স্বর্গসুখ কিংবা নরকযন্ত্রণা — দুই এর দ্বন্দ্বে সে বুঝেছে 'পুথিঁগত মস্তক' স্বার্থপর ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের জন্যই এই পৃথিবী তার কাছে 'পরঘাটা'। এ সমস্ত খুঁচিয়ে তুলে দগদগে করেছে একা বৃদ্ধ সীতারাম। 'একটি অদ্ভূত শালাকার মত চাবিকাঠি সমেত হাত তাহার সমক্ষে নড়িতেছে।' যশোবতীর হঠাৎ মনে হওয়াই স্বাভাবিক 'এ চাবি স্বর্গের নাকি' তারপরই সীতারামের 'মোহর মোহর' উচ্চারণ 'সত্যিই চাবিকাঠি নববধূকে পরিহাস' করে। যখন ভোগের সময়, তখন তাকে ত্যাগের মহিমা শেখানো হচ্ছে, সবই অনিত্য বোঝানো হচ্ছে, অথচ যে মরতে চলেছে তার মধ্যে কী কুৎসিত ভোগবাসনা। অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে ক্ষিপ্ত যশোবতী চাবিকাঠি দূরে নিক্ষেপ করলে দুইপুত্রের পড়িমরি চাবি নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, মৃতপ্রায় পিতাকে একবারের জন্যও দেখতে আসে না আর, স্বর্গের চাবিকাঠি পেয়ে গেছে তারা। মূল্যবোধ, ধর্মবোধ এমনকী কর্তব্যবোধের কি করুণ দুর্দশা। 'নিশ্বাস-কাঙাল জীবনের কাছে ইহা (চাবিকাঠি ও মোহর) ভ্রূকুটি মাত্র; জমি হইতে উচ্ছেদ হওয়া কৃষক যে ভাবে আপনার জমিতে পা দিতে ভীতি অনুভব করে, সেইরূপ তাহার (যশোবতীর) মনোভাব...' জীবন থেকে তাকে যত উচ্ছেদ করা হয়েছে, জীবনের প্রতি বাসনাও তার বেড়েছে আরো বেশি। যশোবতী 'বিচলিত'। তার স্থির মনে ঢেউ তুলেছে অবিশ্বাস, টলে যাচ্ছে অশৈশবের শেখা ধর্মবোধ। সে অনুভব করতে পারছে সীতারাম তাকে উসকে দিয়েছে, অথচ আঁচ নেবার সাধ্য নেই, নেভাবারও সামর্থ্য নেই। সীতারামের যা ছিল সন্দেহমাত্র, ক্রমে যশোবতী সত্যিই 'নষ্ট খল খচ্চর রাক্ষুসী ন্যাঙনী মাগী'ই হয়ে যায়। ভেসে গেল তার গভীর বিশ্বাস — 'এ জীবন গেল, কি হয়েছ? আবার জন্মাব, আবার ঘর পাতর....। আর জন্মে না নিশ্চয়ই তোমায় কষ্ট দিয়েছিলুম, তাই এত দেরী হল আসতে।' 'ধীরা: নবোঢ়া, লাজুক, শীলা, বিহ্বলা, বিড়ম্বিত, মুহ্যমান বিষাদময়ী যশোবতী প্রগলভা হইলেন, আপনকার দেহ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইল....আপনার ভগ্নস্বরে আপনি সম্মোহিতা হইয়া, জরাজীর্ণ কালাহত স্বামীর কণ্ঠ ঝটিতি আবেষ্টন করত রমণী জীবনের, প্রকৃতি জীবনের, প্রথম, মধ্য এবং শেষ এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।' করেই যশোবতী বোঝে তার সমস্ত আচরণই 'খেলা', 'মায়া'; বৃদ্ধকে আলিঙ্গন মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন। অলীক বিশ্বাসের ধর্মবোধ এবং প্রত্যক্ষর সত্যর দোলাচলতার মাঝখানে, ভাঙনের কেন্দ্রে যশোবতী।

এ ক্ষেত্রে বৈজুর ভূমিকা কোথায়, প্রয়োজনটাই বা কোথায়? সে ত বহিরাগত। ব্রাহ্মণ সমাজ তাকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে, যশোবতীই বা কতটুকু? শ্মশানের বদলে গোটা ব্যাপারটা সীতারামের ঘরে হলে বৈজু যা সৎ ধর্মবোধের ভেতর যশোবতীকে প্ররোচিত করেছে, অসৎ অধর্মবোধের ভেতর একই প্ররোচনা সে পেতে পারত বলরাম হরেরামের কাছ

থেকে। যশোবতীর যাবতীয় স্খলন, তা ঘটেছে তার অন্তর্গত চরিত্রদোষ থেকেই। — সময় ও সমাজটা এতই অসুস্থ।

কমলকুমারের ঔপন্যাসিক মনোযোগ কিন্তু বৈজুর ওপরই, জীর্ণ সমাজটার ছবিও আঁকা হয়েছে বৈজুর চোখ দিয়ে, বোধ দিয়ে, এমনকী তারই অনুভূতি দিয়ে। অতএব সমাজ সংসার নয়, তাকে উপস্থাপন করলেন সমাজহারা এক স্থানে, শ্মশানে, তত্ত্বগত ভাবে, শ্রেণীগতভাবেও যেখানে ‘উচ্চ নীচ ভেদ’ নেই — সেই পুণ্যভূমে বা পাপভূমে পাপকে দগদগে করে তোলার জন্য। সেখানেও, উভয়ত ব্রাহ্মণসমাজ ও বৈজু চণ্ডাল রক্ষা করে চলে যে-যার লক্ষ্মণগণ্ডীকে : বৈজু ব্রাহ্মণদের গা বাঁচাতে আকাশের দিকে মুখ করে অট্টহাস্য করে; চণ্ডালের দেয় রোপ্যমুদ্রা হাতে নয়, ব্রাহ্মণের পায়ে দিতে আজ্ঞা হয়, না হলে ‘মহাপাতক’ হতে হবে। বিপরীতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধটিও রয়েছে উভয় পক্ষের, যে-যার মত : ‘আমি শালা ত প্রণামী দিচ্ছি না যে পায়ে দেবো’ বৈজুর স্পষ্ট জবাব। সতীদাহের চিতা করতে পারবে না সাফ জবাব দেয় সে। শ্লেষও কম নেই, ‘না শালা আমরা কাঁদি না, মুতি—চোখে ত জল নেই।’ পঞ্চমুণ্ডির পুণ্যের ঘাট তার চোখে ‘হাতী’। ব্রাহ্মণদের সাধারণ কথাবার্তা বৈজুর কানে বাজে ‘কলহরত খানকীদের আওয়াজের মতন’। শ্মশানের ‘সুদীর্ঘ গল্প’ তার জানা বলেই মোক্ষম দুর্বলতাটিও সে প্রকাশ করে প্রকাশ্যেই ঃ ‘সুতাহাটা - থানার মা-বাপ, তুমি মোড়ল, আমরা আবার কথা কইব কোন মুখে গো, ছোটজাত মোরা — বল?’ টেলিগ্রাফের সত্যতা ও তার জোরও তার জানা। বৈজুর যে লড়াই, যে লড়াকু মনোভাব, বৃহত্তর ময়দান ছেড়ে কেবলমাত্র ক্ষীয়মান, মুমূর্ষু সীতারামকেই সে টার্গেট করলো কেন, কেনই বা ‘যত নষ্টের গোড়া’ বলে মনে হল সীতারামকেই? এর পেছনে কি যশোবতী, যশোবতীর রূপলাবণ্য? সম্ভবত তাই-ই, উপন্যাসের অন্তিমে স্পষ্টতই সে যশোবতীকে ভোগ করেছে, যশোবতীর ইচ্ছাক্রমেই, তবে এত লম্বা লম্বা নীতিবাগীশ ধর্মকথা কেন? কেনই বা সে মিলনঅন্তে কোটালে ভেসে যাওয়া সীতারামের পেছনে যশোবতীকে লেলিয়ে দেয়? জেনেশুনেই কি? ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সে সরাসরি প্রতিবাদও করতে পারেনি, প্রতিরোধ ত সম্ভবই নয় তার পক্ষে। বৃদ্ধ জীর্ণ, মরণোন্মুখ সীতারামের ক্ষয়াটে শরীরের জোর বৈজু টের পায় গঙ্গায় ডুবিয়ে মারতে গিয়ে : ‘বৃদ্ধ তার তাহার কণ্ঠে জগদ্দল হইয়া আছে। সে (বৈজু) যেমত ভাঁড়ে বাঁধা নেউল...’। ক্ষয়াটে ব্রাহ্মণ্যবাদের জোর সীতারামকে দিয়েই সে টের পায় — প্রতীকী অর্থেও, ব্রাহ্মণ্যবাদের জগদ্দল তার কণ্ঠে সে মারতে গিয়েও মারতে পারে না, ডুবে মরতে যাওয়া যশোবতীকে বাঁচাতে গিয়েও সে কার্যত পরাভূত — গঙ্গায় ডুবে মরতে দিতেও সে চায় নি। বৈজু অনুভব করে যশোবতী সহমরণে সতী হওয়ারই যোগ্য — তার মনে শক্তপোক্ত সংস্কারের শেকড়, লতাতন্তুজাল — তার কি মানুষী মৃত্যু উচিত? অথচ উলঙ্গ যশোবতীকে সে রক্তমাংসের মানুষীর মতই বাঁচাতে চেয়েছিল, ‘এমন ঠাঁই ছেড়ে আসব তোমাকে, ফরসা হবে, তেনা (কাপড়) নাই আসতে লারবে, তুমি ইহকাল

পাবে...'। লহমার জন্য উলঙ্গ যশোবতীর দেহে স্পষ্টতই সে 'শুভ্র সুদীর্ঘ উপবীত' দেখেছিল যেমন 'পান্না ভৈরবীর অঙ্গে সে ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছে'। চণ্ডালকে শেষপর্যন্ত আরও লড়াকু বানাতে কমলকুমার সিদ্ধাই বানান, তন্ত্রসাধকে পরিণত করেন — ন্যূনতম আপত্তির জায়গাটিকে বৈজুর স্বাধিকারে আনেন কমলকুমার — যশোবতী হয়ে ওঠে 'ব্রাহ্মণী-অবধৃতী', 'শব ছাড়া' কিছু নয় সে, তার ওপর সিদ্ধাই বৈজুর পূর্ণ অধিকার। সেই অধিকারেই বৈজু যশোবতীর 'নশ্বর দেহখানি দুই হস্তে তুলিয়া ধরিল'।

কিন্তু এভাবে কি বাঁচানো যায়, যে বাঁচতে চায় না, তাকে বাঁচাবে কে? 'একটি সুবৃহৎ গল্পে'র সূচনা করেও বৈজু যশোবতীকে বোঝাতে পারেনি 'পৃথিবীটা খুব বড়'। তার জন্য প্রয়োজন ছিল সীতারামের দিক থেকে তীব্র আঘাত।

বৈজু নিজের সাধনায় নিজেও দ্বিধাগ্রস্ত। সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছে, 'আমি কি ঘুম। আর জন্মে আমার নাম কি ঘুম ছিল?' কিংবা 'আমি কি ভূত।....হয়ত আমি চিতা।' সর্বগ্রাসী চিতার শুদ্ধতায় সে উদ্দীপ্ত। তাহলে বৈজুর মধ্যে কি লেখক আধুনিক দ্বিধাদ্বন্দ্বকেও ঢোকাতে চেয়েছেন? সে-ও কি প্রশ্ন তুলতে চায় 'আধুনিক কালে মানুষ কি সত্যি ঘুমায় — যদি একান্তই, তাহা হইলে কোন বিশ্বাসে?' ঘুম ভাঙানিয়া বৈজুর লাগাতার প্রচেষ্টায় যশোবতীর তবে জেগে ওঠা, যদি তাই-ই তা, কী ধরনের জেগে ওঠা? একবার জেগেই পুনরায় ফির ধর্মের আফিমের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য?

কমলকুমার সময়টিকে, সমাজটিকে হয় এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, নয় সচেতনে তাকে পরিহার করেছেন 'ঈশ্বর দর্শনের গল্প' শোনানোর জন্য — পাঠককে নিয়ে আসেন নির্জন শ্মশানভূমে। কী অনায়াসে যৌবনবতী সালঙ্কারা নববধূকে একা শ্মশানে ছেড়ে দেয় সবাই — এমনকী যশোবতীর বাবাও, যশোবতী শ্মশাণেই প্রায় সংসার পাতে — রান্না করে, গঙ্গায় স্নান করে, দুধ আনতে যায়, ফুলও আনে, নিজেই রচনা করে ফুলশয্যা। অমন নজর কাড়া যুবতীর দিকে ট্যারা চোখেও কেউ তাকায় না, সে কি ধর্মভয়ে নাকি এই উপাখ্যানে কমলকুমার একটি স্বাক্ষীহীন নির্জনতা, জনবিরলতা চেয়েছিলেন সমাজ থেকে বহু দূরে? সমাজ-ইতিহাস বলে সেই সময়টাই ছিল সীমাহীন ব্যাভিচারের, কমলকুমার নিজেই তার বিবরণ দিয়েছেন 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসে, পুরুষেরা 'বিট খচ্চড়া' কোর্ট রাঢ় খোর' মেয়েরা 'সদর দরজায় তড়পা... এঁড়েতে আসবে মুখ দেবে, টানবে, নিয়ে বেরিয়ে যাবে'। যশোবতীও অনায়াসে ধরা দিয়েছে বৈজুর অষ্টপাশে, 'বজ্রজোরে' বৈজুকে আঁকড়ে ধরে, 'স্বয়ং মোহিনী মায়া' সীতারামকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতেও দ্বিধা করে না।

বৈজু এতটা স্খলন আশা করেনি। সমাজের অনেক গুহ্য খবর তার করতলে, তবুও। শ্মশানে পা দেওয়ার পর-পরই সে যশোবতীর পেছনে ফেলে আসা অনৈতিক লোলুপ অবিবেচনাকে যেমন দেখেছে তার পাশাপাশি তার শরীর সম্পর্কে সচেতনতার ক্রম-বিকাশও দেখেছে। 'মাংসল খেমটা-পূর্ণ শ্মশাণ, যৌবনবতী যুবতী, কামুক বৃদ্ধ, শক্ত পাথরে কোঁদা

বৈজু চণ্ডাল, যাকে দেখে যশোবতী কখনো 'সম্মোহিতা', কখনো 'আবিষ্ট, নাস্তিক, শক্তিরহিতা'। নৈতিকতাকে, ধর্মকে রক্ষা করার দায় ত যশোবতীর একার নয়, ঘাটের মড়াও যখন শ্মশাণকে 'মাংস হি-হি' করে তোলে! 'দুধ আলতা' স্বর্গের চেয়ে পাপপূর্ণ পৃথিবীই শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর মনে হয়েছে তার কাছে — নিভৃত এই কামনাকে ঘুঁচিয়ে জাগিয়েছে নষ্ট সময়ের ক্ষয়িষ্ণু প্রতিনিধি সীতারাম। মৃত্যু মুহূর্তেও কামনার কি কুৎসিত প্রকাশ! অসম্ভব জোরে যশোবতীর ঊরুদেশে আহ্লাদে এক চাপড় মারা এবং পরে ''ছেলে দুব'র মধ্যে যে যৌনতার ইশারা, যৌবনবতী যশোবতীও প্রথম সন্তানের আস্বাদ গ্রহণ করিতে উৎফুল্ল।' — সীতারামের মধ্যে ত প্রেমের ইঙ্গিত নেই, তা জীবনাকাঙ্ক্ষাও ত নয়, — তা তার জীবনভোর নারীভোগের অক্ষম কিন্তু অবশিষ্ট বাসনামাত্র। এ সব আচরণকে কেউ কেউ আয়রনি হিসেবে দেখেছেন, যদি আয়রনিও হয়, তা সীতারামের নয়, ক্ষয়াটে সমাজটার তলিয়ে যাওয়ার আগের অক্ষম তেজটার প্রতি কটাক্ষ লেখকের।

বাঙালি জীবনে প্রেম আর কবে এল ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে? নারীর কেবল সন্তান ধারণ, স্বামীসেবা ও অত্যচার সহ্যর জন্যই জন্ম, কিন্তু এর মাঝখানে স্বামীসেবার মধ্যেই, খানিকটা হলেও প্রেমহীন হলেও যৌনতৃপ্তি ছিল — যশোবতী সেই সময়েরই যুবতী, ধর্ম ও যৌনতাকে একাকার করা সংস্কৃতির ভেতর বেড়ে ওঠা। তার জীবনে তাও নেই!

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাস আলোচনা কালে কমলকুমার বলেছিলেন, এ 'জৈবচেতনার গল্প'। 'আহার নিদ্রা মৈথুন' দিয়ে জীবনকে পরিমাপ চলে না। নিজের ভাবে বিভোর বৈজুও, যার 'জ্বললে আঁধার নিভলে আলো — এ বড় ভাগ্য যে আমা হেন মানুষ নিশ্বাস নেয়' — কৃমিকীটের চেয়েও অধম এমন জীবের কাছে কেবল খিদেই বাস্তব, পেট জ্বললে সব অন্ধকার খিদে নিভলে সব আলো, তবুও সে ভাবের ঘরে ডাকাতি করে শেষ পর্যন্ত চিরসত্যকে প্রত্যক্ষ করতেই। সে পরীক্ষার আসনে বসাতে চায় যশোবতীকে : ''তোমাকে কনে বউ, আগে বাঁচাতে চেয়েছিলাম...তুমি গালমন্দ করলে, তখন ভাবলাম ও আমি কি ভুল করছি। তোমাকে না বাঁচাবার সুকৃতি ফলে তুমি যে ঘরে জন্মাবে আমিও কাছে জন্মাব — এটা কি বেশি চাওয়া?'' বৈজু আয়ান ঘোষ হতে চেয়েছে যশোবতী তাকে কেষ্ট ঠাকুরই বানায়। যশোবতী 'প্রেম' পেয়েছে বৈজুর কাছ থেকেই, একমাত্র, বাঁচার মন্ত্র পেয়েছে। আয়রনি কিন্তু এখানেই — যশোবতীর চোখে যা প্রেম, বৈজুর চোখে তা হয়ে যায় অধঃপতন, নৈতিকতার স্খলন। খুব সরলরেখায় বৈজু সময় ও সমাজটাকে বিচার করেছে, সে সহ্য করতে পারে নি, সে নিজেই যশোবতীর মৃত্যুদণ্ডটি ঘোষণা করে, 'কনে বউ এসো...বুড়ো...তোমার বর'। পালিয়ে যেতেও তাকে দিল না বরং টেনে আনল 'ওজস্বিনী বিশাল তরল সমতল শ্মশান' 'দাম্ভিকভাবে' এগিয়ে আসা সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ভেতরে। সতী হওয়ার পুণ্যটুকুও কেড়ে নিল বৈজু। নষ্ট সময়ের জীর্ণতাকে বৈজু পরখ করে নিল, বুঝে নিল, সতী হওয়ারও যেমন ন্যায্যত তার অধিকার নেই, অসতী হয়ে

বেঁচে থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই নষ্ট যশোবতীর। বৈজু অনুভব করল শেষ পর্যন্ত অজাচারী ‘গুপ্তঘাতকের হাতে সীতারাম আহত’—গুপ্তঘাতকটি আর কেউ না, যশোবতীই।

এরপরও লেখক যশোবতীকে ‘অল্পবয়সী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী পতিপ্রাণা’ বলেছেন, হয়ত সে পতিপ্রাণাই কিন্তু অজামিল, কিন্তু গুপ্তঘাতক, কিন্তু ‘ঘাগী, কুটনী, রাক্ষসী, নষ্ট, খল, খচ্চর হারামজাদী’। শ্মশানভূমে পা দিয়ে বৃদ্ধ সীতারামকে সে একটি মৃতদেহ ছাড়া ভাবে নি। ‘চম্পক ঈশ্বরী’ লক্ষ্মীপ্রতিমা’র বিসর্জন আয়োজনে যে চক্রান্ত যে ছলনা যে নিমর্মতা যে নিদর্য়তা ও লোলুপ অবিবেচনা তার পাশে স্বয়ং সীতারামের সন্দেহবাতিক অক্ষম কামুকী রূপটি সে দেখে এসেছে সংক্ষিপ্ত সময়ে কিন্তু সুদীর্ঘ যাত্রার ভেতর। তখনো শ্মশানে জেগে ছিল মেটে সিঁদুরে আঁকা নৌকাগাত্রের চোখটি, তখনো তা অশ্রুপাতক্ষম ছিল না, হয়ত সতীদাহ দেখে দেখে সে চোখ অশ্রুহীন, — যশোবতীও অশ্রুহীন। তার ‘যৌবন উচ্ছল শরীর খানিকে যেন বা নিঙড়াইয়া দিল’ শ্মশানের বৈপরীত্য। বিবাহের বৈপরীত্যও বিকৃতি নিয়ে এলে সে অচৈতন্য, মানসচক্ষে সে দেখে, ‘এক বৃক্ষ, শিকড় যাহার উচ্চে, শাখা নিম্নে’ এমন আয়রনিপূর্ণ বিবাহ সভার প্রারম্ভেই সে ‘বিড়াল ও পাখির ঘোরতর যুদ্ধের আওয়াজের রেশ’ শোনে। নিজের ‘হতভাগ্যের কথা ভাবিবার মত কোন মনোবৃত্তি যশোবতী খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধুমাত্র চক্ষু বুজাইয়া ঘুম চাহিলেন।’ অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে! প্রলয় তার ধ্বংসলীলা ঠিকই চালিয়ে গেল। বৈজুনাথও বুঝে গেছল, ‘ভয়ংকর উন্মত্ততা (ধার্ম্মিকের মত) আমাদের নাই, আমাদের বক্ষদেশ লাল নহে। বিনিদ্রতা আমাদের নাই।’ আত্মজিজ্ঞাসাও নাই, আত্মবিশ্লেষণও নাই। আছে কেবল কুৎসিত প্ররোচনা, কামনা পুরনের নিষ্ঠুর চক্রান্ত। কমলকুমার বৈজুকে ব্যর্থ হতে দেন নি। শেষ পর্যন্ত সে-ই শ্মশান-ভূমের একচ্ছত্র সম্রাট। বিগত যুগের শেষ সতীদাহের সমস্ত যন্ত্রণা সে-ই প্রকৃতপক্ষে জলাঞ্জলি দিয়েছে। ‘দুঃসাহসিক মোচে দৃপ্ত চাড়া’ দিয়ে তার উপন্যাসে আবির্ভাব, নৈতিকতার মৃতদেহের চিতাও জ্বললো তারই হাত দিয়ে — সে-ই স্বয়ং চিতা। পাড়ে দাঁড়িয়ে বৈজু দেখেছে : ‘‘জল আলোড়নে, বৃদ্ধদেহ চক্র দিয়া উঠিল, মৃত্তিকা তৈজস ছত্রাকার হইল। এতদ্দর্শনে যশোবতী জলে নামিয়া পড়িলেন। একটি বৃষকাষ্ঠ ধরিলেন, ক্রমাগত ‘কর্ত্তা কর্ত্তা’ চিৎকারে হাত ছাড়িয়া গেল! বান...সহসা তাঁহাকে লইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।” তারপরও বৃদ্ধকে দেখল যশোবতী, ‘ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী পতিপ্রাণা’ যশোবতী প্রতিমার কাঠামো ছেড়ে জলে লাফ দিল তারপর বৃথা ‘সন্তরণের’ চেষ্টা, তারপর রক্তিম জলোচ্ছ্বাস। একটি যুগের অন্তর্জলী ঘটল, গঙ্গা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়ে গেল তার ‘মৃত্তিকা’ তার ‘তৈজস’। এতক্ষণে, চক্ষু নয়, চক্ষুসদৃশ নৌকার গায়ে আঁকা সিঁদুরে চোখ অশ্রুপাতক্ষম হল; বিলীয়মান ওই যুগটির জন্য অঝোরে কেঁদে গেছে, কেঁদেছে বলেই তা মায়া। মায়িক অবভাস নয়, প্রসব ধর্মিনী নয়, কেবল Pity।

‘শেষের কবিতা’র শেষ অধ্যায় : রচনার নেপথ্যে

শ্রাবণী পাল*

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে রয়েছে দুটি কবিতা। একটি অমিতর চিঠিতে (তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,), অন্যটি লাবণ্যর (কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?)। বিদায় বেলায় পরস্পরকে বলার কথাগুলি ধরা আছে ঐ কবিতায়।

উপন্যাসের শেষে লাবণ্যকে পাঠানো অমিতর কবিতায় দেখা যায় বড় হয়ে উঠেছে প্রাপ্তির কথা, তার গ্রহণের অনুভব, ‘লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি,/আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়াছ আপনি।” সান্নিধ্য আর বিচ্ছেদের মধ্যে সে লাবণ্যকে পেয়েছে নূতন নূতন রূপে। লাবণ্যর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে অমিতর উচ্ছ্বসিত আবেগ ছিল ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’-র মতো। আর শেষের কবিতায় অমিত যখন লাবণ্যকে তার অনুভবের কথা জানায়, তদিনে তার প্রেম হয়ে উঠেছে -‘সন্ধ্যার দেউলদীপ’। ‘জীবন আঁধার’ করে লাবণ্য বিদায় নেওয়ার পর অমিত সেই নিভৃত দীপশিখাটিকে খুঁজে পেয়েছে নিজের ‘চিত্তের মন্দিরে’। লাবণ্যর সান্নিধ্য তাকে নূতন সত্যের সন্ধান দিয়েছে। প্রেমের পূর্ণতাকে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে দুটি ভিন্ন মাত্রায়, - একটির প্রকাশ প্রাত্যাহিকে, প্রত্যক্ষের সীমায়, আর অপরটি অসীম, অনিঃশেষের দিকে ব্যাপ্ত। তাই বিদায়কালে, কবিতার মাধ্যমে অমিত তার প্রণতি পৌঁছে দিতে চেয়ে লাবণ্যর কাছে।

অন্যদিকে, অমিতর উদ্দেশে লাবণ্যর কবিতাটি রয়েছে তার চিঠির শেষে। চিঠিতে লাবণ্য শোভনলালের সঙ্গে তার বিবাহের খবর দেয়। আর সঙ্গে পাঠায় একটি দীর্ঘ কবিতা। এই কবিতা দিয়ে লাবণ্য অমিতর কাছে বিদায় নেয়। সেখানে সে জানায়, তার ‘মৃত্যুঞ্জয়’ প্রেমের ‘অপরিবর্তন অর্ঘ্য’ অমিতর হাতে তুলে দিয়ে নিজের জীবনতরী ভাসিয়ে দিচ্ছে ধাবমান কালের স্রোতে। ‘শূন্যেরে’ ‘পূর্ণ’ করার ব্রত নিয়ে আবার সে প্রস্তুত হচ্ছে নূতন পূজায় নিজেকে নিবেদন করার জন্য। সমস্ত কবিতার মধ্য থেকে যে কথাটি বিশেষ করে ফুটে ওঠে, তা হল, লাবণ্যর প্রেমের পূর্ণতা তার দানে - (শূন্যেরে কবির পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।)। লাবণ্য তার জীবনের মধ্যে প্রেমের উৎসটিকে আবিষ্কার করেছে অমিতর সান্নিধ্যে। অমিতর আবেগোচ্ছল ভালোবাসার সংস্পর্শেই সে চিনেছে শোভনলালের প্রেমের মূল্য। নূতন পথে যাত্রার আগে তাই সে অমিতর কাছে ঋণ স্বীকার করে তার কবিতায়।

উপন্যাসের শেষ কবিতা দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে অমিত আর লাবণ্যের পারস্পরিক সান্নিধ্য থেকে পাওয়া উপলব্ধির নির্যাস। তাই লেখার শুরু তে রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছিলেন ‘মিতা’, উপন্যাসটি শেষ করার পর সেটি বদল করে নাম রাখেন ‘শেষের কবিতা’। এই

*অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশান (কলেজ)।

পরিবর্তন দেখে মনে হয়, রচনা শেষ করার পর লেখক শেষ অধ্যায়ের (যার নামও দিচ্ছেন শেষের কবিতা) কবিতাকে উপন্যাসে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে চাইছেন। প্রাথমিক ভাবে লেখা শেষ করার পরেও উপন্যাসের শেষ অধ্যায় এবং শেষের কবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে কত গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের একটি পাণ্ডুলিপিতে। স্মরণ করা যেতে পারে, এর আগে দু-একটি ক্ষেত্রে উপন্যাসের সমাপ্তি প্রসঙ্গে তিনি সমালোচিত হয়েছেন। শেষের কবিতার সমাপ্তি নিয়ে তাঁর এই ভাবনা সেদিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যবহ বলে মনে হয়।

শেষ পর্বের প্রায় সব উপন্যাসের মতো শেষের কবিতার বেলায়ও রবীন্দ্রনাথ রচনার প্রাথমিক খসড়া লিখে ফেলার পর, নানান পর্যায়ে তার পরিমার্জন করে ছিলেন। ফলে তৈরি হয়েছিল একাধিক পাণ্ডুলিপি। তারই একটিতে (বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন অভিলেখ্যাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ সংখ্যা 236-ii) দেখা যায় উপন্যাসের শেষ অধ্যায় থেকে তিনি বাদ দিচ্ছে কেটি-অমিত এবং লাবণ্য-শোভনলালের বিবহের প্রসঙ্গ। অধ্যায়ের সূচনায় যতিশঙ্কর আর অমিতর কথোপকথন অংশটি বর্জন করে অধ্যায়টিকে করে তুলতে চাইছেন অত্যন্ত পরিমিত ও একাগ্র। শেষ অধ্যায় থেকে অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ সরিয়ে নিয়ে উপন্যাসের শেষ কথা বলার ভার তুলে দিচ্ছেন মূলত কবিতা দুটির উপর।

প্রথম পর্যায়ে উপন্যাসটি লেখা হয়ে যাওয়ার পর, শেষ অধ্যায়ের যে অংশটি তিনি বর্জন করতে চেয়েছিলেন তার সিংহভাগ জুড়েই ছিল যতিশংকরের সঙ্গে অমিতর কথোপকথন। যেখানে তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে জানানো হয়েছে অমিত আর কেটির আসন্ন বিবাহের সংবাদ, আর অমিতের মুখে শোনা যায় সেই বিয়ে নিয়ে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা। অমিত জানায় 'ভালোবাসা' আর 'বিবাহ' সম্পর্কে তার নতুন উপলব্ধির কথা - '*যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত তাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষ ভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ।*' ভালোবাসার এই ভিন্নতা অনুসারে কেতকী আর লাবণ্যর সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে নির্ধারণ করে অমিত বলে-" কেতকীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন যেন তাতে সাঁতার দেবে।' রোম্যান্স আর রোম্যান্টিকতা নিয়েও এখানে অমিত একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা উপস্থিত করে। জীবন চর্চায় ও সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সেই সময় আধুনিকতার যে নূতন অর্থ সন্ধান করছিলেন, শেষের কবিতা উপন্যাসে তাকেই এক বিশেষ রূপে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তিনি। (এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় নির্মলকুমারী মহলানবিশের লেখা কবির সঙ্গে যুরোপে গ্রন্থের একটি অংশ। ১৯২৬ সালে যুরোপ ভ্রমণের স্মৃতিচারণায় শ্রীমতী মহলানবিশ লিখেছেন - "একদিন এই রকম বেড়াবার পথে যেতে যেতে কবি বললেন : একটা কথা মাঝে মাঝে ভাবি, আধুনিক কালের ছেলেমেয়েরা কিন্তু

রোমান্স করতেও জানে না। তাই আধুনিক সাহিত্যের আজকাল এই রকম চেহারা। সবাই যেন স্থূল। কোনো সুন্দর জিনিসই সুশ্রীভাবে ভোগ করতে জানে না। সবেতেই লোলুপতার ছাপ লেগে কুশ্রী হয়ে ওঠে। আগেকার দিনে বিরহটাকেও লোকে রসিয়ে ভোগ করতে পারত। তাই মিলনের সমানই তাতে আনন্দও পেয়েছে বেদনার মধ্যে দিয়ে। এদেশের পুরনো কালের সাহিত্যে তার পরিচয় পাই। তার আজকের দিনে যাকে সকলে আধুনিক সাহিত্য বলছে, তার মধ্যে কেবলই বাস্তবের দোহাই দিয়ে সুন্দরের অপমান। বিধাতা আমাদের কল্পনাশক্তি দিয়েছেন কেন? প্রতিদিনের জীবনযাত্রার দৈন্যের মধ্যেও নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে সৌন্দর্য রচনা ক'রে তো সে দৈন্য খানিকটা ঘোচাতে পারি। সাহিত্য তো সেই কাজই করবে।...” (নির্মলকুমারী মহলানবীশ, কবির সঙ্গে য়ুরোপে, ১ম প্রকাশ : ২২শে শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃ. ১৪৬) রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনারই অনেকটা প্রকাশ ঘটেছে শেষের কবিতার শেষ অধ্যায়ে, অমিতের নানা কথায়।

শেষ অধ্যায়ের প্রথমাংশটি পড়তে গিয়ে মনে হয়, যতিশঙ্করের প্রশ্ন আর অমিতর উত্তর যেন স্বাভাবিক কথাবার্তার ছন্দে গাঁথা নয়। সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে যে কথাগুলি বলা হল অথবা না বলা রয়ে গেল, এমনকি উপন্যাস পড়তে বসে পাঠকমনে যে সব প্রশ্ন জাগতে পারে, সেগুলি অতি দ্রুত বলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা রয়েছে অধ্যায়ের সূচনায়, যতিশংকর আর অমিতের সংলাপে। লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধহয় বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। সম্ভবত সেই কারণে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন উপন্যাসের সমাপ্তি নিয়ে। বিশেষ করে অমিত-লাবণ্যর বিদায়ের কবিতা দুটি যেন কথার ভিড়ে হারিয়ে না যায়, শেষের কবিতার গুরুত্ব এবং আবেদন যেন পাঠকের কাছে যথার্থ রূপে পৌঁছতে পারে সে বিষয়ে তিনি সজাগ হয়ে উঠেছেন। হয়ত সেই কারণেই এক সময় তিনি অমিত-লাবণ্যর চিঠি দুটি ছাড়া শেষ অধ্যায় থেকে অন্যান্য সব প্রসঙ্গ বাদ দিতে চেয়েছিলেন।

লক্ষ্য করা যায়, পাণ্ডুলিপির যে পাঠে যতিশঙ্কর আর অমিতের কথোপকথন অংশটি বাদ যায় সেখানে রবীন্দ্রনাথ শেষ অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন সরাসরি আগের অধ্যায়ের (মুক্তি) ঘটনা অনুসরণ করে। মুক্তি অধ্যায়ের শেষে, অমিত চেরাপুঞ্জি থেকে ফিরে যোগমায়া দেবীর বাসায় গিয়ে দেখে-“...ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায়নি।” অধ্যায়টি শেষ হয় অমিতর গভীর শূন্যতাবোধে, “সমস্ত শিলং পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও সান্ত্বনা পেল না।” এর পরে সেখানে ‘শেষের কবিতা’ অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ের শুরু হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে-

“দুটো দিন গেলে পর অমিত গেল ডাকঘরে। জিজ্ঞাসা করলে, “যোগমায়া দেবী কি তাঁদের ঠিকানা দিয়ে গেছেন?”

ডাকাবাবু বল্‌লে, “হাঁ”।

‘আমি সেই ঠিকানাটি চাই।’

'কাউকে জানাতে বারণ।'

একটুখানি চুপ করে অমিত দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলে, বারণটা বিশেষ করে তারই সম্বন্ধে। পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে জাকবাবুকে দিয়ে বল্‌লে, এর উপরে লাবণ্যদেবীর ঠিকানাটা লিখে পাঠিয়ে দেবে।"

চিঠিতে এই ছিলঃ-"

অমিতর চিঠি আর কবিতা উপস্থিত হয় এর পরে। শেষ অধ্যায়ের এই পাঠের সঙ্গে বর্তমান উপন্যাসের এই অংশের তফাৎ চোখে পড়ার মতো। এই পাঠে উপন্যাসের শেষ দুটি অধ্যায়ের (মুক্তি এবং শেষের কবিতা) মাঝে কালের ব্যবধান মাত্র দুদিনের। ধরে নেওয়া যায়, এই দুদিনের, কোনো এক সময় শিলং-এ বসেই অমিত চিঠি লেখে। আর সেটি সঙ্গে নিয়ে যোগমায়া দেবীর ঠিকানা সন্ধানে যায় ডাকঘরে। অর্থাৎ স্থান, কাল আর মানসিক দিক দিয়ে 'মুক্তি' অধ্যায়ের শেষের পটভূমিতে বসেই লেখা হয় চিঠিটি। যখন লাবণ্যর চলে যাওয়ার অকস্মিক সংবাদে তার স্বপ্ন বিলাসী মনের সব আলো মুহূর্তে নিভে যায়, অমিত এই চিঠি লেখে সেই সময়ে। এই পাঠে, লাবণ্যর বিদায় আর অমিতর চিঠির মাঝে ব্যবধান কমিয়ে এনে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত অমিতর তৎকালীন অনুভূতির প্রগাঢ়তা সঞ্চারিত করে দিতে চান চিঠির ব্যঞ্জনায়।

অন্য দিকে, এখনকার পাঠে দেখা যায়, (পাঠটি প্রথম পর্যায়েই লেখা। মাঝে একবার বর্জন করে আবার ফিরিয়ে এনেছেন উপন্যাসে। তাই এখনকার শেষ অধ্যায় মোটামুটি প্রথম পাঠের অনুরূপ।) শেষ অধ্যায়ের ঘটনা শুরু হয় শিলং-এর ঘটনার বেশ কিছু কাল পরে। কতদিন পরে শেষ অধ্যায়ের ঘটনাক্রম শুরু হয় সে বিষয়ে এখন স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। কলকাতার কলেজ পড়া যতিশংকরের সঙ্গে অমিতর নিয়মিত যোগাযোগের কথা থেকে অনুমান হয় মাঝখানে বেশ কিছুকাল অতিক্রান্ত। লাবণ্যর উদ্দেশ্যে অমিত চিঠিটি কখন লেখে সে কথা এখনকার পাঠে স্পষ্ট নয়। তবে অমিত যখন সেটি যতিশংকরের হাতে তুলে দেয় ততদিনে শিলং পর্বের সঙ্গে তার স্থান কালের বেশ কিছুটা দূরত্ব ঘটে গেছে। তাই চিঠিটা শুধু লাবণ্যর কাছে নয়, যে সময় পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়, তখন তা আর অমিতর শিলং -এর ভাবাবেগ বহন করে না। তার পরিবর্তে যে ভাষ্য প্রকাশ করে তা কালের ব্যবধানে লব্ধ, অমিতর সুস্থিত অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রকাশ পায়। বোঝা যায়, প্রথমে অধ্যায়টি লেখার সময় কাল বিন্যাসের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বলার কথাগুলিতেই তখন লেখকের প্রধান মনোযোগ ছিল। পরে হয়ত তাঁর মনে হয়েছে এই অংশে সময়ের অস্পষ্টতা রয়েছে। কালের শিথিল বিন্যাসের পলে অমিত এবং লাবণ্যর চিঠি দুটিতে বিধৃত বিদায়কালীন অনুভূতির গাঢ়তা ক্ষুন্ন হতে পারে।

লক্ষ্য করার বিষয়, বর্তমান পাঠে এই সময় সম্পর্কে এই অস্পষ্টতা রয়েছে লাবণ্যর বেলায়ও। অমিতর কাছে লাবণ্যর চিঠি পৌঁছানোর আগে উপন্যাসে এখন সে বিবরণটি

পাওয়া যায়, সেখানে সময় সুনির্দিষ্ট করা হয়নি - ‘‘তার পরেও আরো কিছুকাল গেল। সেদিনের কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরাম কেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়াম জেম্‌সের পত্রাবলী পড়ছে। এমন সময় যতিশংকর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে।...’’

স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে ঘটনা কালটিকে নির্দিষ্ট করার কোনো তাগিদ নেই লেখকের। শিথিল, অনির্দিষ্ট সময়ের মাঝখানে স্বল্প কিছু উল্লেখে প্রকাশ করতে চাইছেন অমিত -কেটির নিশ্চিন্ত জীবন প্রবাহের ইঙ্গিত। আর তার মাঝখানে যতিশংকরের হাতে অমিতর কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন লাবণ্যর চিঠি।

এর পাশে রাখা যায় সেই বর্জিত পাঠটি, যেখানে রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়টিকে নতুন করে রূপ দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। সেখানে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহ প্রসঙ্গ বাদ দেওয়ায় অংশটি আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে,

‘‘তারপরে ছয় মাস কেটে গেছে। অমিত তখন নাসিকে। সঙ্গে কেটিরা ছিল। সেখানে লাবণ্যর হাতের লেখা এক চিঠি পেলে,--- সে এক পাহাড়ের ঠিকানা থেকে, পোলের কাছাকাছি কোন্ এক জায়গা:---

লাবণ্যর কবিতা শুরু হয়েছে ঠিক তারপরে। স্পষ্টতই প্রথম লেখা শিথিল সময় বিন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ এখানে সুনির্দিষ্ট সময়ের পরিধিতে ধরতে চেয়েছেন। শিলং পর্বের ছয় মাস পরে লাবণ্যর চিঠিটা নেপালের কোনো এক জায়গা থেকে এসে পৌঁছয় নাসিকে অমিতের কাছে। কেটি আর শোভনলালের সঙ্গে অমিত আর লাবণ্যর সংযোগটি ইঙ্গিতে ধরিয়ে দেওয়া হয় এখানে। লাবণ্য চিঠিটা নেপালের কাছে কোনো জায়গা থেকে আসার উল্লেখই মনে করিয়ে দেয়, ঐ রকম জায়গাতেই শোভনলাল তার গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিল। আর চিঠিটা ছয় মাস পরে পৌঁছনোর পিছনেও দায়ী সম্ভবত লাবণ্য আর অমিতর এই গরঠিকানায় অবস্থান। তাদের উভয়ের চিঠিই ঠিকানা অনুসন্ধান করে যথাস্থানে পৌঁছতে যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগবে, সময় উল্লেখের পিছনে সেই সূক্ষ্ম হিসাবটিও এক্ষেত্রে লেখকের মনোযোগ এড়ায়নি। অনুমান করা যায়, ছয় মাস পরে পৌঁছলেও লাবণ্যর চিঠিটা লেখা হয়েছিল আরো আগে।

লাবণ্যর এই চিঠিতে কবিতাটি ছাড়া অমিতর উদ্দেশে আর কোনো কথার উল্লেখ নেই। তবে ই পাঠে যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো, - রবীন্দ্রনাথ এখানে লাবণ্যর কবিতায় মাথায় ব্রকেটে লিখে যোগ করছেন ‘নিবারণ চক্রবর্তীর খাতা হইতে’। লেখার ধরন থেকে মনে হয় মূল লেখার সময় নয়, লেখা শেষ হওয়ার পরে এটি যোগ করা হয়েছিল। এখানে আমাদের কিছুটা বিস্মিত করে ‘হইতে’ শব্দের ব্যবহার। প্রশ্ন জাগে, লাবণ্যর চিঠিতে এই ধরণের সাধু ক্রিয়ার ব্যবহার করা হয় সচেতন ভাবে, না অসতর্কতায়। অসতর্কতার কারণটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর রচনা

বলে চিহ্নিত করার সময় তাঁকে আরো নানান দিক নিয়ে ভাবতে হচ্ছিল। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রথম পাঠেই নিবারণ চক্রবর্তী আবির্ভূত হলেও উপন্যাসে তার উল্লেখ এবং কবিতার সংখ্যা কম ছিল। আলোচ্য দ্বিতীয় পাঠটিতে রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপির মূল খাতার সঙ্গে আলাদা পৃষ্ঠা জুড়ে সেখানে বালিগঞ্জের সাহিত্য সভার বিবরণটি সংযোজন করেছেন। বোঝা যায় মূল লেখা চলাকালে নয়, এই অংশ যুক্ত হয় লেখা হয়ে যাওয়ার পরে। এই অংশে তিনি যোগ করেন রবি ঠাকুরের প্রতি অমিতর শানিত আক্রমণ, আর আধুনিক কবিদের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত করেন নিবারণ চক্রবর্তীকে। এই চরিত্রকে অবলম্বন করেই যেন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার একটি আদর্শ সন্ধানে অবতীর্ণ হলেন উপন্যাসে। ক্রমেই ভাবনাটি যখন বিকশিত হতে থাকে তখনই তিনি শেষের কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা বলে উল্লেখের কথাও ভাবেন।)

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, উপন্যাসের শেষে লাবণ্যর কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর খাতা থেকে নেওয়া বলে নির্দেশ করা হলে অনিবার্যভাবে যে প্রশ্নটি সামনে চলে আসে সেটি হলো, খাতাটি লাবণ্য পেল কোথায়।

বর্তমান উপন্যাসে তার উত্তর পাওয়া যাবে না। তবে সে পাঠে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর বলেছেন সেখানে তার একটি উপযুক্ত উত্তর ছিল। ঐ পাঠের 'আশঙ্কা' অধ্যায়ের শেষে অমিত লাবণ্যকে নিবারণ চক্রবর্তীর খাতাটি দিয়ে দেয়। এই অধ্যায়ের শেষে অমিত-লাবণ্যর কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎ এসে পড়ে শোভনলালের প্রসঙ্গ। অমিতর মুখে ঘরছাড়া শোভনলালের কথা শুনে ব্যথাহত লাবণ্য যখন চোখের জল আড়াল করতে উঠে যেতে চায়, তখন অমিত তাকে ডেকে বলে, ''আচ্ছা, যাবে যদি নিবারণ চক্রবর্তীর খাতাখানা নিয়ে যাও।" ফলে ঐ পাঠে উপন্যাসের শেষে লাবণ্য যখন নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা উদ্ধৃত করে তখন সেখানে কোনো ভুল হয় না। (পরবর্তীকালে নতুন করে পরিমার্জনের সময় অংশটি বর্জিত হয় ভিন্ন কারণে।)

তবে উপন্যাসের শেষে কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর রচনা বলে উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁকে আরো কয়েকটি প্রশ্নের সমাধান বসতে হয়। এই কারণে কয়েকটি নূতন অংশ লিখে সংযোজন করতে হয় তাঁকে।

'আশঙ্কা' অধ্যায়ের শেষে অমিত যখন লাবণ্যকে খাতাটি দিয়ে দেয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যায় কবিতাটি তার আগে লেখা। স্পষ্টতই লাবণ্য তার শেষে চিঠিতে নিবারণ চক্রবর্তীর খাতা থেকে যে কবিতা উদ্ধার করে সেটি অমিত লেখে আগে কোনো এক সময়। যার অর্থ, শেষের কবিতায় যে বিচ্ছেদের উপলব্ধি প্রকাশ পায় তা লাবণ্যর আগেই অমিত অনুভব করেছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে, কি করে এটি সম্ভব হল অমিতর পক্ষে। যে অমিত শুধু মিলনের কথাই জোর করে বলতে চায় নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতায়, তার পক্ষে এই বিচ্ছেদের কবিতা লেখা কি স্বাভাবিক ছিল ঐ সময়? নাকি তারও অনুভবের গোপন তারে বাজতে শুরু করেছিল অবসম্ভাবী বিচ্ছেদের সুর।

এ প্রসঙ্গে, ‘আশঙ্কা’র আগে, ‘ঘটকালি’ নামের অধ্যায়ে লাবণ্য-অমিতর কথোপকথনের একটি অংশ উদ্ধারযোগ্য। অমিত তার কাছে কী চায় সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে (তুমি আমার কাছে কী চাও, আর আমি তোমাকে কতটুকু দিতে পারি, ভেবে পাই নে।) লাবণ্য যখন বলে ‘‘যতই আমার আলো থাক আর ধ্বনি থাক, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।’’

তখন তার উত্তর প্রত্যুত্তর ও তৎপরবর্তী অমিতর ভাবনার অংশটি লক্ষ্য করার মতো-

অমিত বললে, কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে, আর-কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে!

লাবণ্য হেসে বললে, ‘কোথায়? নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়’?

আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে ধরা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।’

‘তা হলে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।’

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে-খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে কথাটা বললে সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ-বা করে জীবন, কেউ-বা করে রচনায় - জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে অথচ তার থেকে সরতে সরতে, নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে তেমনি। আমি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব! এইখানেই কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় আপনাকে রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করার জন্যেই নতুনকে সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।’

এ কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।’’

‘ঘটকালি’ অধ্যায়ের শেষে অমিতের এই উপলব্ধি বুঝিয়ে দেয় সেই সময়ই লাবণ্যর মত অমিতর কাছেও ধরা পড়েছিল তাদের স্বভাবের অমিল আর আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাব্য সংকেত। লক্ষ্যণীয়, ঘটকালি অধ্যায়ের শেষের এই উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ যোগ করেছিলেন

সংযোজন আকারে। যে পাঠে শেষের কবিতাটিকে 'নিবারণ চক্রবর্তীর খাতা হইতে' বলে উল্লেখটিও যোগ করা হয়। সেই কারণে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় সংযোজন দুটির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত যোগ রয়েছে। কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর বলে চিহ্নিত করার জন্যই পটভূমি রচনা করছেন এখানে। এই রকম আরো একটি সংযোজন লক্ষ্য করার মত-

'মিলন তত্ত্ব' অধ্যায়ের শেষে 'সন্ধ্যাবেলার শেষ কবিতা' (কত ধৈর্য ধরি/ছিলে কাছে দিবসশর্বরী!) বলে অমিত যে কবিতাটি আবৃত্তি করে তার সঙ্গে লাবণ্যর চিঠিতে উদ্ধৃত শেষের কবিতাটির সুরে যেন এক অন্তর্লীন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেও শোনা যায়-

''আজ যবে / দূরে যেতে হবে / তোমারে করিয়া যাব দান / তব জয়গান।''

শেষের কবিতার মতো ধাবমান কালস্রোতের মাঝখানে জীবনকে প্রত্যক্ষ করার অনুভব নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতাতে প্রকাশ পায় -

''কতবার ব্যর্থ আয়োজনে / এ জীবনে / হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি, / শূন্যে গেছে চলি / হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী! / কতবার ক্ষণিকের শিখা / আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা / নিশ্চেতন নিশীথের ভালে! / লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

অথবা, কবিতার শেষ স্তবকটি-

লহো এ প্রণাম / জীবনের পূর্ণ পরিণাম। / এ প্রণতি-'পরে / তোমার স্পর্শ রাখো স্নেহভরে। / তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে / সিংহাসন যেথায় বিরাজে / করিয়া আহ্বান / সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।

এই কবিতাটি সংযোজন করা হয় আগে লেখা একটি ইংরেজি কবিতার বদলে (...........)। লক্ষ্য করার বিষয়, সব ক'টি সংযোজনই হচ্ছে মূল লেখা হয়ে যাওয়ার পরে, যোগ করার জায়গাটিতে ** চিহ্ন দিয়ে। অমিতের ভাবনার অংশটি যোগ করছেন আলাদা পাতায় লিখে। কবিতাটি যোগ করছেন খাতার বাঁদিকের খালি পৃষ্ঠায়। আর 'নিবারণ চক্রবর্তীর খাতা হইতে' কথাটি লিখেছেন কবিতার মাথায় ব্র্যাকেটের মধ্যে ছোটো হরফে। সংযোজনগুলির পিছনে যে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। 'ঘটকালি' অধ্যায়ের শেষাংশ আর 'মিলন তত্ত্ব'-এর শেষ কবিতা, দুটি সম্ভবত যোগ করা হয় শেষের কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর রচনা বলে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য।

উপন্যাসের সমাপ্তি নিয়ে নূতন করে ভাবতে বসে শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবর্তনগুলি ঘটালেন তার ফলে অমিত এবং লাবণ্যর বিবাহ প্রসঙ্গটি উপন্যাস থেকে বর্জিত হল। সামান্য ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইলেন অমিত এবং লাবণ্য তাদের বিচ্ছেদের পরে নূতন সম্পর্কের দিকে অগ্রসর হয়েছে। শুধুমাত্র শেষের কবিতাটির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে চাইলেন ভালোবাসার সীমা ও অসীমের সত্যটিকে। অন্যদিকে, প্রথম পাঠে অমিতর মুখে প্রেম, বিবাহ ও আরো যে সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন সেগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করলেন। কালের শিথিল বিন্যাসের পরিবর্তে শেষ অধ্যায়ের কাল পরিসীমাটিকে কমিয়ে

আনলেন এখানে। আর শেষ কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর রচনা বলে নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ অমিত এবং লাবণ্যর প্রেম ও বিরহের উপলব্ধিকে একটি জায়গায় মিলিয়ে দিয়ে। বিদায় বেলায় রবি ঠাকুরের ভক্ত লাবণ্য নিজের কথা প্রকাশে কবি নিবারণ চক্রবর্তীর আশ্রয় নিয়ে বুঝিয়ে দেয় শুধু বইয়ের তাকে নয় নিবারণ চক্রবর্তীর স্থান পেয়েছে তার অন্তরেও। অপর দিকে অতি আধুনিক কাব্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ অমিত রবি ঠাকুরের কবিতা দিয়ে তার শেষের অনুভব প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্বীকৃত হয় তার কাব্য জগতে। মনে রাখা প্রয়োজন, উপন্যাসের এই পাণ্ডুলিপিতেই রবীন্দ্রনাথ বালিগঞ্জ সাহিত্য সভার বিবরণ সংযোজন করে রবি ঠাকুর সঙ্গে অমিত তথা নিবারণ চক্রবর্তীর বিরোধের বিষয়টিকে ক্রমশ বড় করে তুলেছিলেন। শেষের কবিতাটিকে নিবারণ চক্রবর্তীর রচনা বলে চিহ্নিত করার সেই দ্বৈরথের সমাপ্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। শেষ অধ্যায়ের পরিমার্জনের ভাবনায় এটিও বড় কারণ বলে মনে হয়।

লক্ষ্য করার বিষয়, রচনার একটি স্তরে ‘শেষের কবিতার’র শেষ অধ্যায় নিয়ে এই রকম একটি বিকল্প পরিকল্পনা মনে এলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে গিয়েছিলেন প্রথম পাঠে। এখানে প্রেম এবং বিবাহ বিষয়ে যে ভাবনাটি অমিতের মুখে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রতি লেখকের একটি বিশেষ মমত্ব থাকারই কথা। তাই উপন্যাস থেকে সেটি সম্পূর্ণ বর্জন করতে গেলে মনে আপত্তি জাগাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এই তত্ত্বের মধ্যে যে রোমান্টিকতা রয়েছে সেটি অমিত চরিত্রের ক্রমপরিণতির পক্ষেও যথার্থ। রাণী মহলানবিশের স্মৃতিচারণায়, রবীন্দ্রনাথের কথায় বিরহের মধ্যেও আনন্দ লাভের যে প্রসঙ্গ রয়েছে, তাই যেন রূপ পেয়েছে লাবণ্য চলে যাওয়ার পর অমিতর ভাবনায় এবং জীবন সাধনায়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের সমাপ্তি নিয়ে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে এই দিকটি প্রকাশের সুযোগ পায়নি। তার পরিবর্তে সেখানে বিচ্ছেদের বেদনাবিধুর আবহকেই যেন শেষ পর্যন্ত অটুট রাখার কথা ভাবা হয়।

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ব্যাঙ্গালোরে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাড়িতে বসে দ্রুত শেষ করেছিলেন। কথা ছিল লেখাটি তাঁকে পড়ে শোনানোর। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের বর্ণনায় জানা যায়, শ্রোতারা বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কবির এই নূতন রচনায়। কিন্তু নিজের রচনা স্রষ্টাকে যে সম্পূর্ণ খুশি করতে পারেনি সে কথা স্পষ্ট। কারণ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেই তিনি হাত দিয়েছেন উপন্যাসটির পরিমার্জনে। যার ফলে ‘শেষের কবিতার’ শেষ অধ্যায় রচনার নেপথ্যে সৃষ্টি হয়েছে লেখক মনের টানাপোড়েনে এই রকম একটি ইতিহাস।

বুদ্ধদেব বসুর স্বতন্ত্র ভাবনা : 'প্রথম পার্থ' নাটকে কর্ণ ও কুন্তী

অনিরুদ্ধ নায়ক*

১৯৬৯ সালে লেখা বুদ্ধদেব বসুর একটি বিখ্যাত কাব্যনাট্য 'প্রথম পার্থ'। মহাভারতের কাহিনিকে অবলম্বন করে তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব ভাবনার ছাপ রেখেছেন বুদ্ধদেব বসু। এর পূর্বেও আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও এরকম একটি কাব্যনাট্য রচনা করেন— 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'। তাঁর কাহিনিরও মূল উৎস ছিল মহাভারত। তবে তিনিও 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এ তাঁর নিজস্ব জীবন দর্শন ও ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। মহাভারতের ঘটনার হুবহু বর্ণনা তিনি করেননি। চরিত্র দুটির মধ্যে তিনি জীবনরসের ফল্গুধারা বইয়ে দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুকে রবিঠাকুরের সার্থক উত্তরাধিকার বলা যেতে পারে। তবে তিনি এক্ষেত্রে তাঁর অগ্রজকে অনুসরণ করলেও চরিত্র দুটির মধ্যে তাঁর নিজস্ব ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটেও নাটকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল যে বুদ্ধদেব বসু ভালো কবি না হলে বোধহয় এত ভালো কাব্যনাট্য রচনা করতে পারতেন না। বুদ্ধদেব বসু প্রথম স্বতন্ত্র এনেছেন কাব্যনাটটির নামকরণের মধ্য দিয়ে। তিনি নাম দিয়েছেন 'প্রথম পার্থ'। এই নামকরণটির পেছনে যে দুজনের উপস্থিতির কথা তিনি জানাতে চেয়েছেন তারা হল কর্ণ ও কুন্তী। তিনি কর্ণকেই 'প্রথম পার্থ' বলছেন এবং পার্থ বলছেন এইকারণে যে সে পৃথার পুত্র। অর্থাৎ কুন্তীর নাম পৃথা, তাই এরূপ নামকরণ। এজন্যই এই কাব্যনাট্যটিতে এই দুজনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির তুলনায অনেক বেশি সচল। আমরা পার্থ বলতে সবাই অর্জুনকেই বুঝি। কিন্তু এখানে এই নাটকে অর্জুনের কোন ভূমিকা নেই। 'প্রথম পার্থ' হল কর্ণ। কর্ণ-র নাম কেন তিনি প্রথম পার্থ দিলেন কারণ অনুসন্ধান করলে আমার দেখতে পাব যে কর্ণ কুন্তীর প্রথম সন্তান অর্থাৎ কর্ণ কুন্তীর কুমারী অবস্থার সন্তান। কথিত আছে কোন এক মুনির বর লাভ করে কুন্তী যে কোন দেবতাকে আহ্বান করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। কিন্তু ভুলবশত সে কুমারী অবস্থায় সূর্যকে আহ্বান জানায় এবং গর্ভে আসে কর্ণ। তাই কর্ণের ক্ষেত্রে মাতৃ পরিচয়ই বড় হয়ে উঠেছে পিতৃপরিচয় নয়। তাই সন্তানের পরিচয় মায়ের হলে সেক্ষেত্রে পার্থনাম অর্জুন নয় কর্ণেরই হওয়া উচিত, কারণ সেই কুন্তীর (পৃথার) প্রথম পুত্র। তাই কর্ণকে প্রথম পার্থ বলায় যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিতেই হবে।

---

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

এরপর আসা যাক মহাভারতের প্রসঙ্গে। সেখানে আমরা দেখি যখন কুন্তী জানতে পারে পরের দিন সকালে তার দুই পুত্র পরস্পর সম্মুখসমরে উপস্থিত তখন সে উপস্থিত হয় তার প্রথম আত্মজ কর্ণের কাছে। মহাভারতে আছে যে কর্ণ কৃষ্ণের কাছে জেনেছে যে কুন্তী তার জননী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেব বসু কেউই এ ঘটনার অবতারণা করেননি। তাঁরা দেখিয়েছেন যে কর্ণ কুন্তীকে চেনে না এবং কুন্তীই প্রথম কর্ণকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে শুধুমাত্র দুটি চরিত্রকেই বেছে নিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাট্যে রচনার জন্য কর্ণকে কেন্দ্র করে কুন্তী ছাড়াও দ্রৌপদী ও কৃষ্ণ-এর প্রসঙ্গও এনেছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষণীয় যে এই দুটি কাব্যনাট্য অর্থাৎ 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ও 'প্রথম পার্থ'-এ অর্জুনের কোন প্রসঙ্গ নেই। মহাভারতে দেখি অর্জুন এবং কর্ণ উভয়েই সৎ, ধর্মপরায়ণ এবং যথেষ্ট সংবেদনশীল। আবার দুজনেই সাহসী, বীর, পরাক্রমশালী এমনকি শারীরিক গঠনেও দুজনের মিল বর্তমান। আসলে তো তারা সহোদর। তাই সার্বিক এই নৈকট্যের জন্য অর্জুন যদি পার্থ হয়, তাহলে কর্ণ অবশ্য প্রথম পার্থ।

এরপর আসা যেতে পারে রবি ঠাকুরের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'- কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে। এই 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-কাব্যনাট্য রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের তথ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেও আপন ভাবনার আলোকে নবরূপ দান করেছেন। প্রশান্ত কুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী'তে বলেছেন যে জগদীশচন্দ্র বসু একবার লিখিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ করেন যে কর্ণের দোষ গুণ মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবন, তার প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল করে তোলে। যার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহানুভবতার সংগ্রাম সবসময় প্রৌজ্জ্বল ছিল, যে এক সময় মানুষ হয়েও দেবতা হতে পারত এবং যার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাকে নিয়ে কবি কিছু লিখলে সেটা অবশ্যই খুশির কারণ হবে। এই অনুরোধ রক্ষা করতেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'- কাব্যনাট্য লেখেন।

মহাভারতের লেখক কর্ণকে অনেকটা জায়গা দিয়েছেন তাঁর কাব্যে। দুর্বাশার বরের ফলে সূর্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম কর্ণকে ইন্দ্রের কবচ-কুণ্ডল দান, এগাঘ্নী বাণ দান, পাণ্ডব ও কৌরবের অস্ত্র পরীক্ষার সময় কর্মের আগমন ও অর্জুনের সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ইচ্ছা প্রকাশ কৃপাচার্য কর্তৃক কর্ণের পিতৃ পরিচয় জানতে চাওয়া, অপমানিত কর্ণকে দুর্যোধনের অঙ্গরাজ্য দান, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে কৃষ্ণের দ্বারা কর্ণকে তার জন্মবৃত্তান্ত জানানো এবং তাকে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেবার আমন্ত্রণ, কর্ণের প্রত্যাখ্যান, কুন্তীর কর্ণকে স্বপক্ষে আনার চেষ্টা, সূর্যের কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব ও কর্ণের প্রত্যাখ্যান, এই কাহিনি অংশটুকুই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যনাট্যে গ্রহণ করেছেন। কিছুটা সরাসরি আর কিছুটা একটু এদিক ওদিক করে। কেননা উনিশ শতকীয় মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে কর্ণ ও কুন্তী চরিত্র দুটির অন্তরের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'কর্ণকুন্তীসংবাদ'- কাব্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে শুরু করেছেন যেখানে কর্ণ এবং কুন্তী প্রথমেই উপস্থিত এবং কুন্তীকে দেখে কর্ণ তার আপন পরিচয় দিয়ে কুন্তীর পরিচয় জানতে চেয়েছে। কুন্তী তার প্রত্যুত্তরে কিন্তু কর্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী তা উল্লেখ করেই বলতে চেয়েছেন। এরপর কর্ণ যখন জানতে পেরেছে এই অপরিচিতা রমণী কুন্তী, তখন তার মুখ থেকে নির্গত হয়েছে বিস্ময়- ''তুমি কুন্তী! অর্জুন জননী!''[১] কেননা অর্জুনকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে সেই অস্ত্র পরীক্ষার দিন থেকে। যুদ্ধের প্রাক্কালে সেই অর্জুন জননী এসেছে তার কাছে, প্রীত তার বিস্ময়ের সীমা নেই। কুন্তী তার উত্তরে তাঁর এই পরিত্যক্ত পুত্রের জন্য লোক-অন্তরালে সমবেদনা ও পুত্রের অপমানে অশ্রু বিসর্জনের কথা যতই বলুন না কেন, কর্ণের চিত্ত তাতে বিগলিত হয়নি। অত্যন্ত আত্ম সংযম ও ভদ্রতাবোধের পরিচয় দিযে কর্ণ প্রশ্ন করেছে—

''কর্ণ। প্রণমি তোমারে আর্যে! রাজমাতা তুমি,
কেন হেথা একাকিনী? এ যে রণভূমি,
আমি কুরু সেনাপতি।
পুত্র, ভিক্ষা আছে—
কুন্তী। বিফল না ফিরি যেন।
ভিক্ষা, মোর কাছে!
কর্ণ। আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।''[২]

কুন্তী বলেছেন, মাতৃক্রোড়ে তৃষিত বক্ষের মাঝে তাকে তিনি স্থান দেবেন—জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে সবার আগে বসবেন। কিন্তু কর্ণ তা চায় না। আসলে কর্ণ অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি সমবেদনার অভাব তার হয়নি।

কর্ণ জানে কপট পাশাখেলায় হেরে গিয়ে সাম্রাজ্য, সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। মায়ের স্নেহটুকু সম্বল করে তারা বেঁচে আছে। সেই স্নেহসম্পদে ভাগ বসিয়ে তাদের বঞ্চিত করা একান্ত অনুচিত। মায়ের স্নেহ 'দ্যূতপণে না হয় বিক্রয়, বাহুবলে নাহি হারে মাতার হৃদয়- সে যে বিধাতার দান''

একদিকে অভাবিত পরিস্থিতিতে চিরবঞ্চিত মাতৃস্নেহের লোভে চিত্ত আত্মহারা, অন্যদিকে পাণ্ডবদের মাতৃস্নেহ ভাগ বসানোর অনৌচিত্যবোধে অপরাধের আভাষ। কর্ণের দ্বন্দ্বমুখর। মায়ের স্নেহমাখা কাতর আহ্বানে তার অবদমিত মাতৃস্নেহক্ষুধা জেগে উঠেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন মায়ালোকে মনে হচ্ছে এ সব বুঝি তার স্বপ্ন। তবু জাগ্রত অন্তরাত্মা বলছে—

''কর্ণ। সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী,
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে,
রাখো ক্ষণকাল।''[৩]

লোকমুখে কর্ণ শুনেছে যে সে জননীর পরিত্যক্তা। কতবার স্বপ্নে দেখেছে যে, জননী ধীরে ধীরে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কর্ণ দেখতে চেয়েছে তার মুখ। কিন্তু দেখতে পায়নি— স্বপ্নমূর্তি মিলিয়ে গেছে তার শূন্য হৃদয়কে আরো বেশি শূন্য করে দিয়ে।

''কর্ণ। সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডব জননী-রূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে রণক্ষেত্রে, ভাগীরথী তীরে।''[৪]

কাল প্রাতে শুরু হবে মহারণ। অর্জুনের সঙ্গে হবে তার যুদ্ধ। আজ জানা গেল অর্জুনজননী তার মা। তার বিহ্বলচিত্ত পঞ্চপাণ্ডবের পানে ভাই বলে ছুটে যেতে চাইছে। আর তখনি জেগে উঠেছে সঞ্চিত অভিমান—

''কর্ণ। কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীনা
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে? কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে?
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে?''[৪]

কেন অর্জুনকে আর আমাকে তুমি বিচ্ছিন্ন করে রাখলে, যার ফলে শিশুকাল হতে আমাদের দুজনকে দুর্নিবার আকর্ষণে পরস্পর দিকে টানছে— যে আকর্ষণ প্রেমের নয়— প্রবল হিংসার।

''কর্ণ। বিধির প্রথম দান ও বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ কেন সেই দেবতার ধন
আপন সন্তান হতে করিলে হরণ।''

কুন্তী ক্ষমা চেয়েছেন পুত্রের কাছে। কর্ণকে তার নিজের অধিকার নিয়ে ফিরে আসতে বলেছেন। সে সূতপুত্র নয়। সে রাজার সন্তান। কিন্তু অভিমানী কর্ম স্বপ্নসম প্রবল আকর্ষণ ছিন্ন করে বলেছে—

''কর্ণ। মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।
পাণ্ডব পাণ্ডব থাক, কৌরব কৌরব-
ঈর্ষা নাহি করি কারে।''[৭]

কুন্তী সিংহাসনের লোভ দেখালে কর্ণ বলেছে—

''কর্ণ। সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ—
তাহারে দিতেছ মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস!
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।''[৮]

আমার মা, আমার ভাই, আমার রাজবংশ সব ধ্বংস হয়ে গেছে আমার জন্মক্ষণেই— যখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ।

আসলে কর্ণ একদিকে যেমন সংবেদনশীল, স্নেহাকাঙ্ক্ষী বুভুক্ষুহৃদয়, একদিকে যেমন পৌরুষদীপ্ত বীর, তেমনি আর একদিকে সত্য ধর্মে চরিত্রবান, বন্ধুবৎসল, কৃতজ্ঞচিত্ত। সূত অধিরথ ও রাধা তাকে পুত্রজ্ঞানে প্রতিপালন করেছেন. তাঁদের ত্যগ করে শুধু নিজের সুখের জন্য মাতা কুন্তী ও ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডবের কাছে চলে যাওয়ার মত অমানবিক কাজ কর্ণের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সূতজননীকে ছলনা করে রাজমাতার কাছে চলে যাওয়া গর্বের হতে পারে কিন্তু গৌরবের নয়। শত প্রলোভন সত্ত্বেও দাতার প্রতি গ্রহীতার কৃতজ্ঞতাবোধ কর্ণ চরিত্রটিকে মহনীয় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখানেই থেমে যাননি। তিনি দেখিয়েছেন, যুদ্ধের ফল কর্ণ পাঠ করতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে কৌরবের পরাজয় হবে- পাণ্ডবের জয়। তবু কৌরবের পক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবের পক্ষে চলে যাওয়াটাকে অকৃতজ্ঞ অপৌরুষের কাজ বলে মনে করেছে কর্ণ। তাই নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছে—

“কর্ণ। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যাজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিস্ফলের, হতাশের দলে।”[৯]

মাকে অনুরোধ করেছে, শৈশবে জন্মকালে এক তাকে নামহীন, গৃহহীন, ধরাতলে ফলে গিয়েছিল, আবারও তেমনি তাকে ত্যাগ করে যাক দীপ্তিহীন, কীর্তিহীন পরাভবের মধ্যে। সে দুঃখ কর্ণের কাছে দুঃসহ হবেনা, কিন্তু জয়লোভে, যশলোভে, রাজ্যলোভে যদি সে বীরের সদগতি থেকে ভ্রষ্ট হয়, তবে তা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণাদায়ক হবে।

কর্ণের এই মহৎ চারিত্রিক দৃঢ়তা মহাভারতসম্মত। কিন্তু তার অন্তরের দ্বান্দ্বিক আলোড়ন- যা এই চরিত্রটিকে জীবন্ত ও মানবিক করে তুলেছে, তা রবীন্দ্রনাথের কীর্তি। কুন্তী যুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে কর্ণের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে তাকে পাণ্ডব পক্ষে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল। কৃষ্ণের পরামর্শে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে, এ কথা আমরা জানি। কর্ণ যদি ফিরে নাও আসে, তাকে অন্তত মানসিক ভাবে দুর্বল করে দেওয়া যাবে যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানকার রাজনৈতিক ভাষায় একে ‘দলভাঙানো’ বলা যেতে পারে। কুন্তী সে কাজে সফল হয়েছিল। বোঝাই যায়, মহাভারতেরকুন্তীর পুত্রস্নেহ অপেক্ষা কর্ণ সম্ভাষণে রাজনৈতিক স্বার্থই ছিল প্রবল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কুন্তীর এই পরিচয়কে বড় করে দেখাননি। তিনি কুন্তীকে লোকলজ্জার ভয়ে সন্তানকে পরিত্যাগ করার জন্য অপরাধী, মর্মান্তিক ক্লেশাচ্ছন্ন স্নেহময়ী জননী রূপেই তুলে ধরেছেন। তার এই আন্তরিকতায় তাই অবিশ্বাস করেননি কর্ণ। তাই তার অন্তর প্রবল দোটানায় দোলাচল হয়েছে। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট এই চরিত্র দুটি মহাভারতানুসারী কাহিনি মাত্র নয়- চিরন্তন মহাকাব্যিক চরিত্র হয়ে উঠেছে।

তবে বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই কাব্যনাট্যে প্রথম যে অভিনবত্ব আনলেন সেটা হল তিনি কর্ণ এবং কুন্তীর কথোপকথনের আগে দুই বৃদ্ধের সঙ্গে কুন্তীর কথোপকথনের প্রসঙ্গ। যেটা খুবই প্রাসঙ্গিক। এই প্রথম কোন একটা সত্য ঘটনা কুন্তী জানাতে চেয়েছে, যে কথাটা শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে সেটা জনসমক্ষে বলতেও মানা করে প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছে। কুন্তী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে—

"শুনুন আমার কলঙ্ক ও বেদনা,
সাক্ষী থাকুন আমার স্বীকারোক্তির,—
আপনাদের মার্জনা পেলে আমার মন আরো নির্ভার হবে।"[১০]

এরপর কুন্তী যখন কর্ণকে অভিভাষণ করেছে তখন কর্ণ প্রণত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে সে তার কী কাজে আসতে পারে। আর তার পরেই যখন কুন্তী তার পরিচয় দিয়েছে তখন যথারীতি বিস্ময়ের সঙ্গে কর্ণ বলেছে—

"কুন্তী! অর্জুনের মাতা!"[১২] প্রত্যুত্তরে কুন্তী জানিয়েছে যে সে শুধুমাত্র অর্জুনের নয়, একই সঙ্গে যুধিষ্ঠির, ভীম এবং আরো এক জনের মা সে।

এরপর কর্ণ যখন জানতে চায় যে অন্য জন কে? তার উত্তরে কুন্তী বলেছে যে সে তাকে প্রচ্ছন্ন রেখেছে এবং এও বলেছে যে সে অর্জুনের মত বীর আবার যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মাত্মা। এই শুনে কর্ণ ভেবেছে যে তাহলে তার দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। এর পরেই কুন্তী বলেছে—

"তোমার সঙ্গে অচিরে তার দেখা হবে, কর্ণ,
দেখবে কেমন অবিকল সে প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার;
তোমারই মতো দীর্ঘকায়, আয়তাক্ষ,
তোমারই মতো শক্তিমান, হৃদয়বান,
মহত্তম বন্ধু, শত্রুর পক্ষে অসহন-
ভরত বংশের সেই প্রথম পার্থ, যার নাম-
(হঠাৎ থেমে, উচ্ছ্বসিত স্বরে)
কর্ণ, পুত্র আমার!"[১২]

কর্ণ কুন্তীর পুত্র সম্বোধনে কৃতার্থ হয়েও তার নিজ পরিচয় থেকে বিচ্যুত হয়নি। কুন্তী তাকে জানিয়েছে যে তার গর্ভ ছিল কর্ণের প্রথম আশ্রয়। তার প্রাণ বায়ু ছিল কর্ণের প্রাণবায়ু, তার খাদ্য ছিল কর্ণের পথ্য। সে সূর্যের সন্ধান। এর উত্তরে কর্ণ যখন বলেছে যে সে আগে শুনেছিল সূর্যদেব তার পিতা তখন তা তার সত্যি বলে মনে হয় না। সে বলেছিল—

"...কিন্তু কে নয়,
কে নয় সূর্যের সন্তান এই জগতে?"[১৩]

কুন্তী প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে যে একমাত্র মা জানে তার সন্তান কে আর তার সন্তানের পিতা কে। এরপর কর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলেছে যে সূর্যের তেজঃপুঞ্জকে ধারণ করতে পারে এমন কার আছে। কর্ণের এই সন্দেহ দূর করতে কুন্তী দুর্বাশা মুনির আর্শীবাদের কথার পুরোটায় কর্ণকে বলেছে। তখন আবেগের সঙ্গে কর্ণ কুন্তীকে মা বলে ডেকেছে। এই ঘটনাটা মহাভারত বা 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'- কোথাও নেই। এটা বুদ্ধদেব বসুর একান্ত নিজস্ব ভাবনা। এর পর কুন্তী কর্ণকে তার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছে। কর্ণ কিন্তু তার জন্ম নিয়ে তখনও সন্দিহান সে বলেছে—

''আমার জন্ম নেবার কোন কারণ ছিল না, কিন্তু কোনো- এক
নারী চেয়েছে মাতৃত্ব, পেয়েছে দেহে-মনে দৈব প্রেরণা-
তাই আমার জন্ম।
আমার মনে হয় মাতা একাই সন্তানের জন্ম দেন,
আমার মনে হয় আমরা সকলেই কুমারীর সন্তান-
পিতা শুধু উপলক্ষ্য গোত্র চিহ্ন।''[১৪]

এই সাহস বুদ্ধদেব বসুর আগে কেউ দেখাতে পারেনি। এইভাবে কোনো মহিলাকে সরাসরি বলতে পেরেছে একমাত্র বুদ্ধদেব বসুর কর্ণ। কর্ণ জানতে চেয়েছে তার জন্মের পর কুন্তী কোথায় ছিল। সে নিজেকে বলেছে— ''লজ্জিতা মাতার পরিত্যক্ত সন্তান!''[১৫] সে কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করেছে যে আজ কেন সে লজ্জা পায়নি তাকে পুত্র বলে ডাকতে। কুন্তী এখানেই রাজনীতিবিদের মত বলেছে তাকে ধিক্কার করতে। কুন্তী বলেছে— ''আমার চোখে জলে হোক তোমার অভিষেক''।[১৬]

এত পরেও কর্ণ তাকে প্রত্যাখ্যান করলে কুন্তী তাকে উত্তরাধীকার গ্রহণের বার্তা দিয়েছে, তাকে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের মর্যাদা দিতে চেয়েছে, ইন্দ্রপ্রস্থের সংশয়ময় ভবিষ্যত থেকে ভরত বংশকে উদ্ধারের আবেদন রেখেছে তার কাছে। কর্ণ তখন সরাসরি বলেছে—

''তাহলে এই আপনার অভীষ্ট? পাণ্ডবের শ্রীবৃদ্ধি?
অর্জুনের আয়ু?
সেইজন্যই এই পরিত্যক্ত পুত্রকে আজ
মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করলেন?''

এক্ষেত্রে কুন্তী কোন কিছুই গোপন না করে বলেছে যে এই রাষ্ট্রের উন্নতি, কুরু বংশের মঙ্গল তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কাশ্মীর থেকে কেরল পর্যন্ত ভারতবর্ষে তার একটা কর্তব্যবোধ আছে। কিন্তু কর্ণের কাছে সে কর্তব্যবোধে আসেনি এসেছে রক্তের টানে হৃদয়ের আজ্ঞায়। কর্ণ তখন দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চেয়েছে। যখন হস্তিনাপুরে রাজপুত্রদের অস্ত্র শিক্ষার প্রদর্শনী হচ্ছিল তখন সূতপুত্র বলে কর্ণকে সেই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। তাতে কুন্তী আনন্দিতই হয়েছিল কারণ তাকে দুই পুত্রের লড়াই দেখতে হয়নি।

সেটাকে কুন্তী ভাগ্য বলে মনে করেছিল। এত সত্ত্বেও কর্ণ একবিন্দু বিচলিত না হয়ে বলেছে দুর্যোধন তাকে আতিথ্য দিয়েছে তাই সে তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সে বলেছে।

''অবজ্ঞায় বেঁচে থাকা দুঃখের সম্মান সর্বদায় কাম্য।
আমি ক্ষত্রিয়ের সংস্কার পাইনি। কিন্তু অর্জন করেছি
দুর্যোধনের কাছে ক্ষত্রিয়ের অধিকার।''[৯]

সে আরও বলেছে—

''আমি শাস্ত্র মানি না; আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব।
যদি পাণ্ডবেরা আমার ভ্রাতা হন, তবে কৌরবেরাও তা-ই।
যদি মনু হন আদিপিতা, আমার ভাই তবে সর্বমানব।''[১৯]

এই কথা শুনে কুন্তী বলেছে যে বঞ্চিত শুধু কর্ণ একা নয় কুন্তীও- পুত্রহীন হয়ে। কর্ণ রাজা হলেও যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জুন সকলে তার সেবা করবে। দ্রৌপদী মিলিত হবে তার সঙ্গে। কারণ সেও ধর্মত কর্ণের ভার্যা- একথা কুন্তী বলেছে। কিন্তু কর্ণ স্বয়ংবর সভার ঘটনা মনে করে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে—

''পাঞ্চালী সুখে থাকুন। আপনার মঙ্গল হোক। আপনি ফিরে যান।''[২০]

কিন্তু উপেক্ষা সত্ত্বেও যাবার আগে কুন্তী কর্ণকে জানিয়েছে এক নারীর সান্ত্বনার জন্য যুদ্ধের পরেও সে যেন ফিরে আসে তার কাছে। কিন্তু কর্ণ জানিয়েছে—

''আর কয়েকটা দিন, কয়েক বৎসর-
তারপর আমরা,
কুন্তী, কর্ণ, অর্জুন-
আমরা হ'য়ে যাবো
মেঘাচ্ছন্ন উষার মতো ধূসর
এক স্বপ্ন,
তন্দ্রার ঘোরে অর্ধশ্রুত কোনো ধ্বনির মতো
এক মর্মর-
সেই সব অন্য লোকেদের মনের মধ্যে,
যারা এখনো জন্ম নেয়নি।
(এগিয়ে এসে, কুন্তীকে আলিঙ্গন ক'রে)
মা, এসো আমরা সেই স্বপ্নকে সম্পূর্ণ করি,
তুমি তোমার স্বস্থানে, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে,
আর আমি, আমার নির্জনতায়।''[২১]

বুদ্ধদেব বসু কবি বলেই হয়তো এমন সুন্দর একটা কাব্যনাট্য আমাদের উপহার দিতে পেরেছেন এক্ষেত্রে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বলা যেতে পারে। যেন

রবীন্দ্রনাথ যেখানে শেষ করেছেন ঠিক সেখানেই তিনি শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে তিনি তাঁকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র নিজের অভিনবত্বে।

তথ্যসূত্রগুচ্ছ

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৩৮, একাদশ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৬, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র, ১৪১৬, ভাদ্র, ১৪১৮, পৌষ, ১৪১৮, পৃ. ৩৯৬

২. তদেব, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮

৩. তদেব, পৃ. ৩৯৯

৪. তদেব, পৃ. ৪০০

৫. তদেব, পৃ. ৪০১

৬. তদেব, পৃ. ৪০২

৭. তদেব, পৃ. ৪০২

৮. তদেব, পৃ. ৪০২

৯. তদেব, পৃ. ৪০৩

১০. বসু বুদ্ধদেব, অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ দুটি কাব্যনাট্য, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৭০ (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭), পঞ্চম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২ (মাঘ, ১৪১৮), পৃ. ৮১

১১. তদেব, পৃ. ৮৪

১২. তদেব, পৃ. ৮৫

১৩. তদেব, পৃ. ৮৭

১৪. তদেব, পৃ. ৯১

১৫. তদেব, পৃ. ৯৩

১৬. তদেব, পৃ. ৯৫

১৭. তদেব, পৃ. ১০০

১৮. তদেব, পৃ. ৯৯

১৯. তদেব, পৃ. ১০২

২০. তদেব, পৃ. ১০৭

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জ

১. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৫, কলকাতা

২. বসু বুদ্ধদেব, অনামী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ দুটি কাব্যনাট্য- দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৭০ (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭), পঞ্চম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১২ (মাঘ ১৪১৮)

৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, পৌষ, ১৩৩৮, একাদশ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৬, পুনর্মুদ্রণ চৈত্র, ১৪১৬, ভাদ্র ১৪১৮, পৌষ, ১৮১৮

৪. ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৬১, পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ বৈশাখ, ১৪১৯

৫. বিশী প্রমথ নাথ, ওরিয়েন্টল বুক কোম্পানী, কলকাতা, পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ জুলাই, ২০১৪

সহায়ক পত্রিকা

১. উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসুর জন্ম শতবর্ষে বাংলা একাডেমীর সশ্রদ্ধ নিবেদন- বাংলা একাডেমীর সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক- ৩৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৮

২. উর্ণনাভ- ৪র্থ বর্ষ, মহাভারত সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫, আসানসোল।

এবং প্রান্তিক প্রকাশিত

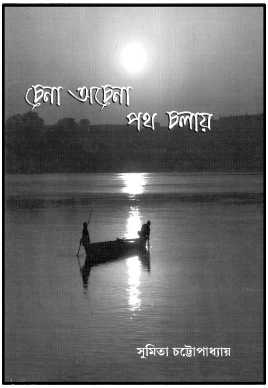

চেনা অচেনা পথ চলায়
সুমিতা চট্টোপাধ্যায়
মূল্য : ৮০ টাকা

সময় মানুষকে চেনায়, শেখায়। শিল্পী সময়ের হাত ধরে চলে সৃষ্টির পথে পথে। জীব-অজীব সমস্ত রকম উপাদান কুড়িয়ে থরে থরে সাজিয়ে রাখেন অন্তরে। সৃষ্টির সাধনায় মগ্ন আত্মা নিসর্গের যজ্ঞ বেদীতে প্রস্তুত। বিলাস বৈভবে মোড়া আজকের আধুনিকতম জীবন। উন্নততর প্রযুক্তির আতিথ্য সমগ্র জীবন জুড়ে। তারই মধ্যে স্বাদবদলের গৃহস্থ রুচি সংজ্ঞায় জায়গা করে নেয় প্রাক্-আধুনিক জীবন। পৌরাণিক ছোঁয়া ছাঁদ মুহুর্তের জন্য বদলে দেয় পারিবারিক রীতি-রেওয়াজ। লোক জগতের অন্তর খুঁড়ে অলোক আনন্দ তুলে আমার কাজ শিল্পী করেন নিখুঁত বয়নশিল্পের আদলে। জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে ফেরেন স্বপ্নজীবীর মত। জীবন-জগৎ অন্তহীন পথের গান পাথেয় করে স্রষ্টা চলেন মনফকিরার বেশে। আত্মার অনুসন্ধান করাই যে প্রকৃত মানুষের সন্ধান, জীবনের সন্ধান সেকথা প্রাবন্ধিক সুমিতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধের বিষয় বিন্যাসে প্রকাশ করেছেন।

লোকায়ত বিশ্বাসে ধর্ম ঠাকুর

সৌভিক পাঁজা*

লোকায়ত বিশ্বাসে আশ্বস্ত মানুষ। প্রাচীন কালে থেকেহেই নানা দেব-দেবীর পুজো হয়ে আসছে। একটা সময় ছিল যখন মানুষ বিশ্বাস করতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পিছনে রয়েছে দেবতার লীল খেলা। পবন দেবতা, বরুণ দেবতা আমাদের সে কথাকেই স্মরণ করায়। আজও এই বিশ্বাস অব্যাহত। তাইতো ঝড়-জলের সময় দাদু-ঠাকুমার মুখে শোনা যায়-

"পবন পিঁড়েতে বসো
পবন পিঁড়েতে বসো
পবন পিঁড়েতে বসো।"

মধ্যযুগের বাংলাতেও মানুষ দেবলীলার বিশ্বাসে আশ্বস্ত ছিল। দেখা দিয়েছে নানান দেব-দেবী। রচিত হয়েছে একাধিক মঙ্গলকাব্য। রাঢ় বাংলার জীবনালেখ্য ধর্মমঙ্গল কাব্য। এই ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই পরাধীন বাঙালি আর্য-অনার্যরা সংঘবদ্ধ হবার সংকল্প গ্রহণ করেন। একথা বলার কারণ ধর্ম পূজা মূলত ডোম জাতির লোকেরা করলেও বর্তমানে হিন্দু ব্রাহ্মণরাও এর পুজো করেন।

ধর্মরাজ, ধর্মঠাকুর, ধর্মরায় যে নামেই ডাকা হোক না কেন প্রত্যেকটি শব্দের মূলে রয়েছে 'ধর্ম'। এই নামটির উৎস সম্পর্কে মতভেদ লক্ষ করা যায়-

● পুরাতাত্ত্বিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন 'ধর্ম' শব্দের অর্থ 'বুদ্ধ'। অমরকোষ বুদ্ধের আর এক নাম ধর্মরাজ।

'সর্বজ্ঞ: সুগতো বুদ্ধো ধর্মরাজাসুথাগত'

● নৃতাত্ত্বিক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র রায় মহাশয় মনে করেন যে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে সূর্যের আর এক নাম 'ধর্ম'।

● নৃতত্ত্ববিদ শ্রী ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর মতে 'ধর্ম' ঠাকুর বৈদিক বরুণ দেবতার আধুনিক সংস্করণ মাত্র।

● ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন 'ধর্ম' শব্দটি কূর্মবাচক প্রাচীন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপ।

এই চতুর্থ মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ 'কূর্ম' শব্দের অর্থ 'কচ্ছপ'। আমি যে হাতি রূপ ধর্মরাজের কথা আলোচনা করবো সেই স্থানের বসবাসকারী মানুষেরা কচ্ছপ খায় না। কোন ভাবে কচ্ছপ তাদের হাতে এলে মাথায় সিঁদুর দিয়ে তাকে জলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই অনায়াসেই বলা যায় ধর্ম কথাটির উৎস কূর্ম রূপী কচ্ছপ থেকে।

ধর্মের মূর্তি কেমন? এ প্রশ্নের মিমাংসা করতে গিয়ে নানা পণ্ডিত নানান মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধের শিরনামে ধর্ম ঠাকুরের মূর্তিকে 'হাতি' বলেছি। তার আগে তার সম্পর্কে

*প্রাবন্ধিক

সাধারণ ধারণার কথা বলি-

● হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ খ্রিঃ বঙ্গিয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এবং ১৮৯৪ খ্রিঃ Royal Asiatic Society -র মুখপত্রের ডিসেম্বর সংখ্যায় ধর্মমঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনিই প্রথম ধর্ম - বৌদ্ধ দেবতা বলেন।

● মানিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর কাব্যে ধর্মকে শূন্য মূর্তি বলে ঘোষনা করেছেন।

● 'ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্য দেবতা। ইনি শ্বেত-অশ্বারোহী সিপাহী বেশধারী সূর্যও বটেন' বলেছেন সুকুমার সেন।

● শূন্যপুরাণ, অনাদ্যমঙ্গল, ধর্মপূজা বিধানে ধর্মের স্বরূপ শূন্য মূর্তি।

● আবার কোন স্থানে একখণ্ড প্রস্তরের গায়ে পিতলের পেরেক পরিয়ে দেওয়া হয়।

● কোন কোন মন্দিরে ধর্মঠাকুর একটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সবসময় ঢাকা থাকে। বাইরে থেকে দেখা যায় না।

● প্রস্তরখণ্ড কোথাও সুগোল আবার কোথাও ডিম্বাকৃতি। বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রামে ধর্মঠাকুরটি শালগ্রাম শিলার ন্যায় সুগোল। আসানশোলের ডেমরা গ্রামের ধর্মঠাকুর ডিম্বাকৃতি।

● মানিকরায় গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায় গোপালপুরের ধর্মঠাকুরটি কাঁকড়া বিছার মতো।

● শূন্যপুরানে কেবল কূর্মের উল্লেখ আছে। তবে এই ধর্মের মূর্তি কোথাও পাওয়া যায় না। যদিও আমি পূর্বে বলেছি ধর্ম শব্দটির উৎস কূর্ম শব্দ থেকে।

প্রবন্ধের যেটি মূল বিষয় তা হল ধর্মরাজের মূর্তি হাতি। এটি দেখা যাবে বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার মদনবাটী গ্রামে। সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাবো ধর্মরাজের পাশাপাশি বিষ্ণুর একটি শীলামূর্তি পূজিত হয়। কোন কোন গ্রামে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার কূর্মের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করে ধর্মশালাকে বিষ্ণুরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে এক্ষেত্রে ধর্মরাজের পাশাপাশি বিষ্ণুর শীলামূর্তি পুজো করার কারণ গবেষণার বিষয়।

হাতির মূর্তিটি মাটির তৈরি। উচ্চতায় এক ফুট সাত ইঞ্চি। প্রস্থ এক ফুট। বর্তমানে হাতির মূর্তির পাশে আরও একটি হাতির মূর্তি ও ঘোড়ার মূর্তি পুজো করা হয়।

ধর্ম ঠাকুরের পুজোর যে সমস্ত কারণগুলির কথা জানা যায়-

● নিঃসন্তান গ্রামবাসী সন্তান কামনায় প্রার্থনা জানিয়ে পুজো করে।

● অনাবৃষ্টির সময় ধর্মঠাকুরের পুজো দিলে বৃষ্টি হবে এই লোকায়ত বিশ্বাসে পুজো করে।

● কুষ্টরোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই পুজো করে।

● চক্ষু রোগেও ধর্ম ঠাকুরের কাছে মানসিক করা হয়।

● মৃত সন্তান প্রসবের হাত থেকে বাঁচার মানসিক করা হয়।

আমি যে হাতিরূপী ধর্ম ঠাকুরের কথা আলোচনা করছি। সেই গ্রামের মানুষ তাদের সমস্ত চাওয়া পাওয়াকে ধর্মরাজের কাছে সমর্পন করে। মনস্কামনা পূর্ণ হলে মানসিক শোধ করে। তাদের চাওয়া পাওয়া-

● কেও যখন গুরুতর রোগে অসুস্থ তখন তার পরিবার মানসিক করে বাবা ধরম আমার পরিজনকে সারিয়ে দাও আমি তোমায় দু-হাড়ি খির ভোগ দেব। এই ভোগ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

● কেও বা তার পুত্র সন্তানের চাকরির জন্য ধর্মরাজের কাছে মানসিক করে বাবা আমার ছেলের চাকরী হলে আমি তোমায় সোনার হার গড়িয়ে দেব।

● কেও চোখ অপারেশন হবে তখন বাবার কাছে মানসিক করে ধুনা পুরানোর।

পশুবলি ধর্ম ঠাকুরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলেও মদনবাটি গ্রামের পাঁজা পাড়ায় কোন কিছু বলি দেওয়া হয় না। এখানে মানসিকের যে প্রথাটি সবচেয়ে প্রচলিত তা হল পরমান্ন দেওয়া এবং ধূনা পুড়ানো। দুটিই হয় পৌষ সংক্রান্তির দিন। তবে অনেক সময় মাটির ছোটো ছোটো ঘোড়া ধর্মরাজকে উৎসর্গ করা হয়।

ধর্ম ঠাকুরের পুজার পুরোহিত সাধারণত ডোম সম্প্রদায় ভুক্ত হয়। তাদের কোন পৈতে থাকে না। তবে তারা বাহুতে তামার তাগা ও হাতে তামার আংটি পরিধান করে। হাতি রূপী ধর্ম ঠাকুরের পুজো পৈতে ধারী ব্রাহ্মণরাই করেন। পুজোর মন্ত্রটি হল-

এতে গন্ধে পুষ্পে ধর্মরাজায় নম
এতে গন্ধে পুষ্পে নারায়নায় নম
এতে গন্ধ পুষ্পে দুর্গায় নম
এতে গন্ধে পুষ্পে শিবায় নম
এতে গন্ধে পুষ্পে সূর্যায় নম
শরী ধর্মরাজায় নম
পরিশেষে 'প্রণাম মন্ত্র'।

ধর্ম ঠাকুরের তিন প্রকারের পুজো প্রচলিত। প্রথমত-বাৎসরিক। বারোদিন ধরে চলে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে উৎসব সমাপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে ধর্মের গাজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে কোন কোন জায়গায় বছরের অন্য কোন সময় ধর্ম ঠাকুরের পুজো হয়। দ্বিতীয়ত গৃহভরণ বা ঘরভরা। বারোদিন ধরে এই পুজো চলে বলে একে বার্মাতিও বলে। তৃতীয়ত-নিত্যসেবা। পুজো হয় দিনে দু-বার। প্রথমত - দ্বিপ্রহরে ধর্মশিলাটি শয্যা থেকে তুলে স্নানাদির পর পুজো করে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়ত - রাত্রিকালে বৈকালী নৈবেদ্য দিয়ে পুনরায় শয্যায় শয়ন করানো হয়। হাতিরূপী ধর্ম ঠাকুরের ক্ষেত্রে নিত্যসেবার প্রচলন আছে। এক্ষেত্রে দুবার করে পুজো করা হয়। প্রথমত- সকালের দিকে। দ্বিতীয়ত - বিকালে বা সন্ধ্যার সময়। কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।

পৌষমাসে সংক্রান্তির দিন পুজো হয় ঘটা করে। পাড়ার প্রত্যেকটি ঘর এক হাঁড়ি করে পরমান্ন বানান মাটির হাড়িতে। তবে বর্তমানে পিতলের হাড়ি ব্যবহৃত হয়। পরমান্ন বানান ব্রাহ্মণরা। পরমান্ন বানানোর উনান তৈরি করে পাড়ার সাধারণ মানুষ। মাটির তিনটি চাপকে কৌশলে বসিয়ে উনান বানানো হয় সংক্রান্তির আগের দিন বা সংক্রান্তির দিন। ধর্মরাজের মন্দিরের সামনে খোলা জায়গায় প্রত্যেক পরিবার পরমান্ন বানালেও প্রধান যে হাড়িতে সকলের উপকরণ সহযোগে পরমান্ন বানানো হয় তা হল 'নিজ' ভোগ। এটিই প্রধান। কোন পরিবার কোন কারণ বসত নিজে পরমান্ন বানাতে না পারলে 'নিজ' ভোগের হাড়িতে চাল ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে থাকে। পরমান্ন বানানো হয়ে গেলে খড়ে বিড়ে দিয়ে গোল করে তা নামানো হয়। ধর্মরাজকে শঙ্খ, ঘন্টা ধ্বনি সহযোগে মন্দিরের বাইরে এনে ঠিক মাঝখানে রেখে পুজো করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কেবলমাত্র একটি দিনই ধর্মরাজকে মন্দিরের বাইরে আনা হয়। পুজো শেষে ধূনা পুড়ানোর পালা।

যিনি ধূনা পোড়াবেন তাকে নতুন পোশাক পরে গলায় গামছা দিয়ে কাছেই 'নতুন পুকুর' নামে একটি পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে আসতে হবে। তারপর ছোট্ট সরার উপর নারকেলের ছিবড়ে জ্বেলে গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে কোন শারীরিক রোগের আরোগ্য হলে সেই স্থানে সরা রেখে ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণ আগুনের উপর ধূনা দেন। তবে অন্য কোন কারণ হলে মাথার উপর সরা রেখে ধূনা পোড়ানো হয়। এরপর ধর্মরাজকে মন্দিরে তুলে সকলকে 'নিজ' ভোগ বিতরণ করার পর, আপন আপন ভোগ সকলে বাড়ি নিয়ে আসেন।

কথিত আছে হাতিরূপী ধর্মরাজ আগে ছিল মদনবাটী গ্রাম থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে 'ধরম সায়ের' নামে একটি পুকুরের পাড়ে। গ্রামের কোন একজন স্বপ্নাদেশ পেয়ে মূর্তিকে মদনবাটী গ্রামে একটি নিমগাছের তলায় রাখে। পরে আবার অন্যকেও স্বপ্নাদেশ পেয়ে বিষ্ণুর পাশে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে আসে। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০২ সালে।

ধর্ম ঠাকুরের মূর্তি হাতির কথা বললেও ওই একই গ্রামে আরও দুটি ধর্মতলা আছে। একটি নিম গাছের নিচে আর একটি বাঁশ বনের তলে। উভয়ক্ষেত্রে ধর্মের মূর্তিটি হচ্ছে শূন্য। বর্তমান নিম গাছের তলে আর আরাধনা হয় না। তবে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তোলে হাতি। যা ধর্মরাজ নামে পরিচিত। ধর্ম শব্দের উৎস প্রসঙ্গের আলোচনায় আমি বলছি কচ্ছপের সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়। তবে আকারগত কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। সুকুমার সেন যখন বলেন ''ধর্ম' ঠাকুর বৈদিক সূর্য দেবতা। ইনি শ্বেত অশ্বারোহী সিপাহী বেশধারী সূর্যও বটেন'' যুদ্ধের একটি বিশেষ বাহিনী অশ্বারোহী। যা অন্যান্য বাহিনী যেন পদাতিক ও হস্তি বাহিনীর চেয়ে দ্রুতগামী। ধর্ম ঠাকুরের রূপ তাই অশ্বারোহী বেশধারী সূর্য দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। যুদ্ধের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ বাহিনী হল হস্তি বাহিনী। যা পদাতিক ও অশ্বারোহীর চেয়ে শক্তিশালী। এই শক্তির কথা মাথায় রেখে মদনবাটী গ্রামের ধর্ম ঠাকুরের রূপ হাতি বলে আমার মনে হয়। অর্থাৎ ধর্মরাজ যখন তাদের সহায়

তখন তাদের কোন কাজে বাধা আসবে না। যুদ্ধে জয় লাভের মত সশস্ত্র ক্ষেত্রে তারা জয়লাভ করবে। এরকম একটা ধারনা তাদের মনে বদ্ধমূল।

'ধর্মরাজ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় 'ধর্ম' ও 'রাজ' শব্দ দুটি। 'ধর্ম' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঈশ্বরের উপসনা পদ্ধতি। 'রাজ' শব্দের অর্থ প্রধান। এখান থেকে আমরা অনায়াসে বলতে পারি উক্ত গ্রামের মানুষের কাছে ঈশ্বরোপসনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ছিল হাতি রূপী ধর্ম ঠাকুরের উপাসনা তাই এরূপ নামকরণ বলে আমার মনে হয়। আবার 'ধর্ম' শব্দের আভিধানিক অপর একটি অর্থ হল 'সৎকর্ম' আর 'রাজ' শব্দের অর্থ হল 'রাজ্য'। এক্ষেত্রে যে গ্রামের নাম উল্লেখ আছে সেই গ্রামকে বোঝানো হয়েছে। তাই আমরা অনায়াসে বলতে পারি উক্ত গ্রামের মানুষেরা কুকর্ম থেকে বিরত থেকে সৎকর্মের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করতো বলে এরূপ নাম করণ।

হাতি রূপী ধর্ম ঠাকুরকে ধর্মরাজ বলা হয়। মানবরূপী রাজার সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় না। হাতির রূপের ভয়ঙ্করতা লক্ষ করা যায়। যা আমাদের মনে ভয়ভাব জাগিয়ে তোলে না, বরং পিতা যেমন আমাদের কাছে ভয়ের কারণ হলেও হয়ে ওঠে আশ্রয় স্থল, ঠিক তেমনি ধর্মরাজও উক্ত গ্রামের মানুষের কাছে একমাত্র আশ্রয় স্থল।

মদনবাটী গ্রামের মানুষের মনে বদ্ধমূল ধর্ম ঠাকুর। ধর্মরাজের নামে তারা সমস্ত সফলতা অর্জন করে। তাইতো গ্রাম থেকে প্রায় দুকিলোমিটার দূরে গড়ে ওঠা শান্তাশ্রম বাজারের সাইন বোর্ডে চোখে পড়ে 'ধর্মরাজ বস্ত্রালয়', 'ধর্মরাজ সু হাউস' নাম। শুধু কী তাই দোকানের খাতায় গণেশকে স্মরণ করে যেমন লেখে 'শ্রী শ্রী ওঁ গণেশায় নম' তেমনি লেখে 'শ্রী শ্রী জয়বাবা ধর্মরাজ'। আসলে দোকানের মালিকের বাড়ি মদনবাটী গ্রামে।

কমবেশি সকল মানুষের কাছে মানসিক শক্তির চাবিকাঠি দেবতা। তা সে মনসা, শীতলা, চণ্ডী, কালী, দুর্গা, ধর্ম যে দেবতাই হোক না কেন। আবার সে সাকার ও নিরাকার হলেও সাধারণ মানুষের কাছে যার আসে আনে-। দেবতা আমাদের মনে যেমন ভয় সঞ্চার করে ঠিক তেমনি জাগিয়ে তোলে ভক্তি। আমাদের মনের গোপন দ্বার সেই কারণে কখনও উন্মুক্ত হয় আবার কখনও বা রুদ্ধ থাকে। ধর্ম ঠাকুরও যেমন আমার কাছে সেই চাবিকাঠি। আসলে আমি এই মদনবাটী গ্রামের জল হাওয়া তিল তিল করে গ্রহণ করে উঠেছি তিলোত্তমা। তাই রচনার শেষে নিদ্বিধায় বলতে ইচ্ছে করে - 'জয় বাবা ধর্মরাজ'।

সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস - ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) - ড. সুকুমার সেন।

৪। মহাকবি ঘনরামের শ্রী ধর্মমঙ্গল-ড. রমজান আলি।

ওসমান : মননের ঔপনিবেশিকতা মুক্তির সেপাই

সৌমী বসু*

খুব বেশি দিন হয়নি মানচিত্রটার আকার বদলেছে আমাদের। কান পাতলে এখনও বাতাস শোনাবে চাপা গোঁগানি আর ধূসর মাটির তলায় মিলবে চাপ চাপ রক্ত, হয়তো! মধ্যরাতের ঘন্টা যখন রাত বারোটা কে সূচিত করল, পৃথিবী যখন নিদ্রাগত, তখন একমাএ জেগে উঠেছিল ভারতবর্ষ। জেগে উঠছিল, জেগে উঠলোও, যেন দুহাত কাটা বিকলাঙ্গ এক মানুষ..রেডক্লিফ লাইনের দুপাশে নিথর নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে, যার দুই শক্ত সবল পেশী। দেশ আর রাষ্ট্রের টানাটানি তে জয় ছিনিয়ে নিয়ে গেল রাষ্ট্র।

নদী-পাহাড়-জঙ্গল-মালভূমি, শহর-গ্রাম-লোকজন-পশুপাখী, শাঁখ-আজান-হাসি - কান্না-আড়ি-ভাবে গড়া দেশটার বুকে পিঠে অসংখ্য অজস্র বুলেট দাগালো রাষ্ট্রিক ক্ষমতা-মিলিটারি- সেনা-ভারী বুটের টহলদারি আর কিছু নারকীয় খুনজখম। বাতাস হোল ভারী। চিৎকার গুলো গলা পর্যন্ত এসেও আর বেরল না, যেন হাঁ-মুখে কেউ পুরে দিয়েছে গাদা তুলো। আলাদা হয়ে গেল রথের পাঁপর আর ঈদের হালিম।

আমরা আলাদা হয়ে গেলাম।

আমরা পর হয়ে গেলাম।

আমরা শত্রু হয়ে গেলাম।

এক শরীর থেকে খসিয়ে দেওয়া দুটো টুকরো, অথচ, কেউ কারোর মধ্যে পেল না শিকড়ের টান! দেশ হেরে গেল। জয়লাভ করল রাষ্ট্র - একদিকে, ভারতবর্ষ অপরদিকে পাকিস্তান। বাংলাদেশের জন্মের সাথেও জুড়ে আছে এই কাটাকুটি খেলা। ভারত-পাকিস্থান-বাংলাদেশের গাল বেয়ে ঝরতে থাকা কান্নার জল সময় শুকয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে অনেক, কিন্তু লোনা জলের দাগ যায়নি। যেভাবে থেকে যায় জন্মদাগগুলো, সেভাবেই রয়ে গেছে ওরা।

পূর্ব পাকিস্তানের 'বাংলাদেশ' হয়ে ওঠার লড়াইয়ের স্পর্শ ভরা, উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত এই 'চিলেকোঠার সেপাই', বাংলা কথাসাহিত্য ধারায় মাইলস্টোন হয়ে যাওয়া এই উপন্যাসটি এই অস্থিরতার জ্যান্ত দলিল। ইলিয়াস এর ''চিলেকোঠার সেপাই'-এর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আমার মনে প্রথমেই যে প্রশ্ন জেগেছে তা হোল,-শুরুতে বাংলাদেশ কি আদৌ বাংলাদেশ হতে চেয়েছিল? জিন্না আর নেহেরুর কাটাকুটি খেলায় আমি অন্তত কোথাও বাংলাদেশের কোনও

*অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, শিশুরাম দাস কলেজ।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম পাইনি। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি- ১৯৪০ সালে 'লাহোর প্রস্তাব'-এ ঠিক করা হয়েছিল ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলিতে মুসলিম বেশি, সেরকম দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকি অঞ্চলটিকে নিয়ে একটি দেশ তৈরী করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট যে এলাকা দুটিতে মুসলিমরা সংখ্যা বেশি সেই এলাকা দুটি নিয়ে ভিন্ন দেশ না হয়ে পাকিস্তান নামে একটি দেশ এবং ১৫ আগস্ট বাকি অঞ্চলটিকে ভারত নামে অন্য একটি দেশে ভাগ করে দেওয়া হলো। পাকিস্তান নামে পৃথিবীতে তখন অত্যন্ত বিচিত্র একটি দেশের জন্ম হলো, যে দেশের দুটি অংশ দুই জায়গায়। এখন যেটি পাকিস্তান সেটির নাম পশ্চিম পাকিস্তান এবং এখন যেটা বাংলাদেশ তার নাম পূর্ব পাকিস্তান। মাঝখানে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরত্ব এবং সেখানে রয়েছে ভিন্ন একটি দেশ ভারত। মানচিত্রে দিকে তাকালে অনুধাবন করা যায় কী ভীষণ কূট উদ্দেশ্য এভাবে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত বলা ভালো ত্রিখণ্ডিত করে দিয়ে গেছে দু'শ বছর এদেশকে শাসন করা শাসক। ভারত-পাকিস্তান ভাগ হল, ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা হল দুই দেশ। পাকিস্থানের মধ্যে আবার পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগ। পূর্ব পাকিস্থান পড়ল, সমধর্ম কিন্তু ভিন সংস্কৃতির শাসকের কব্জায়। একই দেশের দুটি অংশ শারীরিক ও মানসিক, কোন ভাবেই আসতে পারছিল না একে অন্যের কাছাকাছি। বাংলাদেশের আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের শুরু সাতচল্লিশ থেকেই। একটি দেশের থেকে ভাগ হওয়া দুটি অংশ কেউ কারোর সাথে জুড়ে থাকতে পারছিল না। আর মূলের সাথে এক হওয়ার উপায়ও তার আর নেই। এমনই এক চাপানোতরের সময় কফিনের শেষ পেরেকটা পড়লো ১৯৪৮'এ পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলী জিন্নাহের ঢাকায় দাঁড়িয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবকরণে। অর্থনৈতিক নিপীড়নের সাথে রোজ যুঝতে থাকা পূর্ব বাংলা কোন মূল্যেই পাকিস্থানী শাসক গোষ্ঠীর হাতে ভাষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে লুণ্ঠিত হতে দিতে চাইলো না, ফলে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো পূর্ব বাংলা। ১৯৫২'র ২১শে ফেব্রুয়ারি...বাংলা ভাষার মর্যাদারক্ষায় মৃত্যুর সামনে দাঁড়ালো রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত। ভাষাকে ভালোবেসে নিজেকে সঁপে দেওয়ার এমন দৃষ্টান্ত বিশ্ব দেখেছিল প্রথম। এই ভাষা আন্দোলন কেবল আবেগ থেকে হয়েছিল এমনটা নয়, ভাষার সাথে উৎপাদনের নিবিড় যোগাযোগকে অনুধাবন করতে পেরেছিল পূর্ব বাংলা। স্তালিনের ভাষায়..'ভাষা মানুষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরিভাবে জড়িত। শুধু উৎপাদন কেন, মানুষের অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডের সাথে ভাষার রয়েছে যোগাযোগ।' পাকিস্থানী শাসক গোষ্ঠী ১৯৬৫ সালে, বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল। অস্তিত্বের সংকটে ভোগা পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এই ঘটনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী একথা অবশ্য স্বীকার্য। ভাষা আন্দোলনই প্রথম পূর্ব বাংলাকে তার স্বীয়তার সাথে পরিচয় ঘটালো। এরপর সামরিক শাসন, ছ-দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ....রক্তের বিনিময়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে একটা দেশ। অস্তিত্ব

রক্ষার লড়াইতে নেমে নিজের আত্মতা ও স্বাতন্ত্র্যকে চিনেছে। অস্তিত্বের শিকড়কে খুঁজে পেয়েছে।

ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্থান, সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্থান তথা বাংলাদেশের চোখ খোলা, ইতিহাসবেত্তাদের কলম থেকে ঝরে পড়া কালির সদ্ব্যবহারে শতাধিক বইয়ের সহস্রাধিক পাতা জুড়ে সেই কালবেলার তথ্য কোষ মেলে। দু'মলাটের ভাঁজে মেলে জননেতা মুজিবর রহমানের কথা, আওয়ামীলিগের কথা, পাকিস্থানের আইয়ুব শাহী করকারের আনা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা, মুজিবের কারাবাস, তাঁর মুক্তির দাবীতে ছাত্রদের নেতৃত্ব গণ-আন্দোলন, পাতার পর পাতা জুড়ে মেলে ১৯৬৭-৬৮... কিন্তু সে ইতিহাসে থাকে না নিম্নবিত্তের কথা, থাকে না হাড্ডি খিজিরদের শির ফুলানো শ্লোগান ধ্বনি, থাকে না তালেবের মৃত নীল শরীর, থাকে না জুম্মনের মা, থাকে না রঞ্জু আর তার কালো বোন রানু, থাকে না জালাল মাষ্টার আর ওসমান'রা। ইতিহাস সাধারণদের জানায় না, চেনায় না, মনে করে না। ঢাকার শহরের প্রলেতারীয়েতদের চেনান ইলিয়াস, মঞ্চকে ধরে রাখে যে বাঁশগুলো, অথচ যারা থেকে যায় দর্শকের চোখের আড়ালে, ইলিয়াস সামনে নিয়ে আসলেন তাদের। দেশ তৈরীর বুনিয়াদী শক্তি যারা, অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ, অতি সাধারণ মানুষ, রিকশাওয়ালা-দোকানী চায়ের দোকানের ছেলেটা-বেকার-রুজিসন্ধানী-ছাত্র, ঔপন্যাসিক এদের নিয়ে এলেন সামনে। চেনালেন দেশ। ইতালীয় দোকানের উমবার্তো একো বলেছিলেন, উপন্যাসের মর্মকথা হোল জীবনীবিজ্ঞান, জীবনের ছবি নয়। ইলিয়াস তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং 'সচল প্রয়াস' দ্বারা অর্জন করেছিলেন সেই সিদ্ধি। তারই প্রকাশ 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর পাতায় পাতায়। 'উপন্যাস' সম্পূর্ণ ভাবে আধুনিক যুগফসল। তার শরীরজুড়ে মেলে রেনেসাঁর ঘ্রাণ। সেখানে মেলে না মধ্যযুগীয় দেববার্তা, সেখানে মানুষ 'দেবতারও বড়' তাই তার হাতেই যুগের হাল। যেখানে মানুষ তার অনন্ত কৌতূহলী মন নিয়ে ছুটে বেড়ায় 'কেন'-র উত্তর সন্ধানে। অসংখ্যাত প্রশ্নোত্তর জন্ম দেয় আধুনিক উপন্যাসের। উপন্যাসের দর্শন জীবনমুখী। যেখানে প্রতিভাত হয় সময়-জনপদ-সমাজ ও সামাজিক মানুষ। আলোচ্য 'চিলেকোঠার সেপাই'ও এই পথেই পা এগিয়েছে। খুব দ্রুততায় ঘটে যাওয়া পরপর কিছু ঘটনা পরম্পরার কোলাজে গড়া এই উপন্যাসে উঁকি দেয় এক মহল্লা আর কিছু গলিপথ হেঁটে যাওয়া সাধারণ জন, তারাই উপন্যাসের মূল চরিত্র রূপে চিত্রিত। ইলিয়াস কলমে প্রকাশ করেছেন সেই সমস্ত মানুষের কথা যাদের 'রোখ আছে, রোষ আছে, কায়েমি স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বোঝবার জোর আছে।' মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এবং স্বৈরশাসনের পক্ষপাত দুষ্ট মহাজন শ্রেণির মানুষজন নগরজীবনের জটিল ও দ্বন্দ্বময় চেতনার মধ্যে যারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দৌড়ে নেমেছে, উনসত্তরের সংগ্রাম ও মিছিল তরঙ্গিত ঢাকা শহরে এই ভিড়েই চোখে পড়ে ওসমান গনি, একাকীত্ব ও 'ভলো নেই' -- এর গভীর অসুখে ডুবে থাকা একটি মধ্যবিত্ত যুবক। তখন চারিদিকে মিটিং আর

মিছিল আর গুলিবর্ষণ আর কার্ফু। ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। সব মানুষের চাওয়া যেখানে এক - মুক্তি। ইতিহাসের পাতায় যে সমস্ত শোষিত মানুষের মুখ চোখে পড়ে এই উপন্যাস বলেছে তাদের গল্প। উপন্যাসের মূল চরিত্র ওসমান গনিকে বিবর থেকে টেনে বের করে এনেছে সময়।

ওসমান গনি। যার সাথে প্রথম পরিচয়েই পাঠক পরপর কিছু দৃশ্যপট দেখে--

"...চেয়ারে কিংস্টর্কের প্যাকেট, দেশলাই, চাবি ও কয়েকদিন আগেকার পাকিস্তান অবজার্ভার। প্রথম পৃষ্ঠায় চার কলম জুড়ে এই বছরের বিশ্বসুন্দরীর ছবি। রাতে ব্যবহার করবে বলে আনোয়ারের বাড়ি থেকে কাল দুপুর বেলা নিয়ে এসেছে। শালার শওকত ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে বাঙলার মাত্রাটা বেশি হয়ে গিয়েছিল, এসে কখন যে প্যান্টট্যান্টসুদ্ধ শুয়ে পড়েছে খেয়াল নেই।..."

যে বাড়ীর চিলেকোঠায় প্রায় আড়াই বছর বাস করছে ওসমান, সেই বাড়ীরই দোতলায় থাকা রঞ্জুর দাদা মিলিটারির গুলিতে মারা গেছে। কাহিনী এগিয়েছে, পাঠক দেখেছে, সে তার চারপাশের কাউকেই চেনে না! এক মৃত্যু তাকে তার চারপাশের সাথে পরিচয় করায় হয়তো নিজের সাথেও নিজের দেখা হওয়া শুরু হয় তার এখান থেকে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এই ওসমান। তার হাত ধরিয়েই ইলিয়াস পাঠককে নিয়ে যান উনসত্তরের প্রতিবাদ-টিয়ার গ্যাস-লাঠিচার্জ-বোমাবাজি-কার্ফু আর বেপরোয়া গুলিখাওয়া ঢাকার রাজপথে। ওসমান বাস করে তার নিজের তৈরী করা এক দুনিয়ায়। তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্ন আর সত্যের মাঝে গোলমাল হয়ে যায় খোদ পাঠকেরও। কারণ, ওসমান বাস করে এক স্পষ্ট দিবাস্বপ্নের জগতে। যেখানে যে লঙ্ঘন করে কার্ফু, মিছিলের সম্মুখে হাঁটে, আটকায় মিলিটারি ট্রাক। সেই জগতের প্রতিটা ইঞ্চি জুড়ে ওসমান গনি এক লড়াকু সৈনিক। ওসমান, এক অদ্ভুত চরিত্র! বিধ্বস্ত ঢাকা ও শহরের আনাচে-কানাচে জমতে থাকা বারুদ আর রক্ত ওসমানের চেতনায় করাঘাত করে, অথচ সে চুপ করে থাকে। সে দেখে, সে হাঁটে, সে ভিড়ের মধ্যে মিশতে চায় কিন্তু তাও কী এক দুর্বার কারণেই পাঠক তাকে নিষ্ক্রিয় দেখে উপন্যাসের অনেকাংশ জুড়েই, কিন্তু এই নিষ্ক্রিয়তার মাঝে যা বারংবার চোখে পড়ে তা হোল এই চরিত্রের ডানা ঝাপটানো। এক সময় ঔপন্যাসিক এক ধাক্কায় পাঠককে জানান দেয়, কেন্দ্রীয় চরিত্র ওসমান গনি, ও অন্যতম গুরুত্ববহ চরিত্র হাড্ডি খিজরি হলেও এই উপন্যাসের নায়ক কিন্তু - সময়। হাসান আজিজুল হকের ভাষায়, "ব্যক্তি নয়, উপন্যাস থেকে ধাক্কা দিয়ে ব্যক্তিকে সরিয়ে দিয়ে ইতিহাস সামনে চলে আসছে, ইতিহাসই ব্যক্তি। একটা গোটা জনপদ তার ক্ষয়-ধস-নামহীনতা নিয়ে উপন্যাসের নায়ক উপন্যাসের চেনা সত্তাটাকে ছোবড়ার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন একটা পথ বের করতে পেরেছে।"

ইলিয়াস নিজে বলেছেন,..."আমরা কৃষক মধ্যবিত্ত ব্যক্তির তরল ও পানসে দুঃখ বেদনার পাঁচালি গাই কিন্তু এতে উপন্যাসে কি ব্যক্তির যথাযথ সামাজিক অবস্থানটি কোনভাবে

প্রকাশিত হয়? এতে শেষ যে ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করি সে কিন্তু রেনেসাঁসের সেই শক্ত সমর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ নয়, বরং দায়িত্ব বোধহীন ফাঁপা এক প্রাণীমাত্র।" (লেখকের দায় : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস)

আলোচনীয় উপন্যাসটিতে দেখি, তিনি কিন্তু ব্যক্তির বিকাশকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তির হাত ধরে আসছে সময় এবং সেই সময় ধীরে ধীরে ব্যক্তির নির্মোক মোচনে সহায়ক হচ্ছে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা জানতে পারি ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হলে ওসমানের বাবা পূর্ব পাকিস্তানে বাস করার জন্য এলেও আবার ফিরে যায় জন্মভূমি ভারতবর্ষেই, আর ওসমান থাকে পাকিস্তানে। একা। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে বসাক বা সাহাদের কাছ থেকে রহমতউল্লাহর ক্রয়কৃত বাড়ির চিলেকোঠায়। মনে হয়, ওসমানের পারিপার্শ্বিক জগত বিচ্ছিন্নতার শিকড় এখানেই। যেন, এক বাড়ীর উঠান দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একটা কাঁটাতার, ভাগ হয়ে গেছে একটাই উঠান দু-দেশ! মানচিত্র জানিয়ে দিয়েছে আমরা আর ওরা আলাদা। ওসমান দুঃস্বপ্ন দেখে পিতৃবিয়োগের, যে স্বপ্নে তাকে তাড়া করে বেড়ায় পরিবার থেকে তার দূরে থাকা...কী করে ভালো থাকবে সে! তার বিচ্ছিন্নতা, তার আত্মমগ্নতা তাকে ডাকে। ওসমান তাই একা হতে ভয় পায়। ঢাকা শহরের মিছিলের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সে ভেসে যেতে চায়। মানুষের স্রোত, দৃপ্তকণ্ঠী শ্লোগান তাকে উত্তাপ দেয়। যে উত্তাপে তার একাকীত্বের শীতলতা উষ্ণতা পায়। আর তাই শওকতের ডাকে ভীত হয় সে, পাছে আবার 'মূল স্রোতধারা থেকে ছিটকে পড়ে একটি নিঃসঙ্গ জলবিন্দুর মতো সে আবার হাওয়ায় শোষিত না হয়।' উপন্যাসের মূল স্বরূপ-ওসমান গনির নিজেকে খোঁজা। বলা যায়, 'আত্মনাং বিধি-অর্থাৎ আত্মাকে জানো। চাঁচাছোলা ভাষায় ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন তার সেই জানা চেনার পথ বয়ে চলেছে উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের পটভূমি দিয়ে। যে পথ এসেছে স্বৈরাচারী শাসকের সাথে আপসে সে রাজি রহমতউল্লাহ, এসেছে আনোয়ার হয়-'মুক্তি চাই। মুক্তি চাই'। প্রশ্ন আসে, এই যে মুক্তির তীব্রতার আকুতি এর বিস্তার কতখানি? কী থেকে মুক্তি চাইছে সে? শুধুমাত্রই কি পাকিস্তানের শোষণের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তনের মুক্তি? নাকি এই 'মুক্তি' শব্দের গভীরে আছে অন্য কোন কথা? পাঠক দেখে ওসমান নিজে খুঁজে পেয়েছে এই মুক্তি...মুক্তিবেগ...আর তার মুক্তিদাতা হাড্ডি খিজির। পিতৃপরিচয়হীন খিজির। যার মা এবং স্ত্রী দু'জনেই মহাজনের ভোগ্য। যার শ্লোগানে ওসমানের শীত ঘুম কাটে, তার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়া অপর এক ওসমানের জেগে ওঠার মাদল বাজায় ওসমানের বুকে।

কাহিনি এগোলে পাঠক দেখে একদিকে হাড্ডি খিজির যেমন মহাজনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে উঠতি আওয়ামী লীগের নেতা আলাউদ্দীন মিয়ার ধমক খায়, তেমনি গ্রামে গ্রামে গরুচোরদের রক্ষাকর্তা জোতদারদের রক্ষায় রাষ্ট্র-সামরিক বাহিনী-আওয়ামী রাজনীতি একাকার হয়ে যায়। ঢাকা ক্লাব থেকে আইয়ুব বিরোধী মিছিলে গুলি বর্ষণ করা হলে

উত্তেজিত জনতা যখন ক্লাবটিতে আগুন ধরাতে যায় তখন বাঙালি-বাঙালি ভাই ভাই আওয়াজ তুলে তাদেরকে রক্ষা করা হয়। গ্রামে জোতদারদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের গণআদালতেও আইয়ুবের দালালরা রক্ষা পায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ছায়ায়। এই দালালদের বুদ্ধিমান অংশ অচিরেই যোগ দিয়ে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে আরও পুষ্ট করে। ওদিকে ওসমান তার মধ্যবিত্ত দোদুল্যমানতা আর জনগণের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মাঝে ডানা ঝাপটাতে থাকে। চিলেকোঠার গণ্ডী থেকে বেরোনোর তাড়নায় আর আত্মমগ্নতাকে বিসর্জিত করার প্রয়াসে সমনামী কিশোর রঞ্জুকে ছাদ থেকে ফেলে দিতে চায়, আবার কখনো আত্মপ্রেমে নিমগ্ন হয়ে তাকেই আদরে রক্তাক্ত করে। ওসমানের শিকল ছিড়ে বেরিয়ে আসার ও এক চূড়ান্ত সময়। রানু যা পারেনি, পারতো না, তা পেরেছে খিজির। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের শক্তিকে একত্রিত করলে বোধহয় হাড্ডি খিজিররা তৈরী হয়। গলার সুর ফুলিয়ে শ্লোগান দেওয়া, ঘুমের মধ্যে মাকে খুঁজে ককিয়ে ওঠা, স্ত্রী ছেড়ে চলে যাওয়া, সন্তান আসার খবরে শিহরিত, খিস্তিবাজ, আইয়ুব খানকে শয়তান মনে করা, সাত/আটজন লোককে নিয়ে 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' বলা, মহাজনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে আলাউদ্দিনের ধমক খাওয়া খিজিরই টেনে বের করে আনে ওসমানকে তার চিলেকোঠা থেকে। গণঅভ্যুত্থানের সদস্য হওয়ার অপরাধে মধ্যরাতে মিলিটারির হাতে খুন হয় সে--

"...খিজিরের সামনে দুজন লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেছে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে। খিজিরও এগিয়েই যাচ্ছে, ডানদিকের রাস্তা ধরে, ফুটপাথ ঘেঁষে।... কিন্তু আরো এক ঝাঁক টকটকাটকটকটক ধ্বনির সঙ্গে চোখের সামনেকার কালচে হলুদ আলোর হলুদ ভাগ মিলিয়ে যায়, অন্ধকার গাঢ়তর হয়। ব্যাপারটা কি হলো? কোন শালয় খানকির বাচ্ছা ট্রাক এসে ধাক্কা দিল তার বুকে, বুকে বাঁ দিকের ও পেটের ওপরভাগে। শরীরে এই দুই জায়গায় সলিড আগুন এসে বিঁধে গেল। সামনে এখন কিছু দ্যাখা যাচ্ছে না।... হঠাৎ খুব বমির বেগ আসে খিজিরের। মুখ থেকে চলকে চলকে রক্ত পড়ছে। রাস্তার গলানে পিচ ঢালার মতো রক্ত পড়ে নাকের ওপর, রক্ত পড়ে ঠোঁটের কশ বেয়ে, চিবুক বেয়ে। চোখ জোড়া নিজে নিজেই খুলে যায়। ওপরে সবই কালো রঙে আঁকা।"

খিজিরদের এমন ভয়াবহ মরণে রাষ্ট্রিক কাঠামো দুর্বল হয় না, নেতাদেরও ঘুম ভাঙে না, পদ্মায় জোয়ার আসে না। শুধু জেগে ওঠে ওসমানরা। ইলিয়াস দেখিয়েছেন, কী ভাবে প্রতিনিয়ত একটু একটু করে খিজির প্রবেশ করেছে ওসমানে। খিজিরের ডাকে নিজেকে খুঁজে পায়, ফিরে পায় ওসমান।

"ওসমানসাব বাইরাইয়া আহেন। দেরি হইয়া যায়, আহেন।"

কিংবা, কখনো

'কি হইলো? মরলেন নাকি? আহেন না?"

এই ডাকে সক্রিয় সাড়া দিয়ে ঘরের তালা ভাঙেন ওসমান। সবার অগোচরে সে বেরিয়ে আসে রাস্তায়, কার্ফুর দাপট অগ্রাহ্য করে। পূর্ব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ-সব দিক তার খোলা। শৃঙ্খল ছাড়া সত্যিই যে হারানোর কিছু নেই তা প্রমানিত হয়। ওসমান গণির বিচ্ছিন্নতা, আত্মমন্ত্রণা ও একাকিত্বের গভীর অসুখ,যা ভেসে গেছে রাজপথে মৃত খিজিরের রক্ত আর মিছিলের স্রোতে। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির খোঁজ অবশেষে পায় ওসমান। মননের ওপনিবেশিকতা কে মুক্তি দেওয়ার জন্য চিলেকোঠার দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসে চিলেকোঠার সেপাই। পদক্ষেপ ফেলে অজস্র পথের লক্ষে। ওসমানের এই পরিবর্তনকে কালের হাতে সঁপে ঔপন্যাসিক বলেন, ওসমান যেদিকেই পা বাড়ায় সেদিকেই পূর্ব বাঙলা....

‘‘গ্রহ নক্ষত্রের ফোকাসে...আকাশের নিচে এবং পানিকাদা কফথুতু গুমুতের ওপর পা টানতে টানতে ওসমানের চেহারায় নতুন ধরণের দাগ পড়েছে। এখন খাকি কালো বলো, সবুজ বলো, সাদা বলো--- কারো সাধ্যি নেই যে তাকে সেই ওসমান গনি বলে সনাক্ত করে।’’

এই পথ অনিঃশেষ। ওসমানে আত্মোৎবোধ নেই ঘটেছে তার মুক্তি। এই যাত্রা আনন্দযাত্রা, যে যাত্রায় ওসমানের হাতে আছে খিজিরের হাত, আর তাদের কে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সময়। কোন এক মহাসিন্ধুর ওপার হতে, কোন এক জলদগম্ভীর কণ্ঠ হয়ত তাদেরও শুনিয়েছিল এ বার্তা----

‘‘...‘যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল/উঠেছে আদেশ-/‘বন্দরের কাল হল শেষ’।/ মৃত্যু ভেদ করি/দুলিয়া চলেছে তরী।/কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে পার হবে পার,/সময় তো নাই শুধাবার।/এই শুধু জানিয়াছে সার-/তরঙ্গের সাথে লড়ি/বাহিয়া চলিতে হবে তরী;/টানিয়া রাখিতে হবে পাল,/আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;/বাঁচি আর মরি/বাহিয়া চলিতে হবে তরী।/এসেছে আদেশ-/বন্দরের কাল হল শেষ।’’

সহায়ক গ্রন্থ :

১। চিলেকোঠার সেপাই - আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
২। সংস্কৃতির ভাঙাসেতু - আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
৩। বলাকা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সাহিত্যে জীবন ও সমকাল - করুণা রাণী সাহা

ভ্রান্ত রাজনীতির প্রেক্ষিতে সুনীলের গল্প

শ্যামাশ্রী মণ্ডল*

বিচ্ছিন্ন আন্দোলন, আতর্কিত আক্রমণ, গোপনে কাউকে হত্যা করা, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা, — ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ কখনও প্রকৃত রাজনীতির উদ্দেশ্য হতে পারে না, সুনীল, তাঁর ব্যক্তি জীবনে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, কোনও পরিকল্পনা ছাড়া হঠাৎ প্রাণ দেওয়ার মধ্যে কোনও বীরত্ব থাকে না, দেশের কোনও উপকারও হয়না। শুধু শুধু একটা প্রাণের অপচয় ঘটে মাত্র। সুনীল, তাঁর কলেজ জীবনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় বামপন্থীদের হয়ে একটা বুথে পোলিং এজেন্ট হন। বাগবাজারের বিভিন্ন বুথে তিনি নকল ভোটও দেন। তারপর ১৯৫৩ সালে ট্রামের ভাড়া বাড়লে ছাত্র দল ও পুলিশকর্মীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটেছিল, তাতে সুনীল, একজন ছাত্র হিসেবে সংক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও তিনি হাতে অস্ত্র তুলে নেননি তবুও পুলিশদের লক্ষ করে ইঁট ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়েছেন। এর পিছনে কোনও বৃহত্তর পরিকল্পনা ছিল না, শুধুমাত্র সাময়িক উত্তেজনা কাজ করেছে। এছাড়া যখন কলেজের দাদা শ্রেণির নেতারা, সুনীলের কবিতা লেখা নিয়ে খবরদারি শুরু করে, এবং তাঁর স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা করে তখন তিনি রাজনীতি থেকে সরে আসেন।

মধ্যম বয়সে সুনীল, নকশাল আন্দোলনকে সমর্থন করে বলেছেন ঃ ''নকশাল আন্দোলনের সময় আমি যদি উনিশ কুড়ি বছরের কলেজের ছাত্র হতাম, তবে খুব সম্ভবত আমিও সে আন্দোলনে চোখ বুজে যোগ দিতাম, নিজের ছাত্র বয়সে আমি বামপন্থীদের মিছিলে যোগ দিতে দিতে এক সময় বাইরে বেরিয়ে এসেছি, রাজনীতির সঙ্গে আর সংস্পর্শ ছিল না, কিন্তু বিপ্লব শব্দটি আকৃষ্ট করত সব সময়। দেশের অবনতি দেখে আমিও মনে মনে ভাবতাম, একটা সবাত্মক বিপ্লব ছাড়া এ দেশের পচা-গলা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে, আমার সে বিপ্লব-ধারণা ঠিক বাস্তব ভিত্তিক নয়, তার রূপ রেখা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা ছিল না, অনেকটাই কল্পনা রঞ্চিত। আমি তখন জীবিকা অর্জনের জন্য প্রায় সর্বক্ষণ ব্যাপৃত, সদ্য বিবাহিত এবং এক সন্তানের পিতা, তবু মনে হত, এক সময় বিপ্লব শুরু হবেই হবে, তখন আমার কাছেও ডাক আসবে, আমাকে যেতে হবে।''[(১)] সুনীল মনে মনে যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই বিপ্লব আমাদের কখনো হয়নি। নকশালপন্থীদের বিপ্লবীর ধারণা, সুনীলের আকৃষ্ট করেছিল, তাঁদের গ্রামকে দিয়ে শহর ঘেরার প্রস্তাব' — খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল সুনীলের কাছে। কিন্তু নকশালপন্থীদের 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' — এই ঘোষণা তাঁর পছন্দ হয়নি, সুনীল, বুঝেছিলেন চিনের সমস্যা

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষা ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

ও আমাদের দেশের সমস্যা এক নয়, দুই দেশের বিপ্লবী পন্থা এক হতে পারে না। দেশ ও কালভেদে বিপ্লবের আঙ্গিক পৃথক হতে বাধ্য — এই বাস্তব সত্যটা নকশালপন্থীরা অনুভব করতে পারে নি। এছাড়া বাংলার তরুণরা চিনের যে নেতাকে আদর্শ মনে করেছিল, 'বিপ্লবী তরণীর' কর্ণধার বলে গণ্য করছিল, সেই লিন পি. আও পরবর্তী কালে ক্ষমতালোভী এবং বিশ্বাসঘাতক হিসেবে প্রমাণিত হয়। শেষপর্যন্ত নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

কলেজ জীবনে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, দেশ বিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা সবকিছু মিলিয়ে রাজনীতি সম্পর্কে সুনীলের মনে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে, তিনি 'পলাতক ও অনুসরণকারী', সাঁকো, ও 'বিজন তুমি কি' ইত্যাদি গল্প ও 'দর্পণে কারমুখ' উপন্যাস রচনা করেছেন। এই তিনটি গল্পে ও উপন্যাসটির কেন্দ্রে যে সকল চরিত্র রয়েছে — তারা প্রত্যেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সুনীলের ভাষায় এই রাজনীতি এঁদো গলি ছাড়া কিছু নয়, সেখানে কোনও বৃহত্তর পরিকল্পনা নেই, আদর্শ নেই, দলীয় স্বার্থটাই প্রধান। এবং গোপনে কাউকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করে। ঐ চরিত্ররা, প্রত্যেকে, নিজের — নিজের পরিবার প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সর্বদা দুশ্চিন্তার মধ্যে একপ্রকার অনিশ্চিত জীবন যাপন করে। সব - সময় তারা পালিয়ে বেড়ায়, নিজের প্রতি একপ্রকার গভীর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে। ধরা না পড়লেও বিবেকের দংশন থেকে তাদের মুক্তি নেই। সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে চায় কিন্তু ফেরা কঠিন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাদের বিপন্ন জীবনের পিছনে সক্রিয় ভূমিকা কলেজের দাদা শ্রেণির নেতাদের। নেতাদের কাছ থেকেই তরুণপ্রজন্ম ভ্রান্ত রাজনীতির পাঠ নিয়েছে। আজও আমাদের দেশে বা বিদেশে নেতাশ্রেণির ব্যক্তিরা কমবয়সের ছেলে মেয়েদের বিপথে চালিত করে চলেছে, নানা অপকর্মে নিয়োজিত করে চলেছে—এদের পরিণতি ভয়ঙ্কর। গল্প গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে, ভ্রান্তরাজনীতির পরিণতি কী। 'বিজন তুমি কী' ঃ আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বিজন নামে এক যুবক। সে এবং তার দুই সাথী, রতন ও হিরণ্ময় দলের নির্দেশে, প্রগতিশীল দলের শত্রু, হেম চৌধুরীকে হত্যা করে। মুক্তির লড়াই চালাবার পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে, যারা সমাজের শত্রু, তাদের সব কটাকে খতম না করা পর্যন্ত তাদের হত্যালীলা চালিয়ে যেতে হবে। আদর্শের জন্য হত্যা করতে তাদের হাত কাঁপে না। কিন্তু একটা বাচ্চা মেয়ের সামনে তার দাদুকে হঠাৎ মেরে ফেলার মতো অমানবিক কাজ আর হতে পারে না। মানুষের হাতে মানুষের মরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বীভৎস দৃশ্য। হত্যা লীলার পর বিজন সাতদিন একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। বিবেকের দংশন থেকে তার মুক্তি নেই। তার বিবেক তাকে বার বার প্রশ্ন করে — 'বিজন তুমি কি অন্যায় করেছে?' বিজন জোর দিয়ে বলে, না। রাস্তার ওপর একজন মানুষকে হত্যা করার পর প্রায় সাতদিন কেটে গেলেও কেউ হত্যাকারীদের ধরতে পারে না। বিজন বাড়িতে গিয়ে আসে পরিষ্কার জামা পরে, রোজ দাড়ি কামায়, মানুষের ভিড়ে মিশে থাকে, আলাদা করে তাকে কেউ চিনতে পারে

না। কেউ জানতে পারে না তার হাত কয়েকদিন আগে একজন মানুষের রক্তে লাল হয়েছিল।

বিজনের সঙ্গীরা যে-যার মতো সরে পড়ে, কোনও রকম অপরাধ বোধ তাদের মধ্যে কাজ করে না। বিজনকে কেউ সন্দেহ না করলেও, তার বিবেক তাকে টেনে নিয়ে যায়, হেম চৌধুরীর বাড়ির কাছে, পানের দোকানদারের কাছে সে জানতে চায় হেম চৌধুরীর নাতনি কেমন আছে। ছোট্ট মেয়ের মর্মান্তিক পরিণতি, মৃতপ্রায় অবস্থা-বিজনকে ব্যথিত করে তোলে, সে, নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। গায়ের জোরে হত্যার দায় প্রথমে এড়িয়ে গেলেও শেষে কেঁদে ফেলে।

আদর্শের জন্য দলের নির্দেশে হত্যালীলা সংঘটিত হলেও, প্রত্যেকটি হত্যাকে সঙ্গে একটা করুণ ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। মৃতব্যক্তির আপনজনেদের হাহাকার জ্বালা যন্ত্রণা। হেম চৌধুরীকে বিজন হত্যা করার সঙ্গে তার শিশু নাতনি কেও সে মানসিক ভাবে হত্যা করেছিল। সেইজন্য বিজনকে পুলিশ না ধরলেও সে বিবেকের কাছে ধরা পড়ে যায়।

পলাতক ও অনুসরণকারী ঃ আদর্শহীন, বৃহৎপরিকল্পনাহীন, গন্তব্যহীন, হত্যার রাজনীতি একটি অন্তহীন বৃত্তেই ঘুরতে থাকে, আলোচ্য গল্পে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই আমরা এক যুবককে দেখি, যার নাম রবি। সে, পিসির বাড়িতে হঠাৎ মাস খানেক পর ঢুকে পড়ে। সে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত, কিছু খেতে চাইলে তাকে মুড়ি দেওয়া হয়। পিসির বৌমা ওরফে বৌদি, রবির মধ্যে একপ্রকার টেনসন ও চাঞ্চল্য লক্ষ করেন। বৌদি'র চোখে ধরা পড়ে রবির চেহারার নানা বদল — চোখ দুটি কোটরাগত, দেখে মনে হয় কত রাত ঘুমায়নি, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। আসলে বেশ কয়েকদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে, পলাতক আর তাকে অনুসরণ করে চলেছে তিনটে যুবক। তাদের জ্বালার রবি, কোথাও স্থির হতে পারে না। জানলা দিয়ে তাদের আসতে দেখে, মুড়ি খাওয়া অসম্পূর্ণ রেখে রবি পালায়। এরপর রবি চন্দনের বাড়িতে যায়, দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা না করে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। সারারাত গঙ্গার ধারে শ্মশানে কাটায়। শেষে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে শ্রীরামপুরে চলে যায় বন্ধুর বাড়ি সুশান্তর কাছে।

সুশান্তর সঙ্গে রবির কথোপকথন থেকে জানা যায় রবির অনুসরণকারী পথ আসলে কী ধরণের পথ, কেন আজ রবির এমন পরিণতি, কেন আজকের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন তার আজ নির্দিষ্ট আশ্রয় নেই। সুশান্ত, রবিকে তার বাড়িতে দু'একদিন থাকার কথা বললে রবি সদর্পে বলে, ‘‘মাথার ওপর ছাদ না থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না। ঘরের কথা চিন্তা করে আমি রাস্তায় বেরোই নি।’’[২] বন্ধুর কথা থেকে বোঝা যায় রবি যে রাস্তায় চলেছে, সে রাস্তা ভুল রাস্তা। সেটা এঁদো গলি।' সেখানে শুধু অন্ধকার। সেই রাস্তা না বদলালে জীবনে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রত্যেক পদে পদে মৃত্যু ভয়। শেষ পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে পালাতে গিয়ে একটা। দেওয়ালে রবির পিঠ ঠেকে যায়। মুহূর্তের মধ্যে রবির পিছনে ধাওয়া করে আসা তিনটি যুবক রবির শরীরটা অস্ত্রের আঘাতে নিশ্চল করে

দেয়। এইভাবে তারা বর্ধনকে মারার প্রতিশোধ নেয়। রবিকে হত্যা করার পর তারা বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা ফিরতে পারে না। তাদের ধরার জন্য নয় জনের একটা দল ছুটে আসে। যারা প্রথমে অনুসরণকারী ছিল, তারাই এখন পলাতক, এইভাবে হত্যালীলার একটা চক্রব্যূহ বা বৃত্ত রচিত হয়। এই বৃত্তের বাইরে আসা সম্ভব নয়। রবির হত্যাকারীদের নিদ্রাহীন অবস্থায়, শীতের রাতে পালিয়ে বেড়াতে হয়। বাড়ি ফিরে মুসুরজল খাওয়া হয় না।

অন্যদিকে রবিও আর ঘরে ফেরা হয় না। ছোট বোনকে ছবি আঁকার একবাক্স রং পেনসিল পাঠানোর কথা রবি রাখতে পারে না। বন্ধু, সুশান্তর কাচা ধূতি পাঞ্জাবী পড়ে অন্য মানুষ হয়ে যাওয়ার সাধ আর পূরণ হয়না। দলের নির্দেশে অন্য দলের কর্মী বর্ধনকে হত্যা করার শাস্তি তাকে পেতে হয়। বিনা প্রতিবাদে সে প্রাণ দেয়। তার মৃত্যুতে দেশের কোনও উপকার হয়না, কোনও বিপ্লব ও আসে না। কোনও মহৎ উদ্দেশ্যে রবি প্রাণ দেয়নি, ক্ষুদ্র রাজনীতির এঁদো গলিতে রবি ও অন্যান্য যুবকরা হারিয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে, ইঙ্গিতধর্মী ভাষায়, হত্যার রাজনীতির কঠিন পরিণামকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে দেখিয়েছেন।

'সাঁকো' ঃ এই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে নীলু নামে এক চরিত্র। সে, রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর নিজের পরিবার পরিজন — বাবা, মা, বন্ধু-বান্ধব প্রেমিকা সবাইকেই ত্যাগ করেছিল। বর্তমানে চরম বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে, মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ফেলে আসা জীবনের নানা স্মৃতি স্মরণ করেছে। আত্মসমালোচনা করেছে। আজ সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। আজ যে, একেবারে অসহায়, আততায়ীদের দ্বারা ধৃত। তাকে নিয়ে তারা এক মরণ খেলায় মেতে উঠেছে। হাত দুটো পিছনের দিকে মুড়ে বেঁধে, নিরেট কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে, মুখের মধ্যে একটা বেশ বড় তুলোর গোল্লা ভরে দিয়ে ঠোঁট দুটো স্টিফিং প্লাস্টার দিয়ে আটকে দিয়ে খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর উপরে শূন্যে ঝুলে থাকা, মাত্র বিঘেত খানেক চওড়া একটা সাঁকোতে তাকে তুলে দেওয়া হয়। বিপজ্জনক সাঁকো পেরনোর সময় নীলুকে অভয় দেওয়ার জন্য তার মন থেকে বাবার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কিন্তু নীলু, রিনির কণ্ঠস্বর শুনতে চায়। রিনি, আঙুলের ডগায় থেমে থাকা অনন্ত মুহূর্তের কথা তার মনে পড়ে। রিনির প্রতি তার ভালোবাসার কথা মনে পড়ে। রিনিই তার আজ একমাত্র অবলম্বন সবকিছু ভুলে সে, নতুন করে ভালবাসা পেতে চায়, বাঁচতে চায়। কিন্তু সে, না চাইলেও তার অবচেতন থেকে গগনদার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। সে বিরক্ত হয়। কারণ গগনদার পরামর্শ অনুযায়ী জীবনে চলতে গিয়েই নীলু, সব কিছু হারিয়েছে। বাবার কথা শোনে নি। ঘর ছেড়েছে। বাবার মৃত্যুর সময় বাড়িতে যায়নি। প্রেমিকা রিনি'র প্রতি তীব্র আকর্ষণ কেও সে অস্বীকার করেছে। সমাজ সংসার থেকে, সে, আজ অনেক দূরে। গগনদার কথায় দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। বর্তমানে আজ গগনদার প্রত্যেকটি কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। একদা গগনদা নীলুকে বলেছিল, ''....গ্রামের মানুষের সঙ্গে গ্রামের

ভাষার কথা বলতে শেখো, বলেছিলেন বিপ্লবের জন্য অস্ত্র তুলে নাও। বলেছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম—ভালোবাসা বিসর্জন দাও। বলেছিলেন আদর্শের জন্য বন্ধুর বুকেও ছুরি মারবার জন্য তৈরি হও।"(৩)

সব গুলো এক সঙ্গে নীলুর মাথা গুলিয়ে দিয়েছিল। সে, অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গগনদার পরামর্শ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে গিয়ে সে, সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন থেকে সরে আসে। বাস্তবে গগনদা — এসব কিছুই মানেন নি, নিজে দিব্যি ফুরফুরে জীবন কাটান।

কলেজের দাদা শ্রেণির নেতাদের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নীলু যথাযথ বলেছে "....গগনদার মতন মানুষেরা চিরকালই এই রকম বড় বড় গালভরা বাণী দিয়ে যাবে, তা শুনে হয়তো দু চারজন শেষ পর্যন্ত পৌঁছোবে মুক্তির দরজায়, আর বাকি যে কয়েক শো বা কয়েক হাজার টুপটাপ করে খসে পড়ে যাবে অতলে, তাদের হিসেব কে রাখবে?' আমি ঐ খসে পড়ার দলে।"(৪) বাস্তবে নীলু ব্যর্থ হলেও, সে, প্রবলভাবে বাঁচতে চায়, হারিয়ে যাওয়া ভালবাসাকে আবার ফিরে পেতে চায়। নদীতে আছড়ে পড়ে মরতে চায়না। আততায়ীদের হাতে সে, নিজেকে ধরা দেয় না।

আলোচ্য তিনটি গল্পের প্রধান চরিত্ররা প্রত্যেকে একটা কঠিন পরিস্থিতির শিকার তারা যে সময়ে জন্মেছে এবং বড়ো হয়েছে, সেই সময় অর্থাৎ বিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন বিপর্যস্ত তেমনি রাজনৈতিক পরিস্থিতিও জটিল রূপ ধারণ করেছে। বাংলার ইতিহাসে এই দুই দশক হল চরম সংকটের দশক। ঘরে ঘরে ছেলেরা বেকার, রাজনীতিতে যোগদান করে নতুন কিছু করার চেষ্টা করে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয় না, দেশের মঙ্গলের বা সাধারণ মানুষের মঙ্গলের অপেক্ষা দলীয় স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়। বহু যুবকের জীবন বিপন্ন হয়। আদর্শ নেতার অভাবে, বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার অভাবে কোনও উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। আলোচ্য তিন গল্পের প্রত্যেক চরিত্ররা রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে, নিজের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। দলের নির্দেশ মানতে গিয়ে তারা কখনও প্রাণ দেয় বা কাউকে হত্যা করে — তাদের আত্মত্যাগে দেশের কোনও উপকার হয় না। সুনীল, এই তিনটি গল্পে রাজনীতির নেতিবাচক দিককে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

তথ্য সূত্র :

১. অর্ধেক জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, সপ্তম মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১২, পৃষ্ঠা ৩০৩।

২. পলাতক ও অনুসরণকারী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪০৯, পৃষ্ঠা - ৬৫

৩. সাঁকো, বাছাই গল্প, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা - ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০২ সন (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) পৃষ্ঠা - ২১৯।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ২২০

বিপণনের বর্ণমালা : একুশের ছোটোগল্প

কৌশিক মণ্ডল*

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা একটা কথা প্রায়ই শুনে থাকি যে আজকালকার সময়ে কেউই আর সেভাবে লেখাপত্র বা সাহিত্য পড়েই না। তা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করে নিতে হয় যে কেউ কেউ উপন্যাস উলটে পালটে দেখেন কিন্তু ছোটোগল্প নৈব নৈব চ। বর্তমানে, এ কথা স্বীকার করে নিতেই হয় ছোটোগল্প আজকাল শহুরে বাঙালি পাঠকদের তেমন আকর্ষণ করেই না।

যদিও তলিয়ে ভাবতে গেলে দেখা যাবে, বাংলার কতটুকু অঞ্চল শহর, তাতে কতই বা পাঠক থাকে? তুলনায় গ্রাম বাংলায় পাঠকের সংখ্যা ঢের বেশি। ছোটো ছোটো গল্পে লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে, তাতে জেলা থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে বইপত্তর কেনার ফলে নতুন নতুন বই এর জোগান নিয়মিত। আর বাংলা ছোটোগল্পের গতিপ্রকৃতি বলতে গিয়ে প্রথমেই যেটা মাথায় আসে তা হল এসব বাস্তবতার মাঝে বছর খানেকের মধ্যে কতগুলো দৈনিক সংবাদপত্র তাদের রবিবাসরে ছোটোগল্প ছাপা বন্ধ করে দিল। তার বদলে এখন তারা টকঝাল চুটকি ছাপে, ফাজলামোকে গুরুত্ব দেয়।

২০১৭ সালে এসে একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে হুজুগ আর হুল্লোড় এই মুহূর্তে শীর্ষবিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। প্রতিদিনের সঙ্গে প্রতিদিনের নাকি বিশাল ফারাক তৈরি হচ্ছে। আগেকার ছোটোগল্পের থেকে বর্তমানের গল্প নাকি বিস্তর অন্য রকম। আবার অন্য স্বরও আছে যারা বলেন, যা ছিল তাই আছে, বদলায়নি কিছু। একথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে সাহিত্যের অন্যতম কাজ নন্দিত করা, কিন্তু এখনকার দিনে বাঙালি আনন্দ পাওয়ার মতো প্রচুর উপকরণের সামনা-সামনি। বলা চলে, টেলিভিশনে তাকে প্রায় গিলে ফেলেছিল, যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু খেল কম্পিউটার, ফেসবুক আর ইন্টারনেট।[১] ফলে সাহিত্য এখন মুষ্টিমেয়র বিলাস (অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ছাত্র শিক্ষকদের বাধ্যতার কথা বাদ রেখে বলছি) অথবা আনন্দ উপকরণ। অথচ সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্রর সময়ের এমনটা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, কল্লোল গোষ্ঠীর দিনে তো পরিস্থিতি একেবারেই অন্য জগতের ছিল। যেমন উচ্চতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পের উৎসার ঘটিয়েছিলেন তেমনই ঘনমেধা দিয়ে কথাকাররা এসেছিলেন সাহিত্যের এই তরুণ শাখাটির বিকাশের জন্য। সময় পাল্টায়, মানুষের চিন্তা এক থাকে না। ঐ চিন্তা, মেধা থেকে সৃষ্ট শিল্প ও অন্যরকম হয়ে যায়। ছোটোগল্পের শুরুর দিন কখনও পুরোনো হয়নি, যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে পড়েছে-আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা

---

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার, বেলুড় মঠ।

সবার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। বাহ্যিক অবস্থার ওলোট পালোট হলে চিন্তা জগতেও কিছু না কিছু বিপ্লব আসতে বাধ্য। ছোটোগল্পে গোপনে কিছু বদল আসছিল।

একুশ শতকে বাংলা সাহিত্য প্রবেশ করেছে এটা সঠিক, তবে তার ফলে দৃষ্টিভঙ্গির যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যাবে না। গত শতাব্দীর শেষ তিনটি দশককে ধরে যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখব, বাংলা সাহিত্যে একই সাথে যুক্তি ও যুক্তিহীনতা সমান্তরাল ভাবেই বয়ে চলেছে এবং যা পাঠক সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। গত শতকের সত্তরের থেকে বাংলা সাহিত্যের চরিত্র ও গুণগত মান দ্রুত বদলাতে থাকে এবং সাধারণ পাঠকের চোখেও প্রকটভাবে ধরা পড়ে। তবে পরিবর্তনের এই রূপরেখা তৈরি হয়েছিল পঞ্চাশের সময়পর্ব থেকেই এবং ষাটের সময়ে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা শুরু হয়েছিল; সম্ভবত তারই ফলস্বরূপ সত্তরের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যের চরিত্রগত ও গুণগত পরিবর্তন প্রকটিত হয়ে পড়ে এবং বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা বা চিরন্তন স্রোত হয়ে পড়ে অনেকখানি রুদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন এই স্রোতটি বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যে লাভবান হয়নি, বরং এর ফলে বাঙালির মননশীলতা, চিন্তাশক্তি, যুক্তিবাদ এমনকি মৌলিক সৃষ্টিশীলতা ব্যাহত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে।[২] সত্তরের পরবর্তী সময় থেকেই বাংলা সাহিত্য তিনটি ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে, যেমন (ক) পণ্য সাহিত্য। (খ) মতবাদ সাহিত্য (গ) চিরন্তন সাহিত্য। একুশের প্রারম্ভে এই তিনটি ধারাই ভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে।

পণ্যসাহিত্য বলতে আমরা বোঝাতে চাই যেখানে সাহিত্য এবং পণ্য সমার্থক। একজন পণ্যের উপযোগিতা যেমন ক্রেতার কাছে গুরুত্বপূর্ণ একইভাবে সাহিত্যের উপযোগিতা সমান। পণ্যসাহিত্যের উদ্দেশ্যই তাই হয়ে ওঠে পাঠকের চাহিদা পূরণ এবং মনোরঞ্জন। সাহিত্যমূল্য না থাকলেও দেশের চিরন্তন সংস্কৃতিকে বা সুস্থ সাংস্কৃতিক ভাবনাকে বিপর্যস্ত করে সাহিত্যের ধর্মকে বিপন্ন করে তোলাই ছিল একুশের এই পন্য সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একুশের ছোটোগল্পে এরই সমান্তরাল একইভাবে গড়ে ওঠে মতবাদ সাহিত্যের ধারা, যার প্রধান উদ্দেশ্য কোনো মতবাদের পক্ষে প্রচার চালিয়ে পাঠককে নির্দিষ্ট মতবাদের প্রতি মোহগ্রস্ত করে তোলা। মধ্যযুগের প্রচলিত রীতি ছিল 'রাজা কোনো ভুল করতে পারেন না" কিংবা "রাজাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি", ফলে রাজার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠা সে সময়ে সম্ভব ছিল না। ঠিক সেভাবেই মতবাদ সাহিত্যের বিপক্ষে কোনো বিরুদ্ধ মত গড়ে উঠলেই দুষ্টের চক্রান্ত বলে অভিহিত করা হত। মতবাদ, সাহিত্যের ফতোয়া ইসলামী জঙ্গিদের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়। তবে ইসলামী জঙ্গিদের ফতোয়ার বিরুদ্ধাচারণ করলে কাফেরকে জেহাদিদের হাতে প্রাণ দিতে হয়, আর মতবাদ সাহিত্যের বহির্ভূত বা অদীক্ষিত কবি-সাহিত্যিকদের চারধারে একটি অদৃশ্য গণ্ডি কেটে দেওয়া হয়, যাতে অবহেলা ও উপেক্ষায় প্রতিভার বিনাশ ঘটে। এক্ষেত্রে কবি-সাহিত্যিকদের ডানা ছাঁটা হয়। পণ্য -

সাহিত্যের উদ্দেশ্য বাজার দখল এবং অপরদিকে মতবাদ সাহিত্যের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা - অর্থাৎ এই দুই ধারার সাহিত্যেরই উদ্দেশ্য ধনতন্ত্র এবং গোষ্ঠীতন্ত্রকে পরিপুষ্ট করা। প্রথম ও দ্বিতীয় ধারাটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই পরিপূরক। বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও আজ বিভ্রান্ত এদের কর্মী সক্রিয়তায়। বলা যেতেই পারে বর্তমান সময়ে এই দুই ধারার সাহিত্যের মধ্যে যে মেলবন্ধন ঘটেছে, আগামীদিনে সেই বন্ধন আরও দৃঢ় হবে বলেই মনে হয়। এরই পাশাপাশি শুভবোধ এবং যুক্তিবাদ থেকে সৃষ্টি হয় চিরন্তন সাহিত্য। শুভবুদ্ধির বিকাশ, সংস্কারমুক্ত মন এবং দায়বদ্ধতা প্রভৃতির সম্মিলিত সত্তার ভাবধারা থেকে তৈরি হয় চিরন্তন সাহিত্যের ধারা। একুশ শতকেও এই ধারা অব্যাহতভাবে প্রবহমান - তার অবলুপ্তি সাহিত্যের প্রগতির সূচক নাকি ধ্বংসের বিনাশ সাধন করেছে তাই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়।[৩]

সমাজের প্রবল ভাংচুর, সমাজব্যবস্থার নতুন নতুন শক্তি ও উপাদানের সংযোগ প্রভৃতির ফলে মানুষের গভীর ভেতরের রদবদল ও অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত ছোটগল্পের শরীরেও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। উপন্যাসে এই পরিবর্তনটি আসছে লেখকের প্রয়োজনেই। কাহিনি ফাঁদা আর চরিত্র উপস্থাপন এখন উপন্যাসের জন্য যথেষ্ট নয়, কেবল ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেই গল্পের সমস্ত দায়িত্ব পালন করা হয় বলে এখন আর কেউ মনে করে না। গল্পে ভেঙ্গে উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি গল্প তৈরি হচ্ছে, আবার একই গল্প লেখকের কয়েকটি ছোটগল্পে আসছে নানামাত্রায়, নানা ভঙ্গিতে। একই চরিত্র একই নামে বা ভিন্ন নামে লেখকের কয়েকটি ছোটগল্পে আসতে পারে, তাতেও না-কুলালে এ-চরিত্র আসন করে নিচ্ছে লেখকের উপন্যাসে। 'ছোট প্রাণ ছোট কথা বলে এখন কিছু আছে কি? 'ছোট দুঃখ কোনটি? প্রতিটি ছোট দুঃখের ভেতর চোখ দিলে দেখা যায় তার মস্ত প্রেক্ষাপটে, তার জটিল চেহারা এবং তার কুটিল উৎস। ছোটগল্পের হৃদপিণ্ডে যে-প্রবল ধাক্কা আসছে তা থেকে শরীর কি রেহাই পাবে?'[৮]

এই আলোচনার সময়কাল বিগত তিরিশ বছর, যখন আমাদের বিশ্বাসে পরিস্থিতি সব থেকে পালটে গেছে। বাংলার নতুন শাসক, এখনকার মতো তখনও। শুরু হচ্ছে গ্রাম বাংলায় অপারেশন বর্গা। জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আর আগের মতো থাকছে না। নতুন ব্যক্তির আবেগ যুক্ত হচ্ছে জমির সঙ্গে। এক দলের হাহাকারের পাশাপাশি নতুন বিত্তের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সামন্ত শাসনের ভালো-মন্দ-মিশিয়ে যে বিস্তারটা ছিল তা আইন বলে খর্ব হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে মাথা চাড়া দিচ্ছে নতুন ক্ষমতা। অন্য টানাপোড়েন সর্বত্র। এই ছিল আশির সমাজ বাস্তবতা। সত্তরের তুমুল অস্থির নতুন ক্ষমতা। অন্য টানাপোড়েন সর্বত্র। এই ছিল আশির সমাজ বাস্তবতা। সত্তরের তুমুল অস্থির সময়ে যারা কথা সাহিত্যে এসেছিলেন তারা আশিতে এসে নতুন সম্ভাবনার সময়ে ক্রমে দৃঢ় হয়ে রচনা করতে আরম্ভ করলেন। বলা চলে সত্তরের কথাকার বলতে যাদের বোঝা যায় তাঁরা গত

শতকের আট দশকেই যার যার ক্ষমতা মতো পাখা মেলালেন। বাংলা সাহিত্যে নতুন স্বর বলতে লাগল নতুন সময়ের কথা। সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, স্বপ্নময় চক্রবর্তী বদলে যাওয়া শহরতলী, গ্রাম, মানুষের চেতনার বিন্যাস হাজির করলেন পাঠকের সামনে। তখন ছোটোগল্পের ভূবনকে আরও বিস্তার করার কাজ অক্লান্তভাবে করে যাচ্ছেন মহাশ্বেতা দেবী। বোধ করি বোঝা যাচ্ছে আশির দশকের শুরু থেকেই কী বিপুল সমারোহে বাংলা ছোটোগল্প পাঠকদের আপ্লুত করে দিচ্ছিল। শুধু তাই নয় তখনও বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমল কুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ নিজস্ব বিশ্লেষণে মানুষ আর তাঁদের চারপাশকে নিয়ে লিখছেন নিজস্ব কাহিনী। অর্থাৎ বলতে চাইছি যে আশির দশকের গোড়া থেকেই বাংলা ছোটোগল্প বিপুল বৈভব নিয়ে হাজির ছিল।'

আর কিছু না হোক, এই বক্তব্য থেকে অন্তত একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে লেখা মূলত একটি দার্শনিক প্রক্রিয়া। মনে হয় এই সত্য জন্মসূত্রে সময়চেতন ছোটোগল্পের জন্য বিশেষভাবে সত্য। নতুন শতক এসেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত বদল ঘটেছে। কিন্তু একথা আজ প্রমাণিত যা কিন্তু বাস্তব, যা কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সেটাই গল্প নয়। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য যে নতুন করে জোট বাঁধছে। একে অপরের দিকে আঙুল তুলছে সেগুলো আদতে খবর। আর কে না জানে খবর আর ছোটোগল্পের যোজন যোজন পার্থক্য থেকে যায়। খবর থেকেও গল্প তৈরি হতে পারে, সেটা কথাকারের কৌশল, কথাকারের পারদর্শিতা এরকম একটা গল্পের উদাহরণ সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'ঝুলন্তিকা' গল্পটি লেখা হয় মাত্র কয়েক বছর আগে, বিষয় আজমল কাসভের ফাঁসি। লেখাটির সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে খবরের কাগজ থেকে। ফাঁসির সেল, কাসভ সম্পর্কে টুকরো টুকরো খবরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওনার চিন্তা ভাবনা। আমাদের দেশের অবস্থা, একজন সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি-সব মিলিয়ে 'ঝুলন্তিকা' খবরের স্তরে না থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সাহিত্যে।

বাংলা সাহিত্যে বিশেষত ছোটোগল্পের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি আলোচনার পূর্বে আমাদের প্রথমেই যেটা জানা দরকার তা হল কোন কোন কথা সাহিত্যিক এসময় কথা সাহিত্য রচনা করছেন ও তার পাশাপাশি আমাদের জেনে নেওয়া দরকার সাহিত্যিক এই সময়পর্বে কোন কোন বিশেষ ঘটনা কথাসাহিত্যকদের কীভাবে নাড়া দিয়েছে ও তা সাহিত্যে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এসময়ের বিশেষ কথা সাহিত্যকদের কথা উঠলেই যাদের কথা মনে আসে তাঁরা হলেন-শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদার, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, সমরেশ মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, রূপক সাহা, প্রচেত গুপ্ত, রামকুমার মুখোপাধ্যায় আরও প্রমুখ নানান কথাসাহিত্যক। এই প্রসঙ্গে এই সময়কার কথাসাহিত্যকদের বেশ কিছু গল্পগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিতে যে এই শতকে যে খুব বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে এমনটা বলা যায় না।

প্রচলিত ধারার কথা সাহিত্যিকদের মতোই এই ধারার কথা সাহিত্যিকদের লেখায় কখনও বা ফুটে উঠেছে নরনারীর প্রেমের সম্পর্কের টানাপড়েন, আবার কখনও বা সমাজবাস্তবতা লেখনি হিসাবে ধরা দিয়েছে লেখকদের লেখায়। তবে বেশ কিছু নতুন ধারার সূত্রপাত ও লক্ষ্য করা যায় এই পর্বে এসে। যেমন - গৌতম রায়ের 'ইডিয়ট ও সেই মেয়েটির গল্প' তে আমরা লক্ষ্য করি গল্প লিখতে গিয়ে কখনও যেন চরিত্রগুলি তাঁদের দুরবস্থার রিপোর্টিং হয়ে গেছে। তবু সাংবাদিক লেখকের এই গল্পগুলির মূল উপাদান হাস্যরস যা ফুটে উঠেছে এই সংকলনটির বিভিন্ন গল্পে। সুব্রত চক্রবর্তী সম্পাদিত 'যাবো যাবো যাচ্ছি' তে আমরা লক্ষ্য করি সংসারের জটিল আবর্তে মানুষের জীবন কীভাবে বয়ে চলে, গল্পগুলিতে তাই প্রতিভাত হয়েছে। প্রেম-ভালোবাসা, হতাশা, নৈরাশ্য, মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কোনও কোনও চরিত্র লড়াই করে চলে তার পরিপাশের সাথে। গল্পগুলি পড়তে পড়তে এক গভীর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঠক একাত্ম বোধ করবেন গল্পের চরিত্রের সাথে। বাদল সরকার রচিত নির্বাচিত গল্পগ্রন্থতে আমরা লক্ষ্য করি খ্যাতির তীব্র তাড়নায় মানুষ কীভাবে বদলে যায়, কীভাবে বদল ঘটে যায় তাঁর নৈতিক চরিত্রের, গল্পকার তা দেখিয়েছিন রচিত গল্পগুলির মাধ্যমে। যান্ত্রিক নাগরিক জীবনের দংশনে পারস্পরিক সম্পর্কে ছেদ পড়ার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে গল্পগুলির মধ্যে। সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাপনযুদ্ধে মেয়েরা' গল্পগ্রন্থে আমরা লক্ষ্য করি শিশুজীবন থেকে কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য বেলা পর্যন্ত পরিবার, সমাজ, ধর্ম সকলেই নারীকে নিজের নিজের মতো করে নিয়মের নিগড়ে বেঁধে ফেলতে চায়। তার বিরুদ্ধে কখনও নারী রুখে দাঁড়ায়, কখনও অসহায় হেরে যায়। গল্পগুলি সেই জীবনের কথাই বলেছে। এছাড়াও 'আয়লার পর আর ফেরার জায়গা নেই। বাস্তুটা চলে গেছে নদীতে' এভাবেই শুরু হয়েছে উৎপলেন্দু মণ্ডলের গল্প 'মাটির বাশি'। অতি সাধারণ মানুষ, যাঁদের অধিকাংশ সুন্দরবন ও তার আশেপাশের অঞ্চলের বাসিন্দা, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন, দুঃখ-যন্ত্রণা, লড়াইয়ের কাহিনী শোনায় এই গ্রন্থের 'নিত্যবাজার', 'মিশ্র প্রতিক্রিয়া', 'সুবালার স্বজন পরিজন' প্রভৃতি গল্পে। তবে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের দিক পরিবর্তনে আরও বেশ কয়েকটি দিকের বাঁক বদল ঘটেছে।[৬]

ছোটোগল্পের এই পরিবর্তন যে ঘটছে না তা নয়; কিন্তু তা তেমন চোখে পড়ে না। তার প্রধান কারণ এই যে, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভূমিকা এই ব্যাপারে গৌণ। তাদের মধ্যে সৎ ও ক্ষমতাবানেরা কিছুদিন আগে সামাজিক ধ্বসের ভেতরে থেকে হাড্ডিমাংস জোড়া দিয়ে মানুষকে উপস্থিত করেছিলেন পাঠকের সামনে, সাম্প্রতিক সময়কে উন্মোচন করার স্বার্থেই যে এই মাধ্যমটিকে গড়েপিটে নেওয়া দরকার তা নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে বোঝেন তাঁরা। তাহলে তাঁরা গল্প লেখেন না কেন? খ্যাতি লেখককে প্রেরণা হয়তো খানিকটা দেয়, তবে খ্যাতি তাঁকে আরও বেশি সতর্ক করে রাখে খ্যাতি নিরাপদ রাখার কাজে। নিজের ব্যবহৃত, পরিচিত ও পরীক্ষিত রীতিটি তার বড়ো পোষমানা, এই বাইরে যেতে তাঁর বাধো ঠেকে।[৭]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে একটি তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'অবশ্যই এগোচ্ছে। একটা আশঙ্কা হচ্ছে শেষমেশ বাংলা সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যে মিশে না যায়। নাগরিক জীবন ব্যক্তিমানুষের, সংকট নিয়ে বেশি লেখা হচ্ছে। এ সবই পশ্চিমি দেশগুলোর অনুকরণ।' পা ইচ্ছে করে জোরে চালিয়ে আমরা শতাব্দী পার করে দিলাম। আবার যেন নতুন করে মনে পড়ল কাফকার সেই উক্তি 'A book must be the axe which smashes the frozen sea with us.' কথাটি যেন ছোটোগল্প সম্পর্কে আরও বেশি সত্য। ইতিমধ্যে নতুন শতাব্দী আমাদের আরও কৃষ্ণগহ্বরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কম্পিউটার দিয়ে ঝকঝকে মাথা তৈরি করা হচ্ছে। রাষ্ট্র এখন আন্তর্জাতিক মোড়লের দালাল হয়ে দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিচ্ছে। এই সমাজ বাস্তবতাকে নিয়ে বর্তমানে সক্রিয় গল্পকাররা নানা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আখ্যান রচনা করে চলেছেন।

ধারাটা চলেছে। সৃষ্টির ধারাটা চলছেই। হয়তো বা পুরানো কিছু গল্পকার সেভাবে আর সামনে আসছেন না। তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য নতুন নতুন কথাকাররা এগিয়ে আসেন। নতুন শতকের শূন্যদশকে লক্ষ্য করা গেল একঝাঁক নতুন কথাকারদের। সাদিক হোসেন, শতদল বসাক, সম্বিত চক্রবর্তী, অশোক তাঁতি, পার্থজিৎ ভক্ত, স্বাতী গুহ তাঁদের নতুন স্বর নিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের দুনিয়ায় দৃঢ় ভাবে পা রেখেছেন। এই শতকের গোড়ার দিকেও যখন বোঝা গেল জমি বিতরণ সমাজে বড় কোনও পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ তখনও এই সময়ের কথাকারেরা তাঁদের আখ্যান এই বাস্তবতাকে লিখছেন। পার্টিতন্ত্রের দাপাদাপি, মানুষ যেন স্বপ্নহীন। কোন বড় স্বপ্ন দেখতে মানুষ ভুলেই গেছে। প্রযুক্তি ধীরে ধীরে সমাজের গভীর প্রবেশ করেছে, মানুষকে মানুষের কাছে নিয়ে আসছে, আবার দূরেও সরিয়ে দিচ্ছে। গরিব দেশ, অর্থনীতি বন্ধ, বহুজাতিক আগ্রাসনে প্রায় ভিক্ষাজীব, অথচ বাইরে থেকে আসছে তথ্য প্রযুক্তি, আসছে অন্য ইতিহাসের প্রয়োজনে সৃষ্টি নানা কৃতকৌশল যা এই অন্যের প্রয়োজনেই এখানে রপ্তানি হচ্ছে। এওতো এক অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রক্রিয়া। এর ফলাফল চৈতন্যে, মনে, অনুভূতিতে, শুধু ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়া নয়, তার গহন ব্যক্তিতে ও কি পরিবর্তন আনছে?

এই সব জটিল সামাজিক সমস্যার সমাধানের দায় নিশ্চয় সাহিত্যের নয়। ছোটোগল্পেরও নয়। সাহিত্য কেবলমাত্র পরিস্থিতিটা গভীর সংবেদনশীলতায় দেখাতে পারে ও দেখতেও পারে এইমাত্র মেয়েদের কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক খুঁটিনাটি ভালোমন্দ - পরিবারে রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে অতি দক্ষতায় তুলে এনেছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। পরবর্তীকালে সুচিত্রা ভট্টাচার্য এবং অবশ্যই বানী বসু। নব্বই দশকে অহনা বিশ্বাস, জয়া ঘোষাল, অনিতা অগ্নিহোত্রি বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় নতুন সংযোজন করে যাচ্ছেন। এঁরা যে শুধু নারীবিশ্বের কথক তা নয়, গোটা সমাজকে নানা কৌণিক দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়েছেন। নতুন শতকের নয়া বাস্তবতা। । মানব সমাজে তা বটেই ব্যক্তি মানুষও পালটে যাচ্ছে। ক্রমে কেবল প্রকাশিত

হচ্ছে দ্বিধা, কনট্রাডিকশন আর মারাত্মক ক্লান্তি। একই সামাজিক অবস্থা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের উপর কত বিচিত্র প্রভাব ফেলতে পারে তার ঠিকানা পাওয়া যায় অতি তরুণ সাদিক হোসেন, সজল ঘোষ থেকে বাংলা ছোটোগল্পের দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পথিক সাধন চট্টোপাধ্যায়, সোহরার হোসেন, অসীম চট্টরাজ, সুকান্তি দত্ত ও শরবিন্দু সাহার ছোটোগল্পে। চেতনা, মেধা ও উপলব্ধির দিক থেকে লেখকরা এগিয়ে থাকা মানুষ। সেই মূলধনটুকু আঁকড়ে ধরে ডোবা থেকে বেরোতে হবে, নিজের শ্রেণির গণ্ডী অতিক্রম করতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। দেশে কালে বিস্তৃত সজীব তপ্ত প্রাণময় বাঙময় দেশ ও মানুষের দিকে। এগোতে হবে চেতনার দিক থেকে, বুদ্ধির দিক থেকে, বোধ ও উপলব্ধির দিক থেকে....।[৮]

মনে আসে সলোমন রুশদির লেখা 'Haroun and the sea of stories' গল্পটির কথা। ছোট্ট ছেলে হারুন মারাত্মক বিপন্ন কারণ তার গল্পকার বাবার গল্প বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ অনুসন্ধানে সে এক জাদুকরী, মায়াভরা বিচিত্র অভিযানে বেরিয়েছে। ধীরে ধীরে সে আবিষ্কার করে পৃথিবীর তাবৎ গল্পের উৎসবরূপী এক কথাসরিৎসাগরকে। যেখানে বিচিত্রবর্ণের গল্পের স্রোত নানা বিভঙ্গে খেলে বেড়ায়, অথচ কেউ তার স্বরূপ হারায় না।

তথ্যসূত্র :

১। অমিয়কুমার বাগচী বিশ্বায়ন ভাবনা - দুর্ভাবনা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮ পৃষ্ঠা-২০৭-২১৩

২। অমিয়কুমার বাগচী, বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৮ পৃষ্ঠা-২৩৯-৩২৬।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৩১৯-৩২৬।

৪। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে? চিন্তাসূত্র ইন্টারনেট (http://www.chintasutra.com) date : ১/১/২০১৭

৫। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), বাংলা গল্প সংকলন, ভূমিকা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৮, পৃষ্ঠা-ক-ঢ।

৬। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা), বাংলা গল্প সংকলন, ভূমিকা, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য একাদেমি, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১-৭।

৭। আখতারুজ্জমান ইলিয়াস, বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে? চিন্তাসূত্র, ইন্টারনেট (http://www.chintasutra.com) date : ১/১/২০১৭

৮। অশ্রুকুমার সিকদার (সম্পা), বাংলা গল্প সংকলন, ভূমিকা, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৬, পৃষ্ঠা- ১-১২।

পদ্মানদীর মাঝি : লোক উপাদানের বহুমাত্রিক প্রয়োগ

অর্পিতা মণ্ডল*

রবীন্দ্রোত্তর কালের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬ খ্রিঃ) এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হল 'পদ্মানদীর মাঝি'। বাংলা সাহিত্যের নদীকেন্দ্রিক জনজীবন নিয়ে এতদ্‌কাল পর্যন্ত নানান ধরনের লেখালেখি চোখে পড়ে। সেই জগতের মধ্যে 'পদ্মানদীর মাঝি' আজও সচেতন পাঠক হৃদয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। আর এই বিশেষত্বের জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসটি। আবার, আমাদের বাংলা সাহিত্যেও এই কাহিনি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই নবীন গবেষক হিসাবে আমার আগ্রহের বিষয় 'পদ্মানদীর মাঝি ঃ লোক উপাদানের বহুমাত্রিক প্রয়োগ'।

লোক সমাজের মর্মমূলে প্রচলিত বিভিন্ন উপাদানকেই আমরা লোক উপাদান (Folk Material) বলি। প্রত্যেক লোকসমাজে এ রকম অজস্র উপাদান মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। যা তারা Traditionaly ভোগ বা ব্যবহার করে আসছে বংশপরম্পরায়। এইভাবে ব্যবহৃত হতে হতে কখনো-কখনো সেই সব লোক উপাদানগুলি (সে Material বা Nonmaterial যাই-ই-হোক) জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। তাদেরই সৃষ্ট পরিশীলিত সাহিত্যে। ফলে লোকজ রসগ্রহণের উপরি পাওনা থেকে সহৃদয় পাঠকসমাজ বঞ্চিত হন না।

শুধু বাংলা কথাসাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এক সাড়া জাগানো উপন্যাস হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬ খ্রিঃ)। বলাবাহুল্য, মানিকের মানসপ্রকৃতি গড়ে ওঠার অধিকাংশ দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে নগর কলকাতায়। তাই স্বভাবতই সাধারণ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে, তাঁর লেখাতে কেন এমন অজস্র লোক উপাদানের ভীড়। কিন্তু — 'এহো বাহ্য'। মানিকের নিজের অভিজ্ঞতাতে আমি জানতে পেরেছি, এ উপন্যাস লিখবার আগে তিনি বহুদিন পূর্ববঙ্গের, পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেখানকার মানুষ-জন, তাদের জীবন-জীবিকা ও তাদের ভাষার সঙ্গে তিনি ওতোপ্রতোভাবে পরিচিত হয়েছেন। আর সেই জন্য তাঁর পদ্মানদীর মাঝিতে উপাদান ও মানুষ মোটেই কৃত্রিম নয়, যথার্থই তারা নদীমাতৃক বাংলাদেশের কুশীলব, তাদের আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে মাটি-মানুষের গন্ধ। উপন্যাসের নিবিড় পাঠের মাধ্যমে এ সত্য অবশ্যই ধরা পড়বে।

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের প্রধান নদী পদ্মা। সেই পদ্মার বুকে জীবিকা অর্জন করে বেঁচে-বর্তে, সুখে-দুঃখে দিন কাটায় মাঝি-জেলে সম্প্রদায়ের মানুষজন। বর্ষকালে পদ্মার বুকে আসে ইলিশের ঝাঁক। এই সময়টিতেই পদ্মার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের প্রকৃত রোজগারের সময়। পদ্মার ইলিশের স্বাদ পাবার আশায় সারা বছর সমগ্র বাংলার মানুষ অপেক্ষায় থাকে। সেই পদ্মা ও তার জেলে-মাঝি সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকা নিয়ে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস (১৯৩৬ খ্রিঃ)। এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে বা ইঙ্গিতে বিভিন্ন লোক উপাদানের উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি মূলত কেতুপুর গ্রাম ও সেখানকার মাঝি কুবেরের জীবনকে বেষ্টন করে রচিত হয়েছে। নিরক্ষর, বোকা, গরীব, অল্পে খুশি কেতুপুরের জেলে ও মাঝি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস ও সংস্কারের বিপুল আধিপত্য আমাদের চোখে পড়ে। লোকসমাজে প্রচলিত বহুজন লালিত বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে। পদ্মানদীর আর এক মাঝি গণেশ, মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ঃ

''পৃথিবীতে মানুষ আসিলে তাহাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব যে মানুষের নয়, যিনি জীব দেন তাঁর।"

এখানে বহুপ্রচলিত একটি প্রবাদ : বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর-এর কথা স্মরণ করায়। আবার,.। নদীতীরে ভাসমান কাঠকে নিয়েও এই অঞ্চলের মানুষের অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা। সেই কাঠ তারা ঘরে তোলে না কারণ, তাদের বিশ্বাস নদীতে ভাসমান কাঠ চিতারচনার প্রয়োজনেই নদীতীরে আনা হয়ে থাকে। শুধু ওই অঞ্চল নয়, এখনও সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণা বর্তমান।

লোকসমাজ নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাদের চিন্তাভাবনা নাগরিক সভ্যতা থেকে অনেকটাই পৃথক। নাগরিক জীবন যা ভাবতে পারে না, লোকজীবন তা অনায়াসেই করে ফেলে বৃহস্পতিবার যে ধার (কর্জ) দিতে নেই এই সংস্কার পদ্মাতীরবর্তী মাঝি সম্প্রদায়ে প্রচলিত। তাই হীরুজ্যাঠার কাছে গণেশের স্ত্রী উলুপী চাল ধার করতে গেলে সহজেই তিনি বলতে পারেন — ''বিষ্যুদবার কর্জ দেওন মানা।" যদিও এর মধ্যে লোকচাতুরীর সূক্ষ্ম আভাস লক্ষিত হয়।"

ভৌতিক বিশ্বাস, সহজ, সরল পদ্মাতীরবর্তী এই মানুষদের মনে এক বিরাট স্থান বা জায়গা অধিকার করে আছে। তাই, নির্জন নদীর ঘাটে 'সন্ধ্যারাত্রে' হাসির শব্দে কুবেরের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় -

''....আকস্মিক হাসির শব্দে কুবের ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ঠকঠক করিয়া সে কাঁপিতে থাকে। নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যারাত্রে কে হাসিবে? মানুষ নয়, নিশ্চয় নয়!"

আবার, ভৌতিক বিশ্বাস আছে বলেই নদীর ঘাটে সাদা কাপড় পরে রাত্রে একা একটি

রমণীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও কুবেরের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় — তার 'বুকের মধ্যে হঠাৎ কাঁপুনি' ধরে যায়।

একইভাবে জাদুমন্ত্র তুক-তাক, ভূতপ্রেতকে বশীভূত করা প্রভৃতি বিষয়গুলি পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চলের নিরক্ষর মানুষগুলির মনে গভীর রেখাপাত করে। তাই এই উপন্যাসের রহস্যময় চরিত্র হোসেন মিয়াকে কুবের উপেক্ষা করতে পারে না, তার মনে হয় —

''কী জাদুমন্ত্রে তাহাকে বশ করিয়াছে লোকটা!''

কিংবা হোসেন মিয়ার ভূত-প্রেতকে বশীভূত করার ক্ষমতার কথাও তার মনে হয় —

''মনে হয় আশ্বিনের ঝড় নয়, হোসেন মিয়াই আমগাছ ফেলিয়া আমিনুদ্দির কুটিরখানি চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। লোকে যে বলে কোনো কোনো মানুষের ভূত-প্রেতের ওপর কর্তৃত্ব থাকে, হোসেনেরও তাই আছে কিনা কে জানে!''

লোকসমাজ ঠাকুরদেবতাকে ভীষণভাবে বিশ্বাস করে। তাই আশ্বিনের ঝড় শুরু হলে মেয়েরা উঠানে পিঁড়ি পেতে দেয় — ''ঝড়ের দেবতা বসিবেন, শান্ত হইবেন।'' বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মেয়েলি ব্রতগুলি এই বিশ্বাস পালিত হয়। পিতা-স্বামী পুত্রের নদী থেকে নিরাপদে ফিরে আসার কামনায় ঘরে ঘরে মেয়েরা কপাল ঠুকে মধুসূদনকে স্মরণ করে। কুবেরও ফিরে এলে কপিলা উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেলে ও বলে — ''ঠাকুর আমার মুখ রাখছেন - আমি মানত কইরা থুইছি পাঁচ পহার হরিলুট দিমু!''

দেবতার মত লোকসমাজ অপদেবতাকেও ভীষণভাবে মানে। অতিরিক্ত ভয় বা পয়সা চুরির পাপবোধ থেকে হোসেন মিঞার সম্পর্কে নানা অলৌকিক শক্তির কথা কুবের কল্পনা করে। তখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি ও অশরীরী শক্তির কাণ্ডকারখানা বলে বিবেচিত হয় —

''ঘরের চালা হয়তো নয়, হয়তো হোসেনের পোষ-মানা অন্ধকারের অশরীরী শক্তি সেদিন গোপির হাঁটু ভাঙিয়া দিয়াছিল,.....''।

কুবেরের স্ত্রী মালার পা খোঁড়া হওয়ার কারণ হিসাবে সমাজ অস্বীকৃত সম্পর্কের পাপ-কে দায়ী করা হয়েছে। মালার মায়ের এক বামুন ঠাকুরের সঙ্গে অসামাজিক সম্পর্কের পাপেই মালার একটি পা জন্ম থেকে ভাঙা ছিল বলে লোকসমাজে বিশ্বাস করে। একজন মেয়ের পাপের ফলভোগ করছে অন্য একটি মেয়ে। আবার কুবেরও তো কপিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে একই পাপ করেছে-কিন্তু তার কোন শাস্তি নেই পুরুষশাসিত সমাজে। পুরুষ বলেই কি তার 'সাতগুন মাপ'? এটি বিতর্কমূলক গভীর বিচার সাপেক্ষ বিষয়। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আলোচনার আশা রাখলাম।

এবার আসি কুসংস্কার কেমনভাবে মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখে তার কথায়। পদ্মাতীরবর্তী নিরক্ষর মানুষগুলির মনে তা গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাই কুবেরের মেয়ে গোপীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াকে 'প্রতিমা বিসর্জনের' সমান বলে লেখক বর্ণনা

করেছেন —

"গ্রামের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নেওয়া প্রতিমা বিসর্জনের চেয়ে কম গুরুতর ব্যাপার নয় জেলেপাড়াবাসীদের কাছে — "

লেখাপড়া অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞান সম্পর্কে পদ্মানদীর জেলে সম্প্রদায়ের মানুষরা বড়ই উদাসীন। তাই মেজোকর্তা অনন্ত তালুকদার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান দেওয়ার জন্য জেলেপাড়ায় কিছুদিন যাতায়াত করলে লাভের লাভ কিছুই হয় না, শুধু জেলেপাড়ার মেয়ে বৌদের নামে কুৎসা রটে। এই একই কারণে কুবেরের স্ত্রী মালার ফর্সা ছেলে হলে মেজোকর্তার নাম তুলে রসিকতা করতেও এ সমাজ কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

শোষক-শোষিতের যে চিরন্তন সম্বন্ধ এই উপন্যাসে ও তার অন্যথা হয় না — ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কুবের-গণেশ বা জমিদারের মুহুরি শীতল ঘোষের সঙ্গে কুবেরের। মাছ নিয়ে গরীব কুবেরকে কয়েকটা পয়সা দিতেও শীতলবাবুর অনীহা। লেখক বলেছেন, শীতল কোনদিন ঋণশোধ করে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'চণ্ডীমঙ্গল' এর মুরারীশীল চরিত্রটির কথা। যিনি ব্যাধ কালকেতুর কাছে মাংস নিয়েছেন, কিন্তু সামান্য মাংসের কয়েকটা পয়সাও শোধ নিতে চায় না, কালকেতুকে দেখে খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়।

পদ্মাতীরবর্তী জেলেসমাজে, কন্যাপণ প্রচলিত। গণেশ উলুপীকে ঘরে আনে তেইশ টাকা পণ দিয়ে। কুবের ও বারবার তার মেয়ে গোপীর জন্য টাকা পণ হিসাবে চেয়েছে। ছোট বয়সেই মেয়েদের বিবাহদানের রীতি প্রচলিত ছিল। বিবাহ না হলে সমাজে লোকনিন্দার ভয় ছিল। তাই গোপীর এগারো বছর বয়সকে কমিয়ে নয় বছর বলা হলেও তা বিয়ের বয়সের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

Non-material বা বস্তুনিরপেক্ষ লোকউপাদানের মধ্যে প্রবাদের ভাণ্ডার বিশাল। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দেশেই প্রবাদের ব্যবহার অনেক সুপ্রাচীনকালে থেকেই চলে আসছে। দেশ-কাল-সমাজ-সংসার-সংস্কার-পরিবেশ-ধ্যানধারণা-জগৎ-ইত্যাদি মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার প্রকাশই হল প্রবাদে। অর্থাৎ একই কথা দীর্ঘদিন লোকমুখে প্রচলিত হতে হতে প্রবাদের সৃষ্টি হয়। প্রবাদ সম্পর্কে একটি মত হল —

"A proverb is a saying, usually short, that expresses a general truth about lift".

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও জেলে সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কয়েকটি প্রবাদের ব্যবহার করেছেন — হীরুজ্যাঠা চাল ধার না দেওয়ার গণেশ বলে —

"খালি নিবার পারে, দিবার পারে না।"

আবার, গণেশের কথার মধ্যে "জীব দেন যিনি, আহার দেবেন তিনি"

ইত্যাদি প্রবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

লোকসঙ্গীত হল বাংলার সমাজজীবনের একটি সমৃদ্ধ ও প্রাণময় আঙ্গিক। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন - "যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন

করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোক-গীতি বলে।" 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে যে লোকসঙ্গীতের পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মূলত প্রেমের আবেদন প্রকাশিত হয়েছে। গণেশ ভালো গাইতে না পারলেও সে একটি গান গায় যেখানে "যে যাহারে ভালোবাসে সে তাহারে পায় না কেন" এই গভীর সমস্যার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

রহস্যময় হোসেন মিয়ার কণ্ঠে ও আমরা সুখী দাম্পত্যজীবনের প্রেমপূর্ণ একটি গীত শুনি —

"আধঁর রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু, কত ঘুমাইবা
বাঁয়ে বিবি ডাইনে পোলা আকাশ ফসল রোও।
মিয়া কত ঘুমাইবা।
নিদ্ ভাঙ্গে না, দিল জাগে না, বিবির বুকের শির,
পাড়ি দিবার সময় গেল, মাঝি তবু থির -
মাঝি কত ঘুমাইবা।"

আরো একটি প্রেমের গান আমরা গণেশের কণ্ঠে শুনি -

পিরিত কইরা জ্বইলা মলাম সই, আ লো সই!
আওন যাওন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ!
আ লো সই।
থাকলি' ঘরে ছ্যাচন কেমন, ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ন ভাইজা করে খৈ!
আ লো সই!

সভ্যতার সূচনা থেকেই শিশু, মধ্যবয়সী বা বয়স্ক - সমস্ত মানুষই গল্পপাগল। তাই পৃথিবীর ইতিহাসে গল্প সবচেয়ে প্রাচীন, সর্বাপেক্ষা আদৃত ও সর্বজন গৃহীত। সেই গল্পের বিষয়বস্তুগুলি শ্রুতিপরম্পরায় আজও চলে আসছে। আলোচ্য উপন্যাসে আমরা পাই রাসুর মুখে বলা ময়নাদ্বীপের গল্প। সে বারবার সেখানকার গল্প শুনিয়ে সবাইকে আশ্চর্য করতে ও ভয় পাওয়াতে ভালোবাসে। যদিও গল্পগুলি বেশীরভাগই ছিল তার কল্পনা প্রসূত —

"—বাঘ সিঙ্গি। বাঘ সিঙ্গির নামে ডরাইলা? কী নাই ময়নাদ্বী কে কও? সাপ যা আছে এক একটা, আস্ত মাইনসেরে গিলা খায়! সুমুন্দুরের কুমির ভাঙায় উঠ্যা আইসা মাইনসেরে টাইনা নিয়া যায়—"

একইভাবে কুবেরে ঘরে যে ঢেঁকি আছে, সেই ঢেঁকির কাঠের ইতিহাস গল্প বলার ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাসে আমরা রূপকথার প্রসঙ্গ পাই। কুবেরের পঙ্গু স্ত্রী মালা রূপকথা বলে। সে রূপকথার রাজা, রাণী, রাজকন্যা, রাজপুত্র, রাক্ষসদের নিয়ে এমন কোন আবেষ্টনী

তৈরী করে, যাতে সবাই-তার সন্তানরা, পিসি, প্রতিবেশীরা, এমনকি কুবেরও আকৃষ্ট হয় ও নিঃশব্দে শোনে।

''মালা রূপকথা বলে। মালার মাথায় উকুন, গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়,

তাই এ সময়টা সে যে কত বড়ো নিখুঁত ভদ্রমহিলা, অসামঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়।....

ডিবরির শিখাটি ঊর্ধ্বগ ধোঁয়ার ফোয়ারা, মাথার উপরে চাল পচা শণের, চারিপাশের দেয়াল চেরা বাঁশের, স্যাঁতসেঁতে ঢেউ তোলা মাটির মেঝে। আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী। অভিনয় সুমার্জিত সভ্যতার।"

উপরের মালার রূপকথা বলার পরিবেশের বর্ণনা মনে করিয়ে দেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ''রূপকথা' প্রবন্ধে এরকম একটি পরিবেশের কথা —

''বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলো ছায়ার লীলাচঞ্চল নৃত্য; সর্বোপরি কল্পনা-প্রবণ আশা-আকাঙ্খা উদ্বেল শিশুহৃদয় এবং ঠাকুমার স্নেহসিক্ত সরস, তরল কণ্ঠস্বর;"

সোনাখালির রথের মেলাকে কেন্দ্র করে উঠে আসা অন্নবাবার মাঠ প্রসঙ্গে একটি স্থানিক বা আঞ্চলিক কাহিনী লেখক উদ্বৃত করেছেন। এ অঞ্চলে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হলে এক সন্ন্যাসী এসে মাঠে আস্তানা করেন ও এক বিরাট অন্নসূত্র খোলেন। নিজের বলতে সন্ন্যাসীর সেরকম কোন সম্বল না থাকলেও শোনা যায়, তাঁর এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। চোখে চোখে চেয়ে আদেশ করলেই বড়ো বড়ো জমিদার মহাজনেরাও সেই আদেশ পালন করত-মনে মনে চাল, ডাল পাঠিয়ে দিত। প্রচুর ভদ্রগৃহস্থ ব্যক্তি নিজেরাই তা রান্না করে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের অন্ন বিতরণ করত। সেই থেকে এই মাঠের নাম অন্নবাবার মাঠ নামে পরিচিত লাভ করে।

উৎসব সমাজজীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। 'বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন-আলোচ্য উপন্যাসে তেরো পার্বনের একটি, যা বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব 'দুর্গাপূজা' তার উল্লেখ আছে। কেতুপুর গ্রামে জমিদারবাবুদের একটি পূজা হয়। সেই পূজাকে কেন্দ্র করে ঢাক-ঢোলের সমারোহে সারা গ্রামে উৎসবের বাতাবরণ তৈরি হয়।

'দুর্গাপূজার' বিজয়ার পর চতুদর্শীতে 'ভাসানযাত্রা'র আসর বসে আমিনবাড়িতে। কুবের, মেয়ে গোপীকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে সারারাত 'ভাসানযাত্রা' দেখে। সেই ভাসানযাত্রায় চাঁদসদাগর-মনসার কাহিনী তথা 'মনসামঙ্গলে'র কাহিনী অভিনয়ের প্রসঙ্গ আছে।

'ঢিমাইয়া ঢিমাইয়া অভিনয় চলে, মা মনসা একটা গান করেন, চাঁদসাগর দুটো কতা বলে, মৃত লখিন্দর উঠিয়া একটা গান করিয়া আবার মরিয়া যায়।"

রাধা-কৃষ্ণের মধুর মিলন দোলউৎসবের প্রসঙ্গও পাই 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। কপিলার টানে কুবের দোলের দিন তার শ্বশুরবাড়ি চরডাঙায় যায়। সেখানকার দোলউৎসবের

একটি মনোরম দৃশ্য এবং দোলের রাজার একটি সুন্দর বর্ণনা আমরা আলোচ্য উপন্যাসে পাই —

"গাধার মতো ক্ষুদ্রকার একটা ঘোড়ার উপরে বিচিত্র সাজে দোলের রাজা অতি কষ্টে বসিয়া আছে, গলায় তাদের ছেঁড়া জুতোর মালা, গায়ে গোটা দশেক ছিন্ন-ভিন্ন জামা, চারিদিকে লড়বড় করিয়া ঝুলেতেছে অনেকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়া।"

রথের মেলার প্রসঙ্গও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উঠে এসেছে। সোনাখালি গ্রামে রথের উৎসবের কথা আছে। সোনাখালির জমিদারের রথ অন্নবাবার মাঠের একপাশে সাতদিন থাকে, উলটোরথের দিন আবার জমিদারবাড়ির দিকে রওনা হয়। রথ ও রথের মেলায় কেনা জিনিসপত্রকে কেন্দ্র করে জেলেপাড়ায় রীতিমত উৎসবের আমেজ তৈরি হয়।

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায় গীতিকা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের সৃষ্টি। আলোচ্য উপন্যাসে কোনো গীতিকার উল্লেখ না থাকলেও গীতিকা রচনার প্রসঙ্গ এসেছে। কুবের এসেছে অনুকূল পরিবেশ থাকলে হোসেন মিয়া হয়তো গীতিকা রচনা করতে পারত। সেগুলিই মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জীবিত থাকত ও দূরদূরান্তরে কেতুপরের দেওয়ান ফকির হোসেন সাহেবের দরগায় নাম ছড়িয়ে পড়ত। একইভাবে যুগলের মুখে মুখে ছড়া বাঁধার প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য উপন্যাসে লোকচলাচলের মাধ্যম হিসাবে নৌকা ও পালকি-র প্রসঙ্গ আছে। মাঝি ও জেলে সম্প্রদায়ের, নৌকা সবসময়ের সঙ্গী—আর আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে মাঝি - জেলে - সম্প্রদায়ের কাহিনী, তাই নৌকার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় - নৌকা ছাড়া পদ্মানদীর মাঝিদের জীবন অচল। বর্তমানে পালকির আর তেমন ব্যবহার লক্ষিত হয় না।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আমরা পূর্ববঙ্গের লোকভাষা তথা বাংলা ভাষার একটি উপভাষা 'বঙ্গালী'র পরিচয় পাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত —

শীতলবাবু ও কুবেরের কথোপকথন -

'পয়সা কাইল দিমু কুবের।

বলিয়া সে চলিয়া যায়, কুবেরও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইয়া পা বাড়াইয়া বলিল, রন শেতলবাবু, অমন ত্বরা কইরা যাইয়েন না। দামটা দ্যান দেখি।

কাইলা দিমু কইলাম যে?

অঁই, অখন দ্যান। খামু না। পোলাগো খাওয়ামু না?

পয়সা নাই তো দিমু কী? কাল দিমু, নিয্যস দিমু।"

লোকসমাজের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মিলনস্থল হল হাট - যার প্রসঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসে 'সুবচনীর হাটে'র মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

বহুবিবাহের-র কথা ও আলোচ্য উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন — হোসেন মিয়ার প্রথম স্ত্রী বর্তমানে ও সে দ্বিতীয় বিবাহ করে। আবার, কপিলার স্বামী শ্যামাদাস ও কপিলার বর্তমানে আর একটি বিবাহ করে - কপিলাকে ঘরে স্থান দেয় না। আবার, ময়নাদ্বীপে এনায়েতের অসমাজিক সম্পর্ককে বিবাহের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী অঞ্চল তথা পূর্ববাংলার লোক উপাদান বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। পদ্মানদীর মাঝিমাল্লা ও জেলেদের জীবনে অভাব চিরসঙ্গী-বিপদ, আপদ ও পিছু ছাড়ে না, তবুও এই গরীব, সহজ, সরল মানুষগুলি তাদের বিশ্বাস সংস্কার নিয়ে বেঁচে থাকে। সারাবছর পরিশ্রম করেও ভাতের অভাব যারা মেটাতে অক্ষম তারাও চায় একটু তৃপ্তি ক্ষণিকের আনন্দ। তাদের মনেও কাজ করে রসবোধ - আর এই রসবোধ থেকেই জন্ম নেয় বিভিন্ন লোকসাহিত্য। যেগুলির উদ্ভবের কেউ খবর রাখে না, রাখে না হিসাব। যেগুলি যুগে যুগে, কালে কালে অবিস্মরণীয়ভাবে মানুষের মনে বেঁচে থাকে। লোকসৃষ্টিগুলি সম্পর্কে আমরা নিম্নোক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি —

ও নদী রে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে
বল কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কি চলার শেষ...।

তথ্যসূত্র :

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি, প্রথম প্রকাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৩৬
২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০
৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪
৪। ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, অবসর ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট -১৬৬৭

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ ও বৈচিত্র্যে বরাক উপত্যকার গল্প

সুদীপ সরকার*

বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তি ভূবন জোড়া, তা শুধুমাত্র কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের সীমানায় আবদ্ধ নয়। বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগের ফসলে সারা ভারত এমনকি সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত তথা উজ্জীবিত হয়েছে। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এর একমাত্র কেন্দ্রীয় ভূবন হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের ঢাকা দ্বিতীয় ভূবনে পরিণত হল। বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃতি কিন্তু এখানেই থেমে থাকল না। সময়ের সঙ্কট ও অস্তিত্বের বিপন্নতাকে বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভূবন—বরাক উপত্যকা। উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম বা অসম নামক রাজ্যের উল্লেখযোগ্য দুটি নদীর মধ্যে একটি হল ব্রহ্মপুত্র, ওপরটির নাম বড়বক্র বা কলংমা বা বরাক। বরাক নদীটি আবার কুশিয়ারা ও সুরমা নামে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশের দিকে। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং বরাক কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল বরাক-কুশিয়ারা বা বরাক উপত্যকা নামে সাধারণত পরিচিত। কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি-এই তিনটি জেলা দ্বারা গঠিত হয়েছে বরাক উপত্যকা অঞ্চল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মূলত অসমীয়া জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস। অন্যদিকে দেশবিভাগের আগে থেকে পূর্ববাংলা অধুনা বাংলাদেশের অখণ্ড সুরমা উপত্যকার সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে সেখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষের বসতি অপেক্ষাকৃত বেশি।

অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণের তুলনায় এখানকার ছোটগল্পের মধ্যেই এই অঞ্চল অনেক বেশি প্রতিভাত। ছোটগল্পই বরাক-কুশিয়ারা নদীর রসসঞ্জাত হয়ে এই ভূবনের জনজীবনকে মূর্ত করে তুলেছে। 'বরাক উপত্যকা যে দুঃখিনী বর্ণমালার ভূমি, দুয়োরানীর দেশ—।'[১] সেখানে ঝরনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চালতা গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে শিশির ভেজা উপজাতি জন-জীবনের ছবি, কখনও বা উগ্রপন্থার নির্মমতা, সীমান্ত সমস্যায় জর্জরিত সীমান্তবর্তী জনমানসের অসন্তোষ, অস্তিত্বের সংকটে ঝুঝতে থাকা অসহায় বাঙালির নীরব প্রতিবাদ প্রতিনিয়ত ভাষা পাচ্ছে গল্পের অবয়বে। তাই 'অনিশ' (১৯৬৯) কিংবা 'শতক্রতু' (১৯৭৩)-র মতো পত্রিকা গোষ্ঠী কিংবা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ঝুমুর পাণ্ডে, রনবীর পুরকায়স্থ প্রভৃতিদের নিরলস প্রচেষ্টায় নির্মিত গল্পসাহিত্যের ভূবন—দূরের হলেও তাতে যেন কাছের কণ্ঠস্বরই ভাস্বরিত হয়। বরাক-কুশিয়ারা উপত্যকার গল্প- তার ভাষা, ভাব এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে আমাদেরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বরাক উপত্যকার গল্পগুলিতে কতকগুলো বিষয়ের উপস্থিতি আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি। যেমন —

*গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ।

উপজাতি জনজীবন, সীমান্ত সমস্যা, বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সংকট, উগ্রপন্থা সমস্যা প্রভৃতি।

উপজাতি জনজীবন ঃ

বরাক উপত্যকার উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রয়েছে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি, উপভাষাগত বৈচিত্র্য। এদের মধ্যে কেউ কেউ এখানকার আদি বাসিন্দা, যেমন-মাড়, ডিমাসা, লুসাইত প্রভৃতি। আবার কেউ বা অন্যত্র থেকে জন্মভূমির শিকড় কেটে উঠে আসা সম্প্রদায়। এই শেষোক্ত সম্প্রদায় প্রসঙ্গে জানতে পারা যায় — 'When tea was discovered in upper Asam, it was found to be even better than what was grown in China, The local population did not want to work the plantations, so the British brought workers from Bihar, Telengana and Mysore.'[২] অর্থাৎ এই অঞ্চলের উপজাতিদের একটা বড় অংশ মূলত বহিরাগত সম্প্রদায়, যারা মূলত জীবিকার সন্ধানে এই অঞ্চলে এসে পড়ে।

ঝুমুর পাণ্ডে তাঁর 'সুখ গাছের গল্প' তে রামবাসিয়া নামক এক বৃদ্ধা উপজাতি মহিলার জীবনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ করতে চেয়েছেন উপজাতি জনজীবনের আশা-আকাঙ্খা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং তাদের সংস্কৃতি তথা অস্তিত্বের সমস্যাকে। রামবাসিয়া স্বামী পরিত্যক্ত সর্ব পরিজনহারা এক বৃদ্ধা। একমাত্র নাতি লক্ষীন্দরকে নিয়ে সে গড়ে তুলতে চায় একটি ছোট্ট সুখের পৃথিবী। কিন্তু সমকালীন আধুনিক সমাজ জীবনের প্রভাব সভ্য আধুনিক দুনিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে আঘাত হানে উপজাতি জনজীবনেও। চা বাগানে পাতি তোলার কাজ করে বড় হওয়া রামবাসিয়ার ইচ্ছে ছিল নিজের নাতিটাকেও চা বাগানের কাজে নিযুক্ত করবে। কিন্তু সমকালের প্রভাবে লক্ষীন্দর জানিয়ে দেয় — 'হামি রেডিয় টেপের দোকান দিব'। আসলে লক্ষীন্দর এখন 'চোরি চোরি চুপকে চুপকে' গান শোনে, 'কিলাবঘরে' টি ভি দেখে। আধুনিক সমাজ জীবনের প্রভাবে সে আর উপজাতি গোষ্ঠী জীবনের নিয়ম-রীতির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায় না। রামবাসিয়া আরও লক্ষ্য করে তাদের গোষ্ঠীর সমাজ জীবনের পরিবর্তনগুলোকে। সে দেখে - 'আগে পূজায় যাত্রা হতো ঢপও হতো। বাসন্তী পূজায় হতো রামায়ণ গান। এখন সবাই পূজার সময় ভিডিও দেখে...এখন আর কেউ তেমন মনসা গানও করে না।'[৩] শুধু তাই নয়, সে শুনেছে — 'আজকাল নাকি লোভনীয় সব জিনিষ কিনতে শরীর বেচছে গেরস্থ ঘরের মেয়েরা। ভদ্দর লোকের ছেলেরাও নাকি মুখে কালো কাপড় বেঁধে হাতে রিভলভার নিয়ে ডাকাতি করছে রাতে।'[৪] উপজাতি জীবনে আধুনিক সময়ের প্রভাব এই গল্পে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত রামবাসিয়ার অনুভবের মধ্যে দিয়ে।

সীমান্ত সমস্যা ঃ

উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। তাই বিভিন্ন রকম সীমান্ত সমস্যা বরাক উপত্যকায় ও বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলের ছোটগল্পেও

তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বরাক উপত্যকার গল্পকার অরিজিৎ চৌধুরীর 'নিরালম্ব' গল্পে বাংলাদেশি হিন্দু যুবক সৌম্যর ভয়, হতাশা, আশঙ্কা, প্রভৃতির পিছনে সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রভাব থাকলেও দুই বাংলার মাঝে কাঁটাতারের সীমান্ত তার মানসিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বসবাস করার নানা অসুবিধায় সে বাংলাদেশ ছেড়ে বরাক উপত্যকায় বসতি গড়ার কথা ভাবে।

আসলে কুশিয়ারা নদীর দুপারের দুই করিমগঞ্জের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিসেবে অত্যাচারিত হওয়ার কারণে সৌম্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে নিজের বলে ভাবতে পারেনি। উপরন্তু হিন্দু অধ্যুষিত বরাক ভূখণ্ডে মুসলিমদের আচরণে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝেছিল — 'সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও একজন সামান্য রিক্সাচালকের মধ্যে যে আত্মপ্রত্যয় ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে লক্ষ্যণীয়, বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে হাজার কোটি অন্তর্ভেদী সার্চ লাইট দিয়ে খুঁজলেও কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। হিন্দুরা সেখানে সদা সন্ত্রস্ত, তটস্ত।'[৫] এখানকার মুসলিমদের আত্মপ্রত্যয়ের প্রসঙ্গে প্রমানিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু আর ভারত ভূখণ্ডের সংখ্যালঘুদের অবস্থা আর যাই হোক, সমান নয়। তাই জন্মভূমি বাংলাদেশের পরিবর্তে ভারত-ভূখণ্ডের বরাক উপত্যকাই তার কাছে বসবাসের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী ও যথার্থ বলে মনে হয়েছে। যদিও অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বাধা এবং সীমান্তপারের বাসিন্দা হওয়ায় তার সে ইচ্ছে বাস্তবায়িত হয় না। দুই করিমগঞ্জের সীমানায় দাঁড়িয়ে তার দৃষ্টি চলে যায় আকাশের সীমানায় উড়ে চলা কিছু কাকের দিকে — 'কাকগুলো উড়ে উড়ে একবার নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ যাচ্ছিল। আবার কুশিয়ারা পেরিয়ে তারা ভারতে ফিরে আসছিল। কোনও বি. এস. এফ., বি. ডি. আর. কাঁটাতারের বেড়া তাদের আটকাতে পারছিল না। আহা যদি সৌম্য ওই কাকদের মতো হতে পারত।'[৬] বাস্তবের অমসৃণ মাটিতে দাঁড়িয়ে কল্প-ভাবনার এই আশায় শেষ হয়েছে 'নিরালম্ব' গল্পটি।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ঃ

দেশভাগের কারণে পূর্ববাংলার হিন্দু-বাঙালি অনুপ্রবেশের ফলে বরাক উপত্যকায় হিন্দু বাঙালির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ার মুসলিম ধর্মীয় মানুষের সংখ্যাও এখানে কম ছিল না। '... Bengali-Hindu immigrants (different classes, educated and uneducated) ao Assam were mainly refugees, who had to leave their homeland under duress. The displaced Bengali muslims were mainly uneducated poor people, who crossed the border and settled in Assam in the quest of better economic possibilities.... ।'[৭] সুতরাং দুই সম্প্রদায় বহুদিন থেকে এই অঞ্চলে পাশাপাশি থাকার

কারণে পরস্পরের সুখে-দুঃখে শরিক হয়েছে। সাম্প্রদায়িক হানাহানির সময় উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি তৈরি হয়েছে চাপা ক্ষোভ। আবার তারা দুঃসময়ের স্মৃতি ভুলে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

পরম ভট্টাচার্যের 'আহা যদি অহর্নিশি দাঙ্গা হতো' গল্পে উঠে এসেছে এই অঞ্চলের উভয় ধর্মের মানুষদের সম্পর্কের কথা। গল্পটি ১৯৯১ সালে 'ঈশান' নামক সাহিত্যপত্রে প্রকাশিত হয় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কিছুকাল আগে। আলোচ্য গল্পে অপু গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হওয়ার ধর্মভাবনায় রক্ষণশীল ছিল। অপুর মা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপারে বেশি মাথা না গলালেও এইটুকু বোঝে যে —' পাকিস্তানেও মুসলমানের অত্যাচার সহ্য করে ভিটেমাটি ছেড়েছেন, এখানেও ওদের যে রেটে বংশবৃদ্ধি, বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য করবে, মেয়েছেলেদের ইজ্জত থাকবেনা--তাই মাথা সোজা ক'রে দাঁড়াবার আগেই ঝামেলা সাফ করে রাখা ভালো।'[৮] অন্য দিকে অপুর দিদি তাপসী ও দাদা রূপক 'হিন্দুদের ক্ষোভের কারণ বোঝে, মুসলমানদের অন্যায় বোঝে, কিন্তু নৃশংসতা বা ভণ্ড গোঁয়ার্তুমিকে ওরা ঘৃনা করে।' তবে এগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুর ভাবনায় সাম্প্রদায়িকতা সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে। দাদার বন্ধু দেবায়নের সাথে কথোপকথনে সে জানায় — 'মুসলমানের জন্যে আইন আলাদা, ওরা হাজারটা বিয়ে করবে — ১০০ কোটিকে হু-হু ক'রে দশ বছরে দেড়শো কোটিতে পৌঁছে দেবে — স্যাটানিক ভার্সেস না প'ড়েই বন্ধ হয়ে যাবে — চূড়ান্ত ফ্যানাটিকে মোল্লাদের অগ্নিদৃষ্টির কোপে প'ড়ে সাহবানু মামলার সুপ্রিম কোর্টের রায়টাই নস্যাত হয়ে যাবে, আর বলা হবে রামমন্দিরের বেলায় আদালত মানো — এটা কি মগের মুলুক?'[৯] দেবায়ন অপুর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু তার ধারণার মধ্যে যুক্তিবাদী ভাবনার প্রকাশ রয়েছে। সে মনে করে হিন্দু এবং মুসলিম — উভয় ধর্মের মানুষদের মধ্যে থেকেই নিজেদের নিজেদের ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধতা করা উচিত।

তবে এ গল্প হিন্দু-মুসলিম বিবাদ দিয়ে শুরু হলেও শেষ হয় এক নতুন ইতিবাচক ভাবনার মধ্যে দিয়ে। দাঙ্গার রক্তে রক্তাক্ত অপু একদিন স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পায় 'গৈরিক সন্ন্যাসীর' মতো আগুনের মাঝে অস্ত্র হাতে কয়েকজন কশাইকে। তাদের মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে নিজের স্বরূপকে। তাদের কোনও ধর্ম পরিচয় নেই। তাদের শুধু একটাই পরিচয় — তারা কশাই। ধর্মোন্মাদনার বশে অপু হত্যা করেছে বহু মানুষের নিষ্পাপ মা-বাবা ভাইবোনকে। আজ যেন সে দেখতে পায় নিজের হাতের খাঁড়াতেই রক্তাক্ত হচ্ছে তার নিজের মা, দিদি, দাদা। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এই গভীর ভাবনাই ব্যঞ্জিত হয়েছে আলোচ্য গল্পের মোড়কে।

উগ্রপন্থার অভিশাপ ঃ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মতো উত্তর পূর্ব ভারত তথা বরাক উপত্যকাও উগ্রপন্থী সমস্যায় জর্জরিত। ডিমাসা কিংবা লুসাইতদের মতো জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন এ অঞ্চলে বহু দিন ধরে নিয়ে এসেছে সন্ত্রাস। বহু সাধারণ জনমানসের রক্তে রক্তাক্ত হয়েছে

এদের নৃশংস হাত। বরাক উপত্যকার গল্পে তাই এই সংকটের ছবি উঠে এসেছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে।

বিজয়া দেবের 'ছায়াপথ' গল্পে বরাকের গঞ্জ এলাকার 'মাড়' ও 'ডিমাসা' জনগোষ্ঠীর উগ্রপন্থার ছবি প্রকাশ পেয়েছে। গ্রেনেডের আঘাতে জনসাধারণের মনে স্থানীয় জঙ্গিরা সৃষ্টি করতে চায় আতঙ্ক। ব্যাঙ্ক লুঠ কিংবা নানা প্রতিষ্ঠান বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে তাদের বাহু বলের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অতি সাধারণ ব্যক্তি নন্দের মনেও প্রশ্ন জাগে — 'দুটি জনগোষ্ঠীই আতঙ্কের হাত ধ'রে নিজ নিজ জনগোষ্ঠীকে সমৃদ্ধির আলো দেখাতে চায়। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব....।'[১০]

উগ্রবাদীদের অত্যাচারের প্রসঙ্গে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বেদনার স্মৃতি উঠে এসেছে। বরাক অঞ্চলে বসবাসের পূর্বে নন্দরা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী। খানসেনাদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তাদের। 'যুদ্ধের ডামামোল নন্দর একটিমাত্র পিসি কাজরীকে খানসেনারা টেনে নিয়ে যায়....খানসেনাদের কব্জির জোর ছিল বড্ড, এখানেও 'মার'দের চওড়া কব্জি দেখে নন্দ ভয় পায়, 'ডিমাছা'দের কব্জি অবশ্য দেখেনি নন্দ।"[১১] লেখকের বর্ণনায় মিলেমিশে এক হয়ে যায় খানসেনা ও মার-ডিমাছা গোষ্ঠীর জঙ্গিদের কার্যকলাপ। আসলে উগ্রপন্থার কোন জাতি গোত্র ভেদ হয় না। দেশ-কাল-স্থান-পাত্র নির্বিশেষে তাদের জন্ম সমাজের নিকৃষ্ট কীট হিসাবে। নন্দ কিংবা তার বাবা হারাধনের মতো মানুষরা তাদের আতঙ্গে রাতে ঘুমাতে না পারলেও, 'বালিহাঁসদের' মতো কোথাও উড়ে চলে যাবার কথাও ভাবতে পারে না। যাবার ঠিকানা যে তাদের চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে! তাই চিরকালই তারা উগ্রপন্থার কাছে মারই খেয়ে যায়। প্রতিবাদের ভাষা আটকে থাকে কণ্ঠনালীর ফ্যারিংস-এ।

বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্কট ঃ

আসামে* বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম চলে আসছে বহু দশক ধরে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আসামের অগপ (অসম গণ পরিষদ) সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আসামে বাঙালি সংস্কৃতিকে উপড়ে ফেলার চক্রান্ত চলতে থাকে। তার পরিণতিতে দেখা যায় ১৯৫১ সালের পর থেকে একের পর এক বাঙালি নিধন যজ্ঞ - 'বঙাল খেদা আন্দোলন'। এমনকি বাঙালিদের সমস্ত রকম দাবী-দাওয়াকে দূরে সরিয়ে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবরে পাশ হওয়া রাজ্যভাষা বিলে অসমীয়াকে আসামের একমাত্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

---

* বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের মতে 'অসম' নামের মধ্যে দিয়ে অসমিয়া জাতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়, এ রাজ্যের বাঙালিদের উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী তা হবে 'আসাম'। [দ্র. ১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট, পৃ. ৩৩]

এর প্রতিবাদে বাঙালীদের আন্দোলন কখনই থেমে থাকেনি। তারা প্রতিবাদ করেছে, সংগ্রাম করেছে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে। অবশেষে আসে ১৯৬১-র ১৯শে মে দিনটি, যেদিন শিলচর রেলস্টেশনে অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালিয়ে শাসকশ্রেণীর নৃশংসার নির্মম প্রমাণ দেয় আসাম সরকার। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দেয় ১৯শে মের অমর একাদশ শহিদ-কমলা, শচীন্দ্র, সুনীল, বীরেন্দ্র, কানাইলাল, সুকোমল, চণ্ডীচরণ, সত্যেন্দ্র, হিতেশ, কুমুদরঞ্জন ও তরণী দেবনাথ। 'অবশেষে এই সংগ্রামের জেরে আসাম বিধানসভায় গৃহীত হয় সংশোধিত ভাষা আইন। কাছাড় জেলার জন্য বাংলা ভাষার স্বীকৃতিতে আপাত যবনিকা পড়ে ভাষা আন্দোলনের। আসামে এখন দুটি স্বীকৃতি সরকারি ভাষা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জন্য অসমিয়া, বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা, যোগাযোগের ভাষা ইংরেজি।'[১২]

শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর 'মানুষ মানুষের জন্য' গল্পে দেখতে পাই অসমিয়া জাতিবিদ্বেষের প্রেক্ষাপটে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে এক বাঙালির দৃপ্ত প্রতিবাদ। হীরেন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এক ছোট্ট শহরের চাকুরীরত যুবক। সে ভালোবাসে রুপালি নামের এক অসমীয়া মেয়েকে। তাদের জাতি এবং ভাষাগত বিভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা একে অপরের খুবই কাছের। ভাষাগত বিভেদ তাদের মধ্যে কোন দূরত্ব তৈরী করে না। কিন্তু শহরের খগেন মহন্তর মতো অসমিয়া বিদ্বেষকারীদের 'জয় আই অসম' — ডাকের প্রতিক্রিয়ায় সারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থমথমে হয়ে যায়। শহরের বাঙালিরা হয়ে পড়ে সন্ত্রস্ত। খগেনদের ধারণায় — 'অসমিয়া ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আজি সংকটত— তার মৃত্যু ঘনাই আইছে। আরু তার কারণে বঙ্গালি হে দায়ী।'[১৩] কিন্তু তাদের এ ধারণা যে কতটা ভ্রান্ত হীরেনের বক্তব্যে তা স্পষ্ট। হীরেন বিশ্বাস করে সে বাঙালি হলেও আসাম তাদেরও রাজ্য। আসামের ভাষা সংস্কৃতি থেকে সে ব্রাত্য নয়। আসামের সমস্যা তাই যতটা অসমিয়াদের, ততটা তারও। তাই খগেন মহন্তদের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানীয় বাঙালিদের নিয়ে সে গড়ে তোলে প্রতিবাদ সভা। অন্যান্যদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বানে জানিয়েছে — 'আপনারা শুধু বাঙালীদের কথা না ভেবে — যে সমস্ত চিন্তাশীল অসমিয়া মানুষ রয়েছেন তাদেরও টানুন। তাদেরও অংশীদার করুন। তেমন মানুষও অনেক পাবেন যারা শুধু সেন্টিমেন্টকে সমর্থন করেন না। এরসঙ্গে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন বিলটি নাকচ করার দাবী তুলুন।'[১৪] হীরেনের মতো চিন্তাশীল যুবকই হয়ে উঠেছে এ গল্পের প্রতিবাদী সত্তা। ক্রুদ্ধ জাতিবিদ্বেষী অসমিয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তার পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছে—'আসাম থেকে বার করে দেবে...মনে রাখবে আমিও আসামেরই।' সব দিক থেকে এ গল্প তাই আসামের বাঙালিদের কাছে অনুপ্রেরণীয় হয়ে ওঠে।

বরাক উপত্যকার ছোটগল্প সম্পর্কিত এই ছোট্ট আলোচনায় এইটুকু অন্তত পরিষ্কার, যে বাংলা ভাষার বিকাশ বৈচিত্র্যে বরাক উপত্যকার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। বরাকের সমাজ জীবন তথা আর আর্থ-সামাজিক ভৌগোলিক অবস্থা অবশ্য এক্ষেত্রে সাহায্য

করেছে সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ চৌধুরির বক্তব্য উল্লেখনীয় বলে মনে হয়, যে — 'নানা সমস্যায় জর্জরিত নানাভাবে বঞ্চিত — লাঞ্ছিত পশচাৎপর এই উপত্যকার...জীবনের আলো-হাওয়া-রোদ-পশ্চিমবঙ্গ তথা কোলকাতার মতো নয়। মনে হয় যে-ভারতবর্ষে কোলকাতা-সে-ভারতবর্ষে যেন শিলচর কিংবা করিমগঞ্জ নয়। এমন কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা এখানে আছে - যা ভারতের অন্য কোথাও নেই। তাই এ অঞ্চলের গল্পকারদের গল্পের ভাষা, আঙ্গিক, রীতি - বৃহত্তর বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন হ'তে বাধ্য।'[১৫] এই বৈচিত্র্যময় গল্পের ভাণ্ডার নিয়ে বরাক উপত্যকার উপস্থিতি তাই আমাদেরকে আমোদিত করে। সেক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের এই তৃতীয় ভূবন যেন আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে কাঙ্খিত জগৎ হিসাবে।

তথ্যসূত্র :

১. রণবীর পুরকায়স্থ, সুরমা গাঙর পানি (ভূমিকা), একুশ শতক, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১২।
২. Hinduism Today, Insights on Assam, USA, April-May, June, 2017, P. 23.
৩. বিকাশ রায় ও অমিতাভ দেব চৌধুরী (সম্পাদিত), বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, উবুদশ, কলকাতা, ৯ ই ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃঃ ১৮।
৪. তদেব। পৃ. - ১৯।
৫. মিথিলেশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), মুখাবয়ব ঃ বরাক-কুশিয়ারার গল্প, মুখাবয়ব, ২০১১, পৃ. - ৭৮।
৬. তদেব। পৃ. - ৯০।
৭. Nirmal Kanti Bhattacharjee & dipendu das (Editior), Barbed wire Fench: Stories of Displacement from the Barak Valley of Assam, Niyogi books, New Delhi, P. XI.
৮. বিকাশ রায় ও অমিতাভ দেব চৌধুরী (সম্পাদিত), বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, উবুদশ, কলকাতা, ৯ ই ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ. ৫৮।
৯. তদেব। পৃ. - ৬২।
১০. তদেব। পৃ. - ২১।
১১. তদেব। পৃ. - ২২।
১২. বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, ১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট, সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি-আসাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১ জুলাই, ২০১০, পৃ. - ১০।
১৩. মিথিলেশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), মুখাবয়ব : বরাক-কুশিয়ারার গল্প, মুখাবয়ব, ২০১১, পৃ. ২১।
১৪. তদেব। পৃঃ - ২৫।
১৫. বিশ্বজিৎ চৌধুরি, বরাক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্প চর্চা, দ্র. বিকাশ রায় ও অমিতাভ দেব চৌধুরী (সম্পাদিত), বরাক উপত্যকার বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, উবুদশ, ৯ই ডিসেম্বর, ২০০৮, পৃ. - ২৪২।

মহাশ্বেতাদেবীর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে আদিবাসীদের বিশ্বাস ও সংস্কার

অরুণাভ মুখার্জ্জী*

বিশ্বাস ও সংস্কার মানবজীবনের ভীত্তি প্রসূত। যুগ যুগ ধরে মানুষ তার বিশ্বাস এবং সংস্কার নিয়েই টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। ধর্ম যা মানুষকে ধরে রেখেছে। যার মধ্যে আপনত্ব বা নিজস্বতা বর্তমান। এই ধর্ম মানুষের জীবন প্রণালী বা দৈনন্দিন জীবনচর্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে ধর্মও রক্ষিত হয় সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাসের আধারে। বিশ্বাসই শক্তি, বিশ্বাসই সামর্থ, বিশ্বাসই সমগ্র জীবনের মূল সামগ্রী। বিশ্বাসের কারণেই মানুষ জীবন দ্বন্দ্বে জয়ী হয়। বিপরীতে বিশ্বাসের সঙ্গে যেখানে জড়িয়ে থাকে অন্ধবিশ্বাস, সেখনে সময় সময় মানুষের জীবন হয়ে ওঠে বিপন্ন।

অনুরূপ বিশ্বাসের মতো সংস্কারও মানুষ্য জীবনের এক মহত্বপূর্ণ উপাদান। সংস্কারই মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলে, তাকে আত্মসচেতন করে, আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত করে এবং তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তা প্রদান করে। পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতিচেতনা সংস্কারের জন্মভূমিকে সিঞ্চিত করে - উর্বর করে। মানুষ যেখানেই যাক আর যেখানেই তারা বসতি স্থাপন করুক না কেন, সংস্কার ও বিশ্বাসকে ফেলে যেতে পারেনা, তাকে সে সঙ্গে করে অঙ্গ হিসাবেই নিয়ে যায়। বিশ্বাসের পাশাপাশি যেমন অন্ধ বিশ্বাস থাকে, যা মানুষের জীবনকে জটিল করে তোলে, ঠিক তেমনি সংস্কারের পাশাপাশি থাকে কুসংস্কার যা মানুষের জীবনকে অনেক সময় ব্যস্ত করে দেয়। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের কারণে মানুষের জীবন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। সুতরাং কথা সাহিত্যে তথা উপন্যাসে যেখানে সামগ্রিক জীবনবোধের প্রশ্নটি আসে, সেখানে বিশ্বাস ও সংস্কার মনুষ্য জীবনের এই দুটি বিশিষ্ট ধর্মকে উপেক্ষা করা চলেনা।

আদিবাসীদের বিশ্বাস - সংস্কার নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই একথা বলা যেতে পারে, আদিবাসী সমাজ আদিম বিশ্বাস আর সংস্কারের আতুঁড় ঘর। এরা সেই অতিপ্রাচীন যুগ থেকে তাদের গোষ্ঠী - জাতি ও সমাজের চলমান পরম্পরার প্রতি চরম বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছে। তাদের বিশ্বাসের মূল এত সুদৃঢ় যে সেই মূলকে ছেদন করা যায় না। তাদের বিশ্বাস অটুট। তাদের আস্থা বা বিশ্বাসে কোনো বিবিধ ভাব বা কোন দোলাচাল প্রবৃত্তি নেই। বিশ্বাসই তাদের জীবনের মূল ভিত্তি। আর সেই বিশ্বাসের বলেই তারা অরণ্যকন্দরে, গিরিগুহায়, প্রকৃতির শান্ত সুন্দর পরিবেশে জীবন কাটিয়ে এসেছে। এই অরণ্যাশ্রয়ী, নির্ভিক,

*অংশকালীন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়।

শ্রমজীবী, সহজ-সরল কালো মানিকদের বিশ্বাস ও বিশ্বস্ত জীবন কাহিনী সাম্প্রতিক কালের ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর কথা সাহিত্যে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবীর বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পগুলির অনুসরণে আদিবাসীদের বিশ্বাস-সংস্কারের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, সুপ্রাচীন কাল থেকেই অরণ্যাশ্রয়ী বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীরা প্রকৃতিক প্রেমিক এবং প্রকৃতির পূজারী। সৃষ্টির আদিমকাল থেকে এরা বিশ্বাস করে এসেছে শান্ত-স্নিগ্ধ নীরব-নির্জন পরম সৌন্দর্যময় অরণ্য প্রকৃতিকে। বিশেষ করে আদিবাসী সাঁওতালেরা সারনা ধর্মে বিশ্বাসী। 'জাহেরা থান' অর্থাৎ অরণ্য প্রকৃতির কোলে পাথর দিয়ে ঘেরা শালগাছের বাগান তাদের প্রধান ধর্মস্থান। তাদের বিশ্বাস অরণ্য প্রকৃতি সংলগ্ন এই জাহেরা থানেই তাদের আরাধ্য দেব-দেবীদের বাসস্থান। এই স্থানটি তাদের বিশ্বাসে ও সংস্কারে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। তারা প্রতিপর্ব ও অনুষ্ঠানের আগে মাটি ও গোবর লেপন করে স্থানটিকে পবিত্র করে, তাদের রীতি ও প্রথা অনুসারে পুজোপাঠের আয়োজন করে। অরণ্য প্রকৃতি তাদের কাছে মায়ের মতো। তাদের বিশ্বাস ও সংস্কারে নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত এবং বৃক্ষবেষ্টিত মাঠ-বাগান সবই পবিত্র দেব-দেবী স্বরূপ এগুলি সবই ধর্মস্থল। অরণ্যকে তারা মাতৃভাবে পুজো করে আসছে চিরদিন। পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গ (বুরু) আর অরণ্যের কয়েক প্রকারের বৃক্ষ এবং নদ-নদীকেও তারা দেব-দেবী জ্ঞানে পুজো করে আসছে। এই বুরুদের সঙ্গে তাদের আদি পুরুষের সম্বন্ধের কাহিনি জড়িত। তাদের বিশ্বাস, বংশ-বংশানুক্রমে ভূপ্রকৃতি তাদের রক্ষা করে আসছে। তাই তাদের ধর্ম ভাবনায় এই প্রকৃতির স্থান দেব-দেবীর মতোই। পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলি তাদের কাছে বুরু দেবতারূপে পুজিত। মুন্ডাদের উপকথায় মারাংবুরুর মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। বরুডাঙ্গা আদিবাসীদের প্রধান দেবতা। অনেক নামে বোঙ্গাদেবের উল্লেখ আছে। সমসিভ, বোঙ্গা, মাঘ বোঙ্গা, সিং বোঙ্গা, এরুগ বোঙ্গা ইত্যাদি।

আদিবাসীদের ধর্ম-বিশ্বাসে বড়াম বাবার পুজো দিলে গ্রামে কলেরা-বসন্তের মতো মহামারী রোগ প্রবেশ করে না। যে স্থানে বড়াম বাবার পুজো হয়, সেই স্থানটি বড়াম স্থান নামে প্রসিদ্ধ। আদিবাসীদের দেবস্থান সিনি নামেও প্রসিদ্ধ। আদিবাসী ও মুন্ডাদের ধর্ম বিশ্বাসে সিনিরা সাত বোন এবং এরা সবাই নাকি অপদেবতা। এরাই আদিবাসী ও মুন্ডাদের জন্য জীবনে নানা রকম রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ কষ্টের কারণ। সুতরাং তারা সিনি অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য সিনিদের স্থানে সময়ে সময়ে পুজো পাঠ এবং পাঠাবলি-মুরগিবলিও দিয়ে থাকে। সাতটি সিনি অপদেবতা হল - দোয়াসিনি, চড়কাসিনি, বামনিসিনি, যোগিনী সিনি, রংকিনিসনি, লকাইসিনি, অম্বিকাসিনি। কীট, পাটনী, আদিবাসী ও মুণ্ডা সম্প্রদায়ের আর এক দেবস্থান জাহেরা স্থান। এটি আদিবাসীদের একটি পবিত্র ও সুপ্রসিদ্ধ ধর্মস্থান। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সর্বত্রই এই জাহেরা স্থান প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিরাজমান। পাথর দিয়ে ঘেরা শাল গাছ এবং তার নীচে মাটির তৈরী হাতি ঘোড়া রাখা হয়।

আদিবাসীদের ঋতুকালীন অধিকাংশ পুজা পার্বণগুলি জাহেরা স্থানে, আবার কিছু কিছু বড়াম স্থানে এবং বুরুতে হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে এই ধর্মস্থানগুলির মাহাত্ম্য আছে। বাহা, মাঘে, সার, হুল প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠানগুলি এই স্থানেই হয়ে থাকে।

বংশ পরম্পরা ক্রমে তাদের বিশ্বাস, এই জাহেরা স্থানে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান ও পুজো পাঠের দ্বারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধি এবং দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ‘শাল গিরার ডাকে’ উপন্যাসে আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস পুজো পার্বণ প্রসঙ্গটি তিলকার ঠাকুরমার মুখ দিয়ে তিলকাকে কাহিনি শোনানোর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। লেখিকার ভাষায় তিলকার ঠাকুরমা সস্নেহে তিলকাকে বলেছেন - ‘‘গোনা যায় নেরে, আকাশে যত তারা দেখিস তাকি গুনতে পারিস? তখন অগনন অগনন চাঁদ। আগেকার কথা। তখন ত্রিভুবনে কোথাও কিছু ছিল না। কেউ নেই, কিছু নেই, কোথা থেকে উড়ে এল এক বুনো হাঁসিল। এত বড় হাঁস, দুধের ফেনার মত সাদা বুনো হাঁসিল। এত বড় হাঁস দুধের ফেনার মত সাদা, আকাশের ইন্দা চাঁদের মত সাদা, সেই হাঁসিল পাড়ল সাদা গোল বেলে। সেই বেলে ফুটে বেরিয়ে এর একটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারাই আমাদের প্রথম মা, প্রথম বাবা। পিলচু, বুড়ি, পিলচু হাড়াম। এদের সন্তানদের থেকে এল প্রথম সাতটি গোত। কেউ বলে তারা হিহিড়িতে ছিল, কেউ বলে তারা আহিড়ি পিড়িতে ছিল। তখনকার কথা তিলক, সব যেন অনেক জানি, অনেক জানি না। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে তারা এল খোজ কামান। এখন বল দেখি আমাদের কি কি পরব দেখিস? আঘান, মাঘ-সীম, সার্জোম বাহ, আরোসিম, মাহমারে, রোহিন, আষাঢ়িয়া, মোর, আতি, নওয়াই, জান্তাল, বোঙ্গা, রাকাব, শাক-রাত কত কব?’’[১] আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে নিয়ম মেনে পুজো পার্বণের অনুষ্ঠান করে। তাদের বিশ্বাস কোনো দোষ-ত্রুটি হলে তা তাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিলকার ঠাকুরমার বিশ্বাস --- ‘‘তাদের পূর্বপুরুষদের খোজ কামানে অবস্থানকালে কিছু অঘটন বা দোষ-ত্রুটি ঘটায় খোজ কামানে তাদের জীবন ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। পরম্পরা গত লোকগাথা অনুসারে আকাশ থেকে যেমন জল নামে শ্রাবণে তেমন নামল আগুন। আগুনের বৃষ্টি পড়ল খোজ কামানে। এক মেয়ে এক মরদ উঠল হারৎ পাহাড়ের চূড়ায়।’’[২] এর পরের ঘটনা অনুসারে তাদের বাদ দিয়ে আর সবাই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই মেয়ে মরদ গেল সমতল ভূমি শশা বেড়াতে। তার পরে গেল সারপি। সেখানে ছিল উঁচু পাহাড় মারাং বুরু। অন্য দেশে যাওয়ার পথ না পেয়ে তারা তাদের আরাধ্য দেবতা বোঙ্গাকে পুজা করলেন। দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের পথের সন্ধান দিলে তারা আহিরিতে এসে বসবাস করে। তারপর আসে ফেন্ডি, তারপর ছায় দেশ, তারপর চম্পা। আবার বাইরে জগতের মানুষ চম্পায় প্রবেশ করে তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। তারা এল সাওন্ত দেশে।[৩] (বর্তমান সাঁওতাল পরগনা)। তারপর তাদের বংশবৃদ্ধি হলে তারা এখানে

সেখানে অরণ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এটাও আর একটা গণবিশ্বাস যে, যখনই তারা স্বতন্ত্র ভাবে সুখে স্বছন্দে জীবন যাপন করে, তখনই কোনো না কোনো দোষে বা কারণে বাইরের মানুষের আগমন ঘটে তাদের রাজ্যে এবং তাদের সর্বনাশের সূচনা হয়। তারপর থেকেই লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'সিধু কাহ্নুর ডাকে' উপন্যাসে আদিবাসীদের ধর্মোপসনা ও পুজো পার্বণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। এখানেও জাহেরা স্থানকে আদিবাসীদের প্রধান ধর্মস্থল ও ধর্মোপাসনার প্রধান কেন্দ্র স্থল রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের ধর্মে শাল গাছের পবিত্রতা ও মহত্ব অনন্য। আদিবাসী জনসম্প্রদায় তাদের পরম্পরাগত ধর্ম বিশ্বাসের বলেই হুল বা বিদ্রোহের সময় শালগাছের ছালে গিরা বেঁধে অথবা শালগাছের ডাল কেটে পাতায় তেল-সিঁদুর লাগিয়ে আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে বিদ্রোহের জন্য একত্রিত হওয়ার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। অশত্থ এবং বট গাছকেও দেবতা জ্ঞানে তারা পুজো করে বলেই তারা এই সব গাছের তলাতে জড়ো হয়ে সভা বসায়। নিজেরা বৈঠক করে, হুল বা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইত্যাদি। বড়াম স্থান তাদের ধর্মাচারে এক মূখ্য দেবস্থান, সেখানে তারা গ্রাম দেবতা পুজো করে থাকে। 'সিধু কাহ্নুর ডাকে' উপন্যাসে 'ঘন্টা বাজে' কাহিনি অংশে মানুষ সৃষ্টির দেবতা রূপে সংবেভার উল্লেখ করেছেন। তিনিই প্রথম আদিম মানব মানবী সৃষ্টি করেছেন।[৪]

আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস প্রাচীনকাল থেকে বংশানুক্রমিক একই ভাবে চলে আসছে। দিকু বা বাইরের মানুষ সংস্পর্শে এসে কিছু তারতম্য ঘটলেও, ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো দুর্ভাবনা সৃষ্টি হয়নি। হিন্দুদের দুর্গা পূজা, মনসা পূজা, দেবী চণ্ডী, বাসুলী, শিবের গাজন, বাঁদনা পরব ইত্যাদি অনেক পুজো পার্বণ এবং দেব-দেবীর প্রতিও তাদের বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পে অরণ্যবাসী আদিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রসঙ্গে দুখিয়ার মুখ দিয়ে উল্লেখ করেছেন -- "দিকুদের জুলুমটা বড় দেখুক, দিকে দিকে সব সাঁতালরা তুষ হয়ে জ্বলতেছে। এমন সময় বুঝে জানলিদিসু, একটা মহিষ বারায়। যার উঠানে ঘাস আছে, তার উঠানে সে উঠবে আর ঘাস খাবে। তাহলে খেরওয়াল বংশের লোক। এক সময় ছিল যখন দিকুদের সঙ্গে তাদের কোনো বিবাদ ছিল না, সেই সময় দিকুরা থাকতো সমতলে আর আদিবাসীরা জঙ্গলে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করত। তাই দুখিয়া সিধুকে বলেছে --- "অথচ এককালে আমরা খেরাওয়ালেরা শুনেছি যে, রাম রাজার সঙ্গে, রাবন রাজাকে মারতে গেছিলাম, তখন দিকুদের সঙ্গে বিবাদ ছিল না। তারা থাকে সমতলে আমরা থাকি জঙ্গলে, বিবাদ কিসে হবে? তারপর থেকে বিবাদ, আমরা যে জায়গা হাসিল করি তারা কেড়ে নিবে"।[৫]

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় যেমন দিয়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্ম ও অধর্মের বিষয়ে সচেতনার পরিচয়ও উল্লেখ করেছেন। আদিবাসীদের বিদ্রোহ বা হুলের পিছনেও আছে ধর্ম বিশ্বাস। তাদের

জীবনে যা ঘটে তাকে তারা দেবতারাই নির্দেশ বলে মনে করে। 'সিধু কাহ্নুর ডাকে' উপন্যাসে লেখিকা উল্লেখ করেছেন - ''বল কি ঠাকুর এসেছিল, আদেশ দিয়েছে। তুই দেখতে পাচ্ছিস কাহ্নু? ওই বিদ্যুৎ চমকায়, বীর মাতা খ্যাতি করে, জল পাবে বলে গুমনির শুকনা বুকে বালু উড়ে। তুই বনে আগুন দেখছিস, বৈশাখে আগুন দেখেছিস, গ্রহণে ছায়া দেখেছিস, গেরাম দেবতা বৃক্ষরাজ শালগাছ দেখেছিস, সব তাতে ঠাকুরের নির্দেশ জানা যাচ্ছে। আমি অন্ধ ছিলাম, বুঝি নাই। ঠাকুর বলে না, বলিছে। ঠাকুর শুধু আমাকে জানাচ্ছে হুলের ডাক দে।''[৭] তাদের ধর্ম বিশ্বাস অনুসারে পরোপকার, বিশ্বাস, বিপদে রক্ষা করা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি ধর্মের কাজ এবং বিশ্বাসঘাতক, বেইমানি, ছল-কপট, ক্ষতি সাধন ইত্যাদি সকল প্রকার অপকর্ম পাপ বলে বিবেচিত। শঠ, ছলী ও বিশ্বাসঘাতক বেইমানদের তাদের কাছে ক্ষমা নেই। কথাকার মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাস ও কাহিনিগুলিতে তাদের সেই ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন এবং তারা যে অধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা লড়াই করতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হয় না, তারও পরিচয় উপন্যাসগুলিতে বিধৃত।

আদিবাসীরা তাদের গণসংগ্রামে দেবতার উপর বিশ্বাস রেখেছিল সর্বাধিক। তাদের বিশ্বাস, তাদের ঠাকুর তাদের সংগ্রামে জয়লাভে সাহায্য করবে আর সাহেবদের গুলিও জল হয়ে যাবে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই সিধু-কানু সাহেবদের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নেমে এসেছিল। এরূপ ধর্ম বিশ্বাসের কথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অরণ্যবহ্নি'তেও লক্ষ্য করা যায়। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'বিরসা মুন্ডা' উপন্যাসে দেখিয়েছেন এতদিন ধরে মুন্ডা আদিবাসীরা তাদের চিরায়ত ধর্মে বিশ্বাস করে এসেছে। চতুর ইংরেজ মিশনারি সাহেবরা মুন্ডাদের দারিদ্র্যতা ও দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেককেই ভুলিয়ে ভুলিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছে, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব মুন্ডাদের বংশ পরম্পরাগত ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারঘাত করেছে। লেখিকা তাঁর ''বিরসা মুন্ডা'' উপন্যাসে লিখেছেন - ''১৮৯৫ সালের মধ্যেই বিরসা বুঝে ফেলে যে খ্রিস্টান ও হিন্দুধর্মের কাছে তার কিছু পাবার নেই।'[৮] বোধহয় বিরসা সেই জন্যই চেয়েছিল এক নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা। চালকাদের সবারই বিশ্বাস হয়েছিল বীরসা তাদের ভগবান। তাদেরও ধর্ম-বিশ্বাস সে মুন্ডাদের বিপদে তাদের দেবদেবীরাও মানুষের রূপ ধরে আবির্ভূত হন। মুন্ডাগানে এর পরিচয় আছে। 'বিরসা মুন্ডা' উপন্যাসের লেখিকা মুন্ডা গানের একটি পংক্তি উদ্ধৃতি করেছেন - ''বিরসি সুখ চালকদ হাটুরে ধরাতি আবা দোয়ে জনম লেনা।''[৯] অর্থাৎ বনের গভীরে চালকাদ গ্রামে ধপতি আবা জন্ম নিল। আবার স্বয়ং বিরসা মুন্ডাও নিজেকে ধরতি আবা বলে মনে করেছে। মহাশ্বেতা দেবী বিরসার মুখ দিয়ে বলেছেন - ''আমি বিরসা নই, আমি ধরতি আবা। এই পৃথিবীর আমি সন্তান। আমি মুন্ডাদের নতুন ধর্ম শিখাব। আমি তোদের কোলে নিয়ে ভুলাব না। দুলাব না। আমি মুন্ডাদের মরতে আর মারতে শিখাব।''[১০] বিরসা হয়েছিল সকল মুন্ডা জাতির কাছে বিরসা ভগবান। লেখিকা

বলেছেন - ''বিরসার নতুন ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে হুল ও দৈব নির্দেশে তারাও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মতো পূর্ণজন্মে বিশ্বাস করে। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী 'সিধু কাহ্নুর ডাকে' উপন্যাসে কানুর ফাঁসী হওয়ার সময় তার মুখ দিয়ে বলেছেন -- ''আমি আবার আসব। আবার হুল হবে।''[১২] বিরসা মুন্ডার ক্ষেত্রেও আদিবাসী মুন্ডাদের বিশ্বাস বিরসা ধরতি আবা, তার মৃত্যু হয় না। মৃত্যু হলেও বিরসা যে আবার ফিরে আসবে সে বিশ্বাসও তাদের ছিল।

কথাকার মহাশ্বেতা দেবীর লোকবৃত্তের ইতিহাস নিয়ে রচিত 'আঁধার মানিক' উপন্যাসেও অরণ্যশ্রয়ী আঁধার মানিক মানুষদের ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ আছে। এই উপন্যাসটিতে রাঢ় বাংলার আঁধার মানিকদের দেবশক্তি, শিব মহিমার বিশ্বাসের কথা আছে। আরও চৈত্র মাসের শিব গাজনের কথা। লেখিকা শৈব ধর্ম বিশ্বাসী 'আঁধার মানিকদের' প্রসঙ্গে বলেছেন - ''সুর কন্ঠ জানেন, রাঢ় বাংলার রক্তাভুমাটি, রুক্ষ প্রান্তর, আর গৈরিক নজী জলে শুধু একটি দেবতার আসনই পাতা। শশ্মানচারী পুরুষ, আত্মভোলা উদাসীন, শক্তির পদতলে শায়িত শিব। দেবতাদের সংসারের আদিপুরুষ। একতার মধ্যেই সকলে আছেন। এক দৈত্যের আকাশ তাঁর হোমকুণ্ড। আঁধার মানিক গ্রামখানি ভক্তের মতো পড়ে আছে পদতলে।''[১৩] লেখিকা বলেছেন - ''এ গ্রামের গৃহস্থরা দেবাশ্রয়ী তাই ঘরে ঘরে দেব মন্দির।''[১৪] চৈত্র মাসে শিবের এই পুজো চড়ক পুজো নামেও পরিচিত। লেখিকা এই চড়কের মহোৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি উপন্যাস 'ব্যাধখণ্ড'। এই উপন্যাসে তিনি বিশেষ করে শবর জাতির কথা লিখতে গিয়ে তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস ও সংস্কৃতির কথাও উল্লেখ করেছেন। আদিবাসী গোষ্টীর অন্তর্ভূক্ত শবর জাতির ধর্ম বিশ্বাস প্রসঙ্গে জানিয়েছেন - এরাও মাতৃ দেবতার উপাসক এবং এদের বিশ্বাসে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীস্থান হল বড়াম মায়ের পূণ্যস্থল, যা বড়াম স্থান নামে পরিচিত। লেখিকা জানিয়েছেন শবরদের ধর্ম বিশ্বাস মতে লোধা শবরেরাই দেব-দেবীর পূজারী অর্থাৎ তাদের গোষ্ঠীর পুরোহিত। 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের ব্যাধকেই তিনি শবর জাতির প্রতিনিধি মনে করেছেন। অর্থাৎ ব্যাধরাই হল প্রকৃতপক্ষে শবর জাতি। এই শবর জাতির আদিপুরুষ কালকেতু মাতৃদেবতা অর্থাৎ দুর্গার উপাসক ছিলেন। লেখিকা বলেছেন - লোধাদের লেখা থেকেই জানা যায় কালকেতু তাদের আদিম পুরুষ, দুর্গাষ্টমীতে স্বর্ণগোধা শিকারের সুফল, পুরীর জগন্নাথ আদিতে লোধাদের দেবতা ছিলেন এবং জনৈক ব্রাহ্মণ তা চুরি করে বলেই লোধাদের কাছে ব্রাহ্মণ প্রণাম অযোগ্য ইত্যাদি তথ্য জানা যায়।[১৫] পাপ পূণ্যের বিচারও ছিল তাদের মনে। এই পাপ ধর্মের বিচার প্রসঙ্গে লেখিকা তার 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে লিখেছেন ''কিন্তু মিঘা শবর সে কাজ করেছিল, শবর পুরাণে সে কাজের ক্ষমা নেই। মহাপাপ, মহাপাপ সেটা। এক গর্ভিনী হরিণকে জ্ঞান হোক, অজ্ঞানে মেরেছিল মেঘা। সমাজ বসেছিল। বিচার হয়েছিল। সেই পাপেই মেঘা দলপতি হবার অধিকার হারায়।''[১৬]

তাদের ধর্ম বিশ্বাস মতে যিনি সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা তাঁর নিয়ম না মানাই পাপ। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার', 'বিরসামুন্ডা', চৌট্টিমুন্ডা এবং তার তীর' প্রভৃতি উপন্যাস - গ্রন্থে আদিবাসীদের সেই পরম্পরাগত ধর্ম বিশ্বাসই কায়েম রেখেছে। যদিও 'বিরসা মুন্ডা'র আমলে কিছু সংখ্যক অরণ্যাশ্রয়ী আদিবাসী সাঁওতাল ও মুন্ডা সম্প্রদায় ক্রিশ্চান হয়েছিল এবং সেই ধর্ম বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আবার হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্ম দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ঐ সব ধর্ম বিশ্বাস কোনোটাই কাজ করেনি। বরং তারা তাদের বংশ পরম্পরাগত চিরায়ত সারনা ধর্মকেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মেনে নিয়েছে। তাঁর রচিত অনেকগুলি ছোটগল্পেও অরণ্যবাসী আদিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসের উল্লেখ আছে। অনেকগুলি গল্পে আদিবাসীদের শৈব ধর্মে বিশ্বাসের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন লেখিকা। তিনি তাঁর 'রুদালী' গল্পে উল্লেখ করেছেন, শনিচরীর বর বলল, ''চলতো হরিতে বৈশাখী মেলা দেখে আসি। শিব ঠাকুরকে পুজাও দেব। সাতটা টাকাতো জমেছে।''[১৭] অর্থাৎ শনিচরীর রুগ্ন স্বামীর বিশ্বাস হয়তো শিবের পুজো দিলে তার রোগের কিছুটা উপসম হতে পারে। 'স্তনদানী ও অন্যান্য গল্পে' ও তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 'জগন্নাথের রথ' গল্পে পূন্যদাসীর মতে জগন্নাথদেব ও তাঁর রথের মহিমা অপার। তার মনে হয় জগন্নাথের রথের সামনে কারো রেহাই নেই 'এভাবে মরলে মানুষ গতি পায়গো! রথ যাত্রার পূণ্য পেয়ে দিব্য দেহে স্বর্গে যায়।' পূণ্যদাসীর মতো মানুষদের গল্পে লক্ষ্য করি চন্ডাল, বাগদী প্রভৃতি তথা কথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের 'মনসা' বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে বিশ্বাসের পরিচয়। এ গল্পে মহাপ্রভু অবতারত্বের মহিমার প্রসঙ্গেও উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এই সময় থেকে অরণ্যাশ্রয়ী আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম নামে এক নতুন ধর্ম বিশ্বাসও যে জুটতে শুরু করেছে, সে কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে জটি ঠাকুরানীর কৃষ্ণ ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাসের উল্লেখ এবং তারই কৃপায় তার উপর সাঁঝ সকালে দেবতার ভর হয়েছে সেটা তার মনের বিশ্বাস। চাঁদ ও সুরজ অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য এই দুই দেবতার প্রতি আদিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস চিরকালের, তারও পরিচয় রয়েছে এই গল্পে। ভগবানে জারা বা ব্যাধ জাতির মানুষের কতখানি বিশ্বাস, জটি ঠাকুরানীর এই উক্তিতে তার পরিচয় বিধৃত - ''ভগবান কে যারা মানে তাদের ঘরদোর থাকতে নেই। তাই দৈববানী বললে, জারায়ে জারা! ব্যাধহে ব্যাধ। এই ভোবনে ভগবান বারবার আসে। তোমার মত একটা কসাই ভগবানকে বান ফুঁড়া করে। যারা ই কাজ করে তাদের ঘরে থাকতে মানা। তুমি এখন তোমার আঁতের লোক, গাঁতের লোক নিয়ে যে উদ্দিশা হও গা! জানলে?''[১৮] এই উক্তিটি দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের ভগবান অর্থাৎ দেবতার প্রতি বিশ্বাস, তাদের অবতারত্ব এবং দেবতার প্রতি বান বিদ্ধের অপরাধে ব্যাধ জাতির যাযাবরত্বের কারণ, প্রভৃতি ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্পে আবার হনুমানকে দেবতা রূপে বিশ্বাসের পরিচয়ও আছে। 'বিশালাক্ষীর বর' গল্পে তথাকথিত নীচু জাতের মানুষদের মা

মনসা, বাসুলী আর দেবী মা শীতলার প্রতি নিষ্ঠা এবং অসম দৈবী শক্তির প্রতি বিশ্বাস ছিল। তাদের বিশ্বাস দেব-দেবীর প্রকোপে গ্রামের মানুষদের নানা প্রকারের রোগ-ব্যধি হয়ে থাকে। আবার তাদের পুজো দিয়ে সন্তুষ্ট করলে কলেরা, বসন্তের মতো মহামারি রোগ থেকেও বাঁচা যায়। লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর বহু বাছাই গল্পেও অরণ্যাবাসী মানুষদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় আছে। শুধু দেব-দেবীই নয় অরণ্যের পশু পাখিরাও তাদের কাছে দেবতা স্বরূপ। সেই ধর্ম বিশ্বাসের বলেই 'জগমোহনের মৃত্যু' গল্পে হাতির দেবত্ব ও অবতারত্বকে তারা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এইভাবে লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর বহু গল্প ও কাহিনি রচনার মাধ্যমে অরণ্যাশ্রিত মানুষদের বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাদের যুগ-যুগের সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মাচরণ, এমন কি সময় সময় বহিরাগত মানুষদের ধর্ম সংস্কৃতি ও বিশ্বাস প্রভাবিত জীবন চর্যার এক সম্পূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরেছেন। লেখিকা তাঁর অপার অনুসন্ধিৎসা নিয়ে বাংলার কথা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে এক বিস্তৃত সময় সীমার মধ্যে ক্রম বিবর্তিত আদিবাসী জীবনের সংস্কার - সংস্কৃতি, ধর্মভাবনা, পুজা উপাসনা, উৎসব অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের পূর্ণাঙ্গ জীবন কথা প্রকাশ করেছেন তার বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্প সমূহে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কৃতি মান জীবনের এক মহামূল্য সম্পদ; এর থেকে অরণ্যাশ্রয়ী আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজে যে বঞ্চিত নয়, লেখিকা যে প্রসঙ্গে নানা পরিচয় তুলে ধরেছেন, বিশ্বাসযোগ্য প্রামানিক সত্য ও তথ্যের পরিবেশনে।

তথ্য সূত্র :

১। 'শালগিরার ডাকে' - মহাশ্বেতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা - ৯, অগ্রহায়ণ ১৩৮৯, পৃষ্ঠা-২৪
২। তদেব, পৃষ্ঠা-২৪-২৫
৩। 'সিধু কানুর ডাকে' - মহাশ্বতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, কলিকাত - ৯, সংস্করণ ২০০১, ঘন্টাবাজে, পৃষ্ঠা-১১৩
৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৩০
৫। তদেব
৬। তদেব
৭। 'সিধু কানুর ডাকে' - মহাশ্বতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, কলিকাত - ৯, সংস্করণ ২০০১, ঘন্টাবাজে, পৃষ্ঠা-১১৩
৮। 'বিরসা মুন্ডা৪ - মহাশ্বেতা দেবী, প্যাপিরাস সংস্করণ, কলিকাতা - ৪, চতুথ মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১, পৃষ্ঠা-৩২
৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪
১০। তদেব
১১। তদেব, পৃষ্ঠা-৭৯

১২। ‘সিধু কানুর ডাকে’ - মহাশ্বতা দেবী, করুণা প্রকাশনী, কলিকাত - ৯, সংস্করণ ২০০১, ঘন্টাবাজে

১৩। ‘আঁধার মানিক’ - মহাশ্বতা দেবী

১৪। তদেব

১৫। ‘ব্যাধখণ্ড’ - মহাশ্বতা দেবী, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা-৫৭

১৬। তদেব

১৭। ‘রুদালী’ - মহাশ্বতা দেবী, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা-১১

১৮। ‘সাঁঝ সকালের মা’ - মহাশ্বতা দেবী

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১। ‘উপজাতি ভাবনা’ - সুকান্ত পাল, প্রবীর দে, শ্রাবনী ঘোষ - প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০১

২। ‘নবজীবনের সন্ধানে উপজাতীয় জনগণ’ - অরুণ চৌধুরী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১

৩। ‘ভারতের আদিবাসী’ - সুবোধ ঘোষ - ন্যাশনাল বুক এজেন্সী - কলকাতা - ৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ - নভেম্বর, ২০০০

৪। ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ - মহাশ্বেতা দেবী, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি, ২০০৪

এবং প্রান্তিক প্রকাশিত

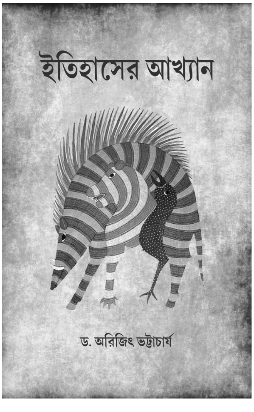

ইতিহাসের আখ্যান
ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য
মূল্য : ১৩৫ টাকা

প্রথা নয়, ইতিহাস ছড়িয়ে আছে প্রান্তে-প্রান্তরে। সাহিত্যে প্রকাশিত ইতিহাসের উপাদান সত্যি কিনা তা মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন হয় না লেখ্যাগারে গিয়ে। যদিও একথাও ঠিক যে একটি বিষয়ের সমগ্র ইতিহাস লিখতে গেলে সেখানে সাহিত্যও আসলে একটি উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাই অন্তহীন ইতিহাস আর অন্তহীন সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পথ চলা। ইতিহাসের ইতিহাস খোঁজার কাজ কলমে কলমে চলে এসেছে চিরায়ত-ভঙ্গিতে সাহিত্যের খাঁজে খাঁজে। গবেষক কেবল খোঁজার চোখ নিয়ে তার বাঁক, মোচড়, ঘাত-অভিঘাতকে চিহ্নিত করেন। এই গ্রন্থে উপন্যাসের পরতে-পরতে সন্ধানী চোখ তাকে টেনে বার করার প্রাণান্ত প্রয়াসী। চেনাকে চেনানো নয়, অচেনাকে, যা আমাদের সাদা চোখে সচরাচর ধরা পড়ে না, সেই অচীন প্রান্তরের সওয়ারী ড. অরিজিৎ ভট্টাচার্য এবং তাঁর এই গ্রন্থ।

মঙ্গলকাব্যে চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ

অনিমেষ নস্কর*

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে 'চিঠি' শব্দটি এসেছে হিন্দি শব্দ 'চিট্ঠী' থেকে। আর 'পত্র' শব্দটি তৎসম। প্রচলিত অর্থে 'চিঠি' এবং 'পত্র' পরস্পর সমার্থক শব্দ হলেও চিঠির মধ্যে পত্রের সবটুকু ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে না। 'চিঠি' অনেকটা 'পত্র'-এর আধুনিক সংস্করণ। 'পত্র' বলতে সাধারণত গাছের পাতাকে বোঝায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গাছের পাতায় লেখার প্রচলন ছিল। সেইসময় রাজকীয় ও বৈষয়িক কাজে লেখার জন্য কাষ্ঠ-ফলক, ধাতব পাত, শিলা ইত্যাদির ব্যবহার থাকলেও, লেখার বহুল প্রচলিত মাধ্যম ছিল গাছের পাতা। সংবাদ প্রদানের জন্য গাছের পাতায় লিখে পাঠানো এক অর্থে পত্র প্রেরণ। সময়ের সঙ্গে গাছের পাতার জায়গায় এসেছে 'কাগজ', বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে সংযোজিত হয়েছে নতুন শব্দ; তবু কাগজে লেখা চিঠি আজও পত্র নামে পরিচিত।

ব্যক্তিগত কিংবা বৈষয়িক কারণে পত্র লেখার প্রচলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু পুরানো। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে দেখা যায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পদ্মপাতায় প্রণয়পত্র লিখেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যত্র পত্র লেখার উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পত্র লেখার কোনো প্রমাণ মেলে না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণের সংযোগ রক্ষা করেছে বড়াই। অবশ্য মধ্যযুগের দেব-দেবী নির্ভর সাহিত্যের চরিত্রদের পত্র লেখার অবকাশ নিতান্তই কম। মর্ত্য পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে দেবদেবীর সম্পর্ক যত নিবিড় হয়েছে, আখ্যানে চিঠিপত্রের প্রয়োজন ততটাই ফুরিয়েছে। এই কারণে মঙ্গলকাব্যের 'দেব খণ্ড'-এ পত্র লেখার কোনো উল্লেখ নেই। আবার স্বর্গবাসীরা যখন শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে পৃথিবীতে নেমে এসেছে তখন প্রয়োজন সাপেক্ষে তারাও চিঠি-পত্র লেখার তাগিদ অনুভব করেছে।

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মনসামঙ্গল কাব্যে দেবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এতটাই দ্বান্দ্বিক ও প্রত্যক্ষ যে, কাহিনির ক্রম পরিণতিতে পত্র ব্যবহারের কোনো অবকাশ ছিল না। বাসর রাত্রে স্বামী মারা যাওয়ার পর, মৃত স্বামীকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে যাওয়ার সময় বেহুলা চাঁপার ডালে বসে থাকা শ্বেতকাককে পিতার গৃহে সংবাদ পাঠানোর মিনতি জানিয়েছিল—'আমার পিতার বাড়ি যাহ শ্বেতকাক/প্রাণনাথ কোলে লৈয়া জলে ভাস্যা

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

যাই।/কহিও মায়ের তরে আর দেখা নাই।'[১] কাহিনির এই স্থানে পত্র প্রেরণের প্রসঙ্গ অবান্তর হত না। কারণ তৎকালীন সমাজে পাখিদের গলায় চিঠি বেঁধে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পত্র পাঠানোর রেওয়াজ ছিল। কিন্তু শ্বেতকাক এখানে নিজ মুখে বেহুলার সমাচার দিয়েছে। সংবাদ বাহক হিসেবে শ্বেতকাককে নির্বাচন করার পক্ষে বোধহয় মধ্যযুগীয় মানুষের লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার নিহিত ছিল। কারণ কাক আজও মৃত্যুর বার্তাবহ দূত রূপে পরিচিত আর সাদা রঙ বৈধব্যের প্রতীক। এই দুইয়ের মিলিত ব্যঞ্জনা শ্বেতকাকের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাই পত্র ব্যবহারের স্থানে শ্বেতকাকের প্রসঙ্গ এনে মনসামঙ্গল কাব্যের কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে প্রথম পত্রের ব্যবহার দেখা যায়। যদিও কাব্যের 'আখেটি খণ্ড'-এ সঙ্গত কারণেই পত্রের প্রসঙ্গ আসেনি। কালকেতু-ফুল্লরার গার্হস্থ্য জীবনের পরিধি অনেকটাই সীমাবদ্ধ। বন কেন্দ্রিক জীবন-যাপনের বাইরে বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ ছিল না।

বিদ্যা-শিক্ষার অন্ধকারে থাকা কালকেতু-ফুল্লরার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে বোধহয় কালকেতু রাজা হওয়ার পরেও পত্র লেখার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে 'বণিক খণ্ড'-এ ধনপতির উপাখ্যান একাধিক পত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

ধনপতি উজানি নগরের সম্ভ্রান্ত বণিক, তাঁর স্ত্রী লহনা। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে খুল্লনার স্থান হঠাৎ পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেলেও সতীন রূপে লহনার খুল্লনাকে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু দুই সতীনের এই সম্পর্ককে ভালো চোখে দেখেনি প্রধান দাসী দুবলা। তার কুমন্ত্রণায় লহনার মনে অবিশ্বাস জন্মায়। লহনার ধারণা হয় যে, খুল্লনার জন্য তার স্বামী-সৌভাগ্য নষ্ট হবে। তাই লহনা খুল্লনাকে দূরে সরানোর কৌশল অন্বেষণে দুবলাকে সখী লীলাবতীর কাছে পাঠায়। শেষ পর্যন্ত লীলাবতী অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্তে আসে যে, খুল্লনার রূপনাশ করলে তার প্রতি ধনপতির মোহ কাটবে। এই সময় রাজকার্যে ধনপতির গৌড়ে থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে লীলাবতী জাল পত্র লেখে। পত্রটি ধনপতির জবানীতে লহনাকে লেখা—

দুই জনে একত্রে বস্যা করেন জুগতি
কপট প্রবন্ধে পত্র লিখে লীলাবতী।
স্বস্তি আগে লিখিআ লিখিল ধনপতি
অশেষ গুণের ধাম লহনা যুবতী।[২]

আখ্যানে এই পত্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই পত্রের মধ্য দিয়ে খুল্লনার ভাগ্য বিপর্যয়ের সূত্রপাত ঘটে। পত্রে দুর্গহ কাটাবার জন্য খুল্লনাকে অলংকার বর্জিত

করে, যৎসামান্য আহার ও নীচ সাজ-শয্যায় এক বৎসর কাল প্রত্যহ নগরের বাইরে ছাগল চরানোর নির্দেশ দেওয়া হল। পত্রটি পড়ে খুল্লনা স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারায়নি। বরং তার সন্দেহ হয়েছিল পত্রটি জাল—'সাধুর অক্ষর ভিনঞিঃ ছন্দ/কে লিখিল পাতি কপটবন্ধ'।[৩] শেষপর্যন্ত এই পত্রের জন্যই লহনার অত্যাচারের কাছে খুল্লনাকে মাথা নত করতে হয়। পত্রের নির্দেশ খুল্লনা মেনে নিতে বাধ্য হয়। লীলাবতীর লেখা এই জাল পত্রের জন্য একদিকে যেমন খুল্লনার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে তেমনি পত্রের নির্দেশ মতো বনে ছাগল চরাতে গিয়েছিল বলেই খুল্লনা দেবীর কৃপা লাভ করে। আবার স্বামী ফিরে আসার পর এই পত্রের জোরেই সে তার পূর্ব জীবন ফিরে পায়।

লীলাবতীর লেখা এই পত্রটির যেমন সাহিত্য মূল্য অস্বীকার করা যায় না, তেমনি এর সামাজিক মূল্যও কম নয়। পত্রটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে পত্র লেখার রীতির পরিচয় মেলে। পত্র লেখার শুরুতে 'স্বস্তি' লেখার প্রচলনের কথা এই পত্র থেকে জানা যায়। তেমনি জানা যায় পত্র পাঠানোর আগে যত্ন করে গুটিয়ে গালার মোহর দিয়ে আটকে দেওয়ার নিয়ম। ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক প্রয়োজন ছাড়াও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে পত্র লিখে নিমন্ত্রণ করার প্রচলনের কথা জানা যায় পিতৃশ্রাদ্ধকালে ধনপতির লেখা পত্র থেকে। ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধের সময় সকল স্বজাতিকে পত্র লিখে পাঠিয়েছিল— 'দেশে দেশে আছে জত কুটুম্ব জ্ঞেআতি/প্রত্যক্ষে সবার পত্র লিখে ধনপতি।'[৪] 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র ধনপতি সিংহল যাত্রাকালে খুল্লনাকে লিখেছে। পত্রটি খুল্লনার প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে লেখা। এখানে পত্র বাহকের কোনো প্রয়োজন হয়নি। পত্রটি এক প্রকার স্বীকারোক্তি। এটি 'সন্দেহভঞ্জন পত্র' নামে পরিচিত। পত্র প্রাপকের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের কাছে এই পত্রটির গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ কালে অতিথিদের কাছে খুল্লনাকে বারংবার সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল বনে একাকী ছাগল চরাতে যাওয়ার জন্য। স্বামীর আসন্ন প্রবাস যাত্রাকালে খুল্লনার গর্ভে ছয়মাসের সন্তান। এই অবস্থায় একজন নারীর পক্ষে নতুন করে আর কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। তাই সতীত্বের মর্যাদা ও সন্তানের যথার্থ পরিচয় রক্ষার্থে খুল্লনা স্বামীর কাছ থেকে পত্রটি লিখিয়ে নিয়েছিল। আলোচ্য পত্রে ধনপতি কেবল নিজের ভাবী সন্তানের স্বীকারোক্তি নয়, ছেলে অথবা মেয়ে জন্মালে কী নাম রাখবে সেটাও ঠিক করে দিয়েছিল—

জখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস
সেইকালে নৃপাদেশে করিল প্রবাস।
জদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুয়্যা
উত্তম বংসজ দেখি ঝি এ বিভা দিহ।
জদি পুত্র হয় নাম থুইয় শ্রীপতি
পড়াইআ শুনাইআ পুত্র করিহ সুমতি।[৫]

ধনপতির লেখা এই ‘সন্দেহভঞ্জন’ পত্রটির ভূমিকা তাৎক্ষণিক না থাকলেও, ভাবী প্রজন্মকে ভালো রাখার এ ছিল এক দৃঢ় অঙ্গীকার। খুল্লনা তাই পত্রটিকে সযত্নে রেখে দিয়েছিল। অতঃপর পুত্র জন্মালে পত্রে উল্লেখিত ধনপতির ইচ্ছানুসারে সন্তানের নামকরণ হয় শ্রীপতি। অন্যদিকে দেবীর ছলনায় ধনপতি সিংহল রাজের কাছে বন্দি হয়। বালক শ্রীপতি মায়ের তত্ত্বাবধানে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করতে থাকে। এগারো বছরের বালক একদিন গুরুর সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। তখন ক্রুদ্ধ জনার্দন পণ্ডিত তাকে ‘জারজ’ বলে অপবাদ দিলে সে পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রায় মনস্থির করে। যাত্রাকালে সে নিয়ে যায় এই পত্রটি। শেষপর্যন্ত এই পত্রটির সাহায্যে শ্রীপতি জনারণ্যের মাঝে চিনে নিতে পারে তার পিতাকে। ধনপতির আখ্যানে এই পত্রটির স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এগারো বছরের প্রায় বেশি সময় ধরে পত্রটি সযত্নে রক্ষিত ছিল। এই পত্রটি খুল্লনাকে দিয়েছে সতীত্বের মর্যাদা আর শ্রীপতিকে দিয়েছে পিতৃ সান্নিধ্য।

মঙ্গল কাব্যের ধারায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে পত্রের ব্যবহার সর্বাধিক। কাব্যের পঁচিশটি পালার আটটি পালায় মোট নয়বার পত্রের ব্যবহার কাহিনিকে অখণ্ড সম্পূর্ণতা দিয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলার জনজীবনে রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক কারণে পত্র ব্যবহারের যৌক্তিকতা ঠিক কতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল ধর্মমঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত পত্রগুলির বিচিত্র রীতিতে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত পত্রগুলির লেখক ও প্রাপক এইরূপ :

পালা	**পত্রলেখক**	**পত্রপ্রাপক**
আদ্যঢেকূর পালা	গৌড়েশ্বর	কর্ণসেন
লাউসেন চুরি পালা	কর্ণসেন	গৌড়েশ্বর, মহামদ, বন্ধুরা
মল্লবধ পালা	কর্ণসেন	মহামদ
কাঙুর যাত্রাপালা	গৌড়েশ্বর	লাউসেন
লৌহগণ্ডার পালা	গৌড়েশ্বর	লাউসেন
অনুমৃতা পালা	গৌড়েশ্বর	লাউসেন
অঘোরবাদল পালা	গৌড়েশ্বর	লাউসেন
জাগরণ পালা	লাউসেন	কানাড়া
জাগরণ পালা	কানাড়া	লাউসেন

ধর্মমঙ্গল কাব্যের পত্রগুলির দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় অধিকাংশ পত্রের লেখক গৌড়েশ্বর এবং পত্র-প্রাপক লাউসেন। কাব্যের ‘আদ্যঢেকূর পালা’য় রাজা গৌড়েশ্বরের লেখা প্রথম পত্রটি একটি সরকারি পরওয়ানা। মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রাজা গৌড়েশ্বর রমতি নগরে উপস্থিত হলে তাঁর শ্যালক মহামদের দ্বারা বন্দি হওয়া

সোমঘোষের সম্মুখীন হন। সোমঘোষ প্রজা দরদি রাজাকে নিজের বন্দিদশার কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা বুঝতে পারেন তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাই তার সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে ঢেকুর গড়ের প্রধান করে দেন। সে সময় ঢেকুর গড়ের অধিপতি ছিলেন কর্ণসেন। তাই কর্ণসেনের ওপর তাকে প্রধান করে পাঠানোর বিষয়টি অবগত করতে গৌড়েশ্বর সোমঘোষের দ্বারা কর্ণসেনকে পত্র লিখে পাঠান। সোমঘোষ রাজার নির্দেশ মতো ঢেকুর গড়ে পৌঁছে পত্রটি কর্ণসেনের হাতে দেয়—'রাজার কবজ পত্র সোমঘোষ দিল।/কর্ণসেন পড়্যা মনে চিন্তিত হইল।'[৬] এই পত্রটির মাধ্যমে ঢেকুর গড়ে সোমঘোষের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তার পুত্র ইছাই ঘোষ একসময় ঢেকুর গড়ের শাসক রূপে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে কর্ণসেনের একসময় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে পত্র, সেই পত্রের মধ্য দিয়েই তার ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রাথমিক সূত্রপাত ঘটে।

রাজা গৌড়েশ্বরের লেখা প্রথম পত্রের সূত্র ধরে ঢেকুর গড়ে ইছাই ঘোষের উত্থান এবং পত্রপ্রাপক কর্ণসেনের পতন ঘটে। ইছাই ঘোষ একছত্র ক্ষমতার অধিপতি হতে কর্ণসেনকে রাজ্য ও সংসারচ্যুত করে। অতঃপর রাজা গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের বেঁচে থাকার নবদিগন্ত উন্মোচিত করতে নিজ শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে নতুন রাজ্য ময়নার অধিপতি করে দেন। তাদের সন্তান রূপে লাউসেন জন্মলাভ করলে কর্ণসেন আনন্দ সংবাদ শ্যালক মহামদ সহ বন্ধু-বান্ধব সকলকে পত্র লিখে জানায়—

মসীপত্র কলম আনিল শীঘ্রগতি।
শুভোদয় বারতা লিখিল নরপতি।।
রাজা গৌড়েশ্বর আগে লিখিল পরোনা।
পাত্রকে লিখিল তব হয়্যাছে ভাগিনা।।
গৌড়-দরবারে ভাই বন্ধু যত ছিল।
সভাকারে কর্ণসেন বারতা লিখিল।।[৭]

এই আনন্দ সংবাদে সকলে খুশি হলেও লাউসেনের মামা মহামদ খুশি হতে পারেনি। কর্ণসেনের সঙ্গে তার পুরানো শত্রুতার ইতি টানতে লাউসেনকে চুরি করার কথা ভাবে এবং নানাভাবে লাউসেনের অনর্থ করতে চায়। আর এই সুযোগটা তার সামনে এসেছিল অযাচিতভাবে একটি পত্রের মাধ্যমে। রানি রঞ্জাবতী সন্তানকে গৌড়ে যাওয়া আটকানোর জন্য তার হাত-পা ভেঙে দেওয়ার কথা ভাবে। সেই কারণে রঞ্জাবতী ভাই মহামদকে চিঠি লিখে সারেঙ্গধলকে আনানোর কথা বলে স্বামী কর্ণসেনকে। কর্ণসেন স্ত্রীর কথা মতো শ্যালক মহামদকে পত্র লেখে—

'পাত্রকে লিখিল রায় বিশেষ পরোনা।

সরণ শিখিব তব লাউসেন ভাগিনা।।
অবশ্য পাঠায়্যা দিবে সারেঙ্গধর মাল।
তুমি আমার সম্পদ সারথি সর্বকাল।[৮]

পত্র পাওয়া মাত্র মহামদ সারেঙ্গধর মল্লকে পাঠিয়েছিল ভাগ্নের মল্লবিদ্যা শিক্ষার জন্য নয়; বরং এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সে লাউসেনকে হত্যা করতে চেয়েছিল। অবশ্য মহামদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। লাউসেনের বীরত্বের কাছে সারেঙ্গধর হার মানে। মহামদকে লেখা এই পত্রটি লাউসেনের বীরত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে। আবার এই পত্রের ফলেই মহামদের প্রতিহিংসা ও ভীতি উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে।

'কাঙুরযাত্রা পালা'য় উল্লেখিত পত্রটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রয়োজনে গৌড়েশ্বর ময়নার মহীপাল লাউসেনকে লিখেছেন। যদিও এই পত্র লেখার অন্তরালে মহামদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা রয়েছে। মহামদ গৌড়েশ্বরের নিকট বার্তা দেয় কাঙুর রাজ গৌড় আক্রমণ করছে। তাই কাঙুর রাজের প্রতি যুদ্ধ যাত্রার জন্য গৌড়েশ্বর পরম শক্তিধর লাউসেনকে পত্র লেখেন—'পাত্রে বচন শুনি রাজা সায় দিল/কাঙুর মহিম হেতু পরোনা লিখিল'[৯]। এই পত্র পেয়ে লাউসেন কাঙুর যাত্রা করেন এবং রাজা পরাজিত করে রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেন। একইভাবে শিমুলরাজ কন্যা কানাড়ার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল গৌড়েশ্বরের লেখা পত্রের মধ্য দিয়ে। শিমুলরাজ হরিপাল কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ম্ভর সভার আয়োজন করলে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র লেখেন। স্বয়ম্ভর সভায় গৌড়েশ্বর লৌহগণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করতে ব্যর্থ হন, কিন্তু লাউসেন লৌহগণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করে কানাড়াকে স্ত্রী রূপে লাভ করেন।

লাউসেনের বীরত্ব ও মর্যাদাকে মহামদ কখনোই ভালো চোখে দেখেনি। লাউসেনকে বারবার অপদস্থ করতে ব্যর্থ হলে মহামদের কূটনৈতিক চক্রান্ত আরও বেড়ে যায়। 'অনুমৃতাপালা'য় দেখা যায় মহামদের কুটিল ষড়যন্ত্রে গৌড়েশ্বর দেবতার বরপুত্র ইছাই ঘোষকে নিজের বশ্যতা স্বীকারের জন্য লাউসেনকে ঢেকূরগড় জয় করতে পাঠাতে চান। সেই কারণে তিনি লাউসেনকে তলব করে একটি পত্র লেখেন—'রাজা বলে শুনরে ধাবক ইন্দ্রজাল।/আন গিয়া লাউসেন ময়নার মহীপাল/...মাথায় করিয়া নিয় রাজার পরোনা/ধাবক বিদায় হৈল দক্ষিণ ময়না।'[১০] এই পত্র পেয়ে লাউসেন ঢেকূর জয় করতে গেলে মহামদ মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিয়ে ময়না নগরে লাউসেনের মায়ামুণ্ড পাঠায়। এর ফলে রাজ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে এবং কানাড়া-কলিঙ্গা অনুমৃতা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। অবশেষে ধর্মঠাকুরের কৃপায় প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং ময়নানগরের শান্তি ফিরে আসে। মহামদের এই কুটিল চক্রান্তে ধর্মঠাকুর আগে থেকেই রুষ্ট হয়ে ছিলেন। তারপর মহামদের কথা মতো

গৌড়েশ্বর স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মপূজা করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে গৌড়ে অকাল বর্ষণের আদেশ দেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় অকাল বর্ষণে গৌড়ের চরম ক্ষতি হলে দেবতার রোষ থেকে বাঁচার জন্য গৌড়েশ্বর লাউসেনকে পত্র মারফত ডেকে পাঠান।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'জাগরণ পালা'য় লাউসেন ও কানাড়ার মধ্যে দুটি ব্যক্তিগত পত্রালাপ দেখা যায়। পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানোর জন্য লাউসেন হাকণ্ডে যাওয়ার পর বহুদিন কেটে যায়। ময়না নগরের বার্তার জন্য তাঁর মন বিচলিত হয়ে ওঠে। সেই কারণে লাউসেন হাকণ্ড থেকে ময়না রাজ্যের সংবাদ জানতে চেয়ে কানাড়াকে পত্র লেখেন—

এত শুনি লাউসেন উৎকল মহীনাথ।
করে নিল মস্যানি কলম তালপাত।।
শ্রীমতি কলিঙ্গা তোরে আমার আশীষ।
ভালমন্দ নাহি জানি ঘরের বিশেষ।।[১১]

লাউসেনের লেখা এই পত্র ময়না নগরে এনেছিল শারী-শুয়া পাখি। কানাড়া এই পত্র পাঠ করে লাউসেনকে ময়নার বার্তা লিখে পাঠান শারী-শুয়ার মাধ্যমে।—

স্বস্তি আদি প্রথম লিখন মনোহর।
গজমোতিসম কান্তি কানাড়া অক্ষর।।
মহোদধি মর্যাদা মহিমা মহাশয়।
কানাড়া তোমার দাসী লিখে সবিনয়।।[১২]

কানাড়া এই পত্রে ময়না নগরের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা লিখে পাঠান। পত্রে প্রত্যেকটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। এই ঘটনা লাউসেন জানার পর পশ্চিমে সূর্য উদয় দেখানোর জন্য তপস্যায় অধিক মনোযোগ দেয়। কারণ রাজ্যের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে পত্রের ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায় কাহিনি যত পরিণতির দিকে গিয়েছে পত্রের ব্যবহার ততই বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ বলা যায়, পত্রের ক্রমাগত ব্যবহার, ঘটনাকে দ্রুত গতি দিয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে পত্র বাহক হিসেবে ধাবক ও শুক-শারীর যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি পত্র লেখার বিশিষ্ট রীতির পরিচয় মেলে কানাড়ার লেখা পত্র থেকে। কানাড়ার লেখা অক্ষরকে এখানে তুলনা করা হয়েছে 'গজমোতি'র সঙ্গে। আবার লাউসেনের লেখা একটি পত্রে কলম দিয়ে তালপাতায় লেখার কথা জানা যায়। সর্বোপরি ধর্মমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত পত্রগুলি থেকে মধ্যযুগে পত্রলেখার বিশিষ্ট রীতি, লেখার মাধ্যম ও পত্রবাহকের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় লাভ করা যায়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা হলেও পত্রের ব্যবহার সবিশেষ চোখে পড়ে না। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনিতে দুই

স্থানে পত্র লেখার কথা জানা যায়। রাজা মানসিংহ বাংলায় আগমণের পর ভবানন্দ মজুমদার তাঁকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি শোনায়। 'বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ' অংশে ভবানন্দ মজুমদারকে বলতে শোনা যায় বীরসিংহ রাজের পত্র লেখার কথা। বর্ধমান রাজা বীরসিংহ তাঁর একমাত্র কন্যা বিদ্যার বিবাহের জন্য কাঞ্চী রাজ গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দরের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করেন—

'বীরসিংহ তার পাট/পাঠাইয়া দিল ভাট/লিখিয়া এসব সমাচার।।
সেই দেশে ভাট গিয়া/ নিবেদিল পত্র দিয়া/ আসিতে বাসনা হৈল তার।।'[১৩]

ভাট পত্র নিয়ে কাঞ্চী দেশে উপস্থিত হলে সুন্দর তার মুখ থেকে বিদ্যার সবিশেষ বর্ণনা জানতে পারে। তারপর ছদ্মবেশে বিদ্যা লাভের জন্য বর্ধমানে এসে হীরা মালিনীর গৃহে আশ্রয় নেয়। হীরা প্রতিদিন বিদ্যাকে ফুলের জোগান দেয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর হীরা মালিনীকে বলে—

'নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও।।
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা।[১৪]

সুন্দর মালার মধ্যে পত্র দেওয়ার জন্য নিজে মালা গাঁথতে বসে। কেয়া, মল্লিকা, বকুল থরে থরে সাজিয়ে তার মাঝে— 'চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে'। গোপনে কেয়াপাতায় পত্র লিখে সুন্দর বিদ্যাকে পাঠানোর পর বিদ্যা নিজের পরিচয় একইভাবে একটি শ্লোকে লিখে পাঠায়। এইভাবে বিদ্যাসুন্দরের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। বিদ্যা-সুন্দরের মাঝে সংবাদ বাহক রূপে হীরা মালিনী থাকায় উভয়ের মধ্যে পত্র লেখার আর প্রয়োজন পড়েনি।

মঙ্গলকাব্যে চিঠি-পত্রের ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায়, মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি প্রাচীন ও সরলরৈখিক হওয়ার জন্য পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটি খণ্ডে পত্রের প্রয়োজন না হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে বণিক খণ্ডে লীলাবতীর কপট পত্র ও ধনপতির মানভঞ্জন পত্র কাহিনির দুই নিয়ামক হয়ে উঠেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে পত্র লেখার প্রচলন পূর্বের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। অন্যদিকে মধ্যযুগের শেষ পাদে লেখা অন্নদামঙ্গল কাব্যে পত্রের ব্যবহার চমকপ্রদ অথচ সংখ্যা অনেক কম। আসলে সময়ের সঙ্গে পত্র লেখার প্রচলন সমাজে থাকলেও সাহিত্যে পত্রের ব্যবহার অনেকটাই আখ্যান নির্ভর।

তথ্যসূত্র:

১. তন্ময় মিত্র, মীর রেজডিল করিম, সুবোধকুমার যশ (সম্পা.), *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৭৮

২. সুকুমার সেন (সম্পা.), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৬
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪
৬. অক্ষয়কুমার কয়াল (সম্পা.), *রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল*, ভারবি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৬১
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১১
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩
১৩. মদনমোহন গোস্বামী (সম্পা.), *ভারতচন্দ্র*, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ১৯৬১, পৃ. ৭২
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

এবং প্রান্তিক প্রকাশিত

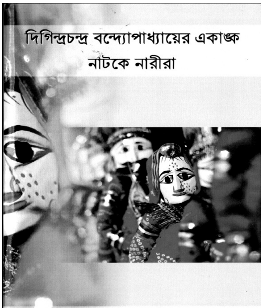

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের একাঙ্ক নাটকে নারীরা
আশিস রায়
মূল্য : ৮০ টাকা

বার বার আহত পাখির মতো জীবনের আকাশে ওড়া-উড়ি দিয়ে প্রমাণ করেছে। ‘এভাবেই ফিরে আসা যায়।’ নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে সেই আহত পাখিদের বার বার ফিরে আসার গল্প শোনানো হয়েছে। নারী যারা নাকি সমাজের ধারক, বাহকও। তাদের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প, সংসার সমুদ্রের নিত্য নৈমিত্তিক জোয়ার ভাটায় উথাল পাথাল জীবনে নিজেকে হারিয়ে যেতে না দেওয়ার গল্প শুনিয়েছেন নাট্যকার। প্রাবন্ধিক আশিস রায় এখানে দশটি প্রবন্ধের মধ্যে সেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে নারীদের কথা তুলে ধরেছেন।

"বঙ্গবানী" : প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক প্রবন্ধ চর্চায় দীনেশচন্দ্র

বিভাষ নায়েক*

বাংলা সাহিত্যের কৃতবিদ্য পণ্ডিত প্রবর জ্ঞানতপস্বী ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। সাময়িক ও মাসিক পত্রিকার লেখক হিসেবে তাঁর পরিচয় ছাড়াও, দুটি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি একসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গদর্শন' এবং রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি সরলাদেবীকে 'ভারতী' পত্রিকা পরিচালনে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থের ২০ অধ্যায়ে তার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। উপরোক্ত দুটি পত্রিকার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহন, জ্ঞানলাভ, পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্রকে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনায় এবং পরিচালনায় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল করে তোলে। ১ম ও ২য় বর্ষ যথাক্রমে ১৩ ফাল্গুন ১৩২৮ থেকে মাঘ ১৩৩০ কালপর্ব পর্যন্ত লেখক ও সম্পাদক ছিলেন। তবে, 'বঙ্গবানী' পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক বিজয়চন্দ্র মজুমদার। অন্য একটি পত্রিকার 'বৈদ্যহিতৈসিনী' (পৌষ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। পত্রিকাটি বৈদ্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মুখপত্র হিসেবে পরিচিত। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিমণ্ডলীর নিজস্ব সাংগঠনিক পত্রিকা। দীনেশচন্দ্র এই পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি অন্যতম সহকারী সভাপতিও ছিলেন। বঙ্গাবানী পত্রিকায় প্রকাশিত দীনেশচন্দ্রের প্রবন্ধতালিকা কালক্রমসহ একটি সূচি নিম্নে প্রদত্ত,-

প্রবন্ধ তালিকা	পত্রিকা	প্রকাশ কাল
ক. টমাস ও রামরাম বসু	বঙ্গাবানী ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা	১৩২৮ মাঘ
খ. কাঁচরাপাড়া - কবিকর্ণপুর	বঙ্গাবানী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা	১৩২৮ চৈত্র
গ. নদীয়ার টোল - একশত বৎসর পূর্বে	বঙ্গাবানী ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা	১৩২৮ চৈত্র
ঘ. শ্রীবাস - ঈশ্বর গুপ্ত	বঙ্গাবানী ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা	১৩২৯ বৈশাখ
ঙ. ঘোষপাড়া (কর্ত্তাভজার দল)	বঙ্গাবানী ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা	১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ
চ. দক্ষিণেশ্বর	বঙ্গাবানী ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা	১৩২৯ আষাঢ়
ছ. বেলুড়	বঙ্গবানী দ্বিতীয়ার্ধ, ১ম বর্ষ	১৩২৯ আষাঢ়
জ. খড়দহ	বঙ্গাবানী (দ্বিতীয়ার্ধ, ৩য় সংখ্যা)	১ম বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২৯ ব.
ঝ. নন্দদুলাল ও রাধাবল্লভজী	বঙ্গবানী, (দ্বিতীয়ার্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)	১ম বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩২৯ ব.
ঞ. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	বঙ্গবানী (প্রথমার্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)	৪র্থ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৩২ ব.
ট. আশুতোষ স্মৃতি	বঙ্গবানী (প্রথমার্ধ, ৫ম সংখ্যা)	৪র্থ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩২ ব.

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চিত্ত মাহাত মেমোরিয়াল কলেজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' গ্রন্থে সখারাম গনেশ দেউস্কর উল্লেখ করেছেন, - বঙ্গবানী পত্রিকায় দীনেশচন্দ্র সেন ১৩২৮ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু নিবিড় গ্রন্থ পাঠ এবং পত্রিকা অনুসন্ধানে আরও দুটি তথ্য সংযোজিত হল। প্রথমত, তিনি প্রবন্ধ লিখন এবং পত্রিকা সম্পাদনার বিষয়ে ১৩৩২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ আরও দুটি বছর সক্রিয় ছিলেন। দ্বিতীয়ত, দুই বিরলতম ব্যক্তিত্বকে নিয়ে দুটি মহতী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যা বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গৌরবজনক। অবশ্য, দ্বিতীয় প্রবন্ধটি আশুতোষ প্রয়াণের পর তিনি উদ্‌বিগ্ন, বিচলিত অবস্থায় মহাপ্রাণ ব্যক্তিত্বের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। 'বঙ্গবানী' পত্রিকায় এগারটি বিচিত্র প্রবন্ধ লক্ষ্য করা যায়, দেউস্কর বক্তব্য মেনে নিলে দুটি প্রবন্ধকে তাঁর সমগ্র রচনা থেকে বাদ দিতে হয়। উল্লেখ্য, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় দীনেশচন্দ্র এগারটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মধ্যে নির্বাচিত সাতটি প্রবন্ধই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠাণ কেন্দ্রিক। আলোচ্য নিবন্ধের ভর কেন্দ্রে সাতটি প্রবন্ধের বস্তুনিষ্ঠ তুলনামূলক বিশ্লেষণ পরিস্ফুট হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ধর্মবোধ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, আচার-প্রথা ইত্যাদির বহুমাত্রিক দিক উন্মোচিত হয়েছে।

কাঁচরাপাড়া - কবিকর্ণপুর

'কাঁচরাপাড়া - কবিকর্ণপুর' প্রবন্ধটি বঙ্গবাণী পত্রিকায় চৈত্র ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে প্রাবন্ধিক কাঁচরাপাড়ার প্রাচীনত্ব এবং হিন্দুধর্ম চর্চার একটি ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষত, বৈষ্ণবচর্চা এবং চৈতন্যচর্চার পীঠস্থান হিসেবে দীনেশচন্দ্র কাঁচরাপাড়র অতীত মহিমা প্রকাশ করেছেন। ক্ষেত্র বিশেযে, ঐতিহাসিক সত্যতা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কবি কর্ণপুরের গৃহচিত্র, সিংহাসনে উপবিষ্ট কৃষ্ণরায়জির বিগ্রহ, সিংহাসন বর্জিত কৃষ্ণরায়জীর প্রতিমূর্ত্তি, কৃষ্ণরায়জির মন্দির, কৃষ্ণরায়জীর প্রবেশ পথ, দোলমঞ্চ এবং কৃষ্ণরায়জীর নৈবেদ্য বা ভোগপ্রস্থ ক্ষেত্রগুলির ফটোচিত্র বর্ণনার পাশাপাশি উপস্থাপন করেছেন। আসলে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব চর্চার পরিসর এবং পরিমণ্ডল স্পর্কে একটি ধারণা তৈরীর সদিচ্ছা প্রাবন্ধিকের অন্তরে ছিল। এমনকি, ভবিষ্যৎ পাঠকবর্গের কাছে অতীতদিনের স্মৃতিগুলি সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক ধারণার পরিসরও নির্মাণ করেছেন।

প্রবন্ধটির সূচনাংশ থেকেই প্রাবন্ধিক সমকালে দাঁড়িয়ে অতীতকে ফিরে দেখতে চেয়েছেন। ফলত উনিশ শতকে নগর কোলকাতার একদিকে 'উপেক্ষিত দোলমঞ্চ' এবং 'পরিত্যক্ত তুলসী মঞ্চে'র প্রতি নিজ হৃদয়ের অনুভূতি, অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন। কেননা, আজন্ম পল্লীপ্রীতিই তাঁকে এ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে। অজন্তা, মাদুরার গুহাচিত্র এবং 'তাজমহলে'র স্বপ্নসৌধ থেকে ফিরে এসে বাংলার ভগ্ন দেবালয়ে বসে আরতি, ঘন্টা, শঙ্খ ও খঞ্জনীর শব্দে হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজেছেন। এই অনুসন্ধান কলিকাতার

মাত্র ২৮ মাইল দূরে; কাঁচরাপাড়ার কবিকর্ণপুরের গৃহদ্বারে। প্রাবন্ধিক কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ সন্ধানে সার্থক হয়েছেন। শিবানন্দ সেন মহাশয়ের চৈতন্যভক্তি, মহাপ্রভুর রথযাত্রার প্রাক্কালে পুরীতে ভক্ত সমাবেশের তথা চৈতন্য দর্শণের দায়ভার অর্পন হয়েছিল। সপ্তগ্রামের কুমার রাজা রঘুনাথ দাসের সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস গ্রহণ, পিতা গোবর্ধনের শোকাবিহবল অবস্থা - বঙ্গের চৈতন্যধর্মের সম্প্রসারণের পথ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা দেয়। সপ্তগ্রামের রাজা গোবর্ধনের অশ্বারোহী সহ দূতের চিঠি রঘুনাথের কাছে আসে। একাধিক ঘটনার অনুসূত্র প্রমাণ করে শিবানন্দ সেন একাদিকে যেমন চৈতন্য আস্থাভাজন বিদ্বদ্‌জন, তেমনি 'অগাধ পাণ্ডিত্যের' অধিকারী।

শিবানন্দের 'পদকল্পতরু' গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদের সমষ্টি। শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপুর। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে কাঁচরাপাড়ায় বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বংশগত সূত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য কবি কর্ণপুরকে চৈতন্য চর্চায় উৎসাহী ও সমৃদ্ধ করেছিল। প্রাবন্ধিকের বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য থেকে আরও জানা যায়, কবিত্ব শক্তির আধ্যাত্ম মহিমা সম্পর্কে। ''চৈতন্যচন্দ্রোদ্বয়' নাটকটি কবি কর্ণপুরের চৈতন্য জীবন আশ্রিত দিব্য ভাবের বর্ণময় প্রকাশ হলেও, 'সেইসঙ্গে মহাপ্রভুর তিরোধানে পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের মানসিক অস্থিরতা সহ জনমানসের শোকবিহ্বল অবস্থার নিখুঁদ উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। আদ্যান্ত ভক্তিরসের ভাবুকতায় হিন্দু ধর্মের সমাজ বিপ্লবের গৌরবগাথা চৈতন্যচন্দ্রোদ্বয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পূর্বে 'কবিকর্ণপুর ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য এই দুই পুস্তক সমাঝা করেন।' ফলত, পরোক্ষভাবেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গ্রন্থরচনায় উপাদানসহ উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়েছেন। প্রাবন্ধিক রচনা মধ্যে কবিকর্ণপুরের সংস্কৃত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির আলোচনায়। উপরোক্ত দুটি গ্রন্থ ছাড়াও কর্ণপুর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' (১৫৭৬), ''আনন্দ বৃন্দাবনচম্পু', 'কৃষ্ণগনোদ্দেশদীপিকা' এবং 'অলংকার কৌস্তুভ' নামক মহামূল্যবান বৈষ্ণব ধর্ম - সাধনা কেন্দ্রিক গ্রন্থগুলি রচনা করেন। স্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ উপরোক্ত গ্রন্থগুলির অনেক শ্লোক 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। ৩৫০ বছর পূর্বের অধিক সময়ে, কাঁচড়াপাড়া শিবানন্দ সেন ও কবিকর্ণপুর (ষোড়শ শতকের) প্রসিদ্ধ জ্ঞানা ব্যক্তিরূপে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। প্রাবন্ধিকের অভিমতের সূত্র দরে বৈষ্ণব মহাজনদের ধর্মতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ মহিমার সৌকর্য অনুমান করা যায়। এছাড়াও, বৈষ্ণব অনুরাগী মহাজনদের উপাসনা, কর্মপদ্ধতি ও কর্মস্থান এই প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব পেয়েছে। এই সঙ্গে হালিশহরের অতীত গরিমা, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান এবং অধুনা রামপ্রসাদ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই শহরেই জন্মভূমি 'তীর্থের মত পবিত্র' স্থান। অথচ, এগুলির সংরক্ষণের অভাব মন্দির থেকে মূর্ত্তি পয়ন্ত ধ্বংসের পথে ক্রম অগ্রসরমান।

নদীয়ার টোল - একশত বৎসর পূর্বে

দীনেশচন্দ্র সেন জ্ঞানদীপ্ত উনিশ শতকে রেঁনেসার সন্তান। যুক্তবাদ, মানবতাবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা এই শতকের বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল - সাহিত্যে এবং শিল্পে। দীনেশচন্দ্রও তাঁর সাহিত্যে উপরোক্ত মানদণ্ডের নিরিখে তাঁর সাহিত্য প্রতিভারক পরিচয়ও দিয়েছে। উনিশ শতকের সাহিত্য নির্মাণের এবং বিচারের একটি মাপকাঠি ছিল। তা হল অতীত ঐতিহ্যকে উনিশ শতকে পুনরাবিষ্কার ও পুনর্বিচার। ‘নদীয়ার টোল - একশত বৎসর পূর্বে’ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নদীয়ার টোল কেন্দ্রিক প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা, পঠন-পাঠন, পত্রিকা, ছাত্র-অধ্যাপকের সমানুপাতিক হার, শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিপ্রদান সহ সাহিত্য চর্চা বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ ও রূপরেখা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। এই সঙ্গে এও জানিয়েছেন, বঙ্গদেশে ধনী ব্যক্তিদের উচশিক্ষার প্রয়োজনে অকুণ্ঠচিত্তে ব্যায়ভারের প্রবণতা। শিক্ষাই যে একটি জাতির জীবনে সংস্কৃতির ধারাকে বহতা বা চলিষ্ণু করে রাখে - প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুসলমান শাসনকালেও তুর্কি আক্রমনোত্তর কালে নদীয়ায় টোলকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি। নদীয়া, শান্তিপুর, গোয়ালাপাড়াকে কেন্দ্র করে তিনটি উচ্চশিক্ষার টোল (কলেজ) যথেষ্ট অর্থখরচে সর্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করেছিল। প্রাবন্ধিক উচ্চশিক্ষার সেদিনের পরিচয়ের স্বরূপ লিখেছেন -

> ‘‘....একমাত্র নদীয়া কলেজেই এগারশত ছাত্র ও দেড়শত অধ্যাপক আছেন। পূর্বে যত ছাত্র অধ্যাপক ছিলেন, তাহা হইতে অবশ্য বর্ত্তমান সংখ্যা অতি অল্প। নবদ্বীপাধিপতি ‘রুদ্রের’ সময় এক নদীয়া টোলেই ৪০০০ ছাত্র এবং তদনুপাতে অধ্যাপকমণ্ডলী ছিলেন।”[১]

বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপান্তে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধার জন্য সেকালে ছাত্রছাত্রীরা এই টোলগুলিতে আশ্রয় নিতেন। প্রাচীন বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি, অধ্যাপকমণ্ডলীর নিত্যনতুন গ্রন্থপ্রনয়ন, পুস্তকের টিকা-টিপ্পনী, রচনার উৎকর্ষতার জন্যও বিশেষ পুরস্কারের বন্দোবস্ত ছিল। বোঝাই যাচ্ছে শিক্ষার উৎকর্ষ, মানোন্নয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি প্রাবন্ধিকের সমকাল থেকে একশত বৎসর পূর্বে কি ধরনের ছিল।

টোল কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় আবর্তিত হত। বেলা ১০ থেকে ৩টা পর্যন্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠদান প্রক্রিয়া অভিনব প্রণালীতে সুসম্পন্ন হত। বিষয় অনুযায়ী দুইজন অধ্যাপকের তাত্ত্বিক ও তার্কিক পর্যালোচনা শিক্ষণবীশকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করত। এমনকি কম মেধা সম্পন্ন ছাত্রদের একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কৌতূহলও

অধ্যাপক মণ্ডলী নিরসন করতেন। যথার্থ দায়িত্ব-কতর্ব্যের সঙ্গে অধ্যাপকমণ্ডলীর ধৈর্য্য-অধ্যাবসায়ের তুলনা রহিত পরিশ্রমের সংকল্পের পরিচয় দীনেশচন্দ্র সেন এভাবে ব্যক্ত করেছেন, -

> ''ছাত্র নির্বোধ হইলেও যদি কোন অধ্যাপক তাহার প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তবে সমস্ত অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে তিনি যৎপরোনাস্তি নিন্দিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায় একেবারে বিমুখ হয়ে পড়েন।''[২]

সুতরং অধ্যাপক মণ্ডলীকে পাঠদানকালে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হতো। পাঠপ্রক্রিয়ায় অধিকাংশ সময় নদীয়ার রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন। নির্বাচিত অসাধারন প্রতিভাধর পণ্ডিতদের রাজা নিজ হস্তে 'পাত্র ভরিয়া স্বর্ণমুদ্রা' প্রদান করতেন। সময়ের ব্যবধানে রাজকোষের অবগতি আসায় -

> ''বিজয়ী অধ্যাপক এমন গরদের ধূতি ও কাঁসার পাত্র পাইয়া থাকেন। রাজার নিজ হস্তে হইতে এই পুরস্কার লাভ করা তাঁহারা বিশেষ গৌরবের জিনিস বলিয়া মনে করেন।''[৩]

একশত বৎসর পূর্বে নদীয়ার শিক্ষাব্যবস্থার বহুমুখী কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে তথ্যগত বক্তব্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে সাধুগদ্যে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু, প্রবন্ধের শেষাংশে তাঁর সমকালে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ ও ছাত্র-অধ্যাপকের আনুপাতিক হার ইত্যাদি বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাই অতীত গৌরবমাখা বঙ্গদেশের বর্ত্তমান হীতশ্রী অবস্থা অবলোকন করে একদিকে যেমন দেশবাসীকে 'শিক্ষার গৌরব' সম্পর্কে সচেতন হওয়ার বার্তা দিলেন, তেমনি শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকদেরও শিক্ষার সর্বাঙ্গীন পরিবেশ, অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করিয়েছেন। যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অতীত গরিমাকে ধারণ করে নিজেদের তথা শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে।

ঘোষপাড়া : কর্ত্তাভজার দল

'ঘোষপাড়া' প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বৈষ্ণব মহাজন সম্প্রদায় এর সাধন-ভজনের প্রণালী, ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত প্রদান করেছেন। প্রবন্ধটিতে লেখকের বিচক্ষণ বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের 'শূন্যবাদী' দর্শন সম্প্রসারিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মের পরিমণ্ডকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু কাল্ট কেন্দ্রক দ্বন্দ্ব সংঘাত

আপেক্ষিকভাবে বৌদ্ধসংঘ বা ধর্ম্মের অবনতি ঘটালেও, কালক্রমে বৈষ্ণবপন্থীদের সাধনচর্চায় বৌদ্ধবাদী ধর্মচর্চার গূঢ় প্রণালী কর্ত্তাভজা ব্যক্তিদের সমৃদ্ধ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের মহাযান সম্প্রদায়ের উদার অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ধর্মীয় জীবন বোধ কিছুটা পরিবর্ত্তিত হয়ে বৈষ্ণব শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাবন্ধিক একাদিক সাদৃশ্যের অনুসূত্র হিসেবে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেনে। প্রাবন্ধিক লিখেছেন,

> ''বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহু শাখা
> এই বৌদ্ধ মতেরই সাধনা করিতেছে,
> ইঁহারা ''সহজিয়া'', ''কর্ত্তাভজা'',
> ''রামবল্লভজী'', ''কিশোরী ভজক''
> প্রভৃতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত।''[৪]

কর্ত্তাভজার দলগুলি একধিক শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বঙ্গে বৈষ্ণবচর্চার পথকে সমৃদ্ধ করেছিল। এদের মধ্যে ষোড়শ শতকে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র খড়দহ গ্রামে ২৫০০ অতি-হীন সম্প্রদায়ের জনগনকে (ভিক্ষু ও ভিক্ষুনা) বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। হীনদশাপ্রাপ্ত কিছু মানুষ বীরভদ্রের কৃপায় বৈষ্ণব ধর্মের আলোক স্পর্শে নিজেরা মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অঅউল মানধেয় এক ব্যক্তি প্রধান প্রবর্ত্তক রূপে বৈষ্ণব ধর্মকে প্রচারমুখী করে তোলেন। কাব্যিক প্রাকৃত ভাষায় সত্য-ধর্ম-প্রেমকে অবলম্বন করে বাইশজন ব্যক্তি কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়কে বঙ্গদেশে প্রচারমুখী করে তোলে। প্রাবন্ধিক কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের পৃথক পরিচয় প্রদানের মধ্য দিয়ে কতগুলি বক্তব্য তুলে ধরেছেন। প্রথমত, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া নিজেরাই প্রহেলিকাময় ভাষায় অথচ সুস্পষ্ট মধুর সুরে নিজেদের মধ্যে বাক্-বিনিময় করতেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও কায়া গুপ্তিবাক্যের মধ্য দিয়ে নিজেদের ধর্মীয় গূঢ়ার্থ চর্চা করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর লালশশী নামক এক কর্ত্তাভজা শত শত গানের মধ্য দিয়ে স্বীয় ধর্ম্মচর্চ্চা সম্প্রসারিত করেন। বাবা আউলের বাইশজন শিষ্যের নাম তথ্যনিষ্ঠভাবে দীনেশচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন। বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কর্ত্তাভজার দলের পৃথক পৃথক পন্থা, ধর্মীয় প্রণালী আলোচনার সূত্রে বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছেন। বাইজ শিষ্য যথাক্রমে - হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, আনন্দরাম, নিতাই ঘোষ, রামশরন পাল, নয়ন, লক্ষীকান্ত, নিত্যানন্দ দাস, খেলারাম উদাসীন, মনোহর দাস, বিষ্ণুদাস, বিনু, গোবিন্দ, কৃষ্ণদাস, হরিঘোষ, কানাই ঘোষ, শঙ্কর, শ্যাম কাঁসারি, ভীমরায়, রাজপুত, পাঁচু রুইদাস, নিধিরাম ঘোষ, শিশুরাম।

প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র কর্ত্তাভজাদের স্বরূপ, তাদের সাধন ভজন সংক্রান্ত তথ্য এবং অলৌকিক মহিমার নানাদিক 'ঘোষপাড়ার প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অলৌকিক মহিমা সম্পর্কে প্রচলিত জনশ্রুতিগুলিকে গ্রহন করেননি। কেননা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদারনৈতিক ভাবধারায় ভাবিত শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অলৌকিক মহিমা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন এ বিষয়ে,-

"যেহেতু যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়
নাই, তাহা গ্রাহ্য করার অন্ধ বিশ্বাস ও
অগ্রাহ্য করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই।"[৫]

ধর্মীয় ভাবাবেগে অন্ধ হয়ে (প্রাবন্ধিক) লোকজ ঔষধ, সতীমায়ের অশ্বত্থ বৃক্ষ, সতীমায়ের পুকুরের অলৌকিক (কিংবদন্তী) মাহাত্ম্যকর্ম সম্পর্কে নিরবতাকে প্রধান অবলম্বন করেছেন।

ফাল্গুন মাসে দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে কর্ত্তাভজার দল একটি মেলার আয়োজন করে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে সমভাবাপন্ন মানসিকতার নিবিড় বন্ধন সুদৃঢ় হয়, এই সঙ্গে ধর্মবোধ জাতীয় স্তরে একটি সংহতিবোধের ভাবনাকে প্রসারিত করে। এতদ্‌সত্ত্বেও অধুনা ইংরেজি শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় 'কেরানী' হওয়ার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই ধরনের ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। তাই প্রাবন্ধিকের অভিমত, -

"সন্ধ্যা ভাষা"র ব্যূহ ভেদ করিয়া
কর্ত্তাভজাদের ধর্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে
পারিলে মহাযানের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব
তাঁহাদের চক্ষে জাজ্বল্যমান হইত।"[৬]

দক্ষিণেশ্বর

'দক্ষিণেশ্বর' প্রবন্ধটি একটি ঐতিহাসিক সাক্ষী। যুগজীবনের দর্পন স্বরূপ। জাত-পাত, বর্ন-বৈষম্য উনিশ শতকের একটি জ্বাজ্বল্যমান সমস্যা ছিল। এই সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রাবন্ধিক রাসমনি দেবীর অতুলনীয় মহানুভবতা এবং মানবিক প্রতিমূর্ত্তি উপস্থাপন করেছেন। জাত-পাত, চ্ছুত-অচ্ছুদ ব্যক্তিগতভাবে রাসমনিদেবী না মানলেও, সমকালের সামাজিক প্রথায় - আভিজাত্যে, কৌলিন্যে এগুলি বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। ফতল, সামাজিক ব্যাধির দুর্ভোগ যন্ত্রনা প্রত্যক্ষভাবে রাসমণিদেবীকে সহ্য করতে হয়েছিল। অসীম ধৈর্যশক্তি, এবং জনহিতকার্যে কৃপামুখী রাসসুন্দরীর বর্নময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাবন্ধিক এই প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থশালী রাজচন্দ্র মাড়ের সঙ্গে কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের কন্যা রাসমণির দাম্পত্য সুদৃঢ় হতে থাকে। স্বয়ং রাজচন্দ্র বুদ্ধিমতী রাসমণির পরামর্শ অনুযায়ী বিপুল অর্থসম্পদ পরিচালনা করতেন। এদিক থেকে রাসসুন্দরীর চরিত্রের আরও একটি দিক উন্মোচিত হয়। বৈষয়িক বুদ্ধি এবং হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও (স্বামীর মৃত্যুর পর) তিনি জনহিতকর কার্যকলাপ এবং দুঃখীজনের সেবা ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ অর্থব্যয়ে গঙ্গার পূর্বদিকে 'কলিকাতার অনতিদূরে' নির্মিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তারই উদার মোহযুক্ত প্রচেষ্টার ফল। যক্ষের ধনের মত স্বামী সম্পদকে ভোগবাদী মানসিকতায় গ্রহণ করতে চাননি।

কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়ের অর্থব্যয়ে মন্দির, অথচ এই যজন-যাজন, পূজা-অর্চনা সমস্তরই সিংহভাগ দায়িত্ব কর্তব্য ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের হাতে। সুতরং ভেদ বুদ্ধির তুচ্ছতা জ্ঞানে সেদিন

রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মন্দির কোন ব্রাহ্মণ পূজাকার্যে এগিয়ে আসেননি। ফলত, প্রাথমিক ভাবে মানসিক অস্থিরতায় তিনি বিপর্যস্ত হয়ে ছিলেন - এটি অনুমান করা অসঙ্গত নয়। স্বয়ং অন্তর্যামী রাসসুন্দরীর ব্যথা উপলব্ধি করে মন্দিরে এমনই এক পূজক প্রেরণ করেন, ঘটনাসূত্রে তিনি সাক্ষাৎ মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। মৃন্ময়ী পাথুরে মূর্ত্তি চিন্ময়ী সত্ত্বায়, এই দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পুরোহিতের সঙ্গে নিবিড় সাহচর্যে বাক্যলাপ করতেন। প্রাবন্ধিক এ ঘটনার সূত্র ধরে লিখেছেন, -

> ‘‘রামকৃষ্ণ স্বয়ং সে মন্দিরের পূজারি হইলেন, সেই মন্দিরে যে দেবতা স্বয়ং আসন গ্রহণ করিলেন, তাহাতে কাহার সন্দেহ হইতে পারে? এই দক্ষিণেশ্বর বঙ্গের সমস্ত তীর্থের রাজা হইয়া দাঁড়াইল। রাসমণির যে পুন্যবল রামকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিল, সেই সৌভাগ্য ও পুণ্যবল কম নহে।”[৭]

ফলত বোঝা যাচ্ছে, কঠোর তপস্যায়, ত্যাগ-তীতিক্ষায় ঈশ্বর স্বয়ং ধরা দেন। ভক্তের আকুতি এবং ভক্তির গভীরতা মানবকে যেমন ঈশ্বরমুখী করে তোলে, তেমনি দেবতাকেও মানবমুখী করে তোলে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে ওতপ্রোতবাবে রামকৃষ্ণের উপস্থিতির সূত্র ধরে প্রাবন্ধিক মন্দিরের পূজাপাঠ, আচারপ্রথা, নিত্যকর্মের বিষয়গুলি সূক্ষভাবে উপস্থাপন করেছেন। পাঠকদের পরিচয়ের সুবিধার্থে দক্ষিণেশ্বরের শিবমন্দির, কালীমন্দির, নাটমন্দির ও কৃষ্ণমন্দির, একত্রে কালীমন্দির, নাটমন্দির ও কৃষ্ণমন্দিরের পার্শ্বচিত্র, রামকৃষ্ণের গৃহ, রামকৃষ্ণের সজ্জা, পঞ্চবটীবন ও বেলগাছের চিত্র পৃথক পৃথকভাবে প্রতিস্থাপিত করেছেন। এই স্থানগুলির সঙ্গে রামকৃষ্ণের গোটা দক্ষিণেশ্বরের পরিমণ্ডলের চিত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হলেও, গঙ্গাঘাটের ছবিটি প্রাবন্ধিক স্থান দেননি। প্রাবন্ধিকের আলোচনায় দুটি বিষয় গভীরভাবে ধরা পড়েছে। এক রাসমনি দেবীর সার্থক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। কেননা সেকালে একজন নারীর পক্ষে নিঃসন্দেহে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা জনহিতকর এক সামাজিক বিপ্লব। অন্তঃপুরের বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতায় বঙ্গের এক গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা ভোগবাদী জীবনচর্চায় আতঙ্কিত মানবের প্রশান্তির প্রাণকেন্দ্র। দ্বিতীয়ত: রামকৃষ্ণের অহৈতুকী সাধনা এবং তোতাপুরীর যথার্থ শিষ্যের ভক্তির কাতরতায় জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাতৃনামের বন্দনায় মুখরিত কালীসাধক রামকৃষ্ণ ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে হুগলি কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পূজক মেথর মধুবাবু, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ উনিশ শতকের বিরল বিদগ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে

রামকৃষ্ণের তপস্যার ভক্তি-ভাবুকতার সংবাদ প্রাবন্ধিক গ্রহণ করেছিলেন। প্রাবন্ধিক মথুরের ব্যক্তি পরিচয় না দিলেও, পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না - মথুরকে অস্পৃশ্য বলে মন্দিরে স্থান দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন সেদিনের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। রামকৃষ্ণ নিজে তাঁকে মন্দিরের পূজকের স্থান দেন। প্রাবন্ধিকের বর্ননা অনুযায়ী রামকৃষ্ণের চরিত্রের অতি সরলতা, সদা কালীভক্তির ব্যাকুলতা এবং ব্যাহ্যিক পূজা-পদ্ধতি, আচার প্রথায় আশক্তিহীন মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বেলুড়

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শুধুমাত্র অতীত বীক্ষন থেকেই তাঁর প্রবন্ধচর্চাকে প্রসারিত করেন নি। বরং, সমকালের দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা ধর্মস্থান, তীর্থকেন্দ্রগুলির উপরও তাঁর প্রখর দৃষ্টি শক্তি ন্যস্ত ছিল। অতীতকে যেমন বর্তমানে ফিরে দেখেছেন, তেমনি বর্তমানের বিষয়গুলি নিয়ে ভবিষ্যতে চর্চার একটি ভূমি তৈরী করে গেছেন। ‘দক্ষিণেশ্বর’ এবং ‘বেলুড়’-এরকমই দুটি প্রবন্ধ। দুটি প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক দুই আলোকজ্জ্বল ব্যক্তির উপস্থিতি, কার্যকলাপ এবং জীবনবোধের পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রবন্ধে রানীরাসমণির অসীম ধৈর্য্য, অধ্যাবসায় সহ কৃত সংকল্পের বাস্তববায়ন পর্যন্ত বহুমুখী কর্মোদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন। ‘বেলুড়’ শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক ভৌগোলিক স্থানগত পরিচয় প্রদানের পর, স্বামীজীর স্বপ্নের সম্ভবনার কেন্দ্রস্থল গঙ্গীর তীরভূমি ‘বেলুড় মঠের’ পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধ দুটি নিবিড়পাঠে একটি সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। রানী রাসমণি - রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ - ত্রয়ী ব্যক্তিত্বের জীবনবোধ; ঘটনাসূত্রে দুই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে এঁদের মহানুভবতা, স্বার্থত্যাগ এবং পরোপচিকীর্চার দৃষ্টান্ত উন্মোচিত হয়েছে। জনহিতকর কর্মযজ্ঞের সার্থক রূপায়নে তাঁদের অসীম দান অস্বীকার করার নয়। ‘বেলুড়’ প্রবন্ধটিতে স্বামীবিবেকানন্দের ধ্যানযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগের পাশাপাশি আশ্রমকেন্দ্রিক কর্মপন্থার এবং কর্মসংস্কৃতির সুচারু বিশ্লেষণ প্রাবন্ধিকের চোখে পড়েছে। পাশাপাশি শ্রী মা সারদা দেবীর জীবনবোধের ভাবনায় উন্নীত হয়ে স্বামীজী অবিবাহিত কুমারী এবং বিধবা ব্রতচারি এং ভক্তিমতী গৃহনারীদের স্বতন্ত্র ধর্মচর্চার পীঠস্থান হিসেবে পৃথক মঠ গঠনের কার্যকলাপ সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। মহিলা মঠের কর্মধারা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক স্বামীজীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন-

> ‘‘ স্ত্রী মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংস্রব থাকবে না।... স্ত্রী মঠে মেয়েদের একটা স্কুল থাকবে। তাতে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ - চাই কি অল্প বিস্তর ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকার্যের যাবতীয় বিধান

> এবং শিশু পালনের স্থূল বিষয়গুলি
> শেখান হবে।"[৮]

এই সঙ্গে তিন ধরনের মহিলাদের স্বতন্ত্র কর্ম আচার প্রথার প্রতি স্বামীজী গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রাবন্ধিকদের তথ্য সূত্র থেকে সহজে অনুমান করা যায়, পাশ্চাত্য পরিভ্রমন স্বামীজীর চিন্তা-চেতনাকে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করেছিল। শিক্ষাই জাগতিক অন্ধকার থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। উনিশ শতকে স্বামীজীর স্বদেশে নারী শিক্ষা তখন অবহেলিত, জাত-পাত, ভেদ-বিভেদ এবং পর্দাপ্রথার নির্মম ফলশ্রুতি হিসেবে বঙ্গললনারা 'আপন ভাগ্য'কেই শুধুমাত্র দায়ী করতেন। সতীদাহ, বিধবার বিবাহরধ এই সমাজে তখন পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। অথচ, ইউরোপের নারী প্রগতিশীল ভাবনায় উন্নীত হয়ে সভা-সমিতি, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন-জীবিকায় নিজস্ব অভিরুচি তৈরী করেছে। স্বামীজী তাই উপেক্ষিত ভারতবর্ষে নারীদের সামাজিক ও সাংসারিক দাসত্ব থেকে মুক্তির অভিপ্রায়ে বিকল্প সাংস্কৃতিক ধর্মীয় জগৎ গড়ে তোলার কর্মপন্থায় উদ্‌গ্রীব। অবশেষে সফলও। শুধুমাত্র বেদ-বেদান্ত মুখস্ত করার তথাকথিত সংকীর্ণ ধর্মাশ্রয়ী পথে না গিয়ে নারী জাগরণের জন্য স্বামীজীর আত্মত্যাগ অস্বীকার করার নয়। যা প্রবন্ধটিতে লক্ষণীয়।

'বেলুড়' প্রবন্ধটিতে পরাধীন ভারতবর্ষে দেশসেবার কর্মযজ্ঞে স্বামীজীর প্রচেষ্টা, উদাত্ত আহ্বান প্রাবন্ধিকের ভাষায় যথার্থভাবে ধরা পড়েছে। কঠোর সন্ন্যাস ব্রতের মধ্যে দিয়ে সাধু জীবনের সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। প্রাবন্ধিক দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,-

> "... বেলুড় মঠ বাঙ্গালীর আদর্শ কর্ম্মজীবনের কেন্দ্র হইয়া আছে। এখান হইতে লোক-সেবা মহিমা মণ্ডিত হইয়াছে, ধ্যান-ধারণার নূতন আদর্শ, প্রাচীন ও আধুনিক ভাবে সমন্বয়, ত্যাগ ও কর্ত্তব্য পালন ও প্রীতির নতুন বার্তা সমস্ত দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ... সর্ব্বজাতির সমন্বয়, বৃন্দাবনের মত এখানে ভক্তির খেলা, যুরোপের প্রকান্ড প্রকান্ড চিকিৎসাশালার ন্যায় সেবা ব্রতের অনুপ্রাণনা ....তীর্থকে জীবন্তভাবের কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে।"[৯]

প্রাবন্ধিকের বক্তব্যের সত্যতা একালের পক্ষেও যথেষ্ট। স্বামীজীর অনুসৃত ভাবধারা অনুযায়ী কর্মপন্থার বহুমুখী উদ্যোগ আজও ক্রিয়াশীল। দীনেশচন্দ্র যে যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক রোমান্টিক মনের অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় ফটোচিত্রগুলিতে বিধৃত আছে। অতিথি ভোজনের

জন্য 'অতিথিশালা', রামকৃষ্ণ ও সারদামায়ের স্মৃতিমন্দির, ঠাকুরবাড়ী গঙ্গারতীরে সূর্যাস্ত বিকেলের মঠ সম্বলিত কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষের প্রতিচ্ছবি প্রবন্ধের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। জনহিতকর কল্যাণকর্ম এবং আধ্যাত্মিক পথে ভারতবর্ষের জাগরণের গায়ত্রী সংকল্প প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত হয়েছে।

খড়দহ

'খড়দহ' প্রবন্ধটিতে দীনেশচন্দ্র নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের ইতিকথা পরিবেশন করেছেন। প্রবন্ধটির শুরুতে, কালনার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্ত গৌরীদাস সরখেলের জনপ্রিয়তা, বৈষ্ণবপ্রীতি এবং গৌরাঙ্গ-ভজনীর বহুমুখী কার্যকলাপ বিধৃত হয়েছে। 'গৌর-নিতাই' এর বিগ্রহকে কেন্দ্র করে 'প্রবাদ কথা' ক্রমান্বয়ে মিথে পরিণত হয়েছে। মহাপ্রভুর দিব্য অনুভবে আপ্লুত গৌরদাস সংকল্প করেছিলেন - 'চিরকাল সাংসারিক চৌহদ্দির আবেষ্টনীতে 'গৌর-নিতাই'কে আবদ্ধ করে রাখবেন। কিন্তু, জগৎ সংসারের উদ্ধারে যাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাব, তিনি তো কোন বন্ধনে থাকবেন না। ফলত, motif পরিবর্তন পূর্বক মহাপ্রভু গৌরীদাসের কথা এবং স্বীয় সংকল্প উভয়দিকেই ভারসাম্য রক্ষা করেছিলেন। সমকালীন শাসকের ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা না করেও গৌরীদাসের পরিবার আশ্চর্যজনক ভাবে বৈষ্ণব মহাপ্রভুর সেবাধর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এমনকি ঘর-সংসার, কামিনী-কাঞ্চনের মায়া অতিক্রম করে গৌরীদাসের ভ্রাতা সূর্য্যদাস নিত্যনন্দের বিশেষ ভক্ত রূপে নিজেকে প্রমাণিত করেন। সমকালের বৈষ্ণবধর্মের গতিপ্রবাহকে ক্রিয়াশীল রাখতে জাহ্নবা ও বসুধা নাম্নী দুই কন্যাকে সমর্পন করেন। উপরোক্ত ঘটনাধারার প্রেক্ষিতে, অনুমান করা যায় গৌরী দাসের পরিবারবর্গ সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে বিশেষ বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। এমনকি চৈতন্যের যে অভিন্ন রাধা কৃষ্ণের যুগল সত্ত্বা - এই বোধের সম্প্রচারের নিমিত্তে জাহ্নবা পুত্র বীরভদ্র 'শ্যাম সুন্দর' বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা নির্মাতা; পূজা-অর্চনা, আচার-প্রথা ইত্যাদি কর্মের দায়দায়িত্বের কর্মপ্রবাহে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য থেকে নিত্যানন্দ বসুধা-জাহ্নবীর খড়দহে বৈষ্ণব চর্চার প্রগতিমুখী পরিচয় পাওয়া যায়। একাধিক অলৌকিক শক্তি এবং লোকশ্রুতি অনুযায়ী বৈষ্ণব কেন্দ্রিক মিথগুলি নিত্যানন্দকে কেন্দ্র করে খড়দহে আবর্তিত হচ্ছিল। প্রাবন্ধির আখ্যান কেন্দ্রিক গল্পরসের মধ্য দিয়ে অলৌকিক বৈষ্ণবধর্মের বিচিত্র দিকগুলি তুলে ধরেছেন। পুরুষানুক্রমিকভাবে খড়দহে চৈতন্যমহাপ্রভুর চর্চার ধারাবাহিক পরিচয় আদর্শনিষ্ঠ এবং তথ্যনিষ্ঠ ভাবে দীনেশচন্দ্র তুলে ধরেছেন। কালের প্রহরাকে অতিক্রম করে জাহ্নবা পুত্র বীরভদ্র সাংস্কৃতিক এবং অধ্যাত্মমুখী বৈষ্ণবধর্মের উন্মেষে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। পারিবারিক ঐতহ্যিসূত্রে পিতা নিত্যানন্দের বৈষ্ণব প্রীতি খড়দহে বীরভদ্রকেও একই পথে চলতে যথেষ্ট উদ্দীপনা উৎসাহ দিয়েছিল। গৌড়ের বাদশাহের শাসনকালে দিকে দিকে একাধিক হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাণ, মঠ মন্দির ধ্বংসের যে সংবাদ সাহিত্যের পাতায় পাওয়া যায়, তা থেকে বৈষ্ণবধর্মও ছাড় পায়নি। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ঐতিহাসিক

প্রেক্ষিতটিকে সচেতনভাবে 'খড়দহ' প্রবন্ধে স্থান দিয়েছেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে শাসককুল মানবতার পরিচয়ও দিয়েছেন। প্রাবন্ধিকের ভাষায় তা ব্যক্ত হয়েছে,-

> "...বাঙ্গালা ১৩১৭ সনের ঝড়ে আদতগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই 'খুন্তী' গৌড়ের বাদশাহের দত্ত অভয় চিহ্ন। অর্থাৎ যে মন্দিরের মাথায় এই 'খুন্তী' থাকিবে তাহা মুসলমান অত্যাচার এবং আক্রমণ হইতে একেবারে নিরাপদ। কথিত আছে বীরভদ্রকে গৌড়েশ্বর সর্বপ্রথম এই খুন্তী ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন এবং শ্যামসুন্দর মন্দিরের শিরেই ইহার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা।"[১০]

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় সমকালীন ইসলামী শাসকবর্গের উদারপন্থী মানবতা এবং সহানুভূতি। তৎসঙ্গে বীরভদ্রের আনুষ্ঠানিক সামাজিক ধর্মীয় কার্যকলাপও ধরা পড়ে। প্রাবন্ধিক নিত্যানন্দের স্বহস্ত লিখিত ভাগবৎ পুথি, শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি, মন্দির, দোলমঞ্চ, বসুধা-জাহ্নবার বিগ্রহ, নেড়া-নেড়ীর মেলায় স্থান-সম্পর্কে কতগুলি ফটোচিত্র উপস্থাপন করেছেন। শ্যামসুন্দরে মন্দিরটি দ্বিচাল বিশিষ্ট, সম্মুখ ভাগ প্রশস্ত একচাল বিশিষ্ট - সম্ভবত: ভক্ত সমাবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে মূল মন্দিরটির সঙ্গে একত্র নাটমন্দিরটির অবস্থান ছিল। শ্যামসুন্দরে দোল মঞ্চটি প্রশস্ত দ্বিচাল বিশিষ্ট দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে নির্মিত। বসুধা ও জাহ্নবা নিত্যানন্দের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের সূত্র ধরে বৈষ্ণবধর্মের ভাব-সাধন বিস্তারে যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাঁদের পরিচিতি প্রদানের উদ্দেশ্যে বসুধা-জাহ্নবীর মূর্ত্তি ও বিগ্রহকারে এক মন্দিরে স্থান পেয়েছিল। ১২০০ নেড়া অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ১৩০০ নেড়ী অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুনা বীরভদ্রের কৃপায় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ আদৃত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ সমাবেশের উপলক্ষে, নেড়া-নেড়ীর মেলা খড়দহে একদা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রসার লাভ করলেও, ক্রমান্বয়ে জনসমাবেশ, মেলা অস্তমিত। বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব ধর্মচর্চা খড়দহকে কেন্দ্র করে উৎকর্ষ সাধন করেছিল।

কালক্রমে, এইগুলি জরাজীর্ণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত। অথচ, জাতিভেদ প্রথা, ভেদাভেদ, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাগুলির বন্ধন খড়দহের মন্দিরের বিগ্রহ, পূজাঅর্চনাকে কেন্দ্র করে যুক্ত হয়েছিল। সমভাবাপন্ন ভক্তের সমাবেশে হিন্দু জাতি তার আধ্যাত্মিক গরিমাকে স্বর্গীয় মহিমায় উন্নীত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্তমানে বিস্তৃতিপ্রবণ বাঙালির চৈতন্যে প্রাবন্ধিকের খেদক্তি যথার্থ,-

> "হায় বাঙ্গালা জাতি! হায় বৈষ্ণব

> সমাজ! কত সভা-সমিতি ও মেলা বসিতেছে - কিন্তু তোমাদের সর্ব্বস্ব যে সকল পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহা আলখাইবার চেষ্টা করিবার জন্য একটি প্রাণীও দেখিতেছি না। কথায় দড়, কাজের বেলা কানাকড়ির দেশ-প্রীতিও তোমাদের দেখিতে পাই না''।[১১]

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে প্রাবন্ধিকের স্বদেশ প্রীতি এবং স্বদেশ ঐতিহ্যের অনুসন্ধান সম্পর্কে সদর্থক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নন্দদুলাল ও রাধাবল্লভজী

'নন্দদুলাল ও রাধাবল্লভজী' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বঙ্গদেশের বর্তমান পূজা পদ্ধতি ও ভক্তির ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষ করেছেন। তৎসঙ্গে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের 'নন্দদুলাল' 'শ্যামসুন্দর' এবং 'রাধাবল্লভজীর' - মূর্তি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণ করেছেন। প্রাবন্ধিকের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মের সংঘাতের স্বরূপ। ধর্মকেন্দ্রিক সংঘাত জনমানসে সচল থাকলেও, রুদ্ররাম শাক্ত হয়েও নারায়ন পূজার মধ্য দিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়কারী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে রুদ্ররাম খড়দহে বীরভদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। নিজ মনোবাসনা পূরণের অভিলাষ ব্যক্ত করেন বীরভদ্রের কাছে। বীরভদ্রের সহেগ সম্পর্কের সূত্র ধরে পূর্ববর্তী 'খড়দহ' প্রবন্ধে তাঁর উদার অপেক্ষাকৃত সাধু মনের পরিচয় পেয়েছি। এইসঙ্গে মুসলমান শাসককুলের বদনত্যায় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে। অভিমানী গৃহত্যাগী রুদ্ররাম জহুরীর সংস্পর্শে এসে সত্যিই জহর চিনেছিলেন। অলৌকিক প্রবাদ এবং জনশ্রুতি সাধু-সন্ত জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। রুদ্ররামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রুদ্ররামের অলৌকিক মাহাত্ম্য তথা কৃষ্ণপ্রীতি সম্পর্কে প্রাবন্ধিক লিখেছেন,-

> ''...তাঁহার দুঃশ্চয় তপস্যায় প্রীত হইয়া স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁহার আতিথ্য গ্রহন করেছিলেন এবং নবাবের নিকট হইতে প্রস্তর আনিয়া বিগ্রহ নির্মাণের উপদেশ দিয়াছিলেন। আরও একটি প্রবাদ এই যে নবাব দত্ত পাথরখানি গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া তিনি নিজে নদীর তীর দিয়া পদব্রজে বাড়ী ফিরিয়া দেখেন যে শিলাখণ্ড তাঁহার পৌঁছিবার পূর্বেই ''সাঁই

বোনার" ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে।"[১২]

লোকশ্রুতি সত্য-মিথ্যা যাই হোক না কেন, রুদ্ররামের প্রচেষ্টায় একদা সাঁইবোনা অঞ্চলে শঙ্খ-ঘন্টা-দীপারতিতে মুখরিত হয়ে নন্দদুলাল এবং রাধাবল্লভজী জীবন্ত বিগ্রহ রূপে জনমানসে অবস্থান করছিল। নিত্যাপূজা অর্চনাকে কেন্দ্র করে জনমানসে ভক্তিভাবুকতার দ্বারও ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল। রদ্ররামের পাণ্ডিত্যে, ভগবৎ চর্চায় মন্দির প্রাঙ্গণ নিত্য মুখরিত হত। অথচ কালের অগ্রগতিতে অতীত গৌরবের প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ 'ভক্তির শ্মশানক্ষেত্র' হয়ে উঠেছে। ভক্তি-স্নেহে, উপবাস-অনসনে আত্মতৃপ্তি তথা লৌকিক মুক্তির প্রচেষ্টায় নন্দদুলাল ও রাধাবল্লভজীর পদপ্রান্তে মুখরিত হলেও উনিশ শতকে এই মন্দিরগুলি জীর্ন-শীর্ন ভগ্নস্তূপে পরিণত। প্রাবন্ধিক গৌরবের সারবত্তাগুলি বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় সমস্ত প্রবন্ধে নির্বিশেষে জিজ্ঞাসা রেখেছেন অতীতকে সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে, প্রাচীন কিংবদন্তী সম্পর্কে যেমন জ্ঞানলাভ করা যায়, তেমনি ধর্মীয় অনুভূতির দিক থেকে এই মন্দিরগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক মানুষ যখন ক্রমশ নগরমুখী, জড় সম্পদের বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি কৌতূহলী; প্রাবন্ধিক তখন প্রাচীনের গরিমা, আধ্যাত্ম অনুভূতি আবিষ্কারে মগ্ন। প্রাবন্ধিক ঐতিহাসিক সত্যতা সংশয়মুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রবন্ধের মধ্যে নন্দদুলালের বিগ্রহ, রুদ্ররামের হস্তলিখিত পুথি, মন্দিরের স্থানবদলের চিত্র, দোলমন্দির, নন্দদুলালের গৃহ ইত্যাদির আলোকচিত্র প্রবন্ধ মধ্যে স্থান দিয়েছেন। হিন্দু ধর্মের জাগরণের দিনে হিন্দুধর্মের বিস্মৃত অধ্যায় উন্মোচনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন গৌরবের মুহূর্তগুলি তুলে ধরেছেন। প্রাবন্ধিক সেই সঙ্গে লিখেছেন,-

> "আমরা কলিকাতার কোন পুতিগন্ধময় গলির এক কোনে দেড় কাঠা জমি কিনিবার লালসায় সর্ব্বস্ব পন করিয়া বসিয়াছি। দেশের ঠাকুর বর্ষকালে ভগ্ন ছাদের জল ঠেলিয়া মাথা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। অথচ আমরা হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি।"[১৩]

আরাধ্যকে কষ্ট দিয়ে মানবভক্ত স্বাচ্ছন্দময় জীবনে স্বস্তি ও শান্তি পেতে পারে না - এ বক্তব্যও প্রাবন্ধিক জানিয়ে দেন। সমস্ত পবিত্র তীর্থভূমিগুলির প্রাচীন এবং বর্ত্তমান অবস্থা অবলোকন করে তুলনামূলকভাবে দুই সময়ের চালচিত্র উপস্থাপন করেছেন। নির্মমভাবে সনাতনী হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন, প্রাচীন মঠ-মন্দির, দেবতা-বিগ্রহগুলির গুরুত্ব সেকালে শুধুমাত্র আচারধর্মী অনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই সঙ্গে ভক্তের অতলান্ত আকুতি, প্রার্থনা এবং ঈশ্বর বোধের মাঙ্গলিক প্রচেষ্টা অনেক গভীর ছিল।

তথ্যসূত্র :

১. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.), বঙ্গবানী, ‘নদীয়ার টোল-একশত বৎসর পূর্বে’, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৮, কলকাতা, পৃ. ১১৭

২. তদেব, পৃ. ১১৭

৩. তদেব, ১১৮

৪. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.), বঙ্গবানী, ‘ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজার দল’, ১ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩২৯, কলকাতা, পৃ. ৪২৮

৫. তদেব, পৃ. ৪৩০

৬. তদেব, পৃ. ৪৩১

৭. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.) বঙ্গবানী, ‘দক্ষিণেশ্বর’, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩২৯, কলকাতা, পৃ. ৫৫০

৮. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.) বঙ্গবানী, দ্বিতীয়ার্ধ, ‘বেলুড়’, ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩২৯, পৃ. ১১৩

৯. তদেব, পৃ. ১১৩

১০. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.) বঙ্গবানী, দ্বিতীয়ার্ধ, ৩য় সংখ্যা, ১ম বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৯, পৃ. ৩৮৮

১১. তদেব, পৃ. ৩৯০

১২. দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পা.) বঙ্গবানী, দ্বিতীয়ার্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১ম বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২৯, পৃ. ১২

১৩. তদেব, পৃ. ১৩

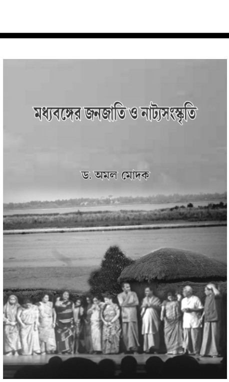

এবং প্রান্তিকের বই-

মধ্যবঙ্গের জনজাতি ও নাট্যসংস্কৃতি

ড. অমল মোদক

মূল্য : ১৬০ টাকা

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বর্গী হাঙ্গামার চিত্রায়ণ

সুস্মিতা ঘোষ*

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন, 'সাহিত্য ঠিক সমাজের আরশি নহে'-কারণ তাঁর মতে সাহিত্যে সমাজ অবিকল প্রতিবিম্বিত হয়না। সাহিত্যিক তাঁর সৃষ্টির রসদ চয়ন করেন পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল থেকেই; কিন্তু মনের কারখানা ঘরে', 'আগুনের জ্বলুনি' আর 'হাতুরির পিটুনিতে' সেই উপকরণ নবরূপ পায়। রচয়িতার জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা নবকলবরে আত্মপ্রকাশ করে স্রষ্টার সৃজনে। তথাপি বিপরীতে একথাও সত্য-'সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ; কারণ মানুষ, সমাজ নিরপেক্ষ নয়, সাহিত্যিক ও সমাজের উর্দ্ধে নন। সাহিত্য হল মানবজীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার ছন্দোবদ্ধ গান। সুতরাং সমাজ নামক যে অদৃশ্য অথচ অমোঘ শক্তি প্রতিনিয়ত মানবজীবনের চড়াই উতরাইকে করে চলেছে নিয়ন্ত্রণ, তাকে ব্রাত্য রেখে সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব। সাহিত্যে তাই সমাজের প্রতিবিম্বন অবশ্যম্ভাবী। দেশে দেশে কালে কালে যুগচিত্র অনিবার্য ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে সফল সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত দেবমহিমা জ্ঞাপক হলেও সমকালীন সমাজচিত্র সেখানেও প্রতীকায়িত হয়েছে সুচারুরূপে। 'দেশ ও কাল' ইংরাজিতে যাকে বলে time and space, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দুই প্রধান অবধারক হয়ে উঠেছে। যেখানে দেবতাই ছিল প্রধান লক্ষ্য সেখানে কখন লক্ষ্যকে ছেড়ে উপলক্ষ্য মানব ও মানবসমাজই হয়ে উঠেছে প্রধান উপজীব্য। রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক - সামাজিক উপপ্লবের ও মানবজীবনের উপর তার নিদারুণ অভিঘাতের জ্বলন্ত দলিল হয়ে উঠেছে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যসম্ভার।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটি বড়ই জটিল ও অগ্নিগর্ভ। এই শতাব্দী ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় রাজশক্তির ভগ্নদশা থেকে সূচীত হয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে পৌঁছে গেছে একেবারে ঔপনিবেশিক রাজত্বের দোরগোড়ায়। অষ্টাদশ শতকের একেবারে প্রারম্ভেই, ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর অকর্মণ্য সম্রাটদের দুর্বলতা ও আত্মকলহে পরাক্রমশালী মুঘল সাম্রাজ্য চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। এই সুযোগে বাংলার সুবাদাররাও স্বাধীন ভাবে বাংলা সুবা শাসন করতে থাকেন ও বাংলায় নবাবী আমলের সূচনা ঘটে। শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলার প্রথম নবাব অপুত্রক মুর্শিদকুলী খাঁ-এর মৃত্যু হলে মসনদে বসেন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন। তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ন হওয়ায় তাঁর প্রধান পরামর্শদাতারা যেমন আলীবর্দি, জগৎ শেঠ, ফতে চাঁদ, হাজী আহমদ, রায়ান আলস চাঁদ এঁরাই প্রকারান্তরে দেশ শাসন

*সহশিক্ষিকা-বাংলা বিভাগ, বাগবাজার মালটিপারপাস গার্লস স্কুল।

করতেন। ১৭৩৯ খ্রিঃ এ নবাব সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁর পুত্র অযোগ্য ও অপদার্থ সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে বসেন। এইসময় আলীবর্দি সসৈন্য পাটনা থেকে মুর্শিদাবাদ হাজির হল ও পিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ কে পরাজিত করে রাজভক্ত অধিকার করে নেন। আলীবর্দি বিপুল পরিমান উৎকোচের দ্বারা দিল্লীর বাদশাহকে বশীভূত করে বাদশাহী সনদ ও বড় অঙ্কের আর্থিক নজরানা পাবার পরই বর্গীরা দমিত হয়। কিন্তু এই আঘাত বাংলার অর্থনীতিকে সার্বিকভাবে পঙ্গু করে রেখে যায়। বৃদ্ধ আলীবর্দির মৃত্যুর পর নবাব হন তাঁর ২০ বছর বয়সী দৌহিক সিরাজউদ্দলা। সিরাজের অপরিণামদর্শী ও উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে জগৎ শেঠ, মীরজাফর, রাজ বল্লভ, রায় দুর্লভ, উমি চাঁদ, ইয়ার লতিফ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সিরাজকে অপসারনের জন্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকেন। সুযোগসন্ধানী ক্লাইভ ও এতে যোগ দেন। অবশেষে ভাগীরথীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয় এবং নবাব বাহিনীর যথাযোগ্য দক্ষতা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সিরাজের পরাজয় ঘটে। পলাশীর যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে বাংলা তথা ভারতের ভাগ্যাকাশে পরাধীনতার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কালপর্ব বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়পর্ব। একদিকে মুঘল রাজশক্তির পতন অপরদিকে ইংরেজ শক্তির উত্থান-এই বিশৃঙ্খল রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে মারাঠা শক্তি তৎপর হয় সর্বভারতীয় আধিপত্য বিস্তারে। লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগ- গণহত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং চৌথ ও সরদেশমুখীর দাবী আদায় করার চেষ্টা চালিয়ে সারাদেশব্যাপী এক আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল মারাঠারা। বঙ্গদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। নবাব আলীবর্দির আমলে ১৭৪২ খ্রিঃ থেকে ১৭৫১ খ্রিঃ পর্যন্ত বারে বারে ঘটেছে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদের আক্রমণ-যা বঙ্গদেশে 'বর্গী হাঙ্গামা' নামে পরিচিত। এই 'বর্গী' শব্দের উৎসব খুঁজতে গিয়ে ডঃ অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

''নিম্নতম মানের মারাঠা সৈন্যদের 'বারগীর' শব্দে অভিহিত করা হত। অত্যন্ত নিম্ন মানের বেতনে এদের কাজে নিযুক্ত করা হত বলে, যুদ্ধের সময় এদের লুণ্ঠন ও ধর্ষণের অবাধ অধিকার দেওয়া হত। আর এরা এই সুযোগ লাভ করবার জন্য সব সময়ে সরকারী বাহিনীর পুরোভাগে থাকত। বাংলায় এই সৈন্যদের উৎপাত বা হাঙ্গামাই 'বর্গীয় হাঙ্গামা নামে পরিচিত।"[১]

ইতিহাস থেকে জানতে পারি শিবাজী পৌত্র শাহুজী ১৭০৮ খ্রিঃ সাতারার রাজা হন এবং বিশ্বনাথকে তাঁর পেশোয়া পদে নিযুক্ত করেন। বিশ্বনাথ ১৭১৯ খ্রিঃ দিল্লীর সম্রাট ফারুকশিয়রের কাছ থেকে শাহুজীর নামে ফরমান নিয়ে আসেন এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অনুমতি লাভ করেন। ক্রমে ক্রমে মারাঠা সাম্রাজ্যে ছোট ছোট আঞ্চলিক শক্তিকেন্দ্রে এক এক জন জায়গীরদার শক্তিমান হয়ে উঠতে থাকেন। তারা মারাঠা রাজধানী সাতারার প্রধানের প্রতি যৌথ ও সরদেশমুখী প্রদান ও সামরিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ নিজ এলাকার অধিপতি হয়ে উঠেছিলেন। নাগপুরের

রঘুজী ভোঁসলেও ছিলেন এমনি একজন প্রবল পরাক্রম সেনানায়ক যার এলাকা ছিল বাংলা ও পূর্বাঞ্চল। তিনি শাহুজীর বিশেষ সমীহের পাত্র ছিলেন। এদিকে বাংলার মসনদে বসেই আলীবর্দি খাঁ এক কোটি টাকা ও বহুমূল্যবান রত্নরাজি নজরানা দিয়ে দিল্লীশ্বরের নিকট হতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসক হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করেন। এরপর প্রায় দুই বৎসর তিনি দিল্লীতে কোনও রাজস্ব প্রেরণ করেন নি। ফলে অসন্তুষ্ট বাদশাহ মুরাদ খাঁ নামক এক কর্মচারীর মাধ্যমে বকেয়া রাজস্ব দাবী করে পাঠান। কিন্তু আলীবর্দি মুরাদ খাঁ কে উৎকোচে বশীভূত করে মাত্র মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা ও কিছু রত্নাদি দিয়ে বিদায় জানান। এর প্রত্যুত্তর হিসাবে বাদশাহ সুকৌশলে বাংলার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। ১৭৪০ খ্রিঃ যখন মারাঠারা বাংলার যৌথ দাবী করে তখন তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা থেকে ৩৫ লক্ষ টাকার যৌথ আদায়ের অনুমতি দিয়ে দেন তাদের। শাহুজী এই চৌথ আদায়ের ভার দিলেন নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলেকে। রঘুজী তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ভাস্কর পণ্ডিতের সহায়তায় বাংলা বিহার উড়িষ্যায় অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। রঘুজীর সঙ্গে যোগ দান করলেন আলীবর্দির এক ক্ষুব্ধ কর্মচারী। একইসঙ্গে দিল্লীর বাদশাহ এই যৌথ আদায়ের সংবাদ জানিয়ে দিলেন পেশোয়া বালাজী বাজিরাওকে। ফলে দুই বিবদমান লুণ্ঠনকারী মারাঠা বাহিনীই বাদশাহী অধিকার নিয়ে এল বাংলায় যৌথ আদায় করতে। এই যৌথ আক্রমণের ভয়াবহতা শুধু বাংলার জনমানসেই নয় বঙ্গীয় অর্থনীতিতেও সুদূরপ্রসারী অভিঘাত রেখে দিয়ে গেছিল।

বাংলার বুকে বর্গী আক্রমণ নারকীয় অত্যাচারের যে চিহ্ন রেখে গিয়েছিল সেই আঘাতের রক্তক্ষরণ ঘটেছে সমকালীন বাংলাসাহিত্যেও। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তবে বর্গীহাঙ্গামার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় গঙ্গারাম দত্ত রচিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্যে। কবি গঙ্গারামের বর্ণনা শুনে সততই মনে হয় এ নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এছাড়া আরেক অজ্ঞাতপরিচয় কবি রচিত 'মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা' থেকেও বঙ্গদেশে বর্গী হাঙ্গামার ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় কাব্য গুলিতে কবিরা দেহমাহাত্ম্য কীর্তনের সমান্তরালে নিজনিজ আত্মপরিচয় ও প্রদান করেছেন। সেই সূত্রে কবিদের সমসাময়িক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক বহু প্রসঙ্গ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে কাব্যে। যেমন কবিকঙ্কন মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ বর্ণনা' অংশটি সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক-সমাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চালচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে উঠেছে। তবে এসবই এসেছে কাব্যকাহিনী বর্ণনার স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। বাংলা মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রই বোধহয় প্রথম সচেতন ভাবে দেশীয় ইতিহাসকে কাব্যদেহে সংযুক্ত করার প্রয়াস করেন। খুব সম্ভব ফারসী শিক্ষিত ভারতচন্দ্র, আল বিরুণী, ফরিস্তা, মীনহাজুদ্দীন, মীরজা প্রমুখ ফারসী ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সমসাময়িক ইতিহাস কে কাব্যে নথিভুক্ত করার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

১৭৫২ খ্রিঃ ভারতচন্দ্র যখন কাব্য রচনা করেছিলেন তখন বাংলার মানুষের মনে বর্গী হামলার ভয়াবহ স্মৃতি সতেজ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে গ্রন্থ সূচনা অংশে তাই বর্গী আক্রমণের

প্রসঙ্গ এসেছে সমকালীন বাস্তব বর্ণনার সূত্র ধরেই। কাহিনীর শুরুতেই আমরা দেখি আলীবর্দি শিবভূমি উড়িষ্যা আক্রমণ করলে শিব অনুচর নন্দী, যবনদের সংহার করার জন্য ত্রিশূল হানতে উদ্যত হলেন। কিন্তু শিব তাঁকে নিরস্ত্র করলেন —

''আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়।।''[২]

নন্দীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত বর্গীরাজা ক্রুদ্ধ হয়ে অপনিত বর্বর সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায়। অবাক লাগে ভাবতে যে ভারতচন্দ্রের মত বাস্তবসচেতন কবি কেন বর্গীহাঙ্গামার মত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অযথা পৌরাণিকতার মোড়কে ঢাকতে গেলেন? গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্যেও আমরা এই একই প্রবণতা লক্ষ্য করি। তবে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বর্গীহাঙ্গামা সম্পর্কিত যে স্বপ্ন কয়েক পঙক্তি সংযুক্ত হয়েছে তাতে বর্গী উপদ্রুত বাংলার বাস্তব চিত্রই প্রতীকায়িত হয়েছে।

'বর্গী মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি,
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।
লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল,
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।'[৩]

কাটোয়ায় বর্গীরা বিভিন্ন ঘাট থেকে নৌকা লুঠপাট করে নিয়ে এসেছিল গঙ্গাবক্ষে সেতুবন্ধনের জন্যে। নদীর উপরে নৌকা গুলিকে পরপর সজ্জিত করে বাঁশ-ঘাস-মাটি বিছিয়ে ঘোড়া চলাচলের সুগম পথ নির্মাণ হয়েছিল। নদী পার হয়ে চলেছিল অবাধ লুণ্ঠন। এই ঘটনার সাক্ষ্য গঙ্গরাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' এও পাই—

'গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস।
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন ফরাস।।
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইছাএ পাইছাএ মাটী ফেলিতে লাগিল।
মাটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া-জাএ তার উপর।।'[৪]

বর্গীরা লুঠপাট চালিয়ে বাংলার মানুষকে এক প্রকার নিঃস্ব করে রেখে গিয়েছিল। দরিদ্র কৃষক প্রজা তো বটেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গরাও তাঁদের ধনসম্পত্তি বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। বাংলার অর্থব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে দিয়েছিল বর্গী আক্রমণ। শুধু আর্থিক লুণ্ঠন নয়, চলেছিল নারীধর্ষণ-নির্যাতন-গনহত্যা। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, শস্য পুড়িয়ে, বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করে দিয়ে গেছিল মারাঠারা।

'কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি,
লুটিয়া লইল ধন ঝিউরি বহুড়ী।

পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল,
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল।
লুটিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী,
সেই পাশে তিন সুবা হইল নারকী।।'[৫]

বর্গী উপদ্রুত বাংলার হতশ্রী অবস্থার যে বাস্তবসম্মত বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা তাঁর ঐতিহাসিক কালচেতনারই পরিচয় দেয়।

বাংলায় বর্গীহাঙ্গামার প্রত্যক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রায়ণ আমরা দেখি গঙ্গরাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এ। তবে কবিও কাব্যসূচনায় ভারতচন্দ্রের মতই পৌরাণিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন। পাপে পরিপূর্ণ ধরিত্রী হতে মুক্তিলাভের জন্যে পৃথিবী স্তব করলে ব্রহ্মা পৃথিবীকে নিয়ে যান শিবের কাছে। শিব এর প্রতিকারের উপায় স্থির করে নন্দীকে আদেশ দিলে নন্দী শাহরাজার দেহে অধিষ্ঠিত হলেন। কাব্যের এই স্বল্পপরিসর অংশই পৌরাণিক আবহমণ্ডিত। এরপর থেকে কবি ইতিহাসকেই অনুগত ভাবে অনুসরণ করেছেন। গঙ্গারামের বর্ণনা থেকে আমরা জ্ঞাত হই ১৭৪২ খ্রিঃ এর ১৯শে বৈশাখ সংঘর্ষ শুরু হয়।

'বৈশাখের উনিশা যাত্র বর্গী আইলা তায়
মহা আনন্দিত হৈয়া মনে।'[৬]

আলীবর্দি তখন বিদ্রোহ দমন করে বাংলায় ফিরেছেন। মারাঠারা চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বিহার অতিক্রম করে বর্ধমানে প্রবেশ করে, চলার পথে চলে অবাধ গণহত্যা ও লুঠপাঠ। ভাস্করপণ্ডিত বর্ধমানের রানীদিঘীর কাছে অতর্কিতে নবাবের শিবির অবরোধ করেন —

বীরভুঁই বামে থুইয়া গোয়ালাভুঁইর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বর্ধমানে।[৭]

নবাব তাঁর পারিষদদের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে স্থির করলেন চৌথ দিতে যে অর্থ ব্যয় করা হবে তা সিপাহীদের দেওয়া হোক, বিনিময়ে তারাই যুদ্ধ করে বর্গী বিতাড়ন করবে। কিন্তু রণনিপুণ, সুকৌশলী অপণিত মারাঠা সৈন্যর বিরুদ্ধে নবাবের সেনারা কোনরকম সাফল্যই অর্জন করতে পারলনা। উপরন্তু বর্গীরা লুঠপাঠ শুরু করল। নবাবের শিবিরে রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিল। সাতদিন যাবত বর্ধমান শহর অবরুদ্ধ হয়ে রইল। বর্গীদের ভয়ে সাধারণ মানুষ ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ করল। খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ ও ক্রমে দুর্লভ হয়ে গেল। দরিদ্রেরা অনাহারে দিন কাটাতে লাগল। স্বয়ং নবাব কলার বীজ খেয়ে কোনরকমে প্রাণ ধারন করলেন। গঙ্গরাম এই পরিস্থিতির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন —

একদিন দুইদিন করি সাতদিন হইল
চতুর্দিকে বরণীতে রসদ বন্ধ কৈল।।
মুদী বানিঞা যত বার হৈতে নারে

লুতে কাটে মারে ছামুতে পাএ যারে।।
বরগী তরাসে কেহ বাহির না হএ
চতুর্দিকে বরগীর তরে রসদ না মিলএ।
কলার আইঠা যত আনিল তুলিয়া
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া।
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল।
বিষম বিপত্ত্য বড় বিপরীত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল।[৮]

চোদ্দ দিন এভাবে সহ্য করার পর নবাব সেনাপতিকে শহর অবরোধ মুক্ত করার আদেশ দিলেন। নবাবের পশ্চাদরক্ষী সেনাপতি মোসাহেব খাঁ এর তৎপরতায় নবাব কাটোয়ায় পৌঁছলেন। মারাঠারা দু ধারে গ্রাম লুটতে লুটতে নবাবের সেনাবাহিনীর অনুসরণ করল। বর্ধমান শহর থেকে কাটোয়া এই পথ মধ্যস্থ গ্রাম গুলিতেই অত্যাচার হয়েছিল সর্বাধিক। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সুবর্ণবনিক, গন্ধবনিক, কাঁসারু, কর্মকার, তাঁতি, জেলে সকলেই নিজ নিজ বৃত্তি কর্মের সরঞ্জাম নিয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করে। অন্তঃপুরবাসী স্ত্রীলোকেরাও আব্রু ঘুচিয়ে প্রাণ ভয়ে পথে নেমে পড়ে। গ্রামত্যাগী উদ্বাস্ত এই জনস্রোতের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন গঙ্গরাম।

ব্রাহ্মণ পলাএ পুথির ভার লইয়া
সোনার বাইনা পলায় কত নিক্তি-হড়পি লইয়া।
গন্ধবনিক পলাএ দোকান লইয়া যত
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত।।
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক-নড়ি
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল-দড়ি।।
ভালমানুষের স্ত্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে
বরগীর পলানে পেটারি লইল সাথে।[৯]

সবচেয়ে করুণ অবস্থার সম্মুখীন হয় সন্তানসম্ভবা নারীরা। সামর্থ্য না থাকলেও বর্গীর ত্রাণে তাদের পলায়ন করতে হয় —

"গর্ভবতি নারি জত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পাইয়া প্রসবিছে পথে।।"[১০]

যদিও অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারিত হয়ে নয়, জনপদবাসীরা লোকালয় ছেড়ে পলায়ন করেছে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েও। এ প্রসঙ্গে কবি কৌতুক করে বলেছেন —

'দস বিস লোক য়াইসা পথে ভারাইলা।

তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা।।
তারা সব বোলে মোরা চক্ষে দেখি লাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই।”[১১]

তবে সত্যই অত্যাচার হয়েছিল নারকীয়। গঙ্গারামের লেখনিতে সেই অত্যাচারের বর্ণনা পাঠ করে শিহরিত হয়ে উঠতে হয় —

‘এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া।।
কাহুকে বাঁধে বরগি দিআ পিঠ মোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া।।
রূপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।।
কাহুকে ধরিয়া বরগি পথইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রাণ জাএ।
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে।।’[১২]

নারীদের উপর বর্গীদের অত্যাচারের মাত্রা ছিল অসহনীয়। গঙ্গারাম স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন সে ইতিহাসও—

‘ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইয়া জাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দাড়ি বাঁধি দেয় তার গলা এ।।
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভয়ে ত্রাহি শব্দ করে।।
এইমতে বরগি কত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া।।’[১৩]

গঙ্গারাম দত্ত অত্যন্ত ইতিহাস সচেতন হয়েই বর্গী হাঙ্গামার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর কাব্যে। কোন স্থান থেকে কোথায় বর্গীরা গিয়েছিল সেই ভৌগোলিক মানচিত্র অর্থাৎ একদিকে বর্ধমান-কাটোয়া-মুর্শিদাবাদ, অন্যদিকে হুগলী-নদিয়া-পলাশী এই পথরেখা অনুযায়ী বর্গীদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়েছেন। কবি বলেছেন —

‘তবে কোন কোন গ্রাম বরগী দিলা পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম সুন মন দিয়া।।’[১৪]

‘মহারাষ্ট্র পুরাণ’ থেকে জানা যায় একদিক থেকে চন্দ্রকোনা, মেদিনীপুর, দিগনগর, ক্ষীরপাই, বর্ধমান শহর পুড়িয়ে দিয়েছিল বর্গীরা। অন্য দিক থেকে নিমগাছি, সেরগা, নিসুইলা, চণ্ডীপুর, শ্যামপুর পাড় হয়ে বর্ধমান শহর কে তারা চারিদিক থেকে পুড়িয়ে

দিয়েছিল। বর্ধমান শহর কে ভস্মীভূত করে বর্গীরা হুগলী বন্দরে আসে কিন্তু—

'সের খাঁ ফৌজদার তবে হুগলীতে ছিল।
তাহার কারনে বরগী লুটিতে নারিল।।'[১৫]

গঙ্গারামের কাব্যে দেখি বর্ধমানকে কেন্দ্রে রেখে বর্গীরা কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, নদীয়া; নৈহাটি, উদ্ধারনপুর; আবার অন্যদিকে বীরভূম, বিষ্ণুপুর, প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করেছিল। ভাগিরথী অতিক্রম করে বর্গীরা মুর্শিদাবাদ গিয়ে পৌঁছায়। রাজধানী লুণ্ঠিত হয় অবাধে। নবাবের দুই সেনাপতি হাজি আহমদ ও নোয়াজিস মহম্মদ অতি কষ্টে নবাবের প্রাসাদ রক্ষা করলেও, বিত্তবান কোনও ব্যক্তিই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হলেন না। প্রভাবশালী ব্যক্তি জগৎ শেঠের প্রাসাদ লুঠ করে বর্গীরা প্রায় আড়াই কোটি টাকা পেয়েছিল। ইংরেজদের বেশ কতগুলি নৌকা লুঠপাঠ করে নিয়ে গিয়েছিল তারা। এছাড়া নগদ টাকা যেখানে যা পেল সব ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেল —

'আরকাট টাকা জত ঘরে ছিল।
গোড়াড় খুরচি ভইরা সব টাকা নিল।।'[১৬]

পালাবার পথে বর্গীরা কিছু ধনরত্ন পথে ছড়িয়ে দিয়ে জনগনকে বিভ্রান্ত করে গঙ্গা পার হয়ে যায়। ভাগীরথী পার হয়ে ভাস্কর কাটোয়ায় শিবির গড়লেন ও নতুন উদ্যমে সৈন্যসংগঠনে মন দিলেন। কিন্তু বর্ষা এসে যাওয়ায় লুঠতরাজ এ বাধা পড়ে যায়। ফলে ধূর্ত ভাস্কর পণ্ডিত বন্ধুত্বপূর্ণ পন্থার চৌথ আদায় করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আশ্বিন মাস আসলে বর্গী সেনাপতি মহা সমারোহে দশভুজার অর্চনার আয়োজন করতে থাকেন। এই ধর্মীয় সংস্কৃতির সূত্র ধরে হিন্দু জমিদারদের সঙ্গেও ভাস্কর হাতে হাতে মেলাবার মনস্থ্ করেন। কাটোয়াতে ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্গা পূজার সমারোহ যখন তুঙ্গে তখনি আলীবর্দি তাঁর পদাতিক সেনাবাহিনী, কামান-অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বারোহী সেনা নিয়ে কাটোয়ার দিকে অভিযান শুরু করলেন। নবাব এবং তাঁর সঙ্গীরা মনস্থির করলেন যে পূজা সাঙ্গ হওয়ার পূর্বেই ভাস্করকে হত্যা করতে হবে। গভীর রাতে নিঃশব্দে নবাবী ফৌজ নৌকা করে অজয় নদ অতিক্রম করতে লাগল। কিন্তু অকস্মাৎ একটি নৌকার তলা ফেঁসে যাওয়াতে হট্টগোল শুরু হয় বর্গীরা সতর্ক হয়ে পড়ে। মায়ের পূজা অসমাপ্ত রেখেই অষ্টমী নিশিতে ভাস্কর পলায়ন করেন। কিছুদিন পর বর্গীরা পুনরায় ফিরে এসে হত্যা ও লুণ্ঠন সীমা অতিক্রম করে। ভাস্কর তাঁর সেনাবাহিনীকে আদেশ দেন।

তলোয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা।।'[১৭]

আলীবর্দি এবার সুকৌশলে ভাস্করকে পরাস্ত করার পরিকল্পনায় রত হলেন। মানকর পরগনায় নবাব শিবির স্থাপন করলেন এবং আপোষ রফার জন্য ভাস্করকে আহ্বান জানালেন। গঙ্গারামের লেখনীতে পাই —

'দুইরায়ি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।

ভাস্করকে লইয়া আইন নবাবের স্থানে।।
বিধাতা বিপত্য হইল বুথ্য গুইলা গেল।।
হাতিয়ার খুইয়া আইসা নবাবকে মিলিন।।'[১৮]

ভাস্করের সঙ্গে সামান্য কথোপকথন হওয়ার পর আলীবর্দি বললেন —

'খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি।'[১৯]

নবাবের বিলম্ব দেখে ভাস্করপণ্ডিত ও স্নান-পূজা সমাপ্ত করার জন্য উঠে পড়েন। সেই সময়ই নবাব দরবারে লুক্কায়িত সেনারা অতর্কিতে আক্রমণ করে ভাস্কর ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের হত্যা করে —

'জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তলআর খুলিয়া তখন মারিলেক তাখে।[২০]

এরপর অতি সংক্ষেপে কাহিনী বর্ণনা করে গঙ্গারাম কাব্যের শেষ পঙক্তি দুটি সংযুক্ত করেন-

'মানকরা মোকাসে জদি ভাস্কর মইল।
মনসুরা দউরাইয়া করি গঙ্গারামে কইল।।'[২১]

ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর বেশ কয়েকবছর বর্গীরা অত্যাচার, লুণ্ঠন বন্ধ রাখে। কিন্তু পুনরায় শুরু হয় হাঙ্গামা। শেষপর্যন্ত নবাব আলীবর্দি উড়িষ্যা প্রদেশ ও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌখ এর বিনিময়ে বাংলায় বর্গী হাঙ্গামার অবসান ঘটান।

বাংলায় বর্গী আক্রমণের বিবরণ সম্বলিত এই সাহিত্যিক নিদর্শনগুলি সমগ্র রাঢ়-বঙ্গ সম্পর্কেই বাস্তবভাবে সত্য। বাংলায় বর্গীরা যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল তা বাংলার জনজীবনকে করে দিয়েছিল স্তব্ধ। ভস্মীভূত হয়েছিল অজয়-ময়ূরাক্ষী তীরবর্তী সম্মৃদ্ধ হাট-বাজার-পঞ্জ গুলি। রাজনগর থেকে মুর্শিদাবাদ বা বর্ধমান অর্থাৎ বর্গীদের অভিযান পথের দুপাশের গ্রাম গুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বর্গী অত্যাচারের চরম তীব্রতা তেমন ফুটে ওঠেনি। মনে হয়, কৃষ্ণনগরে বর্গী হাঙ্গামা নারকীয় রূপ ধারন করেনি। বরং একথা অনস্বীকার্য গঙ্গারামের কাব্যে যে বীভৎসতা ফুটেছে তাই বর্গী হাঙ্গামার বাস্তব সত্য। গঙ্গারাম কাব্যে যে ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন যে পরস্পরায় কাহিনী বর্ণনা করেছেন তার সাথে প্রকৃত ইতিহাসের বিশেষ অনৈক্য নেই। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের অবয়বে সমসাময়িক ইতিহাস কে সন্নিবিষ্ট করে অভিনবত্বের পরিচয় দিলেও গঙ্গারাম তুলনামূলক ভাবে অনেক সংহত ও বাস্তবনিষ্ঠ ইতিহাসবোধের পরিচয় দিয়েছেন; তবে শুধুমাত্র 'অন্নদামঙ্গল' অথবা 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' নয়, অজ্ঞাত পরিচয় কবি কর্তৃক লিখিত 'মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কবিতা'র পুঁথি থেকেও বর্গীদের বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশ, জেলায় জেলায় নারকীয় অভিযান, ইংরেজ সহ সমগ্র বঙ্গবাসীর পলায়ন, মীর হাবিবের বর্গীদের পক্ষে যোগদান ইত্যাদি বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্গী আক্রমণ বাংলার বুকে

এমনই বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল যে বাংলা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামেরও প্রতিটি কোনে আবালবৃদ্ধবনিতায় মুখে আতঙ্কের সঙ্গে বর্গীদের নাম উচ্চারিত হত। শুধুমাত্র শিষ্ট সাহিত্যেই নয়, লোকগান-ছড়া- গাথা ঘুমপাড়ানি পানেও জুড়ে বসেছে বর্গীরা। আজ তথ্য প্রযুক্তির যুগেও অধিকাংশ বাঙ্গালী এই দুই পঙক্তির সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত —

ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে।

যদিও আজ তা লোকসাহিত্যের সামগ্রী হিসাবেই সমাদৃত। বর্গী আক্রমণের ভয়াবহতা আর তাতে নেই। বর্গীরা বিতাড়িত হওয়ার পর ধীরে ধীরে সময়ের স্রোতে মুছে যেতে থাকে বর্গী হামলার ক্ষতচিহ্ন গুলি; জেগে ওঠে জনজীবন; তবে এই আক্রমণ বাংলার অর্থনীতিতে যে ধাক্কা দিয়েছিল তা অদূর ভবিষ্যতেই ডেকে এনেছিল ছিয়াত্তরের মর্মান্তিক মন্বন্তর।

সূত্র নির্দেশ :

১। ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ' প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ২।
২। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-গ্রন্থ সূচনা-উদ্ধত-'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' (প্রথম ভাগ) সম্পাদন, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাঘ - ১০৪৯, পৃ. ১৬।
৩। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ সূচনা — উদ্ধৃত — 'ভারচন্দ্র গ্রন্থাবলী' (প্রথম ভাগ), সম্পাদনা শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাঘ - ১০৪৯, পৃ-১৬।
৪। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায়ের 'আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ' প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ২৫।
৫। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-গ্রন্থ সূচনা—'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ), সম্পাদনা শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সজনীকান্তন্তদাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মাঘ-১৩৪৯, পৃ. ১৬।
৬। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৫১।
৭। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৫১।
৮। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৫২।
৯। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৫৩।

১০। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ১৮।
১১। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৪৫৩।
১২। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ১৯।
১৩। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ১৯।
১৪। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-'অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনপাঠ ও পুনর্বিবেচনা', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ১৭৪।
১৫। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-'অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও পুনবিবেচনা', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ১৭৪।
১৬। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ১৫।
১৭। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-'অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও পুনর্বিবেচনা', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ১৭৭।
১৮। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ৩১।
১৯। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ৩১।
২০। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ৩১।
২১। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' — উদ্ধৃত-ডঃ অনিমা মুখোপাধ্যায় 'আঠারো শতকের বাংলা পুথিঁতে ইতিহাস প্রসঙ্গ', প্রথম সংস্করণ, সাহিত্যলোক প্রকাশনী, পৃ. ৩২।

আমার অনুভবে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'নীলঘূর্ণি'র দয়িতা

সুতপা মুখার্জী*

দয়িতা আধুনিক যুগের আত্মসচেতন, ব্যক্তিময়ী — সাহসী বুদ্ধিমতী নারী। এক সুখী পরিবারের আদরের কন্যা সে। ভাই বুম্বা তার মনের খবর না পেলেও প্রিয় দিদিকে ভালোবাসে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ছাত্রী। দয়িতা হোস্টেলের আর পাঁচটা মেয়ের মত বোধিসত্ত্ব স্যারকে শ্রদ্ধা করত। তবে তার শ্রদ্ধার সঙ্গে আরো কিছু মিশে ছিল, তার স্পষ্ট রূপ সে নিজেও জানত না। এম. এস. সি. ক্লাস শেষ হবার পর সে গেটের বাইরে নীরবে অপেক্ষা করত বোধিসত্ত্বের বাড়ি ফেরার পথে একটু কথা বলা বা একটু সান্নিধ্যের জন্য। বোধিসত্ত্ব উদাসীন, নির্বিকার, বিজ্ঞানচর্চার নিবেদিত প্রাণ এক আকর্ষণীয় পুরুষ। 'ব্ল্যাক হোল' তত্ত্বের অনুসন্ধানে দেশ বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। দয়িতার ভালোলাগত তার পড়ানো, কথা বলা ও হাসি। এমনকি বিজ্ঞানের ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বকে নীরবে শুধু চোখে দেখার মধ্যে দয়িতা খুঁজে পেত অনির্বচনীয় আনন্দ। বোধিসত্ত্ব তাকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারনার কথা বলতো, দয়িতা বোঝার চেষ্টা না করে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো, সে জানত বোধিসত্ত্ব তার কাছে দূর আকাশের সূর্য, যাকে সে কোন দিন পাবে না। ভালোলাগা ধীরে ধীরে কখন যেন ভালোবাসার রূপ নিল। বোধিসত্ত্বের অজান্তে দয়িতা অদ্ভূত এক নীরব ভালোবাসার মোহে আবদ্ধ হলো। সে জানে স্যার বয়স্ক, বিবাহিত একমাত্র পুত্র সন্তান বাবুয়া ও সুন্দরী স্ত্রী রাখীকে নিয়ে সুখের সংসার। সেখানে তার স্থান কোথায়? তবুও ওই দেখার আনন্দটুকু পাবার জন্য সে পাগলের মতো বন্ধুদের কটূক্তি অগ্রাহ্য করে ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে থাকত। বোধিসত্ত্বের স্ত্রী রাখী বাবার মৃত্যুর জন্য বেশ কিছুদিন বাবার বাড়িতে রইল। দয়িতার বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখেই বোধিসত্ত্ব তাকে বাড়িতে আসতে বলল। তখনই বোধিসত্ত্ব অনুভব করল অসম বয়সী দয়িতার উদগ্র প্রেম, প্রথমে দয়িতাকে সে বোঝাতে চাইলো, তারপর এক অদ্ভূত জৈবিক আকাঙ্ক্ষায় দয়িতা তার সঙ্গী বা নর্মসহচরী হয়ে উঠল। বোধিসত্ত্বের ওই বয়সেও দেহের তীব্র ক্ষুধা, দীর্ঘ, ব্যবহারের ফলে রাখী সঙ্গে দেহমিলনে বোধিসত্ত্ব উন্মাদনা পেত না। দয়িতা তাকে আকাঙ্ক্ষিত দেহ সুখ দিতে পারতো। দয়িতা যৌবন দীপ্ত শরীর বোধিসত্ত্ব উন্মত্তের মতো খেলা করে, দয়িতা সেই সুখ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করে সুখ পায়। রাখা তখনোও জানে না যে দয়িতা তার স্বামীর জীবনে একটা জায়গা করে নিয়েছে। দয়িতা দেহ - মন - প্রাণ দিয়ে বোধিসত্ত্বকে ভালো বাসে। বোধিসত্ত্ব তার কাছে এক অপার বিস্ময়, যার স্বামী সে খুঁজে

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়।

পায়না বলেই দয়িতা, বার বার ফিরে আসে বোধি সত্ত্বের সান্নিধ্যে। দয়িতার জীবনে কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু একটা অশান্ত ঘূর্ণি তার জীবনটাকে তছনছ করে দিল।

দয়িতার বিয়ে ঠিক হয় সৌমিকের সঙ্গে। দয়িতা দুঃসাহসী তাই বিয়ে ভাঙ্গার জন্য সে নিজে হাজির হয় অপরিচিত সৌমিকের ব্যাঙ্কে। কোনো ভূমিকা না করেই সে জানায় সৌমিককে বিয়ে করতে পারবে না কারণ সে ভালোবাসে অন্য এক বয়স্ক বিবাহিত পুরুষকে শিক্ষিত দুঃসাহসী বুদ্ধিমতী দয়িতার এই নিজস্বতা সৌমিকের জীবনে এক অদ্ভূত প্রেমের জন্ম দেয়। দয়িতা বাড়ি গিয়ে বাবাকে জানায় সে সৌমিককে বিয়ে করবে না, সে অন্য কাউকে ভালোবাসে। বাবা-মা বিয়েতে মত দেয়, পাত্রের পরিচয় জানতে চায়। দয়িতা জানায় সে ভালোবাসে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বোধিসত্ত্ব মজুমদারকে - যে বিবাহিত, পিতা ও বয়স্ক এক পুরুষ। দয়িতা জানে তার এই প্রেম বিবাহে পরিণতি পাবে না, তবু সে বোধিসত্ত্বকেই ভালোবাসবে সারাজীবন। বাবা-মা-ভাই একথা মানতে পারে না। একটা প্রবল ঘূর্ণি ঝড় তাদের পরিবারের উপর হঠাৎ আছড়ে পড়ে। দয়িতা অশান্তির, দুঃখের আগুন জ্বেলে জোর করে বাড়ি থেকে চলে আসে। এর জন্য দয়িতার কোনো ক্ষোভ, লজ্জা বা দুঃখ নেই।

রাখীকে বোধিসত্ত্ব জানায় তার ইনটেলেকচুয়াল ক্ষুধা রাখী মেটাতে পারে না, তাই দয়িতা কে মেনে রাখীকে এ সংসারে থাকতে হবে — যে রাখীর স্বামীর জন্য জীবন ছিল বোধিসত্ত্বময়, সেই রাখী পত্নীত্বের, নারীত্বের এই পরাজয় বিবাহিত জীবনকে মানতে না পেরে ভাই এর বাড়ি চলে যায়, পুত্র বাবুয়াও মায়ের এই অপমান সহ্য করতে না পেরে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি চলে যায়। তখন ও দয়িতার কোনো অপরাধ বোধ জাগে না। বোধিসত্ত্বে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সব নিন্দা অপবাদ অগ্রাহ্য করে সে বোধিসত্ত্বের কোয়াটারে চলে আসে। বিবাহহীন সম্পর্কের বাঁধনে জড়িয়ে পড়ে সংসার করে। প্রেমের ঘূর্ণি ঝড় তাকে নীল আকাশে মুক্তি দেয়, এ মুক্তি সংস্কার, লজ্জা, অপবাদের থেকে মুক্তি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সে দেয় না। ঘরবাড়ি, রান্না ও বোধিসত্ত্বের উষ্ণ সান্নিধ্য তাকে সুখের সংসারে ডুবিয়ে দেয়। এক সময় দয়িতা অনুভব করে এই মুক্তির মধ্যেও রাখীর সংসার সংসারে রাখীর অলক্ষ্য উপস্থিতি তাকে প্রতিনিয়ত কাঁটা বিদ্ধ করছে। তার অনুরোধে বোধিসত্ত্ব এ চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে যোগদান করে। দয়িতা ভাবে এ তার জয়। নতুন জায়গায় কেউ বোধিসত্ত্বের পূর্বজীবন জানে না। দয়িতাকেই কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় না — সবাই ভাবে সে বোধি সত্ত্বের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। রাখীর স্মৃতি সে রাখতে চায় না বলেই ভাবে পুরোনো কিছু নতুন সংসারে আনে না। উদ্দাম দেহের আবেগে ভেসে যায় দয়িতা — ভাবে এ তো নীল আকাশের মুক্তির জগৎ। রান্না না জেনে ও বোধিসত্ত্বের পছন্দ মত রান্না করতে চায়, রাখী বিনা বিনা প্রশ্নে সব ছেড়ে গেলেও দয়িতা তাকে অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। তাই রূপচাঁদ যখন বলে —

(২)

তা শুনে দয়িতা সম্পূর্ণ অন্য রেসিপিতে মাছ রান্না করে। এর মধ্যদিয়ে সে রাখীকে অস্বীকার করতে চাইছে —

(৩)

ঘর সাজানো নিয়েই দয়িতা ব্যস্ত, সামাজিক বাধা বিপত্তির কথা সে চিন্তা করতে ও চায় না, এখন দয়িতার জীবন বোধিসত্ত্বে আচ্ছন্ন। দুর্দান্ত পুরুষ বোধিসত্ত্ব তার দেহ নিয়ে নিত্যনূতন খেলা করে, দয়িতা ও এর মধ্যেই খুঁজে পায় প্রেমের সার্থকতা। বোধিসত্ত্ব তার দেহ নিয়ে নিত্যনূতন খেলা করে, দয়িতাও এর মধ্যেই খুঁজে পায় প্রেমের সার্থকতা। বোধিসত্ত্ব ডিভোর্সের নোটীশ রাখীকে দেওয়াতে দয়িতা খুশী হয়। বিজ্ঞানী বোধিসত্ত্ব তার আবিষ্কৃত তত্ত্বের উপর বক্তৃতা দিতে দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশে যায়। দয়িতাকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন নেই, কি পরিচয়ে সে যাবে? তাই দয়িতা একা থেকে যায় কোয়ার্টারে। বাবা-মার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই দয়িতার। সৌমিক মাঝে মাঝে আসে, তার জন্মদিনের কথা মনে রেখে ফুল আনে — দয়িতা ভাবে আজ যার কাছ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা পেলে সে সব চেয়ে বেশি খুশি হতো, সেই বোধিসত্ত্ব একটা ফোন করারও সময় পায় না। একাকী নিঃসঙ্গ দয়িতার দিন কাটে, বোধিসত্ত্বের অনুপস্থিতি তাকে আরো বেশি আবেগমথিত করে। হঠাৎ দয়িতা অনুভব করে এ পৃথিবীতে তার ও বোধিসত্ত্বের সন্তান আসছে। দয়িতা এই অনুভবের আনন্দে মাতাল হয়ে উঠে বোধিসত্ত্বকে এ সংবাদ জানাতে গিয়ে সে জানলো বোধিসত্ত্ব এ সন্তান চায় না। সামাজিক দিক থেকে কি পরিচয়ে এ সন্তান বড় হবে? —

(৪)

দয়িতা এ সব ভাবতে চায় না। বোধিসত্ত্বের পরামর্শ মত অনাগত সন্তানকে এ পৃথিবীর আলো দেখা থেকে সে বঞ্চিত করতে রাজি নয়। সামাজিক সম্পর্ক সখ সব কিছুই তার কাছে মূল্যহীন। বিবাহহীন প্রেমের সন্তান তার জীবনে আবার নিয়ে এলো ঘূর্ণি ঝড়। এ ঝড় তাকে বোধিসত্ত্বের আসক্তি থেকে মুক্তির পথ দেখাল। সে ভাবল এ কেমন পুরুষকে সে ভালোবেসেছে। সমাজ, সংসার পরিবার ছেড়ে স্বার্থপর, আত্মসুখসর্বস্ব মানুষটাকে সে একান্তভাবে পেতে চেয়েছিল — দয়িতার মধ্যে একটা আত্মানুশোচনার ঝড় তুলেছে। দয়িতা বোধিসত্ত্বের শয্যাসঙ্গিনী মাত্র, শুধু শারীরিক ক্ষুধা মেটানোর যন্ত্র বিশেষ — এবোধ দয়িতাকে মনেপ্রাণে রিক্ত শ্রীহীন করে দেয়। সে মুক্তি চায়, আত্মসম্মানের সঙ্গে বাচাতে চায় বলেই চাকরির খোঁজ করে, পেয়েও যায়। বোধিসত্ত্ব দয়িতার চাকরি কথা সমর্থন তো করেই না বরং একে অন্যায় বলে মনে করে। দয়িতা চাকরি করতে গেলে বোধিসত্ত্বের সুখসুবিধা কে দেখবে একথা যখন বোধিসত্ত্ব বলে তখনই দয়িতা বলে ওঠে এই আত্মসুখসচেতন স্বার্থপর মানুষটাকে রাখী এতদিন সহ্য করেছিলো কীভাবে।

(৫)

দয়িতা রাখী নয়, রাখীর যন্ত্রণা আজ সে বোঝে।

দয়িতা ঠিক করে সে বোধিসত্ত্বের সংসার ছেড়ে চলে যাবে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সে বাঁচতে চায় না। নিজের জীবনের পথ সে নিজেই বেছে নেবে, তার অনাগত সন্তানকেও সে বোধিসত্ত্বের পরিচয়ে পরিচিত করবে না — আর এখানেই দয়িতার বিদ্রোহ ও স্বতন্ত্রতা, এখানেও সে বাস্তবের মুখোমুখি হচ্ছে — এ কোলকাতা শহরে একজন নারী একা ঘর ভাড়া পেতে পারে না। সৌমিককে সে ভালো না বাসলেও ভালো বন্ধু মনে করে তার কাছে পরামর্শ নেওয়া যায় বলেই সে সৌমিককে নির্দ্ধিধায় সব জানায়। সৌমিক আজ ও দয়িতাকে ভালোবাসে, তাই শুধু নিজের নামে বাড়ি নিয়েই দায়িত্ব শেষ করে না, তার অনাগত সন্তানের দায়ভারও সে নিতে রাজী। দয়িতা আত্মসম্মান, মর্যাদাবোধ, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্বকে সৌমিক সম্মান জানায়। সৌমিক জানে দয়িতা এ সমাজে এখন নিরাপদ নয়, সমাজ তার সর্বাঙ্গে কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দেবে। সৌমিক দয়িতার বাবা — মাকে খবরটা জানায়, তারা সব ভুলে গিয়ে দয়িতাকে আদরের সঙ্গে ঘরে নিয়ে যায়। দয়িতা এই অতিরিক্ত আদরের মধ্যেও অস্বাভাবিকা খুঁজে পায় —

(৬)

তার মনে হয় এদের আদরের, যত্নের মধ্যেও করুণা, আতিশয্য বা অনুকম্পাও থাকতে পারে। এখন কেউ আর দয়িতার মনের সঙ্গী নয়, বোধিসত্ত্বকে এখন সে ঘৃণা করে, সৌমিককেও ভালোবাসতে পারে না, যদিও বন্ধত্বের কথা স্বীকার করে। একজন নারী কীভাবে সমাজের তথাকথিত সংস্কার বন্ধনকে অস্বীকার করে মুক্তি পেতে চাইছে দয়িতা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বীরপূজা নারীর স্বভাবধর্ম। এই কারণেই দয়িতা ভালোবেসে ছিল উদাসীন, নির্বিকার তত্ত্বজ্ঞানী, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী বোধিসত্ত্বকে। যদি বিবাহ বা সংসার দয়িতা না পেত, তবুও আধুনিক নারী দয়িতা বোধিসত্ত্বকে চেয়েছিল মনের প্রিয় পুরুষরূপে। সে স্বর্গসুখ থেকে এক ধাক্কায় নেমে এসেছে রূঢ় বাস্তবের সামনে। সৌমিক আজ তাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চায়, এতেও দয়িতা তার প্রতি করুণা, দয়া ও অনুকম্পা দেখতে পায়। দয়িতার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি আছে। সে বোধিসত্ত্বকে ছেড়ে এলেও, তার সন্তানের পিতৃপরিচয় অস্বীকার করলেও অনাগত সন্তানকে কাছে পেতে চায়, নারীর মাতৃত্বের মধ্যে মুক্তিকে সে প্রতি পলে পলে অনুভব করে। সৌমিকের বন্ধুত্বের বিশ্বস্ত হাতটাকে দয়িতা অস্বীকার করতে পারবে না, সব প্রতিরোধের দেওয়ালটা ভেঙ্গে পড়ে। সৌমিককে আর সে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, অধিকার বা দেহসুখ ভোগের জন্য নয়, সৌমিক তাকে ভালোবাসে — একে অস্বীকার করার শক্তি আজ আর দয়িতার নেই।

দয়িতার জীবনে একটা ঘূর্ণিঝড় এসে তার সবকিছু ওলটপালট করে দিয়েছে — সে ঘূর্ণিঝড় বোধিসত্ত্বের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আসক্তি। এ ঘূর্ণি নীল যা সামাজিক বাধা — বন্ধন — নিয়ম নীতি থেকে মুক্তি এনে দিয়েছিল। সে মুক্তি বোধিসত্ত্বকে ভালোবেসে সে

অনুভব করেছিল। আবার ঘূর্ণিঝড়ের বিপর্য্যয়ের মধ্যে দয়িতা মুক্তির নীল রং খুঁজে পেল নারীত্বকে, মাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় সংকল্পের মধ্যে। ঘূর্ণি ঝড়ের পর শেষ নীল মুক্তি দয়িতা পেল সৌমিকের ভালোবাসার মধ্যে। সৌমিকের প্রেমের ঘূর্ণি দয়িতাকে শেষপর্যন্ত নীল আকাশের মুক্তি এনে দিল।

সহায়কগ্রন্থ :

ক) ভট্টাচার্য সুচিত্রা : 'নীল ঘূর্ণি' — প্রকাশক, আনন্দ পাবলিশাস, প্রকাশকাল দশম মুদ্রণ জুলাই, ২০১৫

১) 'নীলঘূর্ণি' পৃষ্ঠা - ৯৯-১০০

''তোমাকে যে এত বছর আমি টলারেট করেছি, সে তোমার বাপ চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। দয়িতার কথা বলে আমায় উত্তেজিত কোরো না, তুমি দয়িতার পায়ের নখের যোগ্য ও নও। এ বাড়িতে থাকতে হলে মুখ বুজে থাকবে, দয়িতাকে নিয়ে কখনও আর একটা প্রশ্নও নয়। ঢুকছে মাথায় কথাগুলো।

২) 'নীলঘূর্ণি' পৃষ্ঠা - ১১৩

''আজ্ঞা, জিরেও দিতে পারেন, মা জিরে দিয়ে ফুলকপি দিয়ে রানতেন।"

৩) 'নীলঘূর্ণি' পৃষ্ঠা - ১১৫

''পেঁয়াজ আদা রসুন দিয়ে কষকষে করে রাঁধল মাছ, আলাদাভাবে আলু-কপির তরকারি। কেন করল? অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে রেষারেষি? খেতে বসে পাছে বোধিসত্ত্বর রাখীর কথা স্মরণ আসে, এই আশঙ্কায়? দয়িতা নিজেও ঠিক ঠিক জানে না।"

৪) 'নীলঘূর্ণি' পৃষ্ঠা - ১৫৭

''আমার কথা ভেবেছ একবার? আমার তো মনে হয় তুমি বাচ্চাটারওফিউচার ভাব'ছ না। তার কী পরিচয় হবে, সমাজে সে কী ভাবে অ্যাক্সেপ্টেড্ হবে...."

৫) 'নীলঘূর্ণি' পৃষ্ঠা - ১৬৯

''তোমার এখনও ডিভোর্স না হওয়া বউ তোমাকে এত বছর ধরে সহ্য করেছিল কি করে?"

৬) 'নীলঘূর্ণি' পৃষ্ঠা - ১৯২

''কেন যেন মনে হয় তাকে ঘিরে একটা সাজানো নাটক অভিনীত হয়ে চলেছে। রাতে খাবার টেবিলে বসে প্রবীর যখন দয়িতার। ছোট বেলার কোনও গল্প বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, দয়িতার তখন বড় কান্না পায়। বাবা এত চড়া পর্দায় অভিনয় করে কেন? মরিদীপা যখন অনাগত সন্তানের দোহাই দিয়ে দয়িতাকে জোর করে খাওয়ায়, তখন কি তার মুখে একটা চোরা বিষাদ খেলা করে না?

দয়িতার মুখ চেয়ে এক অবাঞ্ছিত শিশুর আগমনকে মেনে নিয়েছে মা, দয়িতা জানে, বুম্বা যখন হাসতে হাসতে দিদির ঘরে ঢোকে দয়িতা স্পষ্ট টের পায় দরজার ওপারেও বুমবার মুখ গোমড়া ছিল।"

তথ্যসূত্র :

১) মুখোপাধ্যায় অরুণ — 'কালের পুতুল' প্রকাশক, দেজ পাবলিশার্স, প্রকাশনাকাল ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৪

২) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার — 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' প্রকাশক, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল, ১৯৮৪

বাংলার মুখ প্রকাশিত

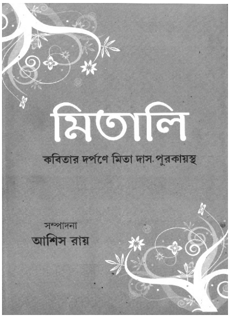

মিতালি
কবিতার দর্পণে
মিতা দাস পুরকায়স্থ
সম্পাদনা - আশিস রায়
মূল্য : ২০০ টাকা

সৃষ্টিসুখের কোনো উল্লসিত প্রভাতে নিষাদের হাতে ক্রৌঞ্চের নিহত হওয়ার খবরে আদি ঋষির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ প্রাচ্য বাণীমন্দিরে আনল প্রথম কবিতার আভাস। তারপর তার যাত্রা কেবলই এগিয়েছে উত্তর কালের দিকে। কেউ পেয়েছে বাণীভারতীর বরমাল্য, সমৃদ্ধি এসেছে দ্বারে। কেউ হারিয়ে গেছে কালচক্রের নিচে, বিস্মৃতির অন্ধকারে। তবু যাত্রা থামেনি। সেই যাত্রা পথে আমরা পেয়েছি মিতা দাসপুরকায়স্থর মতো এক নিভৃত সাধনার কবিকে। আমরা মগ্ন হয়েছি তাঁর কবিতায়। এখন সম্পাদক আশিস রায় ২৪টি প্রবন্ধের সমৃদ্ধ বাসর বুনে দিলেন দু'মলাটের মাঝে, যার সবকটি আরও ব্যাপক ভাবে, আরও নিবিড় ভাবে চিনিয়ে দেয় মিতার কাব্যলোককে। আপামর বাঙালি পাঠকের কাছে এও এক নতুন পাওয়া। সময়ের বিচারে কিছুটা আলাদ পথ ধরে হাঁটা এই গ্রন্থ।

দেশভাগ : নারী বঞ্চনার চিত্র - একটি অনুসন্ধান

সমরেশ মণ্ডল*

এক ও অখণ্ড পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯৪৭ খ্রিঃ, ১৫-আগস্ট ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান দ্বিখণ্ডিত হল। ভারত বিভাগ বিষয়টি বিতর্কিত হলেও এর সর্বনাশা পরিনাম উদ্বাস্তু সমস্যার যার পরিণতি সমাজের নারীর বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল। দেশভাগের পর ব্যাপক হারে পূর্ববাংলার শরণার্থীদের আগমন ও নতুন জনবসতি গড়ে ওঠায় পশ্চিমবাংলার এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

১৯৪৭-এর সেই রক্তাক্ত শোচনীয় ভারতবিভাগ এর জের হিসাবে, ছয় দশকেরও বেশিকাল অতিক্রান্ত হবার পর এখনো ভারতীয় উপমহাদেশের দুটি রাষ্ট্রের প্রায় কয়েকশো কোটি নর-নারীর রক্তপাত হয়েই চলেছে। আদি পাপের অনুসঙ্গ হিসাবে যুক্ত হয়েছে এক নতুন মাত্রা, যার নাম সন্ত্রাসবাদ। সব মিলিয়ে এত প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও উপমহাদেশের দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকই উন্নয়নের নিরিখে রয়েছে নিচের সারিতে।

অখণ্ড ভারত, বিভক্ত-এর কারণ হল সম্প্রদায়িকতা, চরম ক্ষতির শিকার হলো সমাজের ধাত্রি নারী সমাজ। বিশ শতকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলিম নারী আন্দোলনে এবং সাহিত্য সেবায় নিমগ্ন ছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনই (১৮৮০-১৯৩২), বলা চলে বিশ শতকের শুরু থেকেই বেগম রোকেয়া পর্দাপ্রথার সমর্থক মৌলবি-মোল্লাদের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

মেয়েদের অধিকারের জন্য লড়াই, তাদের এগিয়ে আসার জন্য প্রচুর চেষ্টার পরও তাদের নির্যাতন কিন্তু বন্ধ হয়নি। উনিশ শতকের নির্যাতন মূলত ছিল চারদেওয়ালের মধ্যে। বাইরে নির্যাতন আরও বেড়েছে, বদলে গেছে তার ধরনও।

দেশভাগের পর যখন দলে দলে মানুষ এদেশ ছেড়ে ওদেশ যাচ্ছেন বা ওদেশ থেকে এদেশে আসছেন তখন মেয়েদের ওপর যে পরিমান অত্যাচার হয়েছে তার হিসেব নিকেশ নেই। অত্যাচার জাত ধর্ম মেনে হয়না - হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব ধরনের মেয়েদের ওপর চলেছে অকথ্য অত্যাচার, হাজার হাজার মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছে।

দেশভাগের ৭০তম বর্ষেও ঘরছাড়া মেয়েরা বহুভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে। অনেক লড়াই এর মধ্যে দিয়ে পরের প্রজন্ম স্থায়ী ঘরও বেঁধেছেন এক সময়। কিন্তু পথে ঘাটে আজও মেয়েরা লাঞ্ছনার শিকার হন। স্বাধীনতা উত্তর পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টালে সে খবর আমরা পাই।

---

*গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও সহকারী অধ্যাপক, কবি কৃত্তিবাস বি.এড কলেজ, নদীয়া।

স্বাধীনতা ও দেশভাগকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন তখন তীব্রতম সংকট দু'দেশেই। মেয়েরাও এই সমস্যার চিন্তা ভাবনা করেছিল, তার প্রকাশ পাওয়া যায় পত্র-পত্রিকায়। ও ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে যা বলা হচ্ছিল সেগুলি, মন্ত্রীদের বক্তব্যের সারাংশ পাঠককে নিয়মিত জানাতে নুরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামাল। এ ধরনের বহু খবরের মধ্যে থেকে একটি হল -

> স্বাস্থ্য দপ্তরের রাজকুমারী অমৃতা কাউর 'বাস্তুহারা স্ত্রীলোক ও শিশুদের পুনঃবসতিকে গুরুতর সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন।' তিনি প্রস্তাব করেন 'ঐ সকল স্ত্রীলোক ও বালিকা দিগকে ধাত্রী, নার্স, শিক্ষায়িত্রী প্রভৃতির কাজ শিখাইয়া লইয়া সমাজের লক্ষ লক্ষ লোকের সেবায় নিয়োগ করা যাইতে পারে।

স্বাধীনোত্তর দেশে হিন্দু-মুসলিম মিলে আলোক ছায়ায় পথঘাটে সাজিয়ে উৎসবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা দিবসও পালন করে। কিন্তু ৪৬ এর দাঙ্গার দাগ দগ দগে ক্ষত মিলোয় না মানুষের মন থেকে। তাই হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির আবেদন বার বার করেন মহিলারা পত্রিকার পাতায়।

ঈদ উপলক্ষে ১৯৪৭ এর আগস্টে পার্কসার্কাসে মিসেস মোমিন-এর সভানেতৃত্বে সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রায় তিনশো মহিলা (৩০০) ঐ সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত মনিকুন্তলা সেন, সুহাসিণী গাঙ্গুলী, রোশনারারা প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলাগন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তৃতা করেন। দাঙ্গার ফলে যে সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে, উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে মা-বোনেদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন বেগম। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি, বিশ্বাস ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয়তে বলেন, 'এক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ', হিন্দু মা-বোনেরা এ বিষয়ে আগে থেকেই অনেকখানি অগ্রসর। মুসলমান মেয়েরাও এগিয়ে এসে উদ্যোগ নিতে থাকে, 'মহিল মুসলিম লীগ' ও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' উদ্যোগের প্রীতি সম্মেলন আয়োজনের খবরও প্রকাশিত হয় বেগম এর পাতায় (১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৭ খ্রীঃ)।

সাম্রাজ্যবাদ নয়, সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে হিন্দু মুসলিম, নারী-পুরুষ একসাথে এগোতে না পারলে দেশ স্বাধীন হওয়ার আশা নেই। সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ রাজনীতি করার প্রসঙ্গে সফিয়া খাতুনের মতামত 'মুক্ত'-র পাতায় ছাপা হয়েছিল (২৮শে চৈত্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)।

১৯৪৭ এর অক্টোবরে কলকাতার হিন্দু মেয়েরা মুসলিম মেয়েদের পূজোয় নিমন্ত্রন করেন এবং মুসলিম মেয়েরা ঈদে আমন্ত্রন জানায় হিন্দু মেয়েদের। এই ভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নজির সৃষ্টি করে বাংলার হিন্দু মুসলিম নারী।

দেশভাগোত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ অভিজাত উচ্চবৃত্ত ও মধ্যবৃত্ত ভদ্র সম্প্রদায় পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারী আন্দোলনে ভাটা পড়ে। এসময় বামপন্থী দলগুলো পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম নারীদের খানিকটা সংঘবদ্ধ করতে থাকে। ১৯৪৯ এর মে মাস নাগাদ পূর্ববঙ্গে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' বে আইনি ঘোষিত হয়। তবুও থেমে যায়নি মুসলিম নারীর সামনের পথ চলা।

চিরাচরিত মূল্যবোধ, সামাজিক সংস্কার ও সংগঠনের নিয়ন্ত্রন মুক্ত হওয়া তারে পক্ষে বেশ কঠিন ছিল। তবুও সীমাবদ্ধতার মধ্যে তারা নারী কেন্দ্রিক সমস্যাগুলির সমাধান, সংসার ও কর্মক্ষেত্রের সমন্বয় সাধন, কর্মজীবি ও শ্রমজীবি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং জীবনের বহুমুখি চাহিদার সাথে মিল রেখে নারী সমাজ তাদের মুক্তির দাবিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছিল।

আবাল বৃদ্ধবনিতারা চান আইনসিদ্ধ বাসিন্দা হতে। দুই প্রজন্ম ধরে তারা সকলেই বে-আইন দখলদার হয়ে বসবাস করছেন। দেশভাগের জন্য এদের বাপ-ঠাকুরদা দায়ী ছিলেন না, যারা দায়ী ছিলেন তারা এদেশের আইনসিদ্ধ শুধু নয়, একেবারে গন্যমান্য নাগরিক হয়ে গেছেন নিমেষে। গান্ধী হয়েছেন জাতির পিতা, নেহেরু হয়ে গিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রীস প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হয়ে গেলেন মর্যাদা সম্পন্ন সাংসদ। তাদের জন্য দিল্লীতে তৈরী হয়ে গেল প্রসাদে বাসস্থান, কিন্তু নিরীহ উদ্বাস্তুদের জন্য থাকল শিয়ালদহ স্টেশন, দন্ডাকারন্যের গভীর জঙ্গল বা আন্দামানের দ্বীপপুঞ্জ। কাতারে কাতারে মা হারানো সন্তান, পুত্রহারা পিতা ভীর ভীড় করেছিল সেদিনের নবনির্মিত ভারতে। তারা ফেলে এসেছিল মাছভরা পুকুরটা, যার পাড়ে বসে স্বদেশের অনেক মিটিং হয়েছে।

যারা ছিলেন বাস্তুচ্যুত অসহায় মানুষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মুহুর্তে দেশবিভাজনের ফলে প্রায় এক বস্ত্রে ওপার বাংলা ছেড়ে এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল বহু মানুষ। বেঁচে থাকার সামান্য অবলম্বনটুকুও যাদের ছিলনা তারাই এসে ভিড় করতে লাগলেন এই অঞ্চলে। এই নবগঠিত উদ্বাস্তু অঞ্চলে তাঁরা খুঁজে পেলেন তাদের বাসভূমি। জীবনে বেঁচে থাকবার এবং সন্তান সন্ততিদের বাঁচিয়ে রাখবার প্রত্যাশা। সেদিনের সেই বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যদি সেদিন এইভাবে এই অঞ্চলকে একটি স্থায়ী উদ্বাস্তু অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা না চালাত, তা হলে সেদিনের সেই সকল অসহায় উদ্বাস্তু মানুষদের ভাগ্যে কি ঘটতো জানিনা। দেশভাগের ফলে যে উদবাস্তু সমস্যা দেখা দিল, তার ফলে অনেক নারী বাসস্থানের অভাবে ও প্রতারকের দ্বারা প্রতারিত হয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। বিভিন্ন প্রতিতালয়ে তাদের ওপর চলল নানা অমানুষিকতা অত্যাচার।

দেশ ভাগের সময় নারীদের সামাজিক সমস্যা হলেও মুসলিম মহিলাদের অনেকে গান্ধীর ভক্ত ও সমর্থক ছিলেন। মহিলাদের আন্দোলনমুখী করার জন্য তিনি বলতেন ভারতে

সাবিত্রী, সীতা, দয়মন্তি, দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীর প্রয়োজনে, যাতে করে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধাচরন করতে পারে। মুসলিম নারীরা সতী, সীতা, সাবিত্রী কে তাদের আদর্শ নারী হিসাবে দেখতে চাইতো না। তারা মা আমিনা, বিবি ফতেমা ও মরিয়মকেউ তাদের আদর্শ হিসাবে গন্য করতো। মুসলিম নারীরা যখন ওপার থেকে এপারের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে যখন আশ্রয় নিলেন, তখন তাদের জীবন নিয়ে খেলা করলেন এদেশের এক দুষ্টচক্রের ব্যক্তিবর্গ।

একদিন যাদের সব ছিল দেশভাগের ফলে সব ফেলে চলে আসা অসহায় সেই সকল ছিন্নমূল মানুষদের ভিখিরি জীবনের দুর্দশা কাটিয়ে উঠবার জন্য একান্তভাবেই আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং সম্পূর্ণভাবেই নিজেদের প্রচেষ্টায় তৎকালীন নারীদের মধ্যে দেখা যায় তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

যারা শুধু দিয়েই গেলেন, পেলেন না কিছুই, তারাই এসে ভিড় করতে লাগলেন শিয়ালদহ প্লাটফর্ম ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক ঘোষনার মুহূর্তেই দেশভাগের যুপকাষ্ঠেই বলি হলেন পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীরা। এর মধ্যে নারীদের উপর চলতে থাকে অকথ্যভাবে শারীরিক যৌন নির্যাতন, পূর্ববঙ্গের যে হিন্দুদের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম, তারাই বেরিয়ে এলেন ঘর ছেড়ে, সম্পূর্ণ নিজস্ব অবস্থায় নতুন পরিচয় নিয়ে। এঁরা উদ্বাস্তু, মাথার উপর ছাউনি নেই, ভবিষ্যতের শিক্ষার কোন সম্ভবনা নেই।

পরিশেষে সমাপনী মন্তব্যে উপসংহার হিসাবে একথা বলা যায় যে, নারীরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করে তাদের কথা সকলের কাছে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন বহুপূর্বকাল থেকে। তবু নারী কখনো মুক্ত হতে পারেনি। স্বাধীনতার পরে এপার বাংলার এবং ওপার বাংলার মেয়েদের সম্পাদনা বহুপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, আজও হয়ে চলেছে, যুগের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা বদলেছে, নতুনদের অনুমতি দেয়নি সমাজ, সেই বাঙালী মেয়েরা আজ সব সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। স্বাধীনতার সত্তোর বছরে মেয়েদের সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা বেএড়ছে বহুগুন। সেগুলি যুগে যুগে সমকালের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে।

নব্য প্রজন্মের যুবক-যুবতী যারা এখানে জন্মগ্রহন করেছে এবং সেই সময়ের সেই সব কর্মযজ্ঞ দেখবার সুযোগ লাভ করেনি, তাদের প্রচেষ্টা করলে বোঝানো যাবে যে তাদেরই পূর্বপুরুষদের অক্লান্ত কর্মের মাধ্যমে এবং তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সুচিন্তিত এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলেই গড়ে উঠেছিল এই উদ্বাস্তু উপনিবেশ। স্মরণীয় সেই সকল ব্যক্তিদের কর্মপ্রচেষ্টার ফসলকে টিকিয়ে রাখবার এবং আরও সুন্দর করে তুলবার দায়িত্ব এই নতুন প্রজন্মেরই। আর সেটা সম্ভব এই স্থানের প্রতি সমত্ব গড়ে তুলে নিজেদের ভীতর সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধনের মাধ্যমেই।

সূত্রনির্দেশ :

১। বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী, ‘বিভক্ত ভারত’ বিশ্বভারতী গ্রান্থালয়, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৬৫।

২। পুলক চন্দ, ‘নারী বিশ্ব’ গাঙচিল, কলকাতা, ৭০০১১১, ২০০৮।

৩। বাপী দে, ‘নদীয়া জেলার উদ্বাস্তু সমস্যা’ (১৯৪৭-৫৫), ‘ইতিহাস অনুসন্ধান-৭’ - কে.পি. বাগচী এণ্ড কোং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৩।

৪। আশালতা সেন, ‘সেকালের কথা’-কলকাতা, ফেব্রুয়ারী - ১৯৯৬।

৫। যশোধরা বাগচী, Representing Nationalism : idealogy of Matherhood in Colonial Bengal, in Economic and Political weekly, October 1990.

এবং প্রান্তিকের বই-

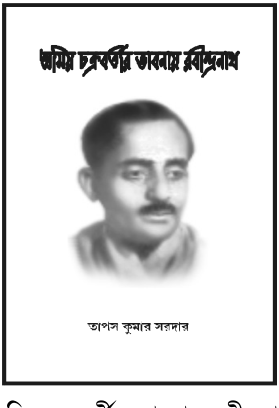

অমিয় চক্রবর্তীর ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

তাপস কুমার সরদার

মূল্য : ১৩০ টাকা

রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকাব্যের প্রেমচেতনা, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এ যুগের কবিদের পথচলা শুরু। অবশ্য আধুনিক কবিদের অনেকেই রবীন্দ্র-বিদ্বেষী ছিলেন না। এই গোষ্ঠীর অন্যতম কবি অমিয় চক্রবর্তী, যিনি ছোট থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। তিনি সময়ে-অসময়ে-দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের স্নেহের স্পর্শ লাভ করেছেন। শৈশব এবং যৌবনের ঊষালগ্নে রবীন্দ্রনাথের মতো প্রখর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বখ্যাত কবির সান্নিধ্যলাভ তাঁর জীবনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক সচেতনতা, সমাজ চেতনা, মানবপ্রেমের দৃষ্টিতে এসেছে পরিবর্তন। তবে এ পরিবর্তন অন্যান্য আধুনিক কবিদের সঙ্গেও মেলে না। স্বতন্ত্র তাঁর কবিদৃষ্টি, স্বতন্ত্র তাঁর কাব্য-জগৎ। তাঁর কাব্য-কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব সর্বদা না থাকলেও তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল আজীবন। এককথায় কবি অমিয় চক্রবর্তীর চিন্তা-ভাবনার জগতের বিচিত্র প্রসঙ্গকে উপস্থাপিত করেছেন লেখক।

বৈষ্ণব সংস্কৃতি চর্চায় শ্রীপাট শ্রীখণ্ড

মিতালী বিশ্বাস*

কাটোয়া শহর থেকে ৬ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম স্থান শ্রীখণ্ড। নৈবেদ্যের উপর স্থাপিত মিষ্টিকে বলা হয় খণ্ড। অনুরূপভাবে এই অঞ্চলের খণ্ডগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এই গ্রামের নাম হয় শ্রীখণ্ড। আবার এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী প্রাচীন শাক্তদেবী 'খণ্ডেশ্বরী'। গ্রাম দেবী 'খণ্ডেশ্বরী'-র নামেও গ্রামের নাম শ্রীখণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। অপরদিকে শ্রীখণ্ডকে বৈদ্যখণ্ড বলে পরিচয় দিতেন বৈষ্ণবরা। উত্তর রাঢ় অঞ্চলের (অর্থাৎ শ্রীখণ্ডের) বৈদ্যরা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। বিদ্যায় বুদ্ধিতে বৈদ্যরা সমাজে অগ্রগণ্য ছিল।[১]

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। প্রায় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে পন্থদাস ও রাঘব সেন নামে বৈদ্য বংশের দুই কৃতি বংশধর শ্রীখণ্ডে এসে বসবাস শুরু করেন। বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি পন্থদাস ও তাঁর উত্তর পুরুষরা (বধুদাস, নারায়ণ, মুকুন্দস নরহরি প্রমুখ) ছিলেন পরম বৈষ্ণব। আর রাঘব সেনের বংশধর দামোদর সেন ছিলেন প্রসিদ্ধ শাক্ত। দামোদর সেনও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন রাজ কর্মচারী ও প্রসিদ্ধ পদকর্তা দামোদর সেন এবং যশোররাজ খান একই ব্যক্তি।[২] তিনি গৌড়ের রাজ দরবার থেকে যশোরাজ খান উপাধি পেয়েছিলেন এবং স্বরচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যে সম্রাট হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর উত্তরপুরুষ বসন্ত সেন 'রায়চৌধুরী' উপাধি পান।[৩] তাই শ্রীখণ্ডে এখনো রায়, সরকার ও ঠাকুর পদবিধারী বৈদ্যরা বেশ প্রভাবশালী। দামোদর সেনের অন্যতম উত্তপুরুষ চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস ঠাকুর প্রথম জীবনে শাক্ত মতাবলম্বী হলেও পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস ও বড়ভাই রামচন্দ্র কবিরাজের প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রামগোপাল দাসের 'রসকল্পবল্লী' ও ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' (১৬৭৫) নাটকে শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধির কথা জানা যায়।---

'শ্রীখণ্ড নাম নগরী রাঢ়ে বঙ্গেষু বিশ্রুতা।
সর্বষামেব বৈদ্যনামাশ্রয়ো যত্র বিদ্যতে।।"[৪]

বৈষ্ণব সংস্কৃতির মহাকেন্দ্র শ্রীখণ্ডের অন্যতম ঐতিহ্য হল বৈষ্ণব জগতের পঞ্চশাখার বৈষ্ণবের লীলাভূমি। কৃষ্ণরাজ কবিরাজ এই পঞ্চশাখার উল্লেখ করে লিখেছেন---

''খণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দ শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি চিরঞ্জীব আর সুলোচন।।

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষাভবন বিশ্বভারতী

এই সব মহাশাখা গৌর কৃপাধাম।
প্রেমফল ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান।।”[৫]

মহম্মদ শাহী বংশের সুলতান গৌড়েশ্বর রকুনুদ্দীন বারবক শাহের চিকিৎসক আয়ুর্বেদাচার্য পণ্ডিত ছিলেন নারায়ণ দাস বা নবনারায়ণ সরকার। তিনি পন্থদাসের উত্তরপুরুষ ছিলেন।[৬] গৌড়েশ্বরের সভাকবি কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর কাব্যে রাজদরবারের অন্য সভাসদদের সঙ্গে নারায়ণ সরকারেরও নাম উল্লেখ করে লিখেছেন---

‘‘রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগানন্দ।
তার পাছে বস্যা আছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ।।
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন।।”[৭]

নারায়ণের তিন পুত্র ছিল, বড় ছিলেন মুকুন্দ দাস, মধ্যম মাধব (শৈশবেই পরলোকগত) ও কনিষ্ঠ পুত্র নরহরি সরকার। সুপণ্ডিত, ভক্তিশাস্ত্রবিদ ও সুচিকিৎসক মুকুন্দদাস গৌড়রাজ হুসেন শাহের রাজবৈদ্য ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগের কারণে তিনি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে গৌরাঙ্গের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চাইলে মহাপ্রভুই তাঁকে বাঁধা দিয়ে সংসার জীবন পালন করতে বলেন। মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে চৈতন্য বলেন---

‘ভক্তগণে কহে সুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম।।
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহোঁ করে রাজ সেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইহা জানিবেক কেবা।।”[৮]

বৈবাহিক জীবন গ্রহণ করার পরও তিনি একনিষ্ঠ হয়ে কৃষ্ণের সাধন ভজন করতেন। শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গা গ্রামে তাঁর সাধনবেদী ছিল। শেষ বয়সে তিনি মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে বসবাস করতেন। আর মুকুন্দপুত্র রঘুনন্দন ও নরহরি শ্রীখণ্ড থেকেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটান। ‘অনন্তসংহিতা’, ‘শ্রীভক্তমাল’, ‘বৈষ্ণবাচার দর্পণ’, ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে জানা যায় মুকুন্দ দাস ব্রজধামে ‘শ্রীবৃন্দাদেবী’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই কারণে তার ভজনস্থান বড়ডাঙ্গাকে শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবরা দ্বিতীয় বৃন্দাবন বলেন।[৯] তিনি শ্রীখণ্ডেই দেহত্যাগ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পরিকর ‘গৌরনাগরবাদী ভাব’-এর প্রবর্তক নরহির সরকার ছিলেন শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। গৌরাঙ্গের নদিয়া লীলায় গদাধর ও নিত্যানন্দের সঙ্গে নরহরিও ছিলেন নিত্যসঙ্গী। পূর্বলীলায় তিনি ব্রজের মধুমতী সখী ছিলেন। ‘পদ্মপুরাণ’ মতে, শ্রীকৃষ্ণের গোপিণীদের অন্যতমা ছিলেন মধুমতী সখী। গীত-বাদ্যে পারদর্শিনী, মধুরালাপ চাতুরা জিতেন্দ্রিয় শিরোমণি এই মধুমতী পুষ্পচয়ন, চামরদান, মধুদা, প্রসাধন বীজন প্রভৃতির

দ্বারা নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের যুগলসেবা করতেন।[১০] নরহিরও গৌরাঙ্গকে নাগর ভেবে মধুমতীর মতো গৌরাঙ্গের পদসেবা করতেন। নরহরির এই মধুমতীতত্ত্ব ও ভক্তির মহিমা প্রকাশ করানোর জন্য নিত্যানন্দ প্রভু সপার্ষদ শ্রীখণ্ডে এসে নরহরির কাছে মধুপানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নরহরি গৃহ নিকটস্থ পুকুর থেকে জল এনে দেন কিন্তু নিত্যানন্দ তা মধু রূপে পান করেন সেই থেকে এই পুকুরের নাম হয় মধুমতী পুষ্করিণী। প্রচলিত সাধন ভজনের বিপরীতে নরহরি গৌরনাগরীভাব সাধনার প্রেম বন্যায় অন্যদের কথা দূরস্থান স্বয়ং গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মোহিত এবং পুলকিত হয়েছিলেন।[১১]

রাঢ় দেশের সাধারণ জনগণের স্তরে লৌকিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রবল প্রভাব আছে। শ্রীখণ্ড গ্রামেই একসময় তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল। শ্রীখণ্ডের চারিদিকে বিখ্যাত সব তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আছে। যথা - ক্ষীরগ্রামের 'যোগ্যদা', কেতুগ্রামের 'বহুলা', অট্টহাস্যে 'ফুল্লরা', মাঝিগ্রাম, উজানি, মঙ্গলকোটের 'শাকম্ভরী' ও ভ্রামরীর 'মঙ্গলচণ্ডী'।[১২] আর শ্রীখণ্ডের ভিতরেই উত্তরে রয়েছে 'অনাদিলিঙ্গ শিব' এবং পশ্চিমে রয়েছে গ্রাম্য দেবী 'খণ্ডেশ্বরী' কালিকা আর একদিকে মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনের ভজনস্থান বড়ডাঙ্গা। নরহরি ও রঘুনন্দনের সাধনায় তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব কিছুটা হলেও ছিল। এঁদের অনুবর্তী লোকানন্দ ও লোচনানন্দের সাধনায় তান্ত্রিক সহজসাধনার কথা অনেক বেশি স্পষ্ট। নরহরি ও লোচনানন্দ রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভজন পদ্ধতি এবং রাধাভাব ও নাগরভাব এর কথা প্রচার করেছেন। লোকানন্দ বিধিমার্গে গৌরাঙ্গের উপাসনার কথা প্রকাশ করেন। লোকানন্দ ভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থে যে তান্ত্রিক পদ্মমণ্ডলের রচনা করেছিলেন ছয় কোণে ছিল চৈতন্যের ছয় জন প্রধান পার্শ্বপরিকর (গদাধর পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর প্রমুখ)।[১৩] নরহিরর বৈষ্ণব পদাবলি রচনায় চণ্ডীদাসের ভাব ও ভাষা প্রবল প্রভাব ছিল।[১৪] গৌরনাগর ভাব-এর সাধক নরহরি শ্রীকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গকে অভিন্ন জেনেও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা গৌরাঙ্গকেই অধিকতর সাধনা করতেন। তিনি অনেক গৌরবিষয়ক পদও লিখেছিলেন। যথা---

''দেখ দেখ অগো ভুবনমোহন গৌরাঙ্গরূপের ছটা।
কিয়ে ধরাধর তেজিয়া ধরণী উপরে বিজুরী ঘটা।।
কিয়ে নিরমল মঙ্গর কনক-কমল কালিকারাশি।
কিয়ে অতিশয় মদ্দিত বিমল চারু গোরোচনারাশি।।"

(১২৯ নং পদ)[১৫]

অথবা

''কি কব স্বপনে কত পরিহাস করি গো
রসিক শেখর মোর গোরা।
কিবা সে নয়ন বাঁকা চাহনি বিষম গো
জীবন-যৌবনধন-চোরা।।" (১৩৯নং পদ)[১৬]

এইভাবে নরহরি তথা শ্রীখণ্ডের অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা পদাবলি সাহিত্যের জগৎকে উৎকর্ষ করেছিলেন। তবে নরহরির তান্ত্রিক প্রভাব সম্পন্ন 'গৌরনাগরীভাব'-এ অনেকেই বিশ্বাসী ছিলেন না। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ দেখা যায়। আর সেই মতভেদ আরও স্পষ্ট হয় মহাপ্রভুর জীবৎকালে অর্থাৎ ১৯২১ সালের পুরীর রথযাত্রায়। শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞায় অন্যান্য ভক্তবৃন্দরা যখন কৃষ্ণগুণ-কীর্তন করছিলেন, তখন শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় অন্যত্র গৌরাঙ্গ গুণ-কীর্তন করেছিলেন--

"খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন
নরহরি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন।"[১৭]

রক্ষণশীল নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সমাজ নরহরি ও তাঁর অনুচরদের চৈতন্য সংক্রান্ত বাড়াবাড়ি ভালো চোখে দেখেননি। তবে বৈষ্ণব ধর্মে 'কান্তা' বা 'প্রকৃতিভাব'-এ ভজন কেবল নরহরিই করেননি, স্বয়ং গৌরসুন্দর নিজেই এই পথের পথিক ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতও রাধাভাব-এ ভাবিতছিলেন। তাই বঙ্গের বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে নরহরি সম্প্রদায় একটি ব্যতিক্রমী নজির রেখে গেছেন।

শ্রীচৈতন্যের কল্পতরুরপঞ্চশাখার অন্যতম শাখা শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। মুকুন্দ পুত্র রঘুনন্দন ছিলেন নরহরির 'গৌরনাগর ভাব'-এর যোগ্য উত্তরসূরি। শিশুকালে রঘুনন্দন গৃহদেবতা 'গোপীনাথ' বিগ্রহের প্রতিমাধর্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষীরের নাড়ু খাইয়েছিলেন। শ্রীখণ্ডের পাটবাড়িতে এখনো সেই ক্ষীর খাওয়া গোপীনাথের মূর্তি আছে। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি মহাপ্রভুকে 'গৌর-ভাবামৃত' স্তোত্র দ্বারা বন্দনা করেছিলেন। নরহরির আদর্শ অনুসরণ করে তিনি অষ্টরস সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর খুব প্রিয় পাত্র ছিলেন।[১৮] রঘুনন্দন, অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। নৃত্য, গীত ও কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন রঘুনন্দন। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়া হিসাবে রঘুনন্দনের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। শ্রীখণ্ডের পঞ্চশাখার আর এক চৈতন্য পরিকর চিরঞ্জীব সেনের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার তেলিয়াবুধুরি গ্রামে। কবি দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিয়ে করে তিনি শ্রীখণ্ডে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ভক্ত চিরঞ্জীব সেন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা ছিলেন। সুলোচনের জীবন বৃতান্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। রামগোপাল দাস বলেছেন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন দুই ভাই ছিলেন। কারো মতে তারা পূর্বাশ্রমে চন্দ্রিকা এবং চন্দ্রশেখরা নামে পরিচিত ছিলেন। কারো মতে আবার নীলকণ্ঠীও সুলোচনা কলাবতীসখী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[১৯]

চৈতন্যের জীবৎকালে নরহরি সরকার নীলাচলে যাবার আগে (আনুমানিক ১৫৩৩ খ্রিঃ, মতান্তর থাকতে পারে) শ্রীখণ্ডে 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই 'গৌরাঙ্গ' বিগ্রহ ছিল কাঠের। এই শ্রীপাটের প্রাচীন কুলদেবতা ছিলেন অষ্টধাতুর 'গোপীনাথ'। এখানে বর্তমানে তিন শরিকের বাড়ি আছে। উত্তর বাড়িতে আছেন মুকুন্দ ঠাকুরের পঞ্চম পুরুষ রতিকান্ত ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'মদনগোপাল জীউ', 'রাধারাণী' ও 'শ্যামরায়', অচ্যুতানন্দ ঠাকুর

প্রতিষ্ঠিত (মুকুন্দ ঠাকুরের নবমপুরুষ) 'লক্ষ্মী-নারায়ণ', 'রাধা-গোবিন্দ', 'শ্রীধর', 'গোপাল' বিগ্রহ এবং রঘুনন্দনের সুতিকা গৃহের একটি প্রতীকী গৃহ আছে। মাঝের বাড়ির মন্দির নরহরি ঠাকুরের ভজনগৃহ হিসেবে পরিচিত। এখানে বৃন্দাবন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'মদনমোহন' ও 'রাধারানী' বিগ্রহ আছে। এই বাড়িতে সমতল ছাদ বিশিষ্ট নাটমন্দিরের পাশে নরহরির ভজন কুঠি, তাঁর ব্যবহৃত শয্যা একটি বেদীরূপ আসন ইত্যাদি আছে। মাঝের বাড়ির 'মদনমোহন' ও 'রাধারানী' উত্তরবাড়ির 'মদনগোপাল'-এর সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। দক্ষিণ বাড়ির মন্দির 'গোবিন্দ জীউ'-র মন্দির হিসাবে খ্যাত। এখানে 'গোবিন্দ জীউ', 'শ্যামসুন্দর' ও 'রাধারানী', আড়াই ফুট উচ্চতার নদিয়ানাগর 'গৌরাঙ্গ' মূর্তি ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' এবং কাটোয়ার সবচেয়ে প্রাচীন রঘুনাথের ক্ষীরের নাড়ু খাওয়া 'গোপীনাথ' বিগ্রহ আছে। এখন আমরা শ্রীপাটে গেলেই দেখতে পাবে 'গোপীনাথ'-এর হাতে অর্ধভক্ষিত নাড়ুর একটি চিহ্ন আছে। 'গৌরাঙ্গ'-'বিষ্ণুপ্রিয়া'-'গোপীনাথ' ব্যতীত অন্যান্য বিগ্রহগুলি শিলা বা ধাতুর তৈরি। 'গৌরাঙ্গ'-বিষ্ণুপ্রিয়া'-'গোপীনাথ' বিগ্রহ তিন বাড়িতে পালা করে সেবা নেয়। এছাড়া দক্ষিণ বাড়ির গায়েই একটি বাঁধানো পুকুর আছে। যেটি 'মধুমতী পুষ্করিণী' হিসেবে পরিচিত। লক্ষণীয় এই যে এখানকার 'গোপীনাথ' বিগ্রহের পাশে কোন 'রাধারাণী' মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

শ্রীপাটে নিত্য বিগ্রহের সেবা পূজা হয়। সকালে বিগ্রহের জাগরণ থেকে শুরু করে স্নান, শৃঙ্গার, পূজা, আরতি, তিনবার ভোগরাগ, বিকেলে বৈকালিক ভোগ, গ্রন্থপাঠ, নামগান, কীর্তন সবকিছুই হয়। বাল্যভোগে ফল, মিষ্টি, ছানা; দুপুরে ভাজা, নানা ব্যঞ্জন, পরমান্নসহ অন্ন; বিকেলে ফল, মিষ্টি; রাতে লুচি, দুধ, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি থাকে। কার্তিক মাসে বিগ্রহের বিশেষ সেবা হয়। এই মাসে পাঁচবার বিগ্রহের ভোগরাগ হয়। এখানে নিত্যসেবা পূজার পাশাপাশি দোল, ঝুলন, রথ, রাস, জন্মাষ্টমী এবং মাঘীপঞ্চমী তিথিতে রঘুনন্দনের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই শ্রীপাটের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসব কার্তিকী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে নরহরি স্মরণ উৎসব বা বড়ডাঙ্গ উৎসব। তিনদিন ধরে এই উৎসব হয়। এই উৎসবটি শ্রীখণ্ড পাটবাড়ির কাছে বড়ডাঙ্গাতে অনুষ্ঠিত হয়। বড়ডাঙ্গা মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনের ভজনস্থল ছাড়াও রঘুনন্দন ও অভিরাম গোস্বামীর মিলনস্থল হিসাবেও খ্যাত। এই মিলনের সময় নৃত্যরত রঘুনন্দনের নুপুর ছিটকে যায় কাটোয়ার আকাইহাটে। বড়ডাঙ্গাতেই কোনো একসময় গৌরাঙ্গের সঙ্গে নরহরির মিলন ঘটেছিল। উল্লেখ্য যে, নরহরি বিদ্যার্জনের জন্য নবদ্বীপে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই নরহরির সঙ্গে গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। বড়ডাঙ্গাতেই নরহরি সরকারের তিরোধান ঘটে। নরহরি তিরোধান তিথি নিয়ে নানা মতভেদ আছে। ভক্তিরত্নাকর-এ নরহরি তিরোধানের দুটি তিথির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ---

''মার্গশীর্ষমাসে কৃষ্ণা একাদশী-দিনে।

আকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এইখানে।”[২০]

আবার,

‘‘অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্বোপরি।
যা’তে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি।।”[২১]

নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন গদাধর দাসের তিরোধানের কিছুদিন পরে নরহরি মারা যান। ঐতিহাসিকদের মতে, ১৫৪০/১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে নরহরি সরকারের তিরোভাব ঘটে। কারো মতে, নরহির ১৪৭০ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[২২] কেউ কেউ মনে করেন তিনি ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের কয়েক বছর পরে মারা যান।[২৩] যাই হোক নরহরির প্রথম তিরোভাব বার্ষিকী উৎসবে শ্রীনিবাস আচার্য অধ্যক্ষতা করেছিলেন। উৎসব হয়েছিল শ্রীখণ্ডের গৌরাঙ্গ বাড়িতে। এর পরের বছর থেকে আজ পর্যন্ত এই উৎসব বড়ডাঙ্গাতেই অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনিবাস আচার্যের ভাগবত পাঠের মধ্য দিয়ে উৎসব শুরু হয়। তারপর বীরভদ্র, রঘুনন্দন ও অন্যান্য বিশিষ্ট বৈষ্ণববৃন্দের পরস্পরকে মালা-চন্দন দান, রাত্রিতে রঘুনন্দনসহ অন্যান্যদের সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠান। ভক্তিরত্নাকর-এ এই মধুর ও আকর্ষণীয় কীর্তনের বিশেষ বর্ণনা আছে।---

‘‘করিয়া আলাপ রাগ প্রকট করয়।
কহিতে কি-রাগের সৌভাগ্য অতিশয়।।
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তালাদি আর।
গমক প্রভেদ প্রকাশয়ে চমৎকার।।

... ...

সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্র উথলিল।
পশু-পক্ষী মনুষ্য-দেবাদি মুগ্ধ হৈল।।
সঙ্কীর্তন স্থলেতে লোকের নাই পার।
সবাকার নেত্রে অশ্রুধারা অনিবার।।”[২৪]

শুধু তাই নয় এ কীর্তনে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহার করা হয়েছিল। নরহরি লিখছেন---

‘‘কিবা সে মধুর ঝাঁজ-বাদ্যের চাতুরী।
বাজায় সুছন্দে চারু, খমক, খঞ্জরী।”[২৫]

এই সঙ্কীর্তনে বীরভদ্রের অপূর্ব নৃত্য দেখে অদ্বৈতপুত্র কৃষ্ণমিশ্র ও গোপালসহ সকল বৈষ্ণবগণ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। এইভাবে মহান্তগণের নৃত্য, গীত ও কীর্তনের হিল্লোলের আত্মবিস্মৃতির মধ্যে দিয়ে একাদশী নিশি শেষ হয়। দ্বাদশীর দিন ‘গোপীনাথ’, ‘গৌরাঙ্গ’ প্রভু ও নরহরি ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করা হয়। বিগ্রহকে প্রণাম পুষ্পার্ঘ দিয়ে সকলেই ভোগ নিবেদন করেন। তারপর উপস্থিত সকল ভক্ত মিলে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্যের মহাউদ্যোগে এই মহোৎসব ছিল বৈষ্ণব ধর্মের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন। বঙ্গের

বৈষ্ণবদের পারস্পরিক দূরত্ব ও রোষ মেটাতে এটি ছিল অনবদ্য একটি প্রচেষ্টা। আর সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অব্রাহ্মণ নরহরির তিরোধান মহোৎসবের একাসনে বসে প্রসাদ খাওয়াও একটা বিপ্লবাত্মক ঘটনা। স্মরণীয় যে গদাধর দাসের তিরোধান উৎসবে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণের ঘটনাটি ঘটেনি। এই মহোৎসবের পর ভাগবত পাঠ বৈষ্ণব সমাজের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়।

বর্তমানে শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গায় মধুমতী সমিতির উদ্যোগে (নরহরির বর্তমান বংশধরদের দ্বারা গঠিত সমিতি) নরহরির তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভগাবত পাঠ, নাম-সঙ্কীর্তন, পালাকীর্তন, রসকীর্তন, মালসাভোগ নিবেদন, অন্নমহোৎসব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উৎসব অতিবাহিত হয়। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী এই উৎসব সম্পর্কে লিখেনে --- ‘‘এই মহোৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হল বিভিন্ন স্থান হতে আগত কীর্তনীয়া দল কর্তৃক কীর্তনে অংশগ্রহণ।’’[২৬] এই মহোৎসব উপলক্ষ্যে তিনদিন এখানে একটি মেলা বসে। উৎসব উপলক্ষ্যে পাটবাড়ি থেকে বড়ডাঙ্গাতে ‘গোপীনাথ’ ও গৌরাঙ্গ’ বিগ্রহকে আনা হয়। প্রভাতি কীর্তন ও নাম যজ্ঞের মাধ্যমে উৎসবের শুভারম্ভ ঘটে। তারপর ভোগরতি, নামকীর্তন, অধিবাসকীর্তন ইত্যাদি হয়। দ্বিতীয় দিন প্রভাতি কীর্তন, মঙ্গলারতি, বিগ্রহকে চিড়েভোগ নিবেদন, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আর তৃতীয় দিন বিগ্রহ ও চৌষট্টি মহান্তের উদ্দেশ্যে মহাভোগ নিবেদন, রসকীর্তন, পালাকীর্তন প্রভৃতি হয়। উৎসবের পর ‘গৌরাঙ্গ’-‘গোপীনাথ’ আবার চতুর্দোলায় চড়ে শ্রীপাটে ফিরে আসেন। এই উৎসবে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, বীরভূমি, কাটোয়া, হুগলি, অগ্রদ্বীপ, যাজিগ্রাম বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক বৈষ্ণবগণের সমাগম হয়। বর্তমানে মেলায় বৈষ্ণবধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে বাউল গান ও লোকসঙ্গীতের আসরও বসে। এই উৎসব ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের আনন্দের ও মিলনের উৎসবে পরিণত হচ্ছে।

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের বৈষ্ণবধর্মে ও সাহিত্যে তথা সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে। যথা---

প্রথম : শ্রীখণ্ডে একাধিক কবি, পদকর্তা ও বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণেতা জন্ম বা আবির্ভাব হয়। তারা হলেন, দামোদর সেন বা যশোরাজ খান, মুকুন্দ সরকার, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব সেন, সুলোচন সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, রতিকান্ত ঠাকুর, রামগোপাল ঠাকুর, পীতাম্বর দাস, শচীনন্দন, জগদানন্দ ঠাকুর প্রমুখ।

দ্বিতীয় : বৈষ্ণবধর্মের জগতে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায় নৃত্য, গীত ও কীর্তনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন---

‘‘খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস মুখ্য এই তিনজন।।’’[২৭]

এই তিনজনই বঙ্গের কীর্তনের ইতিহাসে এক বিশেষ ঘরানার সৃষ্টি করেছিলেন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, তাঁর ‘বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন---

> ''সরকার পরিবারের তিনজনই নৃত্যগীতবাদ্য কুশল ছিলেন এবং এখানে উচ্চসঙ্গীত চর্চার প্রচলন থাকায় শ্রীখণ্ডের নিজস্ব ঘরানায় কীর্তন গানের প্রচলন শুরু হয়। বিলম্বিত লয়ের ধীর গম্ভীর ও মাধুর্যময় শ্রীখণ্ড ঘরানার গান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্যবাহী।... শ্রীখণ্ড ঘরানার কীর্তন সকলের পক্ষে রসোপলব্ধি না হওয়ায় সরলীকৃতরূপে বৈচিত্র্যপূর্ণ তালের সমাবেশে গরাণহাটি, মনোহরশাহী, রেনেটী, মান্দারণী প্রভৃতি ঘরানার সৃষ্টি হয়। শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া হিসাবে শ্রীরঘুনন্দনের খ্যাতি ছিল।''[২৮]

আবার বিনয় ঘোষ লিখেছেন---

> ''বাংলাদেশের কীর্তনগানের বিবিধ ঢঙের মধ্যে 'মনোহরশাহী' ও 'রাণীহাটি' (রেনেটি) ঢঙই প্রসিদ্ধ। মনোহরশাহী বর্ধমান জেলার উত্তরে, রাণীহাটি দক্ষিণে। কুলীনগ্রাম রাণীহাটি পরগণার অন্তর্গত। উত্তরও দক্ষিণের এই দুই ঢঙের বা রীতির মধ্যে উত্তররাঢ়ের মনোহশাহী কীর্তনে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের বিশেষ দান আছে।''[২৯]

ঐতিহাসিক রমাকান্ত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ৫৪টি তাল বিশিষ্ট 'খেয়ালাঙ্গ' মনোহরশাহী কীর্তন ষোড়শ শতকের শেষ দিকে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে ও কাঁদরাতে এবং বীরভূম জেলার ময়নাডাল ও পায়ের গ্রামে উদ্ভাবিত হয়।[৩০] শ্রীখণ্ডের এই ঘরানার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন - গোবিন্দদাস কবিরাজ, শ্রীনিবাস আচার্য, রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। শ্রীখণ্ডের কীর্তন ঘরানা বাংলা কীর্তনের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটিয়েছে।

তৃতীয় : নরহরি সরকারের অন্যতম কীর্তি বাংলাদেশে 'গৌরাঙ্গ' মূর্তি নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও গৌরাঙ্গ পূজা প্রচলন। অনেকে মনে করেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই প্রথম গৌরাঙ্গের পূজা শুরু করেছিলেন। তবে নরহরির গৌরাঙ্গ পূজা সমগ্র বাংলাদেশে অনেক বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নরহরির নির্দেশে যে গৌরাঙ্গ মূর্তি তিনটি তৈরি হয়েছিল তা কাটেয়া, শ্রীখণ্ড ও বীরভূমের একচক্রা গ্রামে আছে। স্মরণীয়, একমাত্র শ্রীখণ্ডেই 'গৌরাঙ্গ' মূর্তির পাশে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থ : বৈষ্ণব ধর্মের জগতে নরহরি যে 'গৌরনাগরভাব'-এর প্রচন ঘটিয়েছিলেন, তা স্মরণীয়। তিনি বৈষ্ণব ধর্মকে রক্ষণশীলতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতামতকে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা না মানতে চাইলেও গৌরনাগরবাদ-এর অনুসারী রঘুনন্দন, লোচনদাস প্রমুখরা অন্যদের মতকে প্রাধান্য জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এখানে শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের উদারতা ও সমন্বয়বাদী

চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। যার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত শ্রীনিবাস আচার্য ও রঘুনন্দনের উদ্যোগে শুরু হওয়া নরহরি তিরোধান উৎসব।

পঞ্চম : বৈষ্ণবধর্ম ও প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গৌরনাগরবাদী-দের অবদান অনস্বীকার্য। এঁরা বাংলাদেশে 'বৃন্দাবনীতত্ত্ব' প্রচারে প্রতিবন্ধকতা না সৃষ্টি করলেও 'বৃন্দাবনী অনুশাসন' মানেন নি। তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছেন। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ পন্থীর বৈষ্ণবদের সমান্তরালে তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। অব্রাহ্মণ নরহরি ও রঘুনন্দন চৈতন্য আদর্শানুসারী হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরাই চৈতন্যের জাত-ধর্মহীন বৈষ্ণব আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য নানা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে গৌরাঙ্গ বাংলার প্রচলিত কীর্ত্তনের থেকে এক নতুন পথ পরিচালিত করেছিলেন। শ্রীখোল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও শঙ্খসহ গেয় কীর্ত্তনের সঙ্গে তিনি করতালি যুক্ত নর্তনকেও যোগ করলেন। অতীতের এই সংকীর্ত্তনের ঐতিহ্য বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রীপাটগুলিতে, বিশেষত বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে। বাংলার মনোহরশাহী কীর্তনের বর্তমান রূপটি ভীষণ ভাবে জীবিত আছে শ্রীখণ্ডে। নরহরি সরকারের উত্তর পুরুষ বিশিষ্ট কীর্তন সাধক গৌরগুনানন্দ ঠাকুর কয়েক দশক আগেও ছাত্রদের নিয়মিত মনোহরসাহী কীর্তনের শিক্ষা দিতেন শ্রীখন্ডে। প্রকৃত অর্থে লীলা কীর্তনের সম্পূর্ণ রূপ শ্রোতারা মনোহরশাহীকেই বোঝেন। এক কথায় বৈষ্ণব সাহিত্যও সংস্কৃতিচর্চায় শ্রীখণ্ড শ্রীপাটের গুরুত্ব অপরিমিত।

তথ্যসূত্র :

১। ***'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড)'***, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী; পুস্তক বিপণি, কলিকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৪; পৃষ্ঠা - ১১৩ [অতঃপর বইটি ***বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড)*** নামে উল্লিখিত হবে।]।

২। ***'তদেব'***, পৃষ্ঠা - ১৩২-১৩৩।

৩। ***'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড)'***; বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা - ৭৩; অষ্টম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪; পৃষ্ঠা - ৯৮ [অতঃপর বইটি ***পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড)*** নামে উল্লিখিত হবে।]

৪। ***'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড)***; পৃষ্ঠা - ১৩২।

৫। ***'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'***; কৃষ্ণদাস কবিরাজ; সম্পাদনা - সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯; দশম মুদ্রণ; চৈত্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা-১৩৩ [অতঃপর বইটি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামে উল্লিখিত হবে।]

৬। ***'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড)***; পৃষ্ঠা - ১৩৩।

৭। ***'রামায়ণ'***; কৃত্তিবাস পণ্ডিত; সম্পাদনা - সুখময় মুখোপাধ্যায়; ভারবি, কলকাতা - ৭৩; তৃতীয় সংস্করণের তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৫; পৃষ্ঠা - ২২।

৮। *'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'*; পৃষ্ঠা - ২৫২।

৯। *'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'*; গৌরগুণানন্দ ঠাকুর; শ্রীখণ্ড, বর্ধমান; দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৪ কার্ত্তিক, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১০ [অতঃপর বইটি ***শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব*** নামে উল্লিখিত হবে।]।

১০। *'তদেব'*, পৃষ্ঠা - ১০০-১০২।

১১। *'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড)*; পৃষ্ঠা - ১৩৩-১৩৪।

১২। *'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (প্রথম খণ্ড)*; পৃষ্ঠা - ১৭৬।

১৩। *'তদেব'*, পৃষ্ঠা - ১৭৭।

১৪। *'কাটোয়ার ইতিহাস'*; নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; সম্পাদনা - স্বপনকুমার ঠাকুর; রাঢ়, বীরভূম; প্রথম রাঢ় সংস্করণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা-১০ [অতঃপর বইটি ***কাটোয়ার ইতিহাস*** নামে উল্লিখিত হবে।]

১৫। *'শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী'*; জগবন্ধু ভদ্র; সম্পাদনা - মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূ,ণ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির, কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা - ১০৫।

১৬। *'তদেব'*, পৃষ্ঠা - ১৩৮।

১৭। *'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'*; পৃষ্ঠা - ২২৯।

১৮। *'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব'*; পৃষ্ঠা - ৬২-৮৫।

১৯। *'তদেব'*, পৃষ্ঠা - ১৮২-১৮৩।

২০। *'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'*; নরহরি চক্রবর্তী; সম্পাদক - নন্দলাল বিদ্যাসাগর; গৌড়ীয় মিশন, কলকাতা - ৬; ২১ ডিসেম্বর ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৩৯৩ [অতঃপর বইটি ***শ্রীশ্রী ভক্তিরত্নাকর*** নামে উল্লিখিত হবে।]।

২১। *'তদেব'*, পৃষ্ঠা - ৩৯৮

২২। *'রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা' (কাটোয় মহকুমা)*; বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ; প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা - ১২; প্রথম প্রকাশ, ২ নভেম্বর ২০০৯; পৃষ্ঠা - ২০ [অতঃপর বইটি ***রাঢ়ের বৈষ্ণব তীর্থ পরিক্রমা (কাটোয়া মহকুমা)*** নামে উল্লিখিত হবে।]।

২৩। *'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড)*; পৃষ্ঠা - ১৩৫।

২৪। *'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর';* পৃষ্ঠা - ৪০১।

২৫। *'তদেব',* পৃষ্ঠা - ৪০১।

২৬। *'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড)*; পৃষ্ঠা - ১৩৪-১৩৫।

২৭। *'শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত'*; পৃষ্ঠা - ২৫১

২৮। *'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড)*; পৃষ্ঠা - ১৮৩-১৮৪।

২৯। *'বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (তৃতীয় খণ্ড)*; পৃষ্ঠা - ১৩৪-১৩৫।

৩০। *'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম'*; রমাকান্ত চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; কোলকাতা - ৯; পঞ্চমুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১৫৮।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চর্যাপদ চর্চা : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ

শুভাশিষ গায়েন

বাংলা ও বাঙালির সারস্বত সাধনা, গবেষণা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির হারানো পরিচয় পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' গঠিত হয়। তার কার্যাবলী সম্পর্কে জনগণের অবগত করার জন্য ১৩০১ বঙ্গাব্দে ১৭ বৈশাখ পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক মুখপত্র হিসাবে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক। সমকালীন অন্যান্য মাসিক পত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। পত্রিকাটির সূচনা লগ্ন থেকে নানা বিষয় অর্থাৎ ইতিহাস, ভূগোল, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজ তত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, বাংলা ভাষার উদ্ভব বিকাশতত্ত্ব কিংবা জীর্ণ কীটদগ্ধ প্রাচীন পুথি প্রভৃতি নতুন তত্ত্ব বা তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের আদর্শ অনুসরন করে। পরিষদের পঞ্চদশ কার্য্য বিবরণীতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পত্রিকার প্রচারের স্বার্থকথা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন-

> 'বাঙ্গাল ভাষা কি রূপে উৎপত্তি ও পুষ্টি লাভ করিল তাহা আদ্যপি নিরুপিত হয় নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন পুথি পত্রের ভিতরে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল পুথিকে জল, আগুন ও কীটের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে হইবে... এই কতব্য সাধনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-ই সাহিত্য পরিষদের প্রধান মুখপত্র'।[১]

পুরাতন বাংলা পুথি প্রকাশের ক্ষেত্রে আদর্শ ধরা হয় 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিয়া'র। পরিষৎ পত্রিকার ক্ষেত্রেও আলোচিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রের আদর্শে। প্রাচীন সাহিত্যের গুরুত্ব বোঝতে পরিষৎ পত্রিকার প্রথম বর্ষ থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এর পাশাপাশি পরিষদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিষৎ সংগৃহীত পুথির আলোচনা এবং পুথির তালিকা প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংগৃহীত পুথির তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পুথিচর্চা শুরু হয়। এই পত্রিকায় রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গল কাব্যের পুথির যেমন চর্চা হয়েছিল ঠিক তেমনি চর্যা পদের পুথিরও চর্চা হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় চর্যাপদের পুথি নিয়ে আলোচনা করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুকুমার সেন মহাশয়।

---

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষাভবন, বিশ্বভারতী

কোনো সময় একটি ভূখণ্ড আবিস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মানচিত্রের বিপুল পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন ভাবে ইতিহাসের বিন্যাসের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তেমনি একটি প্রাচীন গ্রন্থের আবিস্কার সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসকে ও আমুল পরিবর্তন করতে পারে। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দুখানি পুথি আবিস্কারের ফলে মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বিপুল পরিবর্তন হয়। এই দুই খানি পুথির একটি হল সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধন সংগীত যেটি সাধারণত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে পরিচিত। অপরটি বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। প্রথমটি অদি যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের সাধন সংগীত। অপরটি রাধাকৃষ্ণের আদি রসাত্মক কাব্য কাহিনি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যটি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন, এই দুটি পুথির সন্ধান না পাওয়া গেলে হয়তো পুরাতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ সন্ধান করা সম্ভব হত না।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান শুরু হয় উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে। 'এলেম আমি কোথা থেকে' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যেমন মানব জাতির উৎপত্তির ইতিহাস প্রকাশ পেয়েছিল। তেমনি আমাদের নিজেদের অতীত ইতিহাস খুঁজবার চেষ্টা ব্রিটিশ ভারত থেকে শুরু হয়েছিল। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের পিঠস্থান ছিল এই বাংলাদেশ। কলকাতা থেকে ইংরেজরা শাসন করত বিশাল এক সাম্রাজ্য। সদ্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এ দেশের মানুষদের প্রতিদিন মোকাবিলা করতে হতো শাসক কুলের সবজান্তা উন্নাসিকতার সঙ্গে। সে যুগে বাঙালি তরুণরা সেকাজে নানা পথ বেছে নিয়েছিল। কেউ বা ধরেছিল হাতিয়ার, কলম ধরেছিল কেউ কেউ। উৎস সন্ধানের সঙ্গে শুরু হয়েছিল কত বিচিত্র তথ্য উদ্ধারের বিস্তৃত কর্মযজ্ঞ। একাজ যাঁরা শুরু করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁদেরই একজন। মাতৃভাষা বাংলার উৎস সন্ধানে উদ্যোগী এই মানুষটি বলেছেন -

> "...খ্রিস্টাব্দের ৮০ কোটায় (১৮৮০) লোকের ধারণা ছিল বাঙ্গাল একটা নতুন ভাষা, ইহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না। অনুবাদ ভিন্ন হইতে আর কিছু চলেনা, চিন্তা করিয়া নতুন বিষয় লিখা যায় না। লিখতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নতুন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় ঘটমট হয়।"[২]

লোকের আরো ধারণা ছিল বাংলাভাষা আমাদের মুখের ভাষা মাত্র।

"তাহার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার একটা ইতিহাস আছে ইহা কাহার ও ধারনাই ছিলনা।"[৩]

ধারণাটি স্পষ্ট করার পক্রিয়া শুরু হয়েছিল অনেক আগেই অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকায়। এটি একটি প্রতিবাদ

পুস্তিকা। পুস্তিকাটিতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজি ওয়ালাদের আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য এটি ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিচ্ছিন্ন কবি পরিচয় মাত্র। এর পর ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবি চরিত'। গ্রন্থটিতে কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস প্রমুখ ব্যক্তিদের কাব্য সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে জীবগোস্বামীর 'কড়চা' বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ। একই ভাবে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস' প্রথম ভাগ গ্রন্থে লেখক 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' শীর্ষক অধ্যায়ে তিনি বলেন যে সংস্কৃত থেকে বিবর্তনের পথ ধরে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তটি যথেষ্ট গোলমেলে। এই অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি বলেছেন-

> ...মাগধী সংস্কৃতের অপভ্রংশিত ভাষা। হিন্দি ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও প্রতিপন্ন করা গেল। বিদ্যপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি লেখকদিগের রচনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে হিন্দিরই অপভ্রংশে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।"[৪]

আবার ১৮৭১ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে 'The Calcutta Review' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি 'Bengali Literatures' নামে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর সংগৃহীত কীর্ত্তন গানের ভাষাকে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন রূপে মনে করেছেন। যদিও এই ভাষায় হিন্দির মিশ্রন ছিল। এর পর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (১৮৭২ খ্রিঃ) বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন -

> ...বঙ্গলিপি দেবনাগর অক্ষরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল ও তাহা বুদ্ধদেবের সময় প্রচলতি ছিল। তাঁহাদের দেখাইতে হইবে যে এই বঙ্গলিপি পূর্ব্বের কোনো লিপির পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে;.... বঙ্গলিপি বুদ্ধদেবের সময় হইতে আজ পর্যন্ত যে একই ভাবে একই আকারে বর্ত্তমান আছে তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।'[৫]

তাঁর মতে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন বিদ্যাপতির পদাবলী। দীনেশচন্দ্র সেন অবশ্য তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) গ্রন্থে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসাবে মানিকচন্দ্রের গান, গোপীচন্দ্রের গান, ডাক ও খনার বচন-এর কথা উল্লেখ করেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি রচনার উপাদান হিসাবে দীনেশচন্দ্র সেন পুথি সংগ্রহ করেন। তিনি মনে করেন বাংলা ভাষার যথার্থ ইতিহাস নির্ণয় সম্ভব একমাত্র পুথি চর্চার মাধ্যমে।

বাঙালির সংস্কৃতির মনস্কতার এক বিশেষ পর্যায়ে ও সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকে

বাঙালি জাতির বাংলা পুথি সংগ্রহের অভ্যাসটি গড়ে ওঠে। ব্যক্তি বিশেষের নিষ্টার কথা মনে রেখে এবং পুথি সন্ধানের সংগ্রহ ও সম্পাদনার কৃৎকৌশলের বিষয় খেয়াল করে বলা চলে যে পুথি মনস্কতার ধরন ধারন এক বিশেষ সংস্কৃতির অভ্যাসের ফল। এই অভ্যাসের রকম ফেরের ফলে পুথির তালিকার ও রকম ফের ঘটে। যেমনটি ঘটেছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে। প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা তথা বঙ্গ বিদ্যাচর্চার আকর্ষণে বিদেশী পন্ডিতরা পুথি সংগ্রহে আগ্রহী হয়; বিশেষত জার্মান পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের টানে এই কাজে ব্রতী ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পুথি উদ্ধারের মাধ্যমে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইউরোপবাসীরা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী হবে - "For Europe alone, are two principles or criticism and philology understood and applied and fifty years hence in Europe alone, will any intelligent interest be felt in sanskrit Literature".[৬] এই ছকে তাঁরা দেশীয় ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ও সাহিত্যের পুথি নাগরী অক্ষরে অনুলিখিত করেন। এর পাশাপাশি ইংরেজ সরকার প্রাচ্য বিদ্যা তথা বঙ্গবিদ্যার অমূল্য সম্পদ উদ্ধার ও সংগ্রহের জন্য ২৪০০০ হাজার টাকা অনুদান দেয়; বাংলা দেশে পুথি উদ্ধারের জন্য ৩২০০ টাকা পায়। বাংলা তথা পূর্ব ভারতের পুথি উদ্ধার ও তার রির্পোট করার দায়িত্ব অর্পিত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের হাতে। তিনি গ্রামে মাইনে করা সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের পাঠিয়ে পুথির হদিশ করতেন। তাঁদের সংগৃহীত পুথির সম্পাদনা করতেন রাজেন্দ্রনাল মিত্র। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, পুথির নাম, গোত্র ও বিষয়ের পরিচয়। তিনি রিপোর্টে লিখতেন- পুষ্পিকার কথা, পুথির আরম্ভ ও শেষ পঙক্তি এবং পান্ডুলিপির অবস্থা। অক্ষরের ছাঁদ ও তার নজর এড়ায়নি। বাংলা পুথি সংগ্রহের উদ্দেশ্য তিনি নেপালে গিয়ে ছিলেন ১৮৮২ সালে। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কিছু বৌদ্ধ পুথি আবিস্কার করেন এবং তা 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal" নামে একটি পুথির তালিকা প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুর পর সরকার বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যার পুথি সন্ধান ও সংগ্রহের দায়িত্ব হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর ন্যাস্ত করে। এই সময় শাস্ত্রী মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে রাজপুতানার ভাট ও চারণদের পুথি সংগ্রহ করেছেন। অপর দিকে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করছেন ১৮৮৬ খ্রিঃ ১ জানুয়ারি। লাইব্রেরিয়ান থাকাকালীন তিনি বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মঠাকুরের বিষয়ে তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি ১৫০ কবির নাম ও তাদের গ্রন্থের সমালোচনা করেন এবং তিনি অনুভব করেন -

> 'যদি ছাপা পুথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া
> গেল, হাতের লেখা পুথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কতক

> নূতন খবর দিতে পারিব। সুতারং বাংলা পুথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল। সেই সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্তর হইল এবং বাঙ্গালা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যার পুথি খোঁজার ভার আমার উপর পড়িল, আমি সেই সঙ্গে বাঙ্গালা পুথি খুঁজিতে লাগিলাম।... নানা কারণে আমার সংস্কার হইয়াছিল যে ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিণাম। সুতারাং ধর্ম্ম ঠাকুরে সম্বন্ধে কোনো পুথি পাইলে তাহার সন্ধান করা, কেনা ও কপি করা একান্ত আবশ্যক।'[৭]

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ট্রাবেলিং পন্ডিতদের ধর্মঠাকুর ও ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে পুথি ক্রয় করার নির্দেশ দেন। তিনি নিজে ও মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল এর পুথি এবং রামাইপণ্ডিতের 'শুন্যপুরাণ' এর পুথি সংগ্রহ করেন এবং প্রমান করেন যে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি ধর্মঠাকুরের পূজা;-

> ''যখন ধর্ম্মঠাকুরে সম্বন্ধে অনেক গুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তখন ধর্ম্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাংলা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে ঐ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দু রাজাদের অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে দেখিতে যাইলাম।''[৮]

১৯৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দুবার নেপালে গিয়েছিলেন। নেপাল থেকে ফিরে এসে 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও ধর্মঠাকুর বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি 'সুভাষিতানি সংগ্রহ', 'ডাকার্ণবের দোঁহা' এবং 'দোঁহাকোষ পঞ্জিকা' নামক গ্রন্থগুলির পুথি সংগ্রহ করেন। এই পুথি গুলি সম্পর্কে তিনি বলেন-

> ''ইংরাজী ১৮৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দে যখন আমি দুইবার নেপাল যাই, তখন কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। উহার মধ্যে মধ্যে একরূপ নতুন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে; হয় সেগুলি সংস্কৃতে যাহা লেখা, তাহারই প্রমান স্বরূপ অথবা মূলটাই সেই ভাষায় লিখিত, টীকা সংস্কৃত। ডাকার্ণব নামে একখানি পুস্তক আছে ইহার মাঝে মাঝে একরূপ নূতন ভাষায় অনেক লেখা আছে। ডাকার্ণব নাম শুনিয়া

> আমি মনে করিলাম সেগুলি ডাক পুরুষের বচন হইবে এবং তাই মনে করিয়া ইহার একখানি নকল লইয়া আসি। পড়িয়া দেখি বাঙ্গালা নয় কি ভাষায় লিখিত, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আর একখানি পুস্তক পাইলাম তাহার নাম 'সুভাষিত-সংগ্রহ', উহারও মধ্যে মধ্যে একটি নূতন ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে এবং আর একখানি পুস্তক দেখিলাম 'দোঁহাকোষ'।"[৯]

দুবার নেপাল যাত্রায় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাই ১৯০৭ সালে তৃতীয়বার তিনি নেপালে যাত্রা করেন। এই বার নেপালের জাতীয় অভিলেখালয় থেকে তিনি তিনটি পুথি আবিস্কার করেন। তার একটির নাম 'চয্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' উহাতে কতকগুলি কীর্ত্তনের গান আছে ও তাহার সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলি বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের মত। গানের নাম 'চয্যাপদ'[১০] এছাড়াও 'সরহ পাদের দোঁহা' ও অদ্বয় ব্রজের সংস্কৃত রচিত 'সহজান্নয়পঞ্জিকা' এবং 'কৃষ্ণাচার্যের দোঁহ' ও আচার্য পাদের সংস্কৃতে রচিত মেখলা টীকা নামক পুথির আবিস্কার করেন। এই পুথিগুলির সাথে ডাকার্নব এর দোঁহ কোষটি যুক্ত করে তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ' থেকে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'-এ তিনি দাবী করেন যে 'চর্যাপদ' বা 'চয্যাচয্যবিনিশ্চয়' নামক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লিখিত এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' গ্রন্থটি প্রকাশের পর বাংলা ভাষা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক পূর্বতন ঐতিহাসিকগনের সিদ্ধান্তগুলি বিচলিত হয়ে পড়ে। শুধু বাংলায় নয় হিন্দি, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি অন্যান্য নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা দেখা দেয়। ফলে একদিকে যেমন নেপালে আবিস্কৃত পুথি সম্পর্কে ভারতীয় গবেষকদের আগ্রহ আরো প্রসারিত হলো অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিস্কৃত পুথি গুলি নিবিড় বিশ্লেষণ শুরু হল। তাঁর আবিস্কার চমকপ্রদ হলেও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সমস্তই অভ্রান্ত নয়। তার সত্ত্বেও "মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋনের শেষ নেই। তিনিই নেপাল থেকে বাংলা ভাষার প্রথম চর্যাপদবলী আবিস্কার না করলে বাংলা ভাষার আদিপর্ব সম্বন্ধে এতদিন আমাদের আঁধারের মধ্যেই বাস করতে হত। তিনিই অপভ্রংশে লেখা দোহাবলী ও চর্যাগান আবিস্কার করে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা ও কবিতার বিস্মৃত পরিচয় উদ্ধার করেছেন।"[১১]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিস্কৃত গ্রন্থটি সটীক চর্যাগীতি সংগ্রহ। মূল চর্যাগীতি সংগ্রহ গ্রন্থখানির নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া। প্রাপ্ত পুথি

খানি আসলে টীকার। তবে সেই সঙ্গে মূল চর্যাও আছে। টীকাকারের নাম মুনিদত্ত। পরবর্তীকালে প্রবোধচন্দ্র বাগী মহাশয় আবিস্কৃত তিব্বতী অনুবাদের পুথি থেকে বিষয়টি জানা যায়।

নেপালের রাজদরবারের পুথি যিনি লিখেছিলেন তিনি মূল পদ ও টীকা সতন্ত্র পুথি থেকে নকল করেছিলেন। ‘‘একই আদর্শে পুথি হইতে মূল ও চর্যার টীকা অনুলিপি করিলে লিপিকার একাদশ চর্য্যার পর ‘সূনেত্যাদি চর্য্যায়া ব্যাখ্যানাস্তি’ লিখতেন না।’’[১২] চর্যাগীতি রচিত হবার বেশকিছু পরে সংস্কৃত টীকাটি রচিত হয়েছিল। সেকারনে টীকার সঙ্গে মূল পুথির অর্থের কোনো সামঞ্জস্য বিধান ঘটেনি। শাস্ত্রী মহাশয় আবিস্কৃত চর্যাপদের পুথি পাট সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষক মহল সংশয় প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি প্রথম ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় চতুর্থ সংখ্যায় বৌদ্ধ গান ও দোহা আলোচনা’ শীর্ষক প্রবন্ধে পুথির পাঠান্তর নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর অভিমত-

> ‘তবে বৌদ্ধগান পড়িতে পড়িতে কয়েক স্থলে আমার যে খটকা লাগিয়াছিল, পরে আমি যেমন বুঝিয়াছি, তাহা ভারততত্ত্বামোদী সজ্জন গনের নিকট নিবেদন করাই আমার এই প্রগলভতার কারণ। আশা করি, পুজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও অন্যান্য শাব্দিকগণ এই বিষয়ে তাঁহাদের মূল্যাবান অভিমত প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।’’[১৩]

একই বছর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় চতুর্থ সংখ্যায় তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় মূল পুথির পাঠের সঙ্গে পরবর্তী পাঠের পার্থক্য নিরুপন করেন। এর পর ধারাবাহিক ভাবে এই পাঠান্তর প্রক্রিয়া চলতে তাকে।

চর্যাপদের পুথির পাঠান্তরের কারন পুথিতে World Division ছিল না। প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে না। সম্পাদকের পুথি-পঠনের প্রাথমিক জ্ঞান সক্রিয় থাকলেই বিষয়টির সহজ মোকাবিলা করা যায়। চর্যাপদের শব্দ অচেনা যার ফলে চর্যাপদের শব্দ বিভাজনে বেশ সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন পণ্ডিত ও গবেষকগণ শব্দের বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিস্কৃত চর্যাপদের পুথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও পাঠান্তর ঘটেছে। এই পাঠান্তরের কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত মূলের লিপিকর প্রমাদ অর্থাৎ লিপিকর মূল পুথি থেকে অনুলিপি করার সময় নিজের মত শব্দে অর্থ নিরূপন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় আবিস্কৃত ৩নং পদের ‘শুন্ডিনি’ স্থানে মূল পুথিতে আছে ‘শুন্ডিনিনী। ‘‘এই দৃশ্যতঃ ভুল সংশোধন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় শুন্ডিনি করিয়াছেন।’’[১৪] এইরকম ৭নং পদে ‘বাট রুন্ধেলা’ স্থানে মূল পুথিতে ‘বাট এ রুন্ধেলা’, ‘কঁহিগই’ স্থানে ‘কহিব গই’। চর্যাপদের ৮নং পদে ‘মহাসুহ সঙ্গা’ স্থানে মূল পুথিতে আছে ‘মহাসুহ সজ্ঞা’। একই ভাবে

৩৯ নং পদে 'সুইনাহ আবিদার অরে' স্থানে মূল পুথিতে আছে 'সুইনাহয অবিদারমরে'। ৪২নং পদে 'সাআর' স্থানে 'সার অর' আছে। ৪৯নং পদে 'বঙ্গালে ক্লেশ' এর স্থানে মূল পুথিতে আছে 'দঙ্গালে দ্রেশ' ইত্যাদি ভ্রম পূর্ণ পাঠ শাস্ত্রী মহাশয় আবিস্কৃত পুথিটিতে ছিল। দ্বিতীয়ত, মুদ্রিত গ্রন্থে মুদ্রাকরের প্রমাদ আছে। তৃতীয়ত, মূলের অক্ষর সাদৃশ্যের কারনে পাঠে ভুল হয়। অর্থাৎ একই অক্ষর বার বার ব্যবহৃত হওয়ায় সেই অক্ষর ব্যবহারের প্রতি লিপিকরের প্রবণতা বেড়ে যায়। যার ফলে পুথিতে পাঠান্তর দেখা যায়। ১নং পদে 'বইটি' স্থানে 'বইন' আছে। এইরূপ কিছু পাঠান্ত চর্যাপদের মূল পুথির সঙ্গে পরবর্তী পাটে লক্ষ্য করা যায়।

পণ্ডিত ও গবেষকগণ পুথির পাঠ নির্নয়কালে মুনি দত্তের সংস্কৃত টীকার সাহায্য নিয়েছিলেন। কিন্তু সকল সন্ধিগ্ধ স্থানে মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকাকে আঁকড়ে থাকলে দুর্বোধ্য চর্যাগীতির পাঠ অবোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন ৩নং পদে 'সহজে থির করি বারুনি সান্ধে'। 'সান্ধে' শব্দটি দুর্বোধ্য ভেবে মুনিদত্তের 'বন্ধ নং কৃত্ত্বার' অনুসারে 'বান্ধে' পাঠটিকে নিরাপদ মনে করেন (সৌমেন্দ্রনাথ সরকার 'চর্যাগীতিকোষ') কিন্তু মূল পুথির পাঠ 'সান্ধে' হবে। কারন বিদ্যাপতির কৃর্তিলতায় মদ তৈরী অর্থে 'মঁধ' শব্দের উল্লেখ আছে; 'সান্ধ' শব্দটি যথাযথ। সুতারং মূল সর্বত্রই ভ্রান্তিজনক এমন নয়। ৩২ নং পদে শাস্ত্রী ও বাগচী মহাশয়ের 'কাঙ্কন' অপেক্ষায় 'কাঙ্কান' শব্দটি শ্রেয়, তেমনি ৩৩নং পদটি 'হাড়ীত' শব্দটি মুনি দত্তের সংস্কৃত প্রীতির ফলে 'হন্ডীতে' রূপান্তরিত করেছেন। বলাবাহুল্য মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা চর্যাপদের পাঠ নির্নয়ের ক্ষেত্রে সর্বদা অনুসরণ যোগ্য নয়।

অবশ্য মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা বাদ দিয়ে চর্যাপদের পাঠ নির্নয় করা অসম্ভব। ২০নং পদের 'হাঁউ নিরাশী ঘমন ভাতারে'র পরিবর্তে টীকায় উল্লেখিত হয়েছে 'সর্বশূন্যং মনস্বামীর অনুসরণে 'সাঁইপাঠ কল্পিত হয়েছে। 'ভতারে' অপেক্ষা 'সাঁঈ' শব্দটি sophisticated এবং তাতে পরবর্তী ছত্রের সঙ্গে consistency বজায় থাকে।[১৫] মুনি দত্তের সংস্কৃত টীকার পাশাপাশি তিব্বতী টীকার সাহায্যে চর্যাপদের পাঠ যথাযথ নির্নয় করা সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত টীকার তুলনায় তিব্বতী টীকার পাঠ অনেক বেশী বিশুদ্ধ।

চর্যাপদের পাঠ নির্ণয় করতে গিয়ে আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তা হল সন্ধ্যা ভাষার ব্যবহার। চর্যাপদের টীকায় অনেক স্থানে অহেতুক সন্ধ্যাভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ (esoteric meaning) প্রকাশ পেয়েছে। পদটির শব্দগত অর্থ গ্রহন করা হয়নি। অথচ চর্যাপদের পাঠ নির্ণয়ে শব্দগত অর্থ সর্বাগ্রে গ্রহন যোগ্য। যেমন ২নং পদে -

'দুলি দুথি পিটা ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তুলি কুম্ভিরে খাঅ।।"[১৬]

টীকানুযায়ী এর অর্থ মহাসুখকমল (দুলি) দোহন করে বজ্রমনিতে (পিটা) ধরা যায় না। যোগিগণ শরীর বৃক্ষের তেঁতুলের ন্যায় বজ্রফল বোধিচিত্তকে কুম্ভক সমাধি দ্বারা (কুম্ভীরে)

নিঃস্বভাবীকরণ করেন (খাঅ)। ‘‘সহজিয়া পদকর্ত্তা স্বয়ং এই রূপ অর্থ প্রকাশের জন্য হিঁয়ালী ছন্দে লিখলেও অসহজিয়া আমাদের তাহা জানিয়া লাভ নাই। শব্দগত ভাবে পদের সাদা অর্থ () কি হইবে তাতা জানিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হই। অনেক স্থলে কেবল শব্দ বিচার দ্বারা আমাদিগকে এই সাদা অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে। টীকারা দ্বারা আমরা হয়ত কোনো সাহায্য পাইব না। বরং টীকার গূঢ়ার্থের জন্য বাহ্যার্থকে অনেক স্থলে বিকৃত করিয়াছে।”[১৭] সুতারাং চর্যাপদের পাঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সন্ধ্যা ভাষার বিষয়টি সম্পাদকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

হরপ্রসাদ শাস্তারী আবিস্কৃত চর্যাপদের ১নং পদের নবম পঙক্তি ‘ভনই লুই আমহে সানে দিবা’[১৮] সানের অর্থ শব্দ সূচিতে দেওয়া আছে ‘সঙ্গঃ’, ‘সাঙ্গা’। কিন্তু ১৩২১ বঙ্গাব্দে পরিষৎ-পত্রিকায় ‘সভাপতির অভিভাষন’ নামক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চরণটির অর্থ করেছেন - ‘‘লুই বলিতেছেন আমি পণ্ডিতদের বচনানুসারে দেখিয়াছি”[১৯] শহীদুলাহ মহাশয়ের মতে ‘‘প্রকৃত পাঠ ঝানে (ধ্যানে) হইবে”।[২০] টীকায় আছে - ‘‘ মায়া লূয়ী পাদেন সিদ্ধাচর্যেন ধ্যান - বসেনেতি।... দৃষ্টং।”[২১] চরণটির অর্থ লুই বসেন আমি ধ্যানে দেখিয়াছি। পণ্ডিত শ্রী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ের সঙ্গে সহমত পোষন করেছেন-

> এই চরণের ‘সাণে স্থলে তিনি ‘ঝানে’ পাঠ প্রকৃত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। চর্য্যাপদের প্রথম পাতার ছবি উক্ত গ্রন্থের সহিত ছাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল যে মূলপুথিতে প্রকৃত পাঠে ‘সাণে’ রহিয়াছে এবং ইহার অর্থ এইরূপ (সনে) করিলে বোধ হয় সঙ্গ হইতে পারে।[২২]

কিন্তু সুকুমার সেন মহাশয় ও নীলরতন সেন মহাশয় ‘সানে’ শব্দটি গ্রহণ করেছেন। সুমঙ্গল রানা মহাশয় ‘সাণে’ শব্দটির পরিবর্তে ‘ঝানে’ শব্দটি গ্রহণ করেছেন।[২৩]

চর্যাপদের ২নং পদটি ‘কানেট চোরে নিল কাগই মাগঅ’।[২৪] শাস্ত্রী মহাশয় পদটির সাধারন অর্থ করেছেন কর্নভূষণ চোরে নিল কার কাছে চাইব। টীকায় আছে ‘‘কানেট্র প্রভাস্বরচোরেণ প্রবেশাদিবাতদোষো যদা নীতস্তদা গ্রাহ্যদ্যভাবে যোগীন্দ্রো দশানিশি ক্কাপি কিঞ্চিন্ন প্রার্থয়তি।”[২৫] অর্থাৎ প্রবেশাদিবাতদোষ রূপ কর্ণাভরণ প্রভাস্বর চোরের দ্বারা অপহৃত হলে গ্রাহ্যাদির অভাব হয়, এবং কোথাও গিয়ে যোগীন্দ্র কিছুই প্রার্থনা করেন না কিন্তু মহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয় ‘কানেট’ শব্দটি কর্নভূষনের পরিবর্তে ‘কানি’ অর্থাৎ ‘নেকড়া’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শহীদুল্লাহ মহাশয়ের এই অভিমত তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন, নীলরতন সেন মহাশয় মেনে নেননি। তাঁদের কাছে পংক্তিটির অর্থ কর্নভূষণ চোরে নিল কার কাছে চাইব (মাগত)। সংস্কৃত টীকা ও পণ্ডিতদের অভিমত থেকে বোঝা যায়-কর্ণভূষণ চোরে নিল কার কাছে চাইব অর্থটি যথার্থ।

আবার একই পদের ৭ ও ৮ নং পঙক্তি দুটির পাঠান্তর লক্ষ করা যায় -

‘দিবস বহুড়ী কাড়ই ভয়ে জাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ।’[২৬]

‘কামরু’ শব্দটি শব্দসূচিতে ‘কামরূ’, যার অর্থ কোথায়। ‘‘বোধহয়, অর্থ ‘কামরূপ’ (দেশ) হইবে।’’[২৭] এই কামরূপ শব্দ থেকে প্রাচীন বাংলায় কাঙুর, কাউর শব্দ এসেছে। তাহলে পদটির অর্থ হল

‘‘দিবসে বধুটি কালের (কাল বর্ণের) ভয়ে ভীত থাকে অথচ
রাত্রি হইলে কামরূপ যায়’’[২৮]

কিন্তু তারাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় পদটির অন্য অর্থ করেন-

> আমি উক্ত চরণ দুইটির সম্পূর্ণ অন্য রকম অর্থ করিতে চাই - তাহা আমাদের দেশে খুব পরিচিত অর্থ। যথা- ‘‘বধু দিবসে ভয়ে ভাব কাড়ে (ভাবকালি করে), আর রাত্রি হইলে (নায়কের সহিত) কামাসেবার্থ (কামারু) যায়।... ‘কামারু’র অর্থ ‘কামাস্য হেতো গচ্ছতি’ এই কথারই অপভ্রংশ প্রাকৃত রূপ ‘‘কামরু জাঅ’’।[২৯]

সুকুমার সেন, নীলরতম সেন প্রমুখ পন্ডিতগন তাঁর সঙ্গে সহমত পোষন করেন।

‘চর্যাপদ’ আবিস্কারের সাথে চর্যাপদের সংস্কৃত টীকা আবিস্কৃত হয় (পূর্বে উল্লেখ করেছি), কিন্তু চর্যাপদ গুলি রচিত হবার পর তার টীকা রচিত হয়। যখন মূল পাঠ দূবোধ্য হয়ে ওঠে তখন টীকার দরকার। আর যিনি টীকা লিখছেন তিনি সহজিয়া ধর্মলম্বী হবেন এমন কোনো কথা নেই। সুতরাং তিনি যে ভাবে মূলকে বুঝেছেন সেভাবে টীকা রচনা করেছেন। তাই টীকার উপর নির্ভর করে মূলের সর্বত্র পরিবর্তন করলে ভ্রান্তি ঘটতে পারে। কোথাও কোথাও টীকার অর্থ ছাড়া সাধারণ অর্থ দ্বারা পাঠ নির্নয় করলে চর্যাপদের যথার্থ অর্থ উদঘাটিত হয়। বাঙালি পণ্ডিত ও গবেষকগণ সংস্কৃত টীকা দ্বারা চর্যাপদের পাঠ নির্নয় করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে মূল পদের পাঠান্ত হয়েছে; যা এক জন রস পিপাসু পাঠকের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই পাঠান্তরের মাধ্যমে আদর্শ পাছ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই সকল সাহিত্য রসিক ব্যক্তিগণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চর্যাপদ চর্চা করেন।

তথ্যসূত্র :

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; ‘পরিষৎ পরিচয়’, প্রকাশক - বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রকাশ কাল - প্রথম প্রকাশ - ১৯৮১, পৃষ্ঠা - ৫১-৫২

২. অলকা চট্টোপাধ্যায়, ‘চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী’, প্রকাশক - অনুষ্টুপ, প্রকাশ কাল জুন ২০১০, পৃষ্ঠা-১৪

৩. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ (ভাগ-২১); প্রকাশক ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ’, প্রকাশ কাল ১৩২১, বৈশাখ সংখ্যা, ‘সভাপতির অভিভাষণ’,

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা -২৮ (অতঃপর গ্রন্থটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নামে উল্লেখিত হবে।)

৪. দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত। প্রকাশক 'সারস্বত কুঞ্জ', প্রকাশ কাল-২০০৯, পৃষ্ঠা - ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য - ঘ, উদ্ধৃতটি গ্রন্থের নিবেদনে নিমাই চন্দ্র পাল উল্লেখ করেন।

৫. রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রকাশক সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, প্রকাশ কাল - ১৮৭২, পৃষ্ঠা - ২১।

৬. গৌতম ভদ্র, 'ন্যাড়া বটতলায় যায় কবার?', প্রকাশক - ছাতিম বুক্স্, প্রকাশ কাল জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা - ৭।

৭. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'(ভাগ-২১) 'সভাপতির অভিভাষণ' শীর্ষক প্রবন্ধ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা -২৯।

৮. 'তদেব'; পৃষ্ঠা - ৩০

৯. 'তদেব'; পৃষ্ঠা - ৩১

১০. 'তদেব'; পৃষ্ঠা - ৩২

১১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'; প্রথম খণ্ড, প্রকাশক - মডার্ণ বুক এজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশ কাল পুনর্মুদ্রণ - ২০১৪-২০১৫, পৃষ্ঠা ১১৮।

১২. সুকুমার সেন, 'চর্যাগীতি পদাবলী', প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেচ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা - ২২।

১৩. খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (ভাগ-২৭), প্রকাশক 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ', প্রকাশ সাল-১৩২৭, 'বৌদ্ধ গান ও দোহ আলোচনা', শীর্ষক প্রবন্ধ - মহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা - ১৪৫। (অতঃপর গ্রন্থটি ''সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' নামে উল্লেখিত হবে।)

১৪. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'; পৃষ্ঠা ২৪৬।

১৫. ড. সুমঙ্গল রানা; 'চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা'; প্রকাশক ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, প্রকাশকাল - ১৯৮১, পৃষ্ঠা - ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য - (iii)

১৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (ভাগ-২৭), প্রকাশক 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ', প্রকাশ সাল-১৩২৭, 'বৌদ্ধ গান ও দোহ আলোচনা', শীর্ষক প্রবন্ধ - মহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা - ১৪৫।

১৭. 'তদেব', পৃষ্ঠা - ১৪৭

১৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'; প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রকাশ কাল শ্রাবন ১৩২৩, পৃষ্ঠা - ৫।

১৯. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'(ভাগ-২১); 'সভাপতির অভিভাষণ' শীর্ষক প্রবন্ধ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা - ৩২।

২০. খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (ভাগ-২৭); প্রকাশক 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ', প্রকাশ সাল-১৩২৭, 'বৌদ্ধ গান ও দোহ আলোচনা', শীর্ষক প্রবন্ধ - মহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা - ১৪৬।

২১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'; পৃষ্ঠা - ১।

২২. 'তদেব', তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা প্রবন্ধের আলোচনা'; শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা - ১৫৩।

২৩. ড. সুমঙ্গল রানা, 'চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা'; পৃষ্ঠা - ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য - (iii)

২৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা', পৃষ্ঠা - ৫।

২৫. 'তদেব', পৃষ্ঠা - ৬।

২৬. 'তদেব', পৃষ্ঠা - ৬।

২৭. খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (ভাগ-২৭), প্রকাশক 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ', প্রকাশ সাল-১৩২৭, 'বৌদ্ধ গান ও দোহ আলোচনা', শীর্ষক প্রবন্ধ - মহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা - ১৪৬।

২৮. 'তদেব'; পৃষ্ঠা - ১৭৪।

২৯. 'তদেব'; 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা প্রবন্ধের আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা - ১৫৩

প্রকৃত গবেষণামূলক রচনা প্রকাশে আমরা দায়বদ্ধ।

গবেষক-অধ্যাপকদের সাদরে আহ্বান জানানো যাচ্ছে আপনার চিন্তা-সমৃদ্ধ রচনাটি আমাদের দেবার জন্য।

আগামী সংখ্যা জানুয়ারি।

আপনার রচনাটি নকল রেখে হাতে লিখে বা ডি.টি.পি করে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।

ই-মেল মারফৎও পাঠাতে পারেন।

E-mail : ashis.jibonda.roy@gmail.com

শিশু মনস্তত্ত্বের আলোকে ‘পথের পাঁচালী’

শিখা হালদার*

শিশুর মানবজগতে আবির্ভাব ঘটে এক অচেনা-অজানা রহস্যময়লোক থেকে। জন্মের পর থেকে শৈশব অবস্থা পর্যন্ত (অর্থাৎ ১ থেকে প্রায় ১২ বছর) সে পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে পরিচিত হতে হতে সামাজিক হয়ে ওঠে। জীবনের এই প্রথম পর্যায়ে শারীরিক গঠনের সাথে সাথে গড়ে ওঠে মানসিক গঠনও। শৈশবের এই যাত্রাপথে চলতে থাকে ভাঙাগড়ার খেলা। সামাজিক মানুষ রীতিনীতি শিক্ষা পরিবেশ থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠে শিশুর আগামী দিনগুলির চলার পথ। শিশুর মনোজগতের সন্ধানে বড়োরা অনেকসময় নিজেদের শৈশবের স্মৃতির অনুসঙ্গ তুলে আনেন। ঠিক যেভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের দুটি শিশুচরিত্র অপু ও দুর্গার মধ্য দিযে রূপকথার রাজ্যের রহস্যটি বয়স্ক অভিজ্ঞতার সম্মুখে বিশ্লেষণ করেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের অপু ও দুর্গা আমাদের সকলের শৈশবের যেন শাশ্বত দুটি চিত্র। ঔপন্যাসিক সমগ্র উপন্যাসের ক্রমবিকাশের সাথেসাথে যেন দুটি শিশুমনের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির ছবি এঁকেছেন।

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের এই দু’জন গ্রম্য বালক- বালিকার মনকে মনের কল্পনাকে মনস্তত্বকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে হলে ফিরে যেতে হয় নিজেদের হারানো শৈশবের স্মৃতিমধুর দিনগুলিতে। অর্থাৎ, ‘‘অপু আসলে মানুষের জীবনের হারিয়ে যাওয়া উৎস ‘পথের পাঁচালী’ যেমন অপুর জীবনের দলিল তেমনি আমাদের জীবনের অনেক কিছুই গাঁথা হয়ে আছে অপুর জীবনেরসঙ্গে’’[১]। উপন্যাসের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথমটিতে ‘বল্লালী বালাই’-এর প্রথম পরিচ্ছেদেই ছয় বছরের ছোট্ট দুর্গার সাথে আমাদের পরিচয় হয়। সর্বজায়ার সংসারে গলগ্রহ ইন্দির ঠাকুরুনের ‘‘চল্লিশ বচরের নিভিয়া যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটির মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে- একমুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ হইতে চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে’’[২]। উপন্যাসের এই পর্যায়েরই তৃতীয় পরিচ্ছেদ সদ্যজাত শিশু অপুকে আমরা পাই। অপুর উপস্থিতি দৈহিকভাবে থাকলেও তার শৈশবজীবনের মনোজগতের আশা কল্পনা ও ক্রীড়া কৌতুকে বিস্তৃত বিবরণ মেলে পরের দুটি অধ্যায় ‘আম আঁটির ভেঁপু’ ও ‘অক্রুর সংবাদ’-এ।

গাছগাছালি ঘেরা নিশ্চিন্দিপুরের স্নিগ্ধ নিসর্গ প্রকৃতির আলো হাওয়ায় জাত শিশু অপু ও দুর্গা। ‘‘প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে কল্পনার বিকাশ ইহাই অপুর জীবনের

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কথা।"[৩] তাই অপুর মনকে চিনতে গেলে প্রকৃতির ভেতর দিয়েই উপলব্ধি করতে হয়।

শিশু জন্মের পর থেকে যে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে বড়ো হয় শৈশব কৈশোর থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপই জীবনের সমান গুরুত্ব পায়। তাই বাবা হরিহরের হাত ধরে ছোট্ট ছ' বছরের অপু মাঠের বেলাতে বেড়াতে ঝোপের মধ্যে খরগোশের আনাগোনা যখন দেখতে পায়, তখন অবাক হয়ে যায়— "বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ' এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তা সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা সে কখনো ভাবে নাই"[৪] তখন কল্পনা ও বাস্তবে মেশানো ভাবের দ্রুত আসা যাওয়া চলে অপুর মানস জগতে।

অপুর পরিচয়ের পরিপূর্ণতায় তার দিদি দুর্গাকে বাদ দিলে চলে না। দিদির হাত ধরেই তার শৈশবের দিনগুলি শুরু হয়েছে নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতে। দুর্গা হয়তো আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর মতোই বাগানে জঙ্গলে আমের গুটি, শেয়াফুল, নোনাফল এসবের বাহ্যিক আকর্ষণেই ছুটে গেছে নিশ্চিন্দিপুরের আনাচেকানাচে। কিন্তু অপুর মধ্যে ছিল কল্পনা বিলাসী মন। তাই "অনেক দূরের কথায় তার শিশুমনে একটা বিস্ময় মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং এর আকাশটা অনেক দূর সে বুঝাইতে পারিত না, যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত।"[৫]

শিশু এ সময় কল্পনা করতে শেখে। এই কল্পনা ও দিবা স্বপ্নের জগতে শিশু যেন ডুবে থাকে এবং হঠাৎ আবেগেরও পরিবর্তনও হয়। তেমনি অপুও মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনি শুনে নিজে সেটাকে উপভোগ করার জন্যে "কোনো গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ির পিছনে বাঁশবাগানে পথে অথবা বাহিরের উঠোনে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে.................. সেকি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ!"[৬]

কল্পনা বিকাশের পথে ভয় ও বিস্ময় শিশু চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। "আতুরী বুড়ী ডাইনির সঙ্গে অতর্কিতে সাক্ষাৎ তাহার শিশুমনের সমস্ত অপরিচয়ের ভীতি শিহরণকে তীব্র অভিব্যক্তি দিয়াছে।"[৭]

শিশুমন বড়ই খেয়ালী। চঞ্চলাপক্ষ প্রজাপতির মত তার মনে আসে নতুন ভাবনা চিন্তা নতুন আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা। তাই— "শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্তি হয়"।[৮] এই হাস্যকর অন্ধবিশ্বাস শিশুমনেরই সরলতার পরিচায়ক।

বাড়ির নিশ্চিন্ত পরিবেশে, স্নেহচ্ছায়ায় থেকে শিশুকে প্রথম যেতে হয় পাঠশালায় বা শিক্ষাঙ্গনে। বাবা হরিহরের হাত ধরে অপু গ্রামের প্রসন্ন গুরু মহাশয়ের বাড়ীতে যাত্রা শুরু করেছিল। তাই প্রথম প্রথম সে মায়ের ওপর অভিমান করে বলেছিল— "আমি কখ্খনো আর বাড়ি আসছিনে দেখো।"[৯] তারপর ধীরে ধীরে অপু পাঠশালার পড়াকে

অভ্যেস করে ফেলে। পরিচিতি গণ্ডির বাইরে পা রাখলেই তার শিশুমন অপরিচয়ের অকূল জলধিতে ভেসে যেত। তাই একদিন পাঠশালার 'শ্রুতিলেখন'কে তার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়েছে। আর শ্রুতিলেখনের 'প্রসবনগিরি', 'আকাশপথ' 'নদী-পথ-ঘাট'-এর কথা লিখিতে লিখিতে সে হারিয়ে যেত রামায়ণ মহাভারতের দেশে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'child is the father of the man' ভবিষ্যতের স্বভাব চরিত্র শৈশবের আচরণ থেকেই বোঝা যায় কিছুটা। অপুর ছোটোবেলা থেকেই বোঝা যায় কিছুটা। অপুর ছোটোবেলা থেকেই রহস্যকে উদ্ঘাটন করার ইচ্ছে প্রবল। কারণ শিশুমন এমনিতে অজানা রহস্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে সর্বদা। তাই বাবার পুরানো বাক্স থেকে বই বের করে অপু লুকিয়ে পলেছে। ''একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বই এর বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ বই ও বই খুলিয়া বই এর ভালো গল্প লেখা আছে কিনা দেখিতে লাগিল''।[১০] এমনকি পুকুরধারে নির্জন বাঁশবনে মাছ পাহারার পারিশ্রমিক হিসেবে বই পড়তে সে রাজি হয়ে যায়। বই-এ ইহিাসের যুদ্ধের বর্ণনা চিতোরের কাহিনি তার শিশুমনকে অধিকার করে রাখে।

শিশুর মনোজগেত দুটি অবস্থা মুখ্য অনুভূতি (feeling) ও আবেগ (emotion)। জন্মমুহূর্ত থেকেই এই বৈশিষ্ট্য মানব চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভূতিভূষণ অপুর মধ্যেও শিশু মনস্তত্ত্বের এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই যাত্রাদলের ডাকে অপু উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে। যাত্রার অনুকরণে একটি নাটকও লিখে বসে। যাত্রা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে সে গভীরভাবে একাত্ম হয়ে পড়ে। তখন যেন- ''জগৎ নাই, কেহ নাই শুধু অপু আছে, আর নীলমনি হাজরার যাত্রা দল আছে সামনে''।[১১] মায়ের গল্পে বলা রাজপুত্রের সঙ্গে যাত্রার রাজপুত্রের কোথাও যেন একটা মিল খুঁজে পায় অপু।

কৈশোর অবস্থাকে শিশু জীবনের শেষ পর্যায় বলা যায়— যা শিশুকে ব্যক্তি হয়ে উঠতে সাহায্য করে। বয়সের সঙ্গে মনোজগতের এই পরিবর্তন জীবনবিকাশের সহায়ক। উপন্যাসে ষোড়শ পরিচ্ছেদ থেকে লেখক দেখিয়েছেন দুর্গা চরিত্রের মধ্যে একটা পরিবর্তন। শৈশবের চাপল্য চঞ্চলতা কিছুটা হলেও কম। লেখক বলেছেন ''আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না।''[১২] শুধু শারীরিকভাবে নয় কৈশোরের রূপের আভাস নয়— দুর্গার পরিবর্তন এসেছিল মানসিক স্তরেও তাই নীরেনের প্রতি দুর্গার একটা সুপ্ত আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। নীরেনবাবুর সাথে পথে হঠাৎ দেখা হলে, নীরেনের প্রসঙ্গ উঠলে এখনো হয় নাই, রাত্রি শেষের অলস অন্ধকার এখনও জড়াইয়া আছে''।[১৩] দুর্গার চরিত্র থেকেও শৈশব সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। শৈশবের স্নিগ্ধ আবেষ্টনের মধ্যেই কৈশোরের নবীন আলোর দেখা দিয়েছিল দুর্গার মনে। যদিও তার এই স্বপ্ন বেশিদিন

স্থায়ী হয়নি। দুর্গার এই অকালমৃত্যু প্রভাব ফেলেছিল অপুর শিশুমনে। অপুর শৈশবজীবনে দুর্গার মৃত্যু প্রথম বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়ে দেখা দিল। দিদি চলে যাওয়ার পরের চড়কপুজো তার কেমন নিঃসঙ্গ লেগেছে। তাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল ফুটলে, পাখির ডাকলে, ওড়কমলির ফুলের দুলুনিতে তার দিদির জন্যে মন কেমন করে। অপুর ইচ্ছে হয় দিদির কাছে এক মুহূর্তে ছুটে চলে যায় কিন্তু সে পারে না। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় অতিপরিচিত পথে ঘাটে- বাঁশবনে-আমতলায় অপু দিদিকে খুঁজে পেয়েছে অনুভূতিতে। তাই দিদির চুরি করার কথা জানতে পেরেও অপু গোপনীয়তা রক্ষা করেছে। দিদির ওপররাগ করেনি। দিদিকে সে উপলব্ধি করেছে দিদির জীবনের অপ্রাপ্তির জায়গা থেকে। হঠাৎ অপুর শিশুমন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে যায় দিদির স্মৃতির মধ্যে দিয়ে— "তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না।"[১৪] অর্থাৎ মনের মধ্যে কখনো তীব্র, কখনো শান্ত, কখনো মনমরা ভাব। মনস্তত্ত্বের ভাষায় থাকে বলে 'morbid state of mind'- অপুর মধ্যেও লেখক সেই নিখুঁত অনুভূতিগুলিকেও সঞ্চারিত করেছেন।

উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায় 'অক্রুর সংবাদ' অংশে অপুর শৈশব জীবনের শেষ ও একইসাথে কৈশোরের হাতছানি চোখে পড়ে। যদিও নিশ্চিন্দিপুরে থাকাকালীনই অপুর লুকিয়ে চুরুট ও সিগারেটের সাথে পরিচয়ের মধ্যেই কৈশোরের একটু আভাস আমাদের চোখে পড়ে। নিশ্চিন্দিপুরের নিশ্চিন্ত শৈশবের আবেষ্টন থেকে অপু মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের অচেনা শহরে এসে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। পিতা হরিহরের মৃত্যু তারপর থেকে অসম্ভব দারিদ্র্য অপুকে শৈশবের স্বপ্নের জগৎ থেকে ব্যবহারিক জীবনে বন্ধুর পথে নিয়ে গেল, ধনী বাড়ির মেয়ে লীলার সাহচর্য-সান্নিধ্যও অপুর তরুণ বিকাশোন্মুখ মনের উপর যেন রেখাপাত করেছিল।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে বলতে পারি, বিভূতিভূষণ অপু ও দুর্গার মধ্য দিয়ে শিশু মনের এপিঠ ও ওপিঠের দুটি দিককে দেখালেন। প্রকৃতির মায়া জড়ানো রূপে বিভোর হয়ে যাওয়া শিশুমন-অপু, অপরদিকে বাহ্যিক আনন্দের পথে ধাবিত শৈশবে চঞ্চল দুর্গাকে। উপন্যাসে দুর্গার মৃত্যু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দুর্গা বেঁচে আছে পাঠকের কাছে শৈশবের আম কুড়োনোর নির্মল স্মৃতির মধ্যে। আর অপুর শৈশবচিত্র— শিশুমনের টানাপোড়েন এক নস্ট্যালজিক আবেদন ধরা দেয় পাঠকের কাছে। অপুর শৈশবের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা এত সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে 'পথের পাঁচালী'তে, যে শৈশবের সেই অমৃতকুণ্ড-এর পথে যাওয়ার বাসনা নিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। লেখক যেমন নিজের শৈশবের অনুভূতিকে অপুর মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন আমরাও তেমনি নিজের শিশুমনকে খুঁজে পাই 'পথের পাঁচালী'তে। তাই 'পথের পাঁচালী' যেন শিশু মনস্তত্ত্বেরই একটি নিখুঁত দলিল।

তথ্যসূত্র ঃ

১. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, 'বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী লোকায়ত জীবনের গান', সাহিত্য সঙ্গী পাবলিশিং, কলকাতা, ৩রা জুলাই ২০১১ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ১০৩।
২. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'পথের পাঁচালী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, বৈশাখ, ১৪১৭ (পঞ্চাবিংশ সচিত্র সংস্করণ), পৃ. ৬
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি.
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'পথের পাঁচালী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা বৈশাখ, ১৪১৭ (পঞ্চবিংশ সচিত্র সংস্করণ), পৃ. ৩২
৫. তদেব, পৃ. ৪০-৪১
৬. তদেব,পৃ. ৪২
৭. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলিকাতা, (সপ্তম পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ), ১৯৮৪, পৃ. ৬০৫
৮. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'পথের পাঁচালী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, বৈশাখ, ১৪১৭ (পঞ্চবিংশ সচিত্র সংস্করণ), পৃ. ১৩১
৯. তদেব, পৃ. ৭০
১০. তদেব, পৃ. ১৩১
১১. তদেব, পৃ. ১৫১
১২. তদেব, পৃ. ১০৬
১৩. তদেব, পৃ. ১২১
১৪. তদেব, পৃ. ২১০

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ ঃ

ক) দত্ত রায় ড. তিস্তা, 'বাংলা শিশুসাহিত্য রায়বাড়ি ও পরম্পরা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, (প্রথম প্রকাশ ২০১৪)
খ) 'শিশু ও শিশুমন', (পরিকথা), সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়- পত্রিকা, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৭
গ) নন্দী রতনকুমার, 'পথের পাঁচালী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১২

ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক ঃ ছোটো গল্পের হিরন্ময় উদ্ভাস

সুরজিৎ সুলেখাপুত্র*

প্রকৃতি বর্ণনা ঃ কীরূপ স্বতন্ত্র তা দিয়েই নাকি লেখকের জাত চেনা যায়। প্রথমে ১৯৯৮ সালের একটি গল্পটি থেকে এক টুকরো রাতের বর্ণনা দিয়ে শুরু করা যাক : ‘‘বাতাস-ভাপা আকাশে কিছু তারা কেঁপে কেঁপে চরাচরকে ধরে রেখেছে একটি ফ্রেমে। তার মাঝে ভাস্কর্য-সদৃশ অথচ বিমূর্ত শরীরের গায়ে খাই-খুই টুকরো গোটা ছিটকে আসা কুকুরের দুনিয়া দোলা ডাক পিছলে পিছলে সব মুছে দিয়ে যায়-যেন তাদের শরীর ছাড়া মন বলে কিছু নেই। মাঠের নির্জনতায় দূরে গাঁ, অন্ধকারের সংস্থানে আবছা। প্রদীপ, হ্যারিকেনের আঁচল-বাঁচা দাপুটে আলো আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাওয়া ভাঙ্গা, ভাঙ্গন-শুরু মোটামুটি একটি ছবির তলায় তারা।” (জাগর)

এর ছাব্বিশ বছর পরের এক গল্পে দুপুরের প্রেক্ষাপটে একটি মাঠের ক্রমশ বদলাতে-যার আদলের মধ্যেও চিরন্তন প্রকৃতি কীভাবে নিজেকে ধরে রাখে, তার এক ছবি এবার দেখব আমরা ঃ

‘‘জি টি রোডের ধারে জনমানবশূন্য বানজারা মাঠ, রনরন করে বেকার হাওয়ায় ছবি, মাঝ বরাবর হাইটেনশন তার, নীচে একটা দুটোপাখি, তার নীচে গাই-গরু, তার নীচে কাঁচা শুকনো ঘুঁটের ফাঁক-ফোকরে ধুঁড়সে যাওয়া গিটি পাথর, একাই একটা শেয়াল ছুটে ছুটে থেমে থেমে জমিটাকে মাঠ করে তোলে।

.... পাথুরে জমিতে জামবুদ্দিনের গ্যারাজ ওঠে, সন্তোষের চা-সামোসার উলুন ওঠে, পাশে ঘোষালের রুম ওঠে, রুমের গায়ে নারকোল গাছ ওঠে, কচি আমগাছে ক্রিম রক্তের নতুন পাতা ফারায়, মাঠের হাওয়া থমকে জিরায় বগলের বাঁশঝাড়ে। ..... কেরোসিনের ধোঁয়া আর পাম্পের দপদপানি ডোবার ধারের কলমিলতা আর বেদম বাড়া দুর্বাঘাসকে কাঁপায়-মাঠের শূন্যতা কুঁচকে ওঠে। মাঠকে-মাঠ গড়িয়ে পড়া ফাগুনে রোদ আলসে গতর ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ায় দুপুরে, বিকেল হতেই রোদ উধাও, মাঠে লম্বা রোদের ছায়া সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যায় রাতের আঁধারে তখন শিরশির হাওয়ায় কচি নারকোল পাতায় দুলে দুলে শিশির বসে নিশ্চিন্তে, সকাল অব্দি লন্ঠন হাতে চাঁচ মাঠ-পাহারায়। অনেক সকালেও নারকোল গাছের ছায়ায় খানিকটা রোদ রাতের ঘোরে দেয়াল ঠেস দিয়ে হাই তোলে, রাত জানা চাঁদ মাঠের কিনারে রোদ চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমোয়।” (হেজেমনি)।

---

*কবি ও প্রাবন্ধিক

এবার আমরা পড়ব বৈধ-অবৈধ কয়লাখনি অধ্যুষিত কালিপাহাড়ি জনপদের স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলের এক নির্মোহ বর্ণনা। আসানসোল মহানগর সংলগ্ন এই ছোট বসতিটির হিউম্যানস্কেপ বা সমাজদৃশ্যপট লেখকের কলমে কীভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে দেখা যাক ঃ

"কয়লা-ভরা মালগাড়িটা হড়হড় শব্দে ফাঁকা রেললাইনকে কঁকিয়ে আলসে গতরে পথ ভাঙে পোয়াতির চালে, আর-লাইনে এক্সপ্রেস ট্রেন ঝনঝন ক'রে কুত্তাকুত্তির মতো দৌড়ঝাঁপ করে। গাছপালার আড়াল থেকে কুড়নো কয়লা কলে ধুয়ে ভেজা কাপড়ে পাঁচ-ছটা কামিন ধাওড়া ফেরে। এঁটো বাসন কুকুরে খায়, পাখাছিঁড়ে বাছুরটা ঘনে গুঁতো মেরে খুরখুর ল্যাজনেড়ে বাঁট চোষে। চারটে দশের বর্ধমান লোক্যাল লাইন দাবড়ে তিড়িংবিড়িং চলে গেল। চারটে পচ্‌পনের ঝাঁঝাঁ লোক্যাল মেন লাইনে এক্সপ্রেসের স্টাইলে সাঁ-ফুরুৎ হয়ে গেলে শুনশান উঠোনের কোনায় তসলি থেকে চরে চরে গুগলিগুলো মাটিতে পড়ে খোলায় ঢোকে অচানক। পাঁচটার মিনির ট্যা-ট্যারট হর্নের ঠোক্করে নন্দুর বৌ চমকে ওঠে। জাগাহীন, নন্দুহীন উঠোনে একা লছমি কাঁচা কয়লার ধোঁওয়া -ওঠা। চুলা নামায়, টাইট-বাঁধা খুচরো চুল ধোঁয়ার সঙ্গে ধোঁয়ার মতোই লছমির মাথার চারপাশে ওড়াওড়ি করে।" (বেনোজল)

রানিগঞ্জ-শালতোড়া-মালিয়ান রুটের একটি ভাঙ্গাচোরা বাসের ড্রাইভার-খালাসি-কন্ট্রাক্টরের নিত্যদিনের জীবন একটু হাল্কা কৌতুক মিলিয়ে পুনর্গঠন করলেও তাতে বাস্তবতা এতটুকু টোল খায়না ঃ

"শালতোড়া পর্যন্ত বাসের কান্না আর ফোঁসফোঁসানির ভেতর ঠাসা ভিড়ে নিঃশ্বাসগুলো বাসের ছাদে ঝুলে থাকে, তার নীচে যত রাজ্যের বাখনাবাখনি তেজ-নরম চাপ চাপ জমাট বাঁধলে সবার মুন্ডুগুলোই জেগে থাকে চিত্রবিচিত্র গা-গতরের নাকানিচোবানির ওপর যতক্ষণ না পাতলা হতে হতে ময়দান করে যাচ্ছে বাসটাকে। কচকচানি কমলে ফড়ালুল ভিডিও চালায়। লফর গানের তালে তালে বাসের গায়ে চাঁটি মারে....ভিডিওর ভেতর মেয়েমদ্দা নাচে, ভিডিও নিজেও নাচে, সবকিছু থেকে সরে পেপার পড়া বাবুর পেপার নাচে, অক্ষরগুলো লুটোপুটি খায়, দাঁড়ানো যাত্রীরা-এ-ওর গায়ে পড়ে মেয়ে হলে পড়তেই থাকে, মদ্দা হলে ঠেলা দেয় পাশের মদ্দা, বাসের পিছন থেকে ছিটকে আসা গান সারা বাসে ঠোকাঠুকি খায়, বাসের লজঝড় সঙ্গতে জানালার কাচ, ঢিলে নাটবল্টু, আল্‌গা সিটগুলোর নতুন মিউজিক ওঠায়; সবকিছুই গানের তালে নাচে, লফরের বডি নাচে, মাথা নাচে, হাত ও নাচে।" (চাঁদের সওয়ারি)।

লেখকের এই সমাজ-বাস্তবতা রাজনীতি মুক্ত হওয়া অসম্ভব। তাই সিপিএম উত্তর কয়লা অঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গে বিত্তহীন অবাঙ্গালী মানুষগুলির ছোট ছোট সুবিধাবাদ লেখকের নজর এড়ায় না। এই বহুমাত্রিক জগৎ বর্ণনায় ও সংলাপে মিলেমিশে তাঁর লেখনীতে কী চেহারা নেয়, তার চমৎকার উদাহরণ আমাদের পরের উদ্ধৃতি ঃ

"নন্দুর ঘামে ভেজা কপাল আরও ছোট হয়ে যায় বউয়ের বাতচিতে। খাদ, বিজ্জা,

ডিজেল, মিট্রি খোদানা সব ঝপাছপ মাহাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে। দাওয়াই আসমান কা চাঁদসে ভি বাহার-ছেঁদাকে সালানা-কিয়ারা দিয়ে থুয়ে খেতি করে নাফা কোথায়? লছমির সাদি হয়ে গেলে মথুর, নাংটা, ছেঁদা, জগা, ফুচুরা কি পা মাড়াবে নন্দুর আঙ্গনে? 'ওর দো সাল, মহাতাল তো বোলে, কমিশন রুপয়া দেনা ইস্টাট কিয়ে, সরকার হাতমে চেক দিচ্ছে...তবে সিবি আই হো যায়ে তো মুখ্যমন্ত্রী হাত ধো-কর বৈধ যায়ে গা, জিন্মাদারি নেবে না। নন্দুভাবে সিবিআই পাটি এতনা বড়া দুশমনি গরিব আদমির সঙ্গে নিশ্চয় করবে না। করেকে ক্যায়া ফায়দা? চেক বাঁটছে সরকার তুম লোগকা ক্যায়া গাঁড় ফটিতা হ্যায়? মথুরকে একদিন নন্দু বলে, 'তোহরা পাটিসে সিবিআই পাটি জাদা পাওয়ারফুল, লাগরাহা? ত উস পাটিকা লিভার বন খাও। দুগনা ভোট দেঙ্গে। জুলুস নিকাল, সারে ঘরকা আন্ডাবাচ্চা সবকো লাইনমে খাড়া কর দেঙ্গে।" (বেনোজল)।

সমাজ বাস্তবতার অন্যদিক হল ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব। এটি আবার রাজনীতির বৃহৎমাত্রার বিপরীতে ক্ষুদ্র কিন্তু অন্তরঙ্গ মাত্রায় কাজ করে। লেখকের প্রথম দিকের একটি গল্প থেকে এর উদাহরণ দেখা প্রয়োজন ঃ

"বাসিনীবালার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বহু বছরের অভ্যাস। সামনে কাঁপা কিন্তু উজ্জ্বল প্রদীপের শিখায় সমস্তযত্ন রেখে পুত্রের দিকে সরল চোখে তাকাল। পুত্র, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যার অপমান পেরনো অহঙ্কার যেমন সব মায়ের মুখে, তাঁরও আছে; যে বিশ্বাসে গৃহস্থের উঠোনে শরীর ফেলে ধান খায় পাখি, কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয় — বহু রগড় অতিক্রমী পরীক্ষিত বিশ্বাসে পুত্রস্নেহের যাবতীয় অনুভব জেগে উঠলে সুবিমলের মাথায় হাত বোলানোর ইচ্ছা যায়। ডান হাতটি মাথায় উঠে এলে সুবিমল খোলা আকাশের নীচে আর একবার মাকে দেখে; প্রদীপের শিখায় ছেলেমানুষ অন্ধকারে এলোমেলো মায়ের মুখ।" (ইতিহাসে, মাঝেমাঝে) মনস্তত্ত্বের গভীর প্রদেশে রয়েছে মানুষের সুপ্ত যৌনকাতরতা। উত্তরপ্রদেশের প্রেক্ষাপটে এক আশ্রমের তরুণ সন্ন্যাসী তার অবদমিত এই যৌবনতা নিয়ে মনে মনে কীভাবে নাজেহাল হচ্ছে, তা লিখতে গিয়ে লেখক ইচ্ছে করেই অনবরত সংস্কৃতের ঝঙ্কারময় শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন এবং এইভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় এক কৌতুকাবহ কিন্তু গম্ভীর পরিস্থিতি ঃ

"নবীন সন্ন্যাসী বড় বিভ্রান্ত, বড় উচাটন। তাই অন্ধকার; মন্দিরে আসা পূজারিনীদের সদ্যপ্রস্তুত লালাঙ ঊষাকাশহেন মোলায়েন কপালে চেরির টুকরো যেনলাল টকটকে সিঁদুর-সূর্য, একটু চাপ দিয়েই নিভাঁজ-কপালে শিল্পীর স্বভাবে আঁকে সে, তাতেই নবীন সন্ন্যাসী প্রমত্ত শক্তিসংযুক্তং কামবাণান্বিত সংসার দহনসক্ষম, খঞ্জনাক্ষী স্তনযুগগত মুক্তাদামদীপ্তাং যুবতীর ললাটেই কত তেজ! না জানি, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারের শরীরে কী আছে! কুচভারে নমিতাঙ্গী পিনোন্নত পয়োধরাম, রূপসীরা এখন, এই একাকীত্বে আশ্চর্য বিভায় তেত্রিশকোটি পীনোতুঙ্গস্তনাং হয়ে নবীন সন্ন্যাসীকে তছনছ করতে থাকে।"

বিভিন্ন গল্প থেকে উদ্বৃতি আরো সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু আপাতত এই যথেষ্ট। ‘রাষ্ট্রদ্রোহীরা’ এবং ‘হেজেমনি’ নামক যে গল্পগ্রন্থদুটি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি আমরা, তাতে যথাক্রমে পাঁচটি ও ছয়টি, অর্থাৎ মোট এগারোটি গল্পে এমন উদাহরণ অজস্র। লেখাগুলি অনুসরণে, লেখকের প্রবনতা কীভাবে সময়ের সাথে সাথে বদলে গিয়েছে, এবং কেমন তার প্রধান দিকচিহ্ন-সেদিকেই এখন আমরা মনোযোগ দেব।

দুই :

‘হেজেমনি’ বইতে যে ছয়টি গল্প আছে, তার প্রথম দুটি লেখকের প্রথম জীবনের রচনা। জাগর (১৯৮৯) এবং ইতিহাস, মাঝেমাঝে (১৯৯৪)-এই দুটি লেখা পেরিয়ে এরপর আমরা পাই চাঁদের সওয়ারি (২০১৪), বেনোজল (২০১৫) এবং হেজেমনি ও ঐতেরেয় (২০১৬), বইটি ২০১৭ সালে প্রকাশিত। অন্যদিকে, ২০১২ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্পগুচ্ছ ‘রাষ্ট্রদ্রোহীরা’ তে যে পাঁচটি গল্প আছে, তারা কমবেশি ২০০৭ থেকে ২০১২ সময়পর্বের মধ্যে লিখিত। অর্থাৎ, প্রথম দুটি গল্পের পর প্রায় দশ বছরের ব্যবধান পেরিয়ে আমরা আবার শেষ দশ বছরে লিখিত গল্পগুলির ছোঁয়া পাচ্ছি। এই অসম্পূর্ণতা একদিক দিয়ে সুবিধাজনক, কারণ গল্পকারের লেখনী ও মনন কীভাবে বদলেছে, চরম দুই সীমায় লিখিত গল্পের বিশ্লেষণে সেই পরিবর্তন অনেক স্পষ্টভাবে ধরা সম্ভব।

‘এবং প্রান্তিক’ প্রকাশিত হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়-এর গল্পগ্রন্থ ‘হেজেমনি’র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এর সেমিনার হলে। উদ্বোধন করলেন - প্রফেসর এমিরিটাস রফিকুল ইসলাম (বাংলাদেশ), ড. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফেসর ড. সুমিতা চক্রবর্তী এবং ড. মোনালিসা দাস (বাঁদিক থেকে)।

স্থান, কাল ও পাত্র, তথা চরিত্র-এই তিন স্তম্ভের উপর যেকোনো সাহিত্যকর্ম দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা একে একে এইগুলি বিচার করব।

প্রথমত, স্থান। তাঁর প্রথম দুটি গল্পের ভৌগোলিক স্থান সুনির্দিষ্ট নয়। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট নামধারী দলের রাজত্বের মধ্যপর্বে অথবা তার কিছুটা পরে, যখন পার্টি শ্রেণিসংগ্রাম ও শোষণমুক্তির আদর্শ শুধু স্লোগানে সীমাবদ্ধ রেখে ক্রমশই স্থানীয় ও আঞ্চলিক ক্ষমতাকেন্দ্র নির্ভর দুর্নীতিপূর্ণ এক পদ্ধতিতন্ত্রে পর্যবসিত হচ্ছিল, সেই সময়ে স্থানীয় অন্তর্দ্বন্ধ এবং ব্যক্তি-নৈতিকতার টানাপোড়েন এই দুই গল্পের মূল কেন্দ্র। স্বাভাবিক ভাবেই বিভ্রান্তি এবং মতাদর্শগত আত্মসমর্পণে গল্প শেষ হয়। কিন্তু লক্ষ্যনীয়, দুই গল্পেরই কোনো স্পষ্ট ‘লোকেমন’ বা স্থানিকতা নেই। পশ্চিমবঙ্গের যেকোনো জেলার ছোট শহর

অথবা শহরের কাছাকাছি বড়ো জনপদ গল্পের স্থান হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। স্থানের এই 'সাধারণীকরণ' পদ্ধতি হিসেবে ভাবনা বা দর্শনের সঙ্কট সেই সময়ে গোটা রাজ্যেই ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল, স্থান, সুনির্দিষ্ট করে দিলে সেই বৃহত্তর সত্য থেকে গল্পদুটি ভ্রষ্ট হতে পারত।

কিন্তু, পরবর্তী পর্বে লেখকের গল্পগুলির স্থানঙ্ক অনেক সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। কর্মসূত্রে মধ্যবয়সে তিনি আসানসোল মহানগর সংলগ্ন কয়লাখনি পরিপূর্ণ ছোট কয়েকটি জনপদের বাসিন্দা হয়েছেন, সমাজবিজ্ঞানীর নিষ্ঠা ও নৈর্ব্যক্তিকতায় পর্যবেক্ষণ করেছেন এই খনিঅঞ্চলের আর্থ রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরসমূহ এবং তাদের মধ্যে সংযোগের জটিলতা, আর লেখনীতে উঠে এসেছে সেই অভিজ্ঞতার সম্পদ। আসানসোল রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক ভূগোল তাঁর এই পর্বের গল্পগুলির শিরায় শিরায় মিশে গিয়েছে, চাইলেও চরিত্রগুলি এবং তাদের জাগতিক মানসিক সক্রিয়তাগুলি অন্য কোনো ভৌগোলিক বাস্তবতায় নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। ভূগোলের শাস্ত্রীয় পরিভাষায়, তিনি প্রথমে ছিলেন সিস্টেম্যাটিক বা প্রণালীবদ্ধ, আর শেষে উত্তরোত্তর হয়ে উঠেছেন রিজিওনাল বা আঞ্চলিক। খনি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর লেখায় শুধু সমষ্টিমাত্র হয়ে থাকেনি, সমষ্টিকে ছাড়িয়ে বৃহত্তর এক সত্তা অর্জন করেছে। আঞ্চলিক ভৌগোলিকেরা তাঁদের গবেষণায় অঞ্চলের এই 'সত্তা' টিকেই প্রতিষ্ঠা করার অনবরত চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় ঃ স্থানের এক বিশেষ মাত্রা হল প্রকৃতি। প্রকৃতি বর্ণনার উদ্বৃতি দিয়েই আমরা এই লেখা শুরু করেছিলাম। প্রকৃতির প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে কোনো চরিত্রই বাস্তবের মাটিতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে না।

লেখকের প্রথমদিকের গল্পদুটি এই ব্যাপারে ও বিশিষ্ট। এখানে দেখতে পাই, তিনি বৃহত্তরভাবে কীরূপে প্রকৃতিকে কাজে লাগাচ্ছেন, চরিত্রকে কীভাবে পরিবেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করছেন, এমনকী মানসিক ক্রিয়া, চিন্তাপ্রক্রিয়ার প্রতিটি সূক্ষ্ম ওঠানামার ভেতরে ও সমান্তরালভাবে ব্যবহার করছেন প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে। অনেক তাই, — ফলে গল্পের গতি কম, কিন্তু সূক্ষ্ম উপভোগ বেশি ছিল। এই উপভোগে তিনি অনায়াসে ব্যবহার করেছেন চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের অনুভব, এমনকী, এচিং টর্সো প্রভৃতি পরিভাষা প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেননি। এইভাবে ভাষা হয়ে উঠেছে ধাতুতক্ষণ অথবা কাঠখোদাইয়ের এক অনবদ্য শিল্প।

'জাগরণ' গল্পে রমেশ অখিল ও শ্যামল এই তিন যুবক, স্থানীয় নেতা নগেনদার বিরুদ্ধে পাল্টা সংগঠন গড়ে তোলায় জন্য আলোচনা চালায়, শ্যামল নিশ্চিত, অখিল ও অনেকখানি, কিন্তু রমেশ এদের সঙ্গে থেকেও যেন নেই। রমেশ দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শ্যামলের দলে যোগ দেবে কীনা - শুধু এই দোলাচলটুকুতেই গল্প আবর্তিত হয়। রাজনৈতিক এই প্রেক্ষাপটের এতটুকু ক্ষতি না করে লেখক কীভাবে প্রকৃতি ও তার শৈল্পিক উপলব্ধি বাক্যে বাক্যে

সঞ্চারিত করতে থাকেন, তার দু'তিনটি নমুনা না দিলেই নয়। (নিম্নরেখ প্রাবন্ধিকের)।

১। ''শ্যামল কিছু বলার জন্য তৈরি হয় অথচ জুৎসই কোনো শব্দের অভাবে কার্যত নৈঃশব্দ্যকে ভাঙচুর না করলেও তার ভেতরে ভেতরে আলো দেখা পোকার মতো বাক্যের হুড়োহুড়ি থাকে। সে হুড়োহুড়ির শব্দ, কী প্রতিক্রিয়া, কী ক্রিয়াই, তার চোখে মুখে আয়তন পেয়ে যাচ্ছে, বেশ দেখিলা হাবভাবই। ফলে অন্ধকার তাকেও একটু একটু করে টরসো করে তোলে। তবু সে বেশ স্পষ্টতা নিয়েই অবকাশে আঁকা।"

২। 'রমেশের চামড়া ঝুলে পড়ে, চুল, হয়তো মাথাটাও-যেন ভাগাড়ের ন্যাড়া গাছের ভালে শকুনের কাতার। তাদের বাতাস-চেরা আওয়াজ সারা মুখে ভয়ের চড়চড়ানি।.... ভ্যানিস চাঁদের বিপরীতে এসব গড়ে তোলা, ধ্বসে যাওয়ার নির্মাণ আর কারো চোখে পড়ার মতো বিশদ নয়।"

৩। 'চোখের কাঁপন আর থিকথিক মাংসপেশী; শিরার অস্থিরতা; এক পাশে নিঃসাড় হাঁক-হারানো মাঠ, মাঠের কিনারে রুগী নদী, তার একপাশে নিথর দাঁড়িয়ে থাকা অশ্বথের ছায়া, লম্বালম্বি বাবলা ঝোপ ছাড়া সবাই বিমূর্ত। কেবল তার শরীরটিই একমাত্র অন্ধকার - কোঁদা ভাস্কর্য। অথবা বর্তমান-বিপন্নতার কেমন যেমন একটি নিখুঁত এচিং।"

৪। ''সন্ধ্যার খোলা অন্ধকার থিরিয়ে থিতিয়ে কেঁদকাঠ-কোঁদা মূর্তির মতো ফুটিয়ে তুলেছে তাকে। শ্যামল অবাক হয়ে মন্ত্রপড়া দৃষ্টিতে অখিলকে দেখে।"

চিন্তাপ্রক্রিয়ার সাথেও প্রবৃত্তির সমান্তরাল উপস্থিতি এই লেখাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে যেমন ঃ

১। ''রামের জিজ্ঞাসাচিহ্নময় বাক্যটি অন্ধকারে লাট খেতে খেতে শ্যামলের চোখে নিয়ে আসে খর সন্দেহ। স্থিরতর রমেশের অন্তর্গত সত্তাকে বিশদ জানার জন্য সে ঈশৎ নরম - যেন গাছের ফাঁকে ফাঁকে, আড়ে সাড়ে শিকারী পাখির ডাক।"

২। ''ঝিম মেরে যায় তিনজনাই। গাছের সঙ্গে গাছ, যেন আকাশের সঙ্গে আকাশী বাহার। অন্ধকারে ঈশৎ লঘু করা চাঁদ মাথায় উঠি-ডুবি করলে তিনজনাই বর্তমান হারা হয়ে যায়।"

৩। ''উত্তেজিত শ্যামলকে ঘিরে বাবলা গাছের ঘন ডালভাঙ্গা জ্যোৎস্না, ছলছলে চাঁদ নদীতে সাঁতারু, নেচে নেচে ঢেউ ভেঙ্গে, আলো বিছিয়ে — যেন উপরের চাঁদ আর সাঁতারু চাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনা তার চোখে মুখে।"

এই গল্প শেষ করতে লেখকের লার্জ স্কেলে প্রকৃতিকেই আবার দরকার হয়, বোধহয় চরিত্রগুলির থেকে দূরত্ব তৈরি করে তিনি পাঠককে উদাসীন দ্রষ্টা হতে প্ররোচিত করার জন্যই আবার প্রকৃতির কাছে যান, রাজনৈতিক অস্থিরতাও বিভ্রান্তির ভেতর থেকে যায় এর ফলে — এক অস্ত্রে দুই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। শেষ অনুচ্ছেদটি এতই মৌলিক যে, তা উল্লেখ না করলে এই আলোচনার ক্ষতি হবে।

"জ্যোৎস্নাকে খোলা করে শ্যামলের হাতে ছুরি হিসিয়ে ওঠে, লহমায় রমেশও বার করে পিস্তল - আকাশে বাতাসের মাঝে। হিলমিলে নদীর ওপর পিছলে আসা দূর গাঁয়ের ইঙ্গিত ঢালা পাতলা কুকুরের ডাক আর দুই যুযুধান বন্ধু হাতে অস্ত্র দেখে অখিল সহজ হতে হতে আঁতকে ওঠে, আচমকা দৌড় লাগিয়ে দৌড়ে, শেয়ালের মতো ফিরে ফিরে, লুকিয়ে লুকিয়ে, পিছনে শ্যামল, টালমাটাল অখিল মাঝখান রমেশ — পিস্তলরেঞ্জের মধ্যে এসে আবার একে অপরে হারিয়ে যায়....চাঁদ কখনো ওঠে কখনো ডোবে, মেঘে মেঘে ফিকে ঘন আলোর খেলায় তারা আরো মেতে ওঠে, চাঁদ ও চাঁদ-চাঁদাডু খেলায় একাকার....তারা তিনজনেই প্রার্থনা করে জমাট অন্ধকারের তাদের হাতের ভাঙন, হাঁসফাঁস শরীরের মোচড়, চুলের ওড়াওড়ির ফাঁকফোঁকরে চাঁদ পালাবার পৃথিবীকে ক্রমেই বাড়িয়ে তোলে....."

দ্বিতীয় গল্পচিত্তে ও (ইতিহাসে, মাঝেমাঝে) এই প্রবণতা যথেষ্ট রয়েছে। এখানেও ঘন অন্ধকার, হঠাৎ দেশলাইয়ের আলোর কেঁপে ওঠা, কাঁপতে থাকা অপরিচিত কিন্তু ক্ষণিকের সব ছায়া, প্রদীপের নিবু নিবু আলো, চাঁদ মেঘ — এইসব উপকরণের নিবিড় প্রয়োগ লক্ষণীয়। চরিত্র, তার রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সঙ্কট, পরাজয়ের দিকচিহ্ন — সবকিছুর প্রেক্ষাপটেই কোষপর্যন্ত যেন নিয়ামক ভূমিকা নেয় প্রকৃতি, চরিত্রের অন্তর্গত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে বুঝতে সে সাহায্য করে। "এখানে মানুষের ছায়া নাই, ছায়া মানুষের শ্রমে দ্রবীভূত।" অথবা "পড়ে আসা রৌদ্র টাঙির তীক্ষ্ণতায় দ্বিগুন।" — এই রকম বেশ কিছু বাক্য এ প্রসঙ্গে লেখকের মৌলিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ের গল্পগুলিতে লেখক প্রকৃতির তথা পরিবেশের এই ব্যবহার থেকে সরে এসেছেন অনেকখানি। মানুষের বাজার সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রকৃতিকে বৃহৎমাত্রা না দিয়ে তিনি এই পর্বে শুরু করলেন বিপরীত কাজ : প্রকৃতির বা পরিবেশের প্রেক্ষাপটে মানুষ ও তার সমস্যার বৃহত্তর ও বহুমাত্রিক নির্মাণ। এবং আমরা তো আগেই লিখেছি এই পর্বে তিনি বেছে নিয়েছেন তাঁর অভিজ্ঞতার চারপাশ — আসানসোল রাণিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের আর্থ সামাজিক দৃশ্যপট। ফলে চাঁদের সওয়ারি গল্পে বেসরকারী বাসকর্মীদের জীবিকা ও জীবন, 'বেনোজল' গল্পে প্রান্তিক কৃষক ও তার চারপাশের সামাজিক-রাজনৈতিক মলিনতা, 'হেজেমনি' গল্পে একটি ধর্ষণের সমান্তরালে মূল্যবান হয়ে ওঠা একটুকরো জমি নিয়ে আর্থ-রাজনৈতিক জটিলতা, 'উড়ান'গল্পে বেআইনি কয়লাখাদ মালিকের বেপরোয়া অপরাধ, 'ধস' গল্পে দ্বিচারী ও ব্যর্থ এক স্কুলশিক্ষকের নিজস্ব লড়াই' 'রাষ্ট্রদ্রোহীরা' গল্পে একেবারে নীচুতলার সমাজ ও তার নিজস্ব নৈতিকতার বিচিত্র বহিঃ প্রকাশ, 'পলাতক' গল্পে দক্ষ কিন্তু লোভী এক গাড়ি - মিস্ত্রির অবধারিত দুঃসময় এবং পরম্পরা গল্পে ই সি এলের এক মাইনিংসর্দারের জীবন আশ্রয় করে কোলিয়ারি কোয়ার্টাস ও চারপাশের রাজনৈতিক এক নিবিড় চিত্রায়ন ফুটে ওঠে। এরা সবাই খনি অঞ্চলের বৃহত্তর বাস্তবতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মাঝে মাঝে মনে হতে থাকে, এই গল্পগুলো সব মিলেমিশে

আসলে একটাই গল্প — পরিবর্ধিত ও সামগ্রিক এক প্রতিবিম্ব। এই কারনেই একক ভাবে ও গল্পগুলোর বিস্তার ছোটো গল্পের তুলনায় একটু বেশি-প্রতিটিই প্রায় ২০-২২ পাতা দীর্ঘ।

তৃতীয়, কাল বা সময়ের প্রসঙ্গে; প্রথমদিকের গল্পগুলিতে স্মৃতিচারণ বা ফ্ল্যাশ ব্যাক থাকলেও কোনো কাল বিপর্যাস ঘটেনি। কিন্তু পরের গল্পগুচ্ছে বারবার সচেতনভাবে অ্যানাক্রনিজম ঘটানো হয়েছে, পরিস্থিতিকে আরো বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্যই। নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতার পাশাপাশি রয়েছে অজস্র ব্যক্তিগত বাস্তবতা এবং তাদের প্রতিটিই স্মৃতিনির্ভর পুনর্সজ্জার কারণে কাল বিপর্যয়ে আক্রান্ত। আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে কিংবা মাঝের ঘটনা শেষে - ইত্যাদি হল স্মৃতির ধর্ম এবং আমাদের প্রত্যেকের নির্মিত বাস্তবতা এই চরিত্রের। তাই বাস্তবতার স্বার্থেই লেখককে সরে আসতে হয় সরল রৈখিক বা লিনিয়ার বর্ণনাভঙ্গি থেকে, সৃজন করতে হয় বহুমাত্রিক এক কাল-ধারণা, যা গল্পকে আপাত-জটিল করে তুললেও শেষ পর্যন্ত সাফল্য এনে দেয়। 'পরম্পরা', 'হেজেমনি', 'ঐতরেয়' প্রভৃতি গল্প এই অ্যানাক্রনিজম ব্যতিরেকে কল্পনা করাই সম্ভব ছিল না।

চতুর্থত, আমরা আগেই লিখেছি, মানুষের স্ববিরোধ ও সুবিধাবাদ, এবং নিছক বেঁচে থাকার জন্যই তার জৈবিক তাড়না ও অনৈতিকতা লেখকের গল্পে এক বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আঁকা হয়েছে। আর সেইজন্যই তাঁর লেখা সম্পর্কে আরো দুটি পরস্পর সম্পর্কিত সত্য চিহ্নিত করা কঠিন নয়। যেমন, এক, তাঁর বেশিরভাগ গল্পই একটা প্রবাহের ভিতর শেষ হয়। শেষ বাক্য নির্ভর গল্প (যেমন, দেনা-পাওনা কিংবা সুভা)। অথবা ক্রমিক বিকাশের মাধ্যমে যেসব গল্প উপলব্ধির চরমে পৌঁছেদেয় (যেমন, পোস্টমাস্টার অথবা একরাত্রি), এই দুই ধারার থেকেই এরূপ গল্পের পথ অনেকটাই আলাদা, এক্ষেত্রে শুরু ও সমাপ্তি দুইই কিছুটা অনিশ্চিত, যেন অন্যভাবেও আরম্ভ ও শেষ হতে পারত গল্পগুলি — তাতে মূল গল্পের কোনো ক্ষতি হত না, যেন গল্পটা শুরু হওয়ার আগেও অনেককিছু ঘটেছে এবং শেষ হওয়ার পরেও প্রকৃতই শেষ হবে না, চলতে থাকবে অনন্তকাল। আসলে বাস্তব ঘটনাও তো তাই — চিরপ্রবহমান, এবং যাবতীয় গল্প হল শেষ পর্যন্ত সেই প্রবাহ থেকে তুলে নেওয়া একটা স্ট্রেচ, অথবা বিস্তার, যার সত্যি সত্যি কোনো শুরু ছিল না, শেষও নেই। উড়ান গল্পে বেআইনী খাদান মালিক আসলামের অপরাধ নয়, অপরাধের প্রতি তার বেপরোয়া মনোভাব পুরো গল্প জুড়ে প্রতিষ্ঠা পায় একটা রাজনৈতিক-সামাজিক প্যাটার্ন বা ছকের অঙ্গ হিসেবে, এবং সেইজন্যই মোতিয়াবিবির ঘরে ঢুকতে-না-পাওয়া আসলামের অনিশ্চিত ফিরে যাওয়া দিয়ে গল্প শেষ হলেও বাস্তবতা কোথাও আহত হয় না, গল্পটি উত্তীর্ণ হয়ে যায়। হয়তো বৃহত্তর একটা উপন্যাসের কোনো অধ্যায় হিসেবেই।

এবং দুই, তাঁর সমাজচিত্র অন্তত প্রাথমিকভাবে দূরবীনে দেখা নয়, মাইক্রোস্কোপে

দেখা। সমাজ যদি একটা চাদর হয়, তাহলে তার প্রতিটি আঁশ, সুতো, বুনট, ভাঁজ ও নক্সা তিনি নিবিড়ভাবে দেখান। তাই রাবীন্দ্রিক ধরনের বৃহৎ, অখণ্ড ও চিরকালীন কোনো দর্শন তাঁর লেখায় প্রতিধ্বনিত হয় না। বোধহয়, তাতে তিনি বিশ্বাসও করেন না। কেননা, প্রতিটি দর্শন তার নিজস্ব স্থান-কালে বন্দী। এবং এই স্থান-কালের নির্দিষ্ট বাস্তবতা একটি ছোট নদী বা পাহাড় পেরিয়ে গেলেই বদলে যায়।

এই স্থান-কাল আবদ্ধ সত্য থেকেই তাঁর গল্পের শিরোনামগুলিও উঠে আসে। যেমন, 'জাগর' গল্পে তিন বন্ধুর অবিশ্বাস আর সশস্ত্র পশচাদ্ধাবনের ছবিটাই শেষ পর্যন্ত 'জাগ্রত' হয়ে থাকে — বাম বিভ্রান্তির প্রতীক হিসেবে। 'ইতিহাসে,মাঝে মাঝে' — কী ঘটে, অর্থাৎ সাময়িক প্রতিরোধের পর সংগঠিত ব্যবস্থার সামনে ব্যক্তিমানুষের অসহায় আত্মসমর্পণ—এটা যে মাঝে মাঝেই ঘটে, তা 'ইতিহাসে' শব্দটির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর ব্যাঞ্জনা লাভ করে। সুবিমলের আদর্শগত পরাজয় আনুবীক্ষনিক, কিন্তু তার তাৎপর্যটি আনুবীক্ষনিক নয়।' হেজেমনি', 'ধস' অথবা 'পরম্পরা' গল্পের ক্ষেত্র ও একই কথা। অর্থাৎ লেখক দেখেন এবং দেখান মাইক্রোস্কোপ দিয়ে, কিন্তু তার তাৎপর্য দূরবীন দিয়ে দেখার স্তরে পৌঁছে যায়।

পঞ্চমত, লেখকের এই দেখা প্রথমদিকে ছিল নিরাসক্ত পর্যবেক্ষকের। আমরা দেখেছি, প্রথম গল্পে (জাগর) কীভাবে তিনি দূরত্ব সৃষ্টির জন্য গল্পের শেষে বৃহৎ মাত্রায় প্রাকৃতিক আলো ছায়া ও চাঁদের থাকা না-থাকাকে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ লেখকের পছন্দ ছিল না চরিত্রের সাথে নৈকট্য বা সম্বন্ধ স্থাপন। তাদের দূর থেকে বুঝতে চাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। সেই বর্ণনার নিখাদ মিষ্টতা বা সাবলীলতা থেকে ইচ্ছে করেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছিলেন তিনি, চরিত্র ও তার পরিবেশের সাথে সামান্যতম মানসিক সংযোগ ও তাঁর গল্পকে আবেগপ্রবণ ও ব্যর্থ করে দেবে — এই রকম আশঙ্কা থেকে তিনি সংলাপ বাদে বর্ণনার অংশগুলিতে সর্বত্র ভাষাকে যেন খোদাই করে তার থেকে নৈর্ব্যক্তিক সম্ভাবনা নিংড়েবের করার চেষ্টায় মেতে উঠেছিলেন।

কিন্তু পরিণত পর্বের গল্পে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্রমশ অংশগহণমূলক হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, আগে তিনি যেন দর্শক আসনে বসে ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন, আর এখন খেলোয়াড় হিসেবে সক্রিয়ভাবে খেলার মধ্যে থেকে, খেলতে খেলতেই পুরো খেলার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পাঠককে দিতে শুরু করলেন। এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা, এই প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়ে তাঁর ভাষা ও শব্দ চয়নের বিশিষ্টতায়। চরিত্রেরা অসংস্কৃত, কিন্তু লেখক সংস্কৃত — এই পার্থক্য তিনি আর রাখতে চান না, এতে দেখার প্রক্রিয়াটি দূরান্বয়ী হয়ে যায়; এবং যে বাস্তবতা পরিশীলিত নয়, তাকে পরিশীলিত ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বাস্তবকে বিকৃতই করে।

'বেনোজল' গল্পে তাই পশ্চিমবঙ্গের বাম-রাজনীতি-উত্তর সাব-অল্টার্ন ক্ষমতায়নের যে প্রক্রিয়া তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও বিপদ সহ শুরু হয়েছে, তা ঝাড়খণ্ড সীমান্ত ঘেঁষা

বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি মিশ্রিত নিম্নবর্গের একটি জনপদে কী রকম চেহারা নিয়েছে, তার বর্ণনায় লেখক নিজের শিক্ষা ও সংস্কার একপাশে সরিয়ে রেখে অনায়াসে চরিত্রের স্তরে নেমে যান সচেতন ভাবে এবং বর্ণনা ও সংলাপে এক প্রতিসাম্য সৃষ্টি করে বাস্তবকে জীবন্ত করে তোলেন ঃ

''মথুরের ধারের জন্য নন্দুর কপাল দুশ্চিন্তায় খোঁদা মাঠ, খাঁড়ো ভাঁজে চিন্তায় নুন। 'আইঠাই খরচ করে না তো ধার-উধার হোতেই রহে গা। জলদি সাদি-উদি কর, জিম্মাদারি বাড়েনা, সোব কনট্রোলমে আ যায়ে না।'

নতুন সরকার, নতুন ও সিপি-মথুর ইয়াং লিভার, পুরনো সরকার গিরবার কত্তো পহলে এই সরকারের দলের মার-খাওয়া কর্মী। মথুর, এখন চলচলট পজিসনে, নতুন ওসিপির বড়ো ড্রোসার একমুঠি কয়লা তোলার আগে মথুরের পারমিশন মাগে, ওসিপির কন্ট্রাক্টর হরদম মথুরের দরজা খটখটায়। মথুর কি ঘরে থাকার লিভার? সব বুঝে বুঝে কন্ট্রাক্টরবাবুই ওকে মারুতিটা দিয়েছে আনা যানার পরেশানি কমাতে। মথুরের গায়ের পসিনার মহক গায়েব করে দিয়েছে পার্ক এ্যাভিনিও ছিরিক ছিরিক। মথুর গাড়ির ভেতর এদিক সেদিক সেন্ট ছিটায়।'' (বেনোজল)।

'রাষ্ট্রদ্রোহীরা' গল্পেও আমরা দেখি, ওয়াগন ব্রেকার শ্যামলালের হয়ে লেখক নিজেই বলছেন ঃ ''সেই যে ইস্টেশনবাবু মাইকে পোথমে হিন্দি তারপর বালের বাংলায়, ইঞ্জিরিও হয়তো বলেছিল, কে শোনে, বলে দিয়েছে ২২৩২ ভাঙন লোক্যাল টেরেন আসানসোল ছেড়েছে আধঘন্টা লেটে তারপর সাঁই সটাৎ সাঁইসটাৎ রেল পাটরিকে নড়বড়ে করে ক'টা এক্সপেরেস কালিপাহাড়ির মুহে সুতে দিয়ে পার হল কোন ঢ্যামনিচোদা গুনে দেখেছে? — তাও ২২৩২ লা-পাতা!''

প্রথমপর্বে যে নিরাসক্তি ও নৈর্ব্যক্তিতার উল্লেখ করেছি, তার প্রভাব গল্পের বর্ণনা অংশের ভাষাগঠনেও পড়েছে। প্রায় সর্বত্র জ'টিল বাক্য, এবং বারবার কমা চিহ্ন ব্যবহার করে, সেমিকোলন ও ড্যাস সহকারে বহু পরস্পর-সংযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন ভাবের একত্র সমাবেশে ছবির নির্মাণে বহুকৌনিকতা সৃষ্টি হয়। সুখপাঠ্যতা থেকে ভাষা দূরে সরে যায়। ভাষা ক্রমশ আর বিষয়ের বাহন থাকে না, নিজেই বিষয় হয়ে ওঠে — অর্থাৎ ভাষার স্টাইলটাই 'পাঠ্য' করে তোলেন, নিজে ও সরে যান কিছুটা আড়ালে। এই বাস্তবতার নানা স্তর। সচেতনভাবেই তাঁর লেখার মূল উপজীব্য অল্পশিক্ষিত ও দরিদ্র মানুষের সংশয়, সুবিধাবাদ, আত্মসমর্পণ, বিভ্রান্তি, ক্ষোভ, লোভ ও অসহায়তা, এই স্তরটিকেই তিনি নির্বাচন করেছেন তাঁর পরিণত পর্বে। ভাষা ও হয়ে উঠেছে এই জগতেরই উপযুক্ত। সংলাপে অকথ্য গালি-গালাজের প্রবাহ বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন তিনি, আসলে পাঠকের কাছে শব্দগুলি গায়ে-কাঁটা-দেওয়া রকমের অশ্লীল হলেও চরিত্রদের কাছে নেহাতই তা কথার মাত্রা বা লব্‌জ - কোনো বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না। অন্য গড়পরতা লেখকরা এইসব চরিত্রের

মুখ থেকে শব্দগুলি সযত্নে সরিয়ে দেন বা ইঙ্গিতমাত্র রেখে বিন্দু চিহ্ন ব্যবহার করেন এবং এইভাবে নীচুতলার বাস্তবতার এক মধ্যবিত্ত সংস্করণ নির্মাণ করেন, যা আগাপাশতলা মিথ্যা। আমাদের লেখক কিন্তু বাস্তবকে সংস্কার করেন না, বরং অসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করে সচেতনভাবে মধ্যবিত্ত পাঠককে তার ঠুনকো নিরাপত্তার বলয়ে ঢাকা ভঙ্গুর সত্যের পাশাপাশি জাগ্রত সমান্তরাল অন্য সব সত্যের সামনেও এনে ফেলতে চান এবং 'Culture is Volue free" এই আপ্তবাক্য আশ্রয় করে এমন এক সংলাপের জগৎ সৃষ্টি করেন, যাতে যৌনকাজ ও অবৈধ জন্মদানের অবিরাম উল্লেখ, যা এমনকী তাঁর গল্পের প্রথম বইটির প্রকাশককে পর্যন্ত বলতে বাধ্য করে ভাষাটি 'কিম্ভুত'। কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কার সামনে বেঁচে থাকার অন্ধ, জৈবিক ও মরিয়া লড়াইগুলি এই কিম্ভুত ভাষার আশ্রয় করেই টিকে থাকে, সকল সৌন্দর্য পেরনো অসুন্দরের গর্ভে দ্বান্দ্বিকভাবে এক বৃহত্তর সৌন্দর্য জেগে ওঠে। তথাকথিত এই অসুন্দরের প্রতিষ্ঠায় লেখক দৃশ্যচয়নে তাই বারবার জোর দেন কফ, থুতু, ঘাম, মুত, পায়খানা ও পানের পিক-এই ছয়টি শরীর নির্গত বর্জ্য উপাদানের যত্রতত্র পড়ে থাকা বা ত্যাগের দীর্ঘ বর্ণনার ওপর, যার সাহায্যে তিনি গড়পরতা, নান্দনিক বোধকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালান, মধ্যবিত্ত পাঠকের ওপর যা পরিকল্পিত আক্রমনের সমতুল্য হয়ে ওঠে। কিন্তু লেখক যে কোনো স্তরেই দ্বান্দ্বিক স্ববিরোধিতাকে ভুলে যান না, তার নির্ভুল স্বাক্ষর পাওয়া যায় 'পরম্পরা' গল্পের লক্ষীবাবুর মূল্যবোধে, মধ্যবিত্ত জীবিকা ও জীবনযাত্রা থেকে খসে যাওয়ার বহু বছর পরে ও মাইনিং সর্দার লক্ষীবাবুটের পান, "খাদানে নামতে নামতে, সিমের পর সিম পেরোতে পেরোতে অপরিচিত ও অভদ্র গালাগাল সুপরিচিতে ভদ্রস্থ হয়ে যায়....তা বলে ঐ খিস্তি সিমের বাইরে? সারফেসে? জেনটিলম্যানরা,কঙ্‌ভি নেহি...", অথবা চাঁদের সওয়ারি গল্পের একেবারে শেষে লেখক জানিয়ে দেন রানিগঞ্জ মলান রুটের অশিক্ষিত যৌনকাতর হেড খালাসি লফর প্রকৃতপক্ষে ঘোষাল, সাকিন আমড়াতোড়া, পিংস্বর্গত কার্তিকচন্দ্র ঘোষাল, যে কীনা বেশ্যালয়ে ফুর্তি করতে গিয়ে হঠাৎ "চোখের ঢাকনার ভেতর দেখল সত্তরটা আঙ্গুলের দেওয়াল। সাতটা মুখের তীব্র ধিক্কার।" এই ব্রাহ্মসন্তান কি তার সংস্কারের কাছেই হেরে গেল আসলে — অথচ যা তার জীবনে এক পাঠকদের হাতেই এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায় ছেড়ে দিয়েছেন লেখক।

এইভাবেই, অনেক স্থানে লেখক না চাইলেও হয়তো দ্বান্দ্বিকতার শর্ত মেনেই নিজেও কিছুটা কাব্যিক হয়ে উঠেছেন। সেইসব জানালা দিয়ে, বিরল হলেও, কালেভদ্রে বৃহত্তর দর্শন উঁকি দেয়। রুদ্ধশ্বাস বাস্তবতার জেল খানায় তা সামান্য চাঁদের আলোর বিভ্রম সৃষ্টি করে।

আমাদের বিচারের বিষয় এখন গল্পগুলির ব্যক্তিচরিত্র। তাঁর গল্পে চরিত্রগুলির সাধারণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুবই উল্লেখযোগ্য।

এক, চরিত্রেরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিমানুষ এবং একক হয়েও তাদের নিজ নিজ

আর্থ-সামাজিক শ্রেণির প্রতিনিধি। তারা, এই অর্থে, অনেকটাই ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক — বহু মানুষের প্রতিনিধি স্বরূপ গল্পে আসে ও ক্রিয়া করে।

মধ্যবিত্ত পার্টিকর্মী আদর্শবাদী সুবিমল,খনি অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষক নন্দুপাসোয়ান, কয়লা মাকিয়া আসলাম, মাইনিংসদার লক্ষ্মীবাবু, গাড়িমিস্ত্রি আসগর কিংবা পথশিশু হয়ে বেড়ে-ওঠা নাংটা—এরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিগত প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেব, যৌনতা, অপরাধ, নিষ্ক্রিয়তা ও মৃত্যুভয়ের পরিসরে নিজ নিজ শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে উজ্জ্বল।

দুই, চারিত্রিকভাবে প্রায় প্রত্যেকেই দ্বান্দ্বিক, অর্থাৎ আদর্শ, মূল্যবোধ ও সদর্থক প্রবণতার পাশাপাশি একইসাথে স্বার্থপর ব্যভিচারী ও দায়হীন। পরস্পর বিপরীতের এই সহাবস্থানের ফলে কোনো চরিত্রই পুরোপুরি সাদা অথবা কালো নয় — প্রত্যেকেই ধূসরের নানা মাত্রায় বিরাজ করে।

'ধ্বস' গল্পের অখিলবাবু অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক, এক ব্যর্থ পিতা, যার সন্তান অবৈধ কয়লাখাদের ব্যবসায় সফল, যিনি স্ত্রীর শরীরে ভাবী পুত্রবধূকে উপভোগ করতে কুণ্ঠিত হলনা, তিনিই অন্যদিকে এক চিলতে ব্যক্তিগত বাগান, বাঁচিয়ে রাখতে সংগঠিত আক্রমণের বিরুদ্ধে অটলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। গল্পের শেষলগ্নে গান্ধীজির সাথে এই স্কুলশিক্ষকের সমান্তরাল কিন্তু পরোক্ষ কিছু প্রতিতুলনা গান্ধীর নিজস্ব স্ববিরোধ ও ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে লেখাটিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়।

একইভাবে 'চাঁদের সওয়ারি' গল্পে লফর, 'পরম্পরা' গল্পে লক্ষ্মীবাবু, ' পলাতক' গল্পে আসগর, 'রাষ্ট্রদ্রোহীরা' গল্পে নাংটা তাদের নিজস্ব স্ববিরোধিতা সহ স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

তিন, তাঁর গল্পের প্রথম দিকে চরিত্রেরা প্রধানত মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে তাদের সহজাত দোলাচল সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ঐ দোলাচলই মূলত গল্পের উপজীব্য। কিন্তু পরবর্তী কালে চরিত্র হিসেবে বারবার উপস্থিত হয়েছে নীচুতলার মানুষ এবং তাদের সুবিধাবাদ, ভয়, লোভ ও আত্মসমর্পণ।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় অবশ্যই বলবার আচে। বাংলা সাহিত্যের পরম্পরা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাধারণত মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিচারিতা ও সিদ্ধান্তহীনতা কেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে যেসব ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকারেরা কাজ করেছেন, তাঁরা অনেক সময়ই নিম্নবর্গীয় মানুষের নৈতিকতা, প্রতিরোধ ও মানবিকতার ছবি ও খুব উজ্জ্বলভাবে পাশাপাশি তুলে ধরেছেন। এ যেন একই প্রকল্পের পরিপূরক দুই অংশ। এঁরা অনেকেই রাজনৈতিকভাবে সাম্যবাদী হলেও এক্ষেত্রে তাই বলা চলে, সাম্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে অনেকখানি সরে গিয়ে তাঁরা ভাববাদী রোম্যান্টিসিজমের শিকার হয়েছেন, কারণ, নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট ব্যক্তি স্বার্থপরতা, হিংসা ঈর্ষা নীতিহীনতা ও সুবিধাবাদ। আমাদের আলোচ্য লেখক কিন্তু ব্যতিক্রমীভাবে এই প্রবণতা থেকে অনেকটাই

মুক্ত।' ঐতরেয়' গল্পের তরুণ সন্ন্যাসীর মতো দু'একটি চরিত্র বাদ দিলে তাঁর গল্পের মানুষগুলি সত্যিই যেন সম্ভাব্য সব রকম অর্থে 'রক্তমাংসের মানুষ'; পদে পদে তাদের সহজাত স্ববিরোধিতাগুলি চেনাতে চেনাতে লেখক গল্পগুলিকে পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছেন।

চার, তাঁর গল্পে প্রধান প্রতিটি চরিত্রের জীবিকাজগৎ বিপুলভাবে উপস্থিত। অনেকক্ষেত্রে অথবা বাসযাত্রার বিস্তৃত বর্ণনা। আর, এটাই তো সঠিক, কারণ, রাস্তা আর জীবিকার পরিবেশে তো মানুষ দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায়। 'পলাতক' গল্পেতাই বকর আলিলেন, মাইম ইব্রাহিম লেন, মির্জা লাগিব লেন, গাঁজাগলি প্রভৃতি মুসলিম মহল্লার মধ্যে শিরা-উপশিরা মতো ছড়িয়ে থাকা রাস্তা, তার ভিড়, দোকান, ঠেলাঠেলি, থুতু আর ঘামের গন্ধ নিয়ে সরাসরি যেন চরিত্রের সমতুল্য হয়েই দেখা দেয়। এরপর ঐ গল্পেই দেখি আসনর মেকানিকের জগত পরিস্ফুট করতে নিয়ে গ্যারেজের পরিবেশ আর আসানসোল অটো মার্কেট তার গলিখুঁজি কীভাবে চরিত্রের মতন যত্নে জীবন্ত করে তোলেন লেখক। উড়ান গল্পে কয়লমাফিয়া আসলামের পাশাপাশি সমান গুরুত্ব নিয়ে জেগে থাকে তারই সৃষ্ট বেআইনী কয়লাখাদের বাস্তব পরিবেশের খুঁটিনাটি। চরিত্র ও তার পরিবেশ এইভাবে একাকার হয়ে এক সামগ্রিকতা তৈরি হয়।

পাঁচ, যেখানে যেখানে তিনি পারিবারিক পরিবেশ তুলে ধরেছেন, সেখানেও মলিনতা, জৈবিক তাড়না ও কূটনীতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'পরম্পরা' গল্পে লক্ষ্মীবাবু 'ভদ্রলোকের সংসার ও তাই মানিক বাউরির 'ছোটলোকের সংসার থেকে করুনভাবে পার্থক্যটুকু ধরে রাখে একটা ব্যাপারেই ঃ ''ভদ্রলোকের বউ হয়ে মাতাল স্বামীর মদের টাকা দিতে মদভাটিতে যাওয়া, মানিক বাউরির বউ পারে, শিখারানি ঘোষালের কাছে প্রেস্টিজ ইস্যু।'' অথবা ভর দুপুরে লক্ষ্মীবাবু মাতাল হয়ে গেলে শিখারানিকে ভাবতে হয় তাকে ''ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুম পাড়ানোর কথা, নতুন মাতাল প্রতিবেশীর কাছে সম্মান রাখার সবচেয়ে সহজ পথ। মদ খেলেও আমরা ভদ্দরলোক, বাউরি-বামুনে কোথায় তবে?''

অন্যদিকে 'পলাতক' গল্পে আসগর মিস্ত্রির ভাইপোর সংলাপে যে বিপন্ন পারিবারিক কাঠামো ও শৈশবের নিষ্ঠুর ছবি লেখক এঁকেছেন, সত্যিই বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা খুব কমই আছে ঃ

.....''জানতে হ্যায় চাচাজী....মাম্মি না কাল রাতমে ঘরসে নিকাল গয়ে যে.....আব্বু পকড়কে লে আয়া খুব মারে খুব মারে, গালি ভি দিয়া খুব — বোলতা হ্যায় কি 'বাপুচুদি গাঁড়মে বাঁশ ঘুষা দেঙ্গে....চাচা গাঁড়মে বাঁশ ঘুযে না? সাইমে ঘুষতা হ্যায়? গাঁড়মে তো স্রিফ টাট্টি নিকলতা হ্যায়....হিহি....ঘুমতা তো নেই কুছ।' তার কথার জবাব না পেয়ে একটু চুপ করেই আবার বলে, 'জানতে হ্যায় চাচা, মাম্মি ফির বাচ্চা পয়দা করেগি....আব্বু বোলতা হ্যায়, ই বাচ্চা মেরা নেহি হ্যায়, তব তো হামলোগোভি আব্বুকা নেহি হ্যায়....হাম তো মাম্মিসেই পয়দা হুয়ে? মাম্মিজিতো বহুত রোয়ে বহুত রোয়ে....আব্বু ফির মারে, মাম্মি

গুস্সাসে...হিহি...আব্বুকা বিচি পকড়কে ঝুল দিয়া...হিহি...আব্বু অ্যায়সা চিল্লাতে রহে হিহিহি...আম্মি ছোড়েই নেহি....আব্বু চারিতরফ ক্যা ঢুঁড়ে ক্যা পতা উসকে বাদনা মাখিকো বাল পকড়কে ঘরমে ঘুসায়, শিকলি দে দিয়া, বোলে, ক্যা শোচা, হাম অ্যায়সে বুড়বক তুঝে তালাক দেঙ্গে? কভ্ভি নেহি, তুমকো এই সেই রহনা পড়েনি....চাচা জানতে হ্যায়.....পাপ্পা দোসরা সাদি করেনা.....”

এই ভয়ঙ্কর পারিবারিক বাস্তবতা বেশিরভাগ পাঠকেরই সহ্য হবে না। কিন্তু একে এড়িয়ে যাওয়াও হত লেখক হিসেবে এক কৌশলী ও নিরাপদ দ্বিচারিতা, অথবা বলা চলে, ‘যা শোভন ও সুন্দর — শুধু সেটুকুই সত্য’, নাকি ‘শুধু যা সত্য-তাইই সুন্দর’ — এই বিতর্কে লেখক স্পষ্টভাবে তাঁর অবস্থান বেছে নিয়েছেন।

ছয়, তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতি সম্পৃক্ত। লেখক বিশ্বাস করেন, মানুষ একটি আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক জীব এবং সেই রাজনীতির নানারকম স্তর, যা পারিবারিক থেকে শুরু করে বৃহত্তর রাষ্ট্রকাঠামো পর্যন্ত বিস্তৃত। অতএব তাঁর গল্পে ব্যক্তি মানুষের জীবন ও সামাজিক নির্মাণেও বিভিন্ন স্তরে রাজনীতি অর্থাৎ দল, ক্ষমতা ও স্বার্থর বৃহত্তর সংঘাত নিবিড়ভাবে গ্রথিত কিন্তু প্রতিটিই তার নিজের নিজের ক্ষুদ্র পরিসরে গল্পে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে যায়। যেমন, ‘হেজেমনি’ গল্পে ঘোষালের ছাত্রবয়সের ব্যক্তিগত বামপন্থার আলগা মানবিক মুখ ফুচু-টুনির প্রেম সার্থক করে তুলতে দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে, অন্যদিকে ঘোষালের জমিতে একদিকে বেআইনী কয়লা অন্যদিকে উন্নয়নী হাউসিং-এর কমপ্লেক্স যখন বিপুল বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তখন তার মধ্যে নানাস্তরে যে রাজনৈতিক শক্তি ও যথেচ্ছাচারের শুরু হয়, তার ঘূর্ণিতে টুনির ধর্ষণ এবং ঘোষালের জমির হস্তান্তর আর ব্যক্তিগত থাকে না, দুজনের পরাজয়ই আপাদমস্তক রাজনৈতিক হয়ে ওঠে।

সরাসরি রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ ও পার্টিকর্মীদের নিয়ে গল্প-লেখা শুরু করে আমাদের লেখক পরিণত বয়সে বৃহত্তর সমাজের রাজনৈতিক ভাষ্য এইভাবে প্রস্তুত করেছেন গল্পের পর গল্পে - ‘ধস’, ঐতরেয়’, ‘পরম্পরা’ প্রভৃতি যার আদর্শ উল্লেখ।

সাত, তাঁর গল্পের বেশিরভাগ চরিত্র ও তাদের পরিস্থিতি উঠে এসেছে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতরে ভিতরে যে রাষ্ট্রবিরোধী পরিসর সক্রিয় - তার গভীর থেকে। রাজনীতি ও প্রশাসনের পরোক্ষ সমর্থনে সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়া বেআইনী কয়লা উত্তোলন ও তার বাণিজ্যের বিভিন্নমুখী প্রসার, জমি বাড়ি নির্মাণশিল্পের অন্ধকার পরিসর, বাবারবাড়ি গাড়ির এঞ্জিন ও স্যাসে নম্বর বদলে চোরাই গাড়িকে ন্যায়সঙ্গত রূপ দেওয়া, জুয়া, মদ ও নীল ছবির দোকান, লোক ঠকানো ব্যবসার ফিকিরে রাতারাতি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে মন্দির নির্মাণ—এইসব অসুস্থ পরিসরে তাঁর লেখনী ইচ্ছে করে ধাক্কা খেতে খেতে এগোয়। যে পরিসর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক পাঠক সচেতনভাবে ভুলে থাকতে চান, লেখক এইভাবে তাদের

মনে করিয়ে দিতে চান যে বালিতে মুখ খুঁজে থাকলেই আত্নরক্ষা করা যাবে — এই দিন আর নেই, সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে সরকারী চাকরির নিরাপত্তার কবচ কুন্ডল ধারণ করে স্বাধীনতা - উত্তর ভারতবর্ষে যে নিরাপদ মধ্যবিত্ত শ্রেণি এতদিন রূঢ় বাস্তবের গা বাঁচিয়ে সমান্তরালভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন, অবশ্যই নিজেদের দ্বিচারিতা ও স্ববিরোধী শ্রেণিচরিত্র সহ - তাঁরা আজ 'পরস্পরা' গল্পের লক্ষ্মী ঘোষাল, 'ধস' গল্পের রিটায়ার্ড স্কুল শিক্ষক অখিল তালুকদার অথবা হেজেমনি গল্পের ক্যাশবাবু ঘোষালের মতোই বিপন্ন, আর সমান্তরাল নেই, তা এখন সমান্তরাল বাস্তবতা। তাঁদের শান্ত মধ্যবিত্ত জীবন বিদ্ধ ক'রে এফোঁড় এফোঁড় করা শুরু করেছে। রাষ্ট্রের সাজানো সুনাগরিকত্বের পরিসরে রাষ্ট্রদ্রোহী এই অন্তর্ঘাত আগামী দিনে আরো বিভূত চেহারা নেবে একুশ শতকের প্রথম দশকের শেষে এখন গল্পগুলিকে তাই মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎবাণীর মতো মনে হয়।

আমরা লক্ষ্যকরি, বেশিরভাগ গল্পের শিরোনামই শুধু নয় — গল্প গ্রন্থদুটির নাম ও যথাক্রমে 'রাষ্ট্রদ্রোহীরা' এবং হেজেমনি' — দুটিই নিবিড়ভাবে রাজনীতিসম্পৃক্ত উচ্চারণ।

আট, চরিত্রগুলিকে তিনি বারবার এই সমান্তরাল রাষ্ট্রদ্রোহী প্রক্রিয়ার হাতের পুতুল হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, এক হিসেবে তাই তাঁর লেখা যেন এক নতুন পুতুলনাচের ইতিকথা। সমাজ-রাজনীতির বৃহত্তর খাঁচার ভিতরে চরিত্রেরা বন্ধী-যদি স্বাধীন হত, তাহলেই তাদের গল্প হয়ে যেত সুখপাঠ্য রম্য রচনা। পাঠককে তাই তৃপ্তি দেওয়া নয়, বিরক্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। পাঠকের সুবিধাবাদী, বিভ্রান্ত ও পুতুল - অবস্থানকে চিনিয়ে দেওয়াই তাঁর ব্রত।

নয়, তাঁর চরিত্রগুলির আরেকটি বৈশিষ্ট্য খুব ব্যতিক্রমী। একমাত্র সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বেশ কিছু গল্প ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এর উদাহরণ বেশি নেই। আচরণবাদী (বা বিহেভেরিয়ালিজম' তত্ত্বে বলে মানুষ কোনো নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব পরিবেশের সাথে ক্রিয়া করে না। বাস্তবতা সম্পর্কে তার মনে যে ব্যক্তিগত ধারণা আছে — তার সাথেই তার সম্পর্ক। বিপদসঙ্কুল এক জলাভূমি নির্ভয়ে পেরিয়ে এসে এক পথিক যখন জানল যে কী ভয়ঙ্কর পথ সে পেরিয়ে এসেছে, তখনই আতঙ্কে তার হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেল — ফ্রাঞ্জ কাফ্কার একটি অনুগল্পের এই ঘটনা প্রায়শই আচরণবাদের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ছোট থেকে মানুষ যে প্রথা, রীতিনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার, অভিজ্ঞতা, ঐতিহ্য, লোককথা ও মিথের জগতে বড়ো হয়, সেগুলিই বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে তার বাস্তবতা সম্পর্কে উপলব্ধি ও 'মনে হওয়া'কে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এই আচরণবাদী দুএকটি অতি দুর্দান্ত ঝিলিক আমাদের লেখকের গল্পে পাওয়া যায়।

যেমন, 'উড়ান' গল্পে বেআইনী খনিতে ধ্বসে চাপা পড়ে মৃত্যুর পর সেই মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলার জন্য প্রত্যক্ষদর্শীকে দিয়েই কবর খোঁড়ানো হচ্ছে মৃত ফুলিটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ দর্শীরাও এই অবস্থায় অন্ধকারে মোমবাতির আলোয় মাফিয়া সর্দার আসলামের

হঠাৎ মনে হল ঃ ''হাতের গাঁতাইটাও....প্রাচীন থেকে মধ্য পেরিয়ে আধুনিক যুগের অস্ত্রের আদলে বদলে বদলে আবার চলে যাচ্ছে আধুনিক-মধ্য-প্রাচীন যুগে, কখনো রূপকথার দানবীয়তায়, যেন এখনি ঐ একটা শরীর হাজার হাজার দৈত্য শরীর হয়ে প্রতিধ্বনিত করবে অট্টহাসি।'' তবে এই আবেশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। লেখক বলেন। ''আসলাম ইতিহাস ও রূপকথার হ্যালুসিনেসন থেকে নিজেকে বার করে শেষ পর্যন্ত স্থির করে ফেলে কী করতে হবে।''

অথবা 'পলাতক' গল্পে আসানসোল পাক্কাবাজার জুতোপট্টির একটা নোংরা গলিতে মোটর মেকানিক আসগর একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখে স্বর্গের অপ্সরা ভেবে বসে। লেখক তখনই বিভ্রম সৃষ্টি করেন ঃ ''হুরি তখনো তার দিকে বেবাক তাকিয়ে আছে, পেছনের ওই উর্দু হিন্দি-ইংরেজির সাত্তুর ঘোষণাকে ছাপিয়ে, আসগর তার সরসভেজা শরীর ও চোখ প্রায় বেহেস্তে পৌঁছে যাওয়া তারা হারাচোখে ভাবতে লাগে তার কোন সৎকর্মের পুরস্কার ঐ হুরি, আল্লার মেহের বানির দিকে তাকিয়ে সে যখন আবার চোখের তারাকে খুঁজে পেতে আবার হারিয়ে দেবার জন্য হুরির দিকে ফেলার উপক্রম করে, দ্যাখে, গোটা গলিটা জুড়ে ওই ছাতুর সাইনবোর্ড হাগামোতা দুর্গন্ধনর্দমা আরশোলা - ইঁদুরের শবদেহ নিয়ে দোজখ বলে গেছে ফির।... কাচভর্তি জুত্তির শোকেসে সে দেখে জুত্তির বদলে গোটা ওই ঝকঝকে কাচের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সার শরীর জুড়ে ভীরু ভীরু পর্দাসহ জওয়ানিরা — যেন ফিলিস্তিনি বাজারে ইহুদির দোকানে এসেছে সওদা করতে। সবকটি মেয়েরই ভ্রূ-প্লাক করা, পর্দার হুরির মতো নিশ্চয়ই চুলের স্টাইল, গলে নিশ্চয়ই কাশ্মিরী আপেলের লাল — সারা অঙ্গ পর্দামোড়া ওইসব ভুরুচুল ছাঁটা মেয়েরা কোন হাদিস অনুসারে বিউটি পার্লারে অঙ্গ দেখায় কে জানে?''

এই রকম বিভ্রম 'চাঁদের সওয়ারি' ঐতরেয়' প্রভৃতি গল্পে ও মাঝেমাঝেই দেখা যায়।

দশ, তাঁর প্রথমাদিকের গল্প চরিত্র কেন্দ্রিক, রমেশ অথবা সুবিমলেরাই প্রধান, তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বেই গল্পের কেন্দ্রীয় নজর। এই ফোকাসের বাইরে তাদের সামাজিক পরিবেশ - যার ওপর নির্ভর করে চরিত্রগুলির যন্ত্রণা ও টানাপোড়েন মূর্ত হয় এবং একা একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষন্ন স্বাধীনতাকে তারা স্বীকার করতে বাধ্য থাকে, — এই অর্থে গল্পগুলি প্রবলভাবে অস্তিবাদী, মূলত জাঁ-পল-সাত্র অস্তিবাদের কাঠামো যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন, তা অনুসারে এরা ব্যক্তিমানুষের একাকিত্ব, নৈতিক সস্তুট ও সুবিধাবাদী দোলাচল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু পরের দিকের গল্পে চরিত্র নয়, তাদের অর্থনৈতিক - সামাজিক পরিবেশই হয়ে উঠেছে তাঁর কেন্দ্রীয় বিষয়। তাই গল্পগুলিতে, যেমন, 'রাষ্ট্রদোহীরা', 'পরস্পরা', 'বা 'বেনোজল' গল্পে বহু চরিত্রের উপস্থিতি, কেউ প্রধান নয়, কেউ অপ্রধানও নয়, সবাই মিলেমিশে, সবার নিজস্ব স্বার্থের বৃত্তে ঘুরপাক খেয়ে শেষ পর্যন্ত নায়কহীন, কেন্দ্রহীন এক

বৃহত্তর সামাজিক অবয়ব জেগে ওঠে। ফলে অস্তিবাদ থেকে সরে এসে গল্পগুলি প্রকৃত অর্থে মার্ক্সবাদী হয়ে ওঠে — শ্রেণিসংগ্রাম, মিছিল বা লালঝাণ্ডা অনুপস্থিত হলেও। নীচের ছবিতে এই পরিবর্তন সহজে বুঝতে পারা যাবে।

এইজন্যই পরের পর্বের গল্পে যতটুকু পরিবেশ বর্ণনা, তার বেশিরভাগ অংশই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক, প্রথমপর্বের মতো প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তার শৈল্পিক নির্মাণ থেকে লেখক অনেকখানি সরে এসেছেন।

আর্থসামাজিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা তাঁর কাছে চরিত্রের থেকেও কতটা বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে, তা বোঝা যায় 'উড়ান' গল্পে আসলামের গড়ে তোলা অবৈধ কয়লা সাম্রাজ্যের পর্যায়ে ভূগোল ও সমাজতাত্ত্বিক বর্ণনায়। গল্পের সীমা ছড়িয়ে আর্থ-সামাজিক প্রবন্ধের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে দেখে ও তিনি সচেতনভাবে সংযত হন না — কাহিনির সমান্তরালে ঐ অর্থ সামাজিক যুক্তি তাঁর কাছে কাহিনির থেকে ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সত্যিই তো, বেআইনী কয়লা খাদে একটা দুর্ঘটনার খবর চাপা দেওয়ার সময় প্রমাণলোপহেতু আরেকটা নির্বিকার খুন — এইটুকু মাত্র কাহিনি বলবার জন্য তো গল্প লেখার দরকার নেই কোনো, যদি না তার আর্থ সামাজিক নির্মাণ পাঠকের সামনে উপস্থিত নাই করা যায়।

লেখক তাই আলসাম মাফিয়াকে প্রেক্ষাপটে রেখে সমাজ পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে থাকেন এইভাবের।

''৭ নং মাঠের খাদানে পুলিশ এলে সবাই যখন বয়েল গাড়ি, সাইকেল, ধামালোড, রশি ছেড়ে কপিকলটাকে জংলি করে দিয়ে ঝোপে জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচে, আসলামই প্রথম খাদানের বিন্যাস একটুও বদলাতে দেয়নি, একটা পুলিশকেও দৌড়াতে দেয়নি কুলিকামারির পিছু পিছু ঃ বর পুলিশগাড়ির ছায়ায় কাজ করা কত স্বস্তির সেটা সে না বলেও স্রিফ খৈনি মলতে মলতে বড়বাবুর সঙ্গে শেয়ার করে, একই ছন্দে দু'জনে পিক ফেলে, একই সাপে হাসাহাসি করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এবং সেই প্রথম বুঝিয়ে দিয়েছিল গোটা কালিপাহাড়ি বাজারটাকে কেমন গরম করে দেওয়া যেতে পারে; অন্য কারবারের কথা বাদ দিলে ইংলিশ - বাংলা করে স্রিফ দারুকা দুকান বিশঠে।... ওই সমবায়ভিত্তিক খাদান ক্রমে শ্রমজীবীর একমাত্র ও অবিকল্প রুজির ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেলে তাতে প্রায় সরকারী সিলমোহর পড়ে যায় মাননীয় মেয়রের ভাষণেঃ 'আমাদের কাজ দেবার ক্ষমতা নেই সবাইকে। যদি আপনারা নিজেরাই রুজির ব্যবস্থা করে নিতে পারেন আমরা বিরোধিতা করব না, তবে সমর্থনও করব না। প্রশাসন নিজের পথেই চলবে।' প্রশাসনকে নিজের পথে চালাতে আসলাম জানে — ফলে তার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা ৩,৭,১৪ নং ঘুসিকে কর্মের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে ইয়াকুব আরো আগ্রাসী ও আসলাম তারও বেশি গণতান্ত্রিক হয়ে যায়, একজন সব খাদানের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে 'কোলমাফিয়া' উপাধি নিয়ে...থাকে কর্ম দেওয়া যায়নি, তার স্বনিযুক্তি প্রকল্পের বিরোধিতা করে কোন

প্রাতিষ্ঠানিক সূত্র এতভোটারের একত্র সমাবেশ এবং নিরংকুশ জনমতকে কে অবহেলা করে? ফলে এলাকায় সব দলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় আসলামের জনপ্রিয়তাকে নিজের করে নেবার ও আসলামেরও সুযোগ তৈরি হয়ে যায় কোনও দলের মধ্যে না-যাওয়ার ও সব দলকেই নাচানোর। সে চাঁদা দেয় সব দলকে দরাজ হাতে, ... এলাকার সবাইকে শচীন ধোনি হবার স্বপ্ন দেখানেওয়ালা তো আসলামই; প্রায় আসানসোল ব্যাটবল উইকেট বাজারটাকে একাই কিনে কালিপাহাড়ি নিয়ে এসে — সব পুজোর সব উৎসবের মোটা হিস্যাদার ওই আসলামই; বিয়ে-সাদি-সৎকার-দাফন সবেতেই তার উজ্জ্বল অবদান, তারই দিমাক আর রুপযায় স্রিফ ৩৬ নং ওয়ার্ডে চার চারটা ইঁটভাটা, তাতে ৫০ x ৪ = ২০০ লোকের কর্মসংস্থান আর সবচেয়ে বড় কথা ভগ্নপ্রায় কালী ও শিব মন্দিরের ভদ্রস্থ সংস্কার — সে তো আসলামেরই পয়সায়? এলাকায় চুরি-ছিনতাই নেই, বাজার গরম, সবার হাতে রঙিন মোবাইল, হিরো হুন্ডা, চারশো সাত বোঝাই মুর্গা একদিনেই ফাঁ প্রায় সবারই চোখ লাল - পুলিশের নিশ্চিন্তি, প্রশাসনেদ্দর নিশ্চিন্তি - নো ঝুট নো ঝামেলা খুন-খারাবি দু-একটা হবেই - ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট - নর্মাল ব্যাপার।...”

দীর্ঘ এই উদ্বৃতির প্রয়োজন ছিল। ১৯৯০ থেকে অন্তত ২০১০ এবং তার পরে ও কিছুটা সময়ে আসানসোল কয়লাখনি শিল্পাঞ্চলের আত্মা কীভাবে বেআইনি সংগঠিত কয়লা চক্রের হাতে বিকিয়ে গিয়েছিল, তার সার্থক নমুনা বিখ্যাত গল্পকারদের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি, খনি অঞ্চলের সাহিত্যিকদের লেখাতেও প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। এরপর যদি তাঁকে আসানসোল - রানিগঞ্জ খনি অঞ্চলের একমাত্র সার্থক কথাকার বলা হয় তা অতিরঞ্জন হবে না বলেই মনে হচ্ছে। ‘উড়ান’ গল্প বাদ দিয়েও ‘ধস’, ‘বেনোজল’, ‘হেজেমনি’, ‘রাষ্ট্রদ্রোহীরা’, ‘পলাতক’, ‘পরম্পরা’ প্রভৃতি গল্পে পশ্চিমবঙ্গের মালভূমিতে এই শিল্প ও খনিপ্রধান ভূখণ্ডের বিভিন্ন মৌলিক সত্যের প্রকাশ বারোবারেই নিছক শিল্পসৌকর্য অতিক্রয় করে স্থানকালনিবদ্ধ বাস্তবতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি, এরা সবাই মিলেমিশে যেন একটাই গল্প।

প্রথম পর্বের লেখা	পরিণত পর্বের লেখা
১। ভৌগোলিক স্থান অনির্দিষ্ট।	১। ভৌগোলিক স্থান সুনির্দিষ্ট।
২। ব্যক্তির সঙ্কটকেন্দ্রিক, অস্তিবাদী।	২। বৃহত্তর সমাজ পরিবেশ কেন্দ্রীয় - মার্ক্সবাদী।
৩। মধ্যবিত্ত সংশয় ও দোলাচল কেন্দ্রিক।	৩। নিম্নবিত্তের অসহায়তা ও সুবিধাবাদ।
৪। নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ।	৪। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ।
৫। চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতির সাহায্যে প্রকৃতি ও পরিবেশের সূক্ষ্ণ উপভোগ বেশি।	৫। প্রায় অনুপস্থিত।
৬। সূক্ষ্ণ নান্দনিকতা নির্মাণ।	৬। অনান্দনিকতার সচেতন নির্মাণ।

৭। চরিত্র স্বাধীন হতে চেয়ে বিভ্রান্ত।	৭। চরিত্রের স্বাধীনতার ইচ্ছে প্রায় অনুপস্থিত তারা আর্থরাজনৈতিক পরিবেশের হাতের পুতুল।
৮। ভাষা নিজেই (আঙ্গিকসহ) দ্রষ্টব্য।	৮। বিষয়বস্তু দ্রষ্টব্য।
৯। অ্যানাক্রনিজম বা কালবিপর্যয় নেই।	৯। কালবিপর্যয় আছে।
১০। পরিবেশের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিমানুষের রূপায়ণ।	১০। বহু ব্যক্তিমানুষের প্রেক্ষাপটে সামাজিক পরিবেশের রূপায়ন।
১১। দলীয় রাজনীতি ও পার্টিকর্মী কেন্দ্রিক গল্প।	১১। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকা সাধারণ মানুষ কেন্দ্রিক গল্প।
১২। মানুষের অনুভূতি ও বাইরের প্রকৃতির সংযোজন।	১২। প্রকৃতি শুধুই প্রেক্ষাপট।

দীর্ঘ এই আলোচনার পর লেখকের প্রথমপর্ব এবং পরিণতি পর্বের যে তুলনা বারে বারে লেখায় উঠে এসেছে, তা একটি ছকের ভিতর সাজিয়ে দিলে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হবে।

তিন

কে এই লেখক ?

তিনি হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়।

পঞ্চশোর্ধ এই মানুষটির বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা। পুরুলিয়ার গ্রামে জন্ম, বাঁকুড়া খ্রিশ্চান কলেজে কলেজ শিক্ষা, শেযে ১৯৯১ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে পি. এইচ. ডি. শ্রদ্ধেয় লেখক কমল কুমার মজুমদারের জীবন ও সৃষ্টি তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠানিক গবেষণার অঙ্গনে নিয়ে আসার সাহস দেখিয়েছিলেন। কমলকুমারের ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সমগ্র সংগ্রহের পেছনে তাঁর অবদান হয়তো অনালোচিতই থেকে যাবে।

কমল বিশেষজ্ঞ হিসেবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁর জীবন ধারা বয়েছে বিভিন্ন বিচিত্র খাতে। শিক্ষকতা, গৃহশিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, 'চতুরঙ্গ' ও 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদনার পর প্রকাশন সংস্থায়, ছাপাখানায়, কৃষিকাজে আর কোম্পানির কাজে জীবিকার্জন তাঁকে বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা দিয়েছে।

কমল গবেষক ও জীবনীকার, নাকি কথাশিল্পী — কোন পরিচয়ে ভবিষ্যৎ তাঁকে মনে রাখবে, তা বলা কঠিন। তবে গল্পকার হিসেবে, আমাদের আগ্রহ জাগে তাঁর স্থানাঙ্ক নির্ণয়ে। বাংলা সাহিত্যে ঠিক কোন ঘরানায় তাকে রাখা যেতে পারে?

মনে হয়, কমল কুমারের সূক্ষ্ম ও বহুকৌনিক নান্দনিক উপভোগ, ও আখতারওজ্জামান ইলিয়াসের চরিত্রের প্রতি অসম্ভব উদাসীনতা বা নিমর্মতা এবং দেবেশ রায়ের পর্যবেক্ষণ

ক্ষমতা — এই তিন বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটে তা যান্ত্রিক মিলন অপেক্ষা অন্যতর কিছু হয়ে ওঠে — সেটাই হিরন্ময়ের নিজস্ব পরিচয়, কমলকুমারের মতোই তাঁর মোট গল্পসংখ্যা বর্তমানে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ ছাড়াবে কী না সন্দেহ, দুটি গল্প গ্রন্থের এগারোটি রচনা বাদে বাকি লেখা স্বল্প জীবী সব ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত এবং লুপ্ত। এইসব লেখার তাই আশানুরূপ প্রচার হয়নি। ভবিষ্যৎ আমরা কেউই জানিনা।

হয়তো নানা কারনেই অনেকের কাছে, বহু মানুষের কাছে হিরন্ময় গ্রহণযোগ্য হবেন না। তাঁর প্রবল স্বকীয় চরিত্রের লেখাগুলি কেউ সানন্দে স্বীকার করলে অস্বীকারের স্বাধীনতাও সমানভাবেই থাকে। কিন্তু বড়ো কথা এটাই, বাংলা সাহিত্যে তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

* রাষ্ট্রদ্রোহীরা ঃ প্রকাশক ‘কবিতীর্থ’, বিনিময় ১২৫ টাকা।

* হেজেমনি ঃ প্রকাশক ‘এবং প্রান্তিক’, বিনিময় ১৫০ টাকা।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা ও প্রবাসী পত্রিকা

নিতাই গায়েন*

উনিশ শতক বাঙালি জীবনে নতুন তাৎপর্য বহন করে এনেছিল। এই সময়কালেই আধুনিকতার অভিমুখে বাঙালির যাত্রা শুরু হয়, যদিও এই যাত্রাপথ খুব মসৃণ ছিল না। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্বে এই সময়ের বাঙালি জীবন ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। এই শতাব্দীতে বাঙালি জীবন গতানুগতিক ধারায় অগ্রসর না হয়ে নতুন পথের সন্ধানে নেমেছিল। ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় সংঘাত, সংঘর্ষ। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব সংঘাতে উনিশ শতকের বাঙালি জীবন অস্থির হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ কোন পথে, কিভাবে পরিচালিত হতে চেষ্টা করেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে উনিশ শতকের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে। প্রচলিত কিছু অস্বস্তিকর ও অমানবিক রীতিনীতি দূর করে কলুষমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখার সূত্রপাত এই সময়েই। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এই সময়ে গড়ে ওঠে একের পর এক আন্দোলন, যার কোনোটি নাড়া দেয় গোটা সমাজকে, কোনোটি আবার সীমাবদ্ধ থাকে শহুরে বাবুদের আলোচনায়।

প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে ও প্রশ্ন জাগে। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। খ্রিস্টান মিশনারীদের দৌরাত্ম্যের পাশাপাশি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের কার্যকলাপে প্রচলিত হিন্দু ধর্মে আস্থাশীল মানুষ বিপন্ন বোধ করতে থাকেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও দেখা যায় নানা পরিবর্তন। সংস্কৃত-আরবি-ফারসি চর্চায় মানুষের আগ্রহ হ্রাস পায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করে সচেতন বাঙালিরা তাঁদের সন্তানদের ইংরেজী শেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। উনবিংশ শতাব্দী ছিল 'পরিবর্তনের সময়' - পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে প্রাচ্য ধারায় লালিত বিশেষতঃ বাঙালির স্পর্শকাতর জীবনবোধ শিথিলতার শিকার হয়। তারা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাকে অনুকরণ করেছিল। ফলে নব্য যুবকের কাছে স্বদেশ চিন্তা ধাক্কা খেয়ে সরে যায় এবং ইংরেজি চর্চার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই প্রয়োজনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের আলোকে স্বদেশবাসীকে উদ্ভাসিত করা। উনিশ শতকে শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গেল, যার প্রতিফলন ঘটল সংবাদ-সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। এক শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী চিরাচরিত সামাজিক চিন্তা ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু রক্ষণশীল গোষ্ঠীভুক্ত

*সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

হলেন। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। দুই দলই ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও, কেউ কেউ ইংরেজদের অনুগত ছিলেন আবার অনেকে ইংরেজদের কড়া সমালোচক হয়ে উঠলেন। মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবী তার মতামত প্রকাশের, তর্ক-বিতর্কের এবং প্রতিবাদের প্লাটফর্ম হিসাবে বেছে নিলেন সংবাদ-সাময়িকপত্রকে।

উনিশ শতকে ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনার পাশাপাশি নগরবাসী শিক্ষিত শ্রেণী নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। অধিকার আদায়ের জন্য ধীরে ধীরে তাঁরা সংঘবদ্ধ হতে থাকেন ও সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন জানাতে থাকেন। এইসব পন্থার হাত ধরেই রাজনীতির জগতে বাঙালির প্রবেশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সুবাদে পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান এর সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটে। যা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের চেহারাকে পুরোপুরি বদলে দিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা বাঙালিকে শুধু জীবনমুখী করে তোলেনি, প্রেরণা জোগায় বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেও উনিশ শতকের বাঙালিদের সময় লাগেনি। ইতিহাস ছাড়া বাঙালি বাঁচবে না তা স্মরণ করালেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কেবল সাহিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেই নয়, স্থাপত্য - ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এই সময় নানা পরিবর্তন এল। সব মিলিয়ে বাঙালির শিক্ষা, ধর্ম, পোষাক, খাওয়া, ঘর-বাড়ি, চাল-চলন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব কিছুতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল। আগের তুলনায় জীবন হয়ে উঠল অনেক বেশি গতি সম্পন্ন। রেল, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার বাঙালির নাগালের মধ্যে চলে এল। সংবাদপত্রের অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করতেও উনিশ শতকের বাঙালির বেশি সময় লাগেনি। জনমত গঠন এবং মানব কল্যাণের কাজে একে ব্যবহার করতে এগিয়ে এলেন উনিশ শতকের সাংবাদিকরা।

উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ এসেছিল। তবে এ বিষয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ উনিশ শতকের বাংলায় নতুন অনেক কিছু ঘটলেও জনসাধারণের বড়ো অংশই তা স্পর্শ করেনি। সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও জনগনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি। বাংলার মুসলমান সামজেও উনিশ শতকের প্রথমদিকে নবজাগরণের বিশেষ কোন ছোঁয়া লাগেনি। এই সময়ে তাঁরা তাদের পূর্ব গৌরবের কথা স্মরণ করে, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষার প্রতি অসহিষ্ণু মনোভাব দেখিয়ে বাইরের বৃহত্তর জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকায় তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব বিলম্বিত হয়। মুসলমানদের মতোই গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনে এই সব পরিবর্তনের স্পর্শ কতখানি লেগেছিল তা বলা কঠিন। ইংরেজ আমলে নগরবাসী শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও

মধ্যবিত্ত নানা ভাবে উজ্জীবিত হলেও, গ্রামবাংলা থেকে গেছে গাঢ় অন্ধকারে। একদিকে আলো, অন্যদিকে অন্ধকার। একদিকে ঐশ্বর্যের হাতছানি আর অন্যদিকে সীমাহীন দারিদ্র। একদিকে নতুন জীবনের স্বপ্ন, অন্যদিকে দিন যাপনের ও প্রাণ ধারণের গ্লানি। উনিশ শতক বাঙালি জীবনে শুধু আলো, আশা, নবজীবনের ইঙ্গিতই নিয়ে আসেনি, তা নিয়ে এসেছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল, নির্মম শোষণ আর সীমাহীন অত্যাচার অবিচার। সব মিলিয়ে সামগ্রিক ভাবে উনিশ শতকে বাংলায় কোনো নব জাগরণ এসেছিল - একথা মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সময় নগরবাসী বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক নবচেতনা এসেছিল - এই চেতনাই আধুনিকতা। যাকে Cognitive Revolution বা চিন্তন বিপ্লব বলা হয়। যা বাঙালিকে উজ্জীবিত করেছিল প্রচলিত প্রথাকে বিচার করতে, বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে, শ্রেণী স্বার্থ সচেতন হয়েও নিজেদের দৃষ্টি ভঙ্গিকে ব্যাপক করে তুলতে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ-সাময়িকপত্র'কে এই নবজাগরণের ফল বলে মনে করতেন।

পশ্চিমি জ্ঞান বিজ্ঞানের অভ্যুদ্বয়ের সঙ্গে তাল রেখে আমরা নানা কারণে চলতে পারিনি, তারাও এদেশে শিকড় গাড়তে পারেনি। তাই একটা সাংস্কৃতিক ব্যবধান সব সময় থেকে গেছে। ইংল্যান্ডের ভাবধারাই আমাদের প্রভাবিত করেছে, ফ্রান্স বা জার্মানীর নয়। ইতালিতে গ্রিস ও রোম যে ভূমিকা নিয়েছিল, এখানে সে ভূমিকা নিয়েছিল সংস্কৃত ভাষাবাহী প্রাচ্যবাদ। রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই খুব ভালো সংস্কৃত ও ইংরেজী জানতেন - আপন ঐতিহ্যকে বিচার করার ও আধুনিকীকরণের কাজে লাগানোর জন্য তাঁদের কারুর দ্বারস্থ হতে হয়নি। বাংলার সব সময়েই একটি শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী এবং উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে, যা সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাংবাদিকতায় প্রতিফলিত। ব্রিটিশ আসার আগে ও বাংলার বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় এগিয়ে ছিল। যারা বাংলার নব জাগরণের জন্ম দিয়েছিল। বাংলার নব জাগরণ বলতে বোঝায় উনবিংশ ও বিংশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় সামাজিক সংস্কার আন্দোলন। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে।

উনবিংশ শতকের বাংলায় শক্তিশালী ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক, পণ্ডিত, ক্ষুরধার সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দেশপ্রেমী, বাগ্মী এবং বিজ্ঞানী ছিলেন যারা একত্রে নবজাগরণের একটি ভাবমূর্তি তৈরী করেছিলেন। যা বাংলার চিন্তাচেতনাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে

রূপান্তর করতে সাহায্য করেছিল। তাঁদের মহত্ব হল তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধের মধ্যে সেতুবন্ধন বা মেলবন্ধন করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে লব্ধ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গঙ্গা ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে লব্ধ আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার যমুনার সঙ্গমের পলিমাটিতে জন্মে ছিল আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি। সব সময় মাটি ঠিক মত মেশেনি, ঠিক মত বীজ পড়েনি। তার কারণও ছিল গভীরে। কারণ যাই থাক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যম বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

কেমন ছিল সে যুগের বাংলা, যে যুগে জন্ম নিয়েছিল প্রবাসী? ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দাপট প্রকট। তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পূর্বাভাষ ভোরের আকাশে ঊষা-উদয়ের রক্তিম আভা ছড়াচ্ছে। কেবল ভারত নয়, বহির্জগতের রাজনৈতিক ঘটনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিল না প্রবাসী। রামানন্দের মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত রামানন্দের নীতি অনুসরণ করেছে প্রবাসী। অর্থনৈতিক হেরফের প্রবাসীর সম্পাদক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। অর্থনীতির বিভিন্ন দিক ছড়িয়ে আছে প্রবাসীর পাতায় পাতায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতি বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে এবং ভাবতরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছিল। প্রবাসী সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য রেখেছে শিক্ষা বিষয়ে এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রবাসীর কোনও সংখ্যা নীরব থাকেনি। সে সময়ে সাহিত্য জগৎও নবরূপে রূপায়িত হচ্ছিল। শিল্পকলার সৌকর্যে বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ ইতিহাস সমুজ্জ্বল। নতুন গড়ে ওঠা 'বেঙ্গল স্কুল' শিল্প ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে নব্য ভাব ও আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছিল। চিত্র ও ভাস্কর্যের প্রতিনিধি এবং ভ্রমণকাহিনীতে ফটোগ্রাফের আলোকচিত্রের সমাহার প্রবাসীর অঙ্গ বিভূষিত করেছে প্রতিটি সংখ্যায়। পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে বাঙালি মানসে শিল্প চেতনার বিকাশের দাবী রাখে।

যে কোন দেশের যে কোন ভাষার সাময়িক পত্রিকা সমকালের দর্পণ। সেই দর্পণে প্রতিফলিত হয় সেই দেশের বা জাতির ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত 'প্রবাসী' সেই ধরনের একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা যার মধ্যে আমরা বাংলা তথা ভারতের বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তথ্য সমৃদ্ধ ইতিকথা জানতে পারি। 'প্রবাসী' পত্রিকা আকস্মিক ভাবে আবির্ভাব হয়নি। তরুণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৩০৮ বঙ্গাব্দ (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) বৈশাখে প্রবাসী পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন।

রামানন্দ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ এপ্রিল) 'প্রবাসী' সচিত্র মাসিকপত্র নিজ সম্পাদনা ও পরিচলনায় প্রকাশিত করেন। এই কাজে তাঁহার প্রধান সহায় হন ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্ত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ। চিন্তামণি ঘোষ ছিলেন পত্রিকাটির প্রধান

পৃষ্ঠপোষক ও মুদ্রাকর। 'প্রবাসী' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে রামানন্দ বহু ইংরেজী ও বাংলা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। দেশী-বিদেশী অন্যান্য সাময়িক পত্রেরও তিনি সন্ধান রাখতেন। এই রকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি 'প্রবাসী' সূচনা করেন। কিন্তু স্বাধীন মানসিকতার মানুষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যতদিন পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিলেন ততদিন সযত্নে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন, কোন ঘাটতি দেখা যায়নি। এই সমস্ত পত্রিকা নিয়ে তাঁর অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনা ও অনেক কল্পনা ছিল। কিন্তু যখনই তাঁর স্বাধীনতায় টান পড়েছিল তখনই তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেছেন। এক সময় তিনি স্থির করেন নিজেই পত্রিকা প্রকাশ করবেন। তারই ফলশ্রুতি হল বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র প্রকাশ। এই প্রথম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজের সম্পাদনায়, যেখানে অন্যের হস্তক্ষেপ নেই। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নব ভাবনার আঙ্গিকে এই পত্রিকাটি পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

এই সময় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্বলিত কোন পত্রিকাই ছিল না। যা ছিল তা ধর্ম মতাদর্শগত পত্রিকা। সেদিক থেকে 'প্রবাসী'র প্রকাশ পত্রিকার প্রকাশনার ধারাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছিলেন রামানন্দ। তিনি তাঁর সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক নজির সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলায় সেই সময়ে এ ধরনের বহু মিশ্রিত পত্রিকার অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণ করেছিল নিঃসন্দেহে 'প্রবাসী' পত্রিকাটি।

প্রবাসীতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, চিত্র সম্বলিত সমকালীন সংবাদ একত্রে পরিবেশনে পত্রিকা প্রকাশনা জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ে পাঠকের মননে বসুমতী, সবুজপত্র, কল্লোল, বঙ্গদর্শন, ভারতী, ভারতবর্ষ, সাধনা, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার অপ্রতিহত গৌরবেও 'প্রবাসী' পত্রিকা ম্লান হয়ে যায়নি, বরং জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকার বিভিন্ন জ্ঞান ও বিদ্যার সঙ্গে তথ্যানুসন্ধানী নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ সাংবাদিকতার মিশ্রণের কারণেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকার সমসাময়িক যেসব পত্র-পত্রিকাগুলি ছিল, যেগুলি সে সময়ে নামী পত্রিকা হলেও 'প্রবাসী'র জনপ্রিয়তা ও মানের সমকক্ষ ছিল না।

রামানন্দ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ এলাহাবাদ ত্যাগ করে কলিকাতায় ফিরে আসেন। বাসস্থান ও আপিস সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গলির একটি বাড়ীতে নির্দিষ্ট হল। এখান থেকেই 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু' যথারীতি প্রকাশিত হতে লাগল।

প্রবাস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বলে 'প্রবাসী' নামকরণ হয়। কিন্তু রামানন্দ আমাদের সত্যকার অবস্থার দিকে চোখ ফেরালেন। যদিও 'প্রবাসী' শব্দটির অর্থ ব্যপ্তি ঘটে গেল অচিরেই। 'আমরা যে স্বাধীনতা হারিয়ে নিজের ঘরে পরাশ্রিতের মতো বাস করে প্রবাসী

হয়ে আছি এই অর্থটাই প্রধান হল। প্রবাসীর শিরোভূষণ হল এই বাণী 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে'।[১] ভারতবর্ষ জন্মভূমি হলেও ব্রিটিশের নিকটে আমরা ভিন্নরূপে প্রতিভাত - ভারতভূমি যেন আমাদের প্রবাস এবং নিজ ভূমে আমরা প্রবাসী। এর থেকে বোঝা যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন লেখক, সাংবাদিক, সম্পাদক হলেও তিনি ছিলেন একজন দেশ প্রেমিক। জাতীয় স্বাধীনতা স্পৃহা তাঁর মজ্জাগত ছিল। এ প্রশ্নে তিনি সর্বদা দৃঢ় সংকল্প ছিলেন এবং কারো সঙ্গে কোনোদিন আপোষ করেননি। প্রবাসী প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ -

'প্রবাসী' নামটির মধ্যে বাংলাদেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এমন বাঙালির মনের ভিতরকার আকুতি যেন প্রকাশ পাচ্ছে। মনে হয় এই নামের পত্রিকা প্রয়াগ থেকে প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'প্রবাসী বাঙালি' এই শব্দটি বাঙালির মনের মধ্যে গেঁথে গেল।'[২]

প্রবাসী পত্রিকার আয়তন ছিল লম্বায় ১৬.৫ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় ২২.৫ সেন্টি মিটার। দুইটি কলমে বিভক্ত প্রতি কলমের সাইজ ৭ সেন্টিমিটার ছিল। বার্ষিক মূল্য ২।।০ (২ টাকা ৫০ পয়সা)।

প্রবাসীর শৈশব কেটেছে এলাহাবাদে। ১৯০১-১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এলাহাবাদের 'ইন্ডিয়ান প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলকাতার ১২০/২, আপার সারকুলার রোডের 'কুন্তলীন প্রেস' থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। মধ্যে কিছুদিন 'ব্রাহ্মমিশন' ও শেষে নিজস্ব 'প্রবাসী প্রেস' (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) থেকে প্রকাশিত হয়ে পত্রিকাটিকে স্নিগ্ধ ও শিল্পিত করে তুলেছিল। রামানন্দ দীর্ঘ ৪৩ বছর ধরে যুগপৎ স্বত্ত্বাধিকারী ও সম্পাদক হিসেবে প্রবাসীর ধারক ও বাহক ছিলেন।

প্রথম প্রকাশ কালে 'প্রবাসী' নামক কবিতার শিরোনামে ছিল বাংলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাছত্র-

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া'।

সুতরাং - ''প্রবাস কোথাও নাহি - রে নাহি - রে জনমে জনমে মরণে''।

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাদ ললাটে নিয়ে প্রবাসীর দীর্ঘ যাত্রাপথ শুরু হল।

প্রবাসী এতই সমাদৃত হয় যে, প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরেই তা একেবারে ফুরিয়ে যায়। পাঠক-সাধারনের চাহিদা মেটাবার জন্য রামানন্দকে এই সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রিত করতে হয়। পাঠকের কাছে 'প্রবাসীর বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমান্বয়ে প্রতিভাত হতে লাগল। এর মধ্যে এই তিনটি প্রধান - ১) সর্ব্ব ভারতীয় আবেদন। ২) প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা এবং ৩) উচ্চমানের দেশী-বিদেশী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রতিরূপ প্রকাশ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই আমাদের জাতীয়

জীবনে এরূপ কার্যকরী হয়েছে যে, আমরা প্রবাসী পত্রিকাটিকে 'জাতীয় পত্রিকা' বলে গণ্য করতে পারি।

প্রবাসীর এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়-

১) সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব, তাঁর সুনাম, মনন ও মনীষা।

২) মুদ্রণ পরিপাঠ্য। তাঁর মুদ্রণ সম্পর্কিত কারিগরি জ্ঞান, বহু বিষয় লেখার সহজাত ক্ষমতা।

৩) প্রবাসী পত্রিকা হল বাংলা সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সচিত্র সাময়িক পত্র।

৪) প্রবাসী পত্রিকাটি ছিল নব্য সাংবাদিক আদর্শের প্রতীক।

৫) প্রবাসীর জনপ্রিয়তার কারণ - রামানন্দের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা, অধ্যাপক, সমাজ সংস্কারক, ধর্মনেতা, রাজনৈতিক কর্মী, শক্তিশালী প্রাবন্ধিক ও বিরাট সাংগঠনিক এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তা।

৬) পত্রিকাটির সূচীপত্র বিন্যস্ত থাকত - লেখকগণ ও তাঁদের রচনাগুলি, বিষয় সূচী ও চিত্র সূচী এবং বিবিধ প্রসঙ্গ দ্বারা। বিবিধ প্রসঙ্গ সম্পাদক রামানন্দ নিজে লিখতেন।

৭) সহযোগী সম্পাদক ছিলেন নবীন, প্রবীন ব্যক্তিত্বরা। এরা হলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সুধীন কুমার চৌধুরী প্রমুখ।

৮) লেখকদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জওহরলাল নেহেরু, জগদীশচন্দ্র বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন, মহাত্মা গান্ধী, বামনদাস বসু, সি. এইচ. চিন্তামনি এবং রামানন্দের দুই কন্যা শান্তাদেবী ও সীতা দেবী প্রমুখেরা।

৯) পত্রিকাটি নানা বিভাগে নানা আলোচনা সমৃদ্ধ ছিল। এই বিভাগগুলি হল - সঙ্কলন ও সমালোচনা, কষ্টিপাথর, আলোচনা, বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক পরিচয়, সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ, সমালোচনা, পঞ্চশস্য, পারাপারের ঢেউ, মহিলা মজলিশ, ছেলেদের পাত-তাড়ি, প্রশ্নোত্তর মালা, বেতালের বৈঠক প্রভৃতি। সব সংখ্যায় অবশ্য সব বিভাগ থাকত না।

১০) পত্রিকাখানির প্রচার বাংলা ভাষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তার আবেদন ছিল সর্বভারতীয়।

১১) প্রতিমাসের শেষ দিন প্রকাশিত হত এবং লেখকদের সাম্মানিক দক্ষিণা দেওয়া হত।

রামানন্দ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, আমরা প্রথমে ভারতবাসী, পরে বাঙালী বা অন্য প্রদেশীয়। 'প্রবাসী' এই আদর্শ প্রচারে রত থাকিলেও তাহা নিবন্ধ ছিল শুধু বাংলা

ভাষার মধ্যে। ভারতবাসীর পক্ষে যা কল্যাণকর, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীর পক্ষেও তা কল্যানপ্রসূ না হয়ে পারে না। প্রবাসী কালক্রমে (ক্রমান্বয়ে) ভারতবাসীর বিবিধ সমস্যার আলোচনা ক্ষেত্র হয়ে উঠল। চিন্তাশীল সুবিদ্বান লেখকগণ এতে সারগর্ভ রচনা পরিবেশন করতে আরম্ভ করলেন। প্রবাসীতে লেখা প্রকাশিত হওয়ার অর্থ ছিল সাহিত্যের আঙিনায় সৃজনশীলতার প্রবেশাধিকার স্বীকৃতি লাভ ও ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠা লাভের ছাড়পত্র পাওয়া। সম্পাদকীয় আলোচনা ও মন্তব্য তৎকালীন আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও ঘটনা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবাহমানতার ধারা প্রতিমাসে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় এটি সমাজ সচেতনতার পরিচয় যেমন হয়েছিল, তেমনি প্রতিফলিত হয়ে পাঠককূলের মননের কাছে স্পর্শকাতরতা এনেছিল। এই স্পর্শকাতরতার সূক্ষ কাজটি কলম তুলিতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত করেছিলেন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই রামানন্দের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাজেই উন্নতিমূলক সর্বপ্রকার প্রযত্ন, উদ্যোগ অনুষ্ঠান এই সকল আলোচনার বিষয়ভুক্ত হল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অজস্র উপকরণ সঞ্চারিত হয়েছে 'প্রবাসী' পত্রিকার 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। যার বৈশিষ্ট্য হল সম্পাদকীয় বক্তব্য ও মন্তব্য সমগ্র। এহেন এমন কোন বিষয় ছিল না যা প্রবাসীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' স্থান পায়নি। একে বলা যায় পাঠক ও সমাজ সচেতন করে দেওয়ার কলম।[৩] 'বিবিধ প্রসঙ্গে' বিভিন্ন আলোচিত বিষয়গুলি যেমন বৈচিত্র্য অনন্যতায় ভরা, তেমনি তার বলিষ্ঠ যুক্তি ও ভাষার মেলবন্ধন ছিল। বিবিধ প্রসঙ্গের বৈশিষ্ট্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সম্পাদকীয় মন্তব্য, এখানে কোন আপোষের মনোভাব নেই। প্রকৃত সত্যকে যথার্থ ভাবেই 'প্রবাসী' পত্রিকার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রবাসী পত্রিকার মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় জাগরণ।

রামানন্দ একজন লোকশিক্ষক। সাধারণের মধ্যে স্বল্প পরিসরে ও সুলভে জ্ঞান বিতরণ তাঁহার উদ্দেশ্য। এ কারণে শুধু জাতীয় সমস্যা বা বিষয় নহে, বিবিধ বিদ্যার ও আলোচনা ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল 'প্রবাসী'। ভাষা তত্ত্ব, রাসায়নিক পরিভাষা, হিন্দী পরিভাষা প্রভৃতির আলোচনা থেকে ভাষা সাহিত্যের উন্নতি, চিন্তা ও প্রসার লাভ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। আধুনিক বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ, রেডিয়াম, উদ্ভিদতত্ত্ব, পক্ষীতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, লোকগাথা, জ্যোতির্বিদ্যা, জাতিতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, বাঙালী তথা ভারতবাসীর সমুদ্র পারে উপনিবেশ স্থাপন, দেশ-বিদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আমরা প্রবাসী পত্রিকার পাতায় বিধৃত হতে দেখি। এই ধরণের রচনা নির্বাচন ও পরিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ এবং তাহাদের মনে জ্ঞান-স্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করা। চিন্তা ও গবেষণা ক্ষেত্রেও আমরা যে আত্ম নির্ভর হতে পারি এই প্রত্যয় বোধ

বিভিন্ন রচনা নির্বাচন ও পরিবেশনের নৈপুণ্যের মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। চিত্রকলা এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শনগুলির দ্বারা জাতীয় ঐক্য বোধ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। রামানন্দ এই উদ্দেশ্যেই শিল্প তথা চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতির সঙ্গে পাঠকবর্গের পরিচয় ঘটাতে প্রথম থেকেই কৃত সংকল্প হন। কারণ এর দ্বারা পরস্পরের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে আমরা যেমন দ্রুত পরিচিত হতে পারি এমনি আর কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। প্রবাসীর প্রতি সংখ্যায় কোন না কোন উচ্চমানের চিত্র প্রকাশিত হত।

দুইটি বিষয়ে রামানন্দ হলেন এদেশের সাময়িক সাহিত্যে পথিকৃৎ। তিনি প্রথম মাসিক পত্রিকায় বহুবর্ণ চিত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। দ্বিতীয় বিষয়টি হল শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র প্রকাশ। রামানন্দ প্রথম থেকেই প্রবাসীকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। পত্রিকাটিকে কেবল সুদৃশ্য ও পরিচ্ছন্ন করলেই চলবে না, প্রথম শ্রেণীর লেখকদের রচনা সম্ভারে পূর্ণ করাই যথেষ্ট নয়, একে স্থায়িত্ব দান করতে হলে আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মনে করেন পত্রিকাটিকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করা অত্যাবশক। কারণ তখনকার দিনে কম মাসিক পত্রিকাই প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হত। প্রথম প্রথম প্রবাসী ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হত না, কিন্তু তৃতীয় বর্ষ থেকে রামানন্দ স্থির করেন যে, পত্রিকাকে ৩০ বা ৩১ দিন অন্তর প্রকাশ করিতে হবে। হিসাব করলে দেখা যায় প্রতি মাসের অন্তত পয়লা তারিখে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। মাসিকপত্রের নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত রূপে প্রকাশের ব্যবস্থা রামানন্দই বোধ হয় প্রথম অবলম্বন করেন। প্রবাসী পত্রিকা প্রকাশের চল্লিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই চারদশক একক ভাবে সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। একটানা ছেদহীন ভাবে সম্পাদনা বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক দুর্লভ নজীর সৃষ্টি করেছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকা সম্পর্কে জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখেছিলেন - ''বঙ্গদর্শনে সাহিত্যগুরু নব যুগ সৃষ্টি করেছিলেন রামানন্দবাবু। পত্রিকা সম্পাদনা ও সাংবাদিক জগতে বলিষ্ঠ চিন্তা, তেজস্বী ভঙ্গিমা ও মন্তব্যের এক নতুন আদর্শ সৃষ্টি করলেন।''[৪]

বাংলা ভাষায় প্রবাসীর কৃতিত্ব কী, তার ভূমিকা কী এবং রামানন্দের ব্যক্তিত্ব কোথায় এই পত্রিকাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নটি প্রণিধানযোগ্য -

''প্রথম যখন রামানন্দ প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবি অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিস যে বাংলাদেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয়নি। তাছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িক পত্রে সময় রক্ষা করে চলার বাঁধাবাঁধি ছিল না।... পাঠকদের ক্ষমা গুনে পরে নির্ভর করে এমনতর আর আটপৌরে ঢিলেমি করবার সুযোগ প্রবাসী সম্পাদক স্বীকার করেননি - নিজের মান

রক্ষার খাতিরে সময় রক্ষার স্খলন হতে দিলেন না।... প্রবাসী জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি করেছে। জনসাধরণের চিত্রকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয়না, নানা দিক থেকে মৃদু আঘাতে জাগিয়ে রাখে"।[৫]

রঙে, রসে, ভাবনায়, মেধায় সবদিক থেকে প্রবাসী তার পূর্বসূরি পত্রিকাদের ম্লান করে দিয়েছিল। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, সমকালীন সংবাদ এবং সুমুদ্রিত চিত্র সম্ভার বিতরণের এমন বিপুল প্রয়াস ইতিপূর্বে একত্রে দেখা যায়নি। ভালো পত্রিকা শুধু পাঠকদের ক্ষুধা মেটায় না, ক্ষুধা বৃদ্ধি বা সৃষ্টিও করে। প্রবাসী বাঙালি পাঠকের মনে ভালো ছবি, ভালো সাহিত্য, উন্নততর মনন চর্চা নানা ধরনের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। রামানন্দের সম্পাদনায় সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত পাঠকের মনে দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল প্রবাসীতে। এখানেই প্রবাসী-র সার্থকতা।

সহকারী গ্রন্থপঞ্জী :

১। বসু, সোমেন্দ্রনাথ - সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ প্রবাসী, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৬, পৃঃ ২৪।

২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার - প্রবাসী ষষ্ঠী বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ : ষষ্ঠী পূর্তি, পৃঃ ১৩।

৩। বসু, সোমেন্দ্রনাথ - সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গে প্রবাসী, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৬, পৃঃ ২৪-২৫।

৪। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ - বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্গদর্শন ও উত্তরকালে সাময়িক উত্তরাধিকার, কলেজস্ট্রীট, ১৯৯৪, পৃঃ ২৭-৩২।

৫। পত্রিকা পরিচয়, প্রবসী, কার্তিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৬। ধর, কৃষ্ণ, ভট্টাচার্য্য মিহির - সম্পাদিত 'বাংলার কয়েকজন সেরা সাংবাদিক, গণমাধ্যম প্রকাশনা, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ৮৬-৮৭।

৭। ঐ, পৃঃ ৮৭

৮। ঐ, পৃঃ ৮৯

৯। বসু, শংকরী প্রসাদ - 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রবাসী' দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৯০, পৃঃ ৪০

১০। বাগল, শ্রীযোগেশচন্দ্র - সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, দশম খণ্ড, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৩৭১, পৃঃ ৫-৯৫

১১। লাহা, প্রবীর কুমার - ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 'প্রবাসী' পত্রিকা - একুশ শতক, ২০০৬, কলিকাতা, পৃঃ ৯ - ২২

১২। চট্টোপাধ্যয়, পার্থ - বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৩২

১৩। ঘোষ, বিনয় - বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৭৪

১৪। ঘোষ, বিনয় - বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১৯০

১৫। বসু, স্বপন - বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১২০

১৬। বসু, স্বপন, চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ - উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ২০০৩, পুস্তক বিপণি, পৃ. ২৫-২৬

১৭। শাস্ত্রী, শিবনাথ - রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলকাতা, ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স, পৃ. ১-১০

১৮। বসু, স্বপন, সংবাদ - সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, কলকাতা (প্রথম খণ্ড)পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৩, ১-১৫

১৯। ত্রিপাঠী, অমলেশ - ইতালীর র‍্যানেশাঁস বাঙালীর সংস্কৃতি, কলকাতা, ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১-৬

২০। কবিরাজ, নরহারি - উনিশ শতকের বাঙালির জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক, কলকাতা, ২০০৯, কে.পি.বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, পৃ. ১-৫

২১। ঘোষ, বিনয় - বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ২০০৯, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১-৮

২২। বসু, স্বপন, মামুন মুনতাসীর (সম্পাদিত) - দুই শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্র, কলকাতা, ২০০৫, পুস্তক বিপনি,পৃ. ১-৬

২৩। বসু, স্বপন - বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, ২০১৬, কলকাতা, পুস্তক বিপনি,পৃ. ১-১২

২৪। চট্টোপাধ্যায়, গীতা, মিত্র, প্রীতি - প্রবাসীর সম্মিলিত সূচি (১৩০৮ - ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), ২০০৪, কলকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ,পৃ. ১-৯

২৫। বসু, শঙ্করী প্রসাদ, বসু, সুদীপ - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর প্রবাসী, ইতিহাসের ধারা ১ ও ২ খণ্ড, কলিকাতা, ২০০৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি,পৃ. ১-১০

২৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ - সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, (১৮১৮ থেকে ১৮৩০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৌষ, ১৪০৮,পৃ. ১-৫

২৭। ঘোষ, বিনয় - সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১, ২, ৩, ৬ খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১৫,পৃ. ১-১০

২৮। মামুন, মুনতাসীর - উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ - সাময়িক পত্র (১৮৪৭-১৯০৫), বাংলাদেশ, ঢাকা,পৃ. ১-৫

২৯। Ghose, Hemanta Prasad - The News Paper in India, Calcutta, 1951, p.1

৩০। Dasgupta, Uma - Rise of an Indian Public, Impact of official Policy, 1870-1880, Calcutta 1977, p. 13

৩১। John, Mcguire - The Making of a Colonial Mind, A quantitative study of the Bhadralok in Calcutta, 1857-1885, Australian National University Monographics on South Asia, No. 10, 1983, p. 61

৩২। Gohain, Hiren - The Idea of Popular Culture in the Early Nineteenth Century Bengal, calcutta, 1996, p. 24

৩৩। Basu, Arani - History of Media in Bengal : A Chronological overview. p. 5-8

৩৪। https.www.2huberlin.de/transcience/vol.4 issue1, 2013

Girls Working in Households : Some Reflections on Girl Child Domestic Labour

Geetika Ranjan*

Small girls working as *kaamwalis* or maid servants in households is a common trend in India. Children, both boys and girls, work as domestic labourers in houses to earn a living and assist their parents in maintaining livelihood. The United Nations Convention on the Rights of the Child defines a child as anyone younger than 18 years. The term Child Domestic Labour (CDL) applies to children who perform domestic work in the home of their employer and not their family and get paid for their work. The household chores he/she does are - washing utensils, sweeping and mopping, washing clothes, cooking, looking after children, aged and disabled in the house and in general running errands for the householders. Domestic work is a global phenomenon that perpetuates hierarchies based on race, ethnicity, indigenous status, caste and nationality (Andall 2004). Child domestic labour (CDL) is widely prevalent in India. The hierarchies of caste and class which have always existed in the society initiated and perpetrated the trend of some serving the others. The Convention of International Labour Organization (ILO No. 182, 1999) declares child domestic labour as the worst form of child labour and mentions that child domestic labour is exploitative and it includes trafficking, slavery, or practices similar to slavery, or work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is hazardous and likely to harm the health, safety, or morals of the child, it constitutes a worst form of child labour [1].

*Associate Professor, Department of Anthropology, North-Eastern Hill University, Shillong

The issue of child domestic labour is highly complex. They are among the most invisible child labourers. The hidden nature of the work makes it difficult to estimate the number of children involved in domestic labour (Silva-de-Alwis 2007; Tetteh 2014). As per ILO estimate there are 15.5 million children engaged in domestic work and about 90 % of them are girls.[2]. UNICEF finds that girls are two times more likely to be out of school and working in a domestic role.[3] Domestic work is a work sector which mainly involves women and children. The perception of unskilled nature of the domestic work is coupled with the view of women and girls being naturally ordained with the ability to perform the household chores.

Domestic labour and child labour are issues which have been discussed in different writings. These make sporadic and passing mention and references to girl child domestic labour , but a concerted qualitative research on girl child domestic labour *per se* is much required to understand their situation particularly in relation to India. Writings on domestic labour, women domestic labour and child labour include a general picture of the situation of the girl child domestic labour but a specific, detailed and deeper addressing of the same is pertinent to holistically understand the situation of the girl child domestic labour. The vulnerability of a girl child domestic help is not of the same nature and degree as the vulnerability of others engaged in domestic work. The life, problems and challenges of the girl child domestic labour may not be the same as those of men or women domestic labour or as those of the boys in domestic labour. Recent decades have witnessed the growing concern for the 'girl child' from policy makers, civil society and the like with the growth in consciousness about the plight of the same.

A plethora of schemes and legislations have been introduced for the protection and holistic development of the girl child. The reason for the spurt of such measures is the receiving end

position of the girl child in India. The patriarchal mindset which prefers the male child to the female one and looks down upon the girl children as burden, problem and liability, is at the root of the neglect of the girl child. The concern for the girl child becomes all the more pertinent when one sees their state in the labour sector. Child labour stands banned in India. Published data shows that girls are more in demand and number than the boys to work in the domestic sphere (Raghuram 2005, 5). According to the National Domestic Workers' Movement [NDWM], an estimated 20 million people work as domestics throughout the country. Of these workers, 90 percent are women and children between the ages of 12 to 75 while those below 14years old make up 25 percent of the workers. Media reports as well as scholarly writings bring to the fore the trials and tribulations faced by the domestic workers such as trafficking, doing hazardous work, health problems, sexual exploitation, inhuman treatment , lack of access to education etc. There is a need to carry out a holistic study of the situation of the girl child domestic labour as it exists in an integrated relation with a gamut of factors which attribute towards the making of a girl child a domestic labour and are also influenced by the same.

Girl child domestic labour is a global reality. The problems and challenges of child domestic labour in different countries have been brought out in different works. It is in the less developed countries where girls work as domestic labourers. Tetthe's study on Ghana (2014), discusses the juxtaposition of myths about child domestic labour with actual reality. By taking several narratives she challenges various myths about child domestic labour, like child labour is an act of patronage by nice employers. Miller (http://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest /mena/ChildWorkers.pdf D.O.A. 20 May 2015) writes that young girls working as maids in Morocco are extremely vulnerable to physical, emotional and sexual abuse. They work for more than 12 hours a day, have no access to school and perform dangerous works.

While most of the works throw light on the negative effects of the girl children's engagement in domestic labour, there are some works which indicate the protective aspect of the same. Castle (2006) and Foster (2000) point out that by working as domestic labour the children's nutritional, financial, emotional and other welfare needs are likely to be met especially when their parents are not able to fulfil these responsibilities. However, the promise of fosterage may have an ulterior motive. Goody (1982) in her study in West Africa informs that in the name of providing shelter to children, they are trafficked and forced into domestic servitude. Boonpala and Kane (2001) and Brown (2007) discuss how agents traffic children from rural areas into slavery or servitude through false promises of providing them with foster care in the cities.

The issue of child domestic labour is highly complex. They are among the most 'invisible' child labourers (Grier 1994). The hidden nature of the work makes it difficult to estimate the number of children involved in domestic labour (Silva-de-Alwis 2007; Tetteh 2014). Scholarly works on girls working as labour in different industries such as carpet industry (Nangia 1992) , *beedi* industry (Kumar 1992) or as street children (Ghouse 1992) point towards their exploitation in these sectors. Child domestic labour has been recognized as one of the most intolerable and hazardous forms of child work (Basu-Mallik and Basu- Mallik 2006).

Cultural factors motivate parents to send their daughters to work in households as the latter are considered safer compared to outside work(Chakravarty and Chakravarty 2011; Blagbrough (4) 2012;). Trafficking of women and girls for sexual exploitation (Brown 2007,Blagbrough and Glynn 2012; DSAPK 2006) reveals yet another dark side of domestic labour. As per National Domestic Workers Movement, September, 2011), Children in domestic work are hidden and invisible under a veil of acceptance on the pretext of social solution to 'help' the child.

Trafficking of children is rampant. Be it intra or inter country. Children are trafficked from Bangladesh, Nepal, and Bhutan. From within India, children are trafficked from the Tribal belt, especially, Delhi to Patna, Kanpur, Mumbai, and Orissa to Goa.

The situation of the girl child domestic workers needs to be understood in context. Some works while discussing the plight of the girl child labour attribute its main cause to the lower position of girls in the society compared to the boys (Nayar 1997; Subramaniam 1991). The situation of child domestic labour in some places in India is borne out of some works. Mishra (2012) in his study on Odisha states that almost 90% of girl children started working as domestic labour before they completed 12 years of age. He refers to the CACL (Campaign Against Child Labour) study of 2001 which throws light on the fact that the girl children who were forced to take up domestic work, were the daughters of daily wage earners or small cultivators or had fathers addicted to liquor. Intense poverty at the home front was the push factor for little girls to take up domestic work. A large number of girl children domestic labourers are found in big cities like Mumbai, Kolkata and Bangalore. In Mumbai there are approximately six lakh domestic workers (Social Alert 2000). In Bangalore there are about five lakh domestic workers, 25 percent of whom are girls in the age group of 10 to 16 years who accompany their mothers to work (Rani et al. 2005). Madhumati (2013) gives a comprehensive picture of the conditions of migrant females in Bangalore working as domestic workers. Study by SEWA (2008) reports that in Ahmadabad there are about fifty thousand domestic workers mostly women. Approximately five thousand children mostly girls work as domestic labour in Bhubaneswar (PTI 2005). Tandon brings out the role of the placement agency workers and non placement agency workers and in driving women and children to domestic labour. She writes that the “placement agents encourage 9-10 years old girls to earn for their family” (2012: 12)

Surabhi Tandon Mehrotra and Mewa Bharti while discussing the conditions , rights and responsibilities of part-time domestic workers in Delhi mention that “India has witnessed large-scale migration over the last two decades of girls from tribal areas of Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Orissa. These girls come with other girls from the village, through private recruiting agents, or other organisations to be employed as ‘maids’ in urban households. With increasing migration of tribal girls to Delhi, the trend of independent migration of girls has also seen a sharp rise. All migration may not be safe as girls are vulnerable to be trafficked for domestic work by agents and abused physically, psychologically and sexually by employers and agents”(2010:2)

Studies reveal that children working as domestic labourers remain deprived from availing education (Rahman 1995). Working for long hours takes a heavy toll on their physical and mental health (Nieuwehuys 1995). A report (DSAPK 2006) on migrant girl domestic workers from tribal areas of Jharkhand , Chattisgarh and Orissa, discuss the role of NGOs in rescuing minor girls from sexual exploitation by their employers and also from their own fathers and brothers at home. Basu-Malik and Basu-Malik (2006) on Kolkata write that girls are preferred to boys as domestic workers due to the prevalent notion that girls are more skilled in doing domestic chores and are more complaint by nature .

The psychological and physical health problems faced by girl child domestic labour has been brought out by studies dealing with medical practice (Banerjee SR et.al.2008; Mishra and Arora 2007; Mishra 2009). Misra (2009) put forth an ironical picture stating that about 64% of doctors including paediatricians employed domestic child labour and about 85% of such servants were girls facing both nutritional and medical problems. He also writes that due to “ the increasing incidence of child sexual and physical abuse at home by domestic servants, most employers

felt that it was safer to have a young female domestic servant to look after the children, rather than have an adolescent or adult male servant at home.

In an age when countries are witnessing rapid development in practically every field and where the issue of human dignity, human rights and human welfare have become serious subjects of deliberation and action, the plight of the girl child domestic labour needs to be addressed with more agility. Studies on the subject bring out that there has been a growing awareness about the situation of the girl child and individual as well as government and non Government initiatives are being directed towards the amelioration of the problems of the girl children. However what remains a matter of concern is the fact that the root of the problem lies much deeper in the conventions , in the traditional mindset of the elders of the family to which the girl child belongs too. While poverty and illiteracy are major causal factors for driving little girls towards domestic labour what needs to be understood is that these causal factors also in a way, at least to some extent, arise and perpetuate from a mindset which requires counselling.

References:

1. http://unicef.in/Story/1139/Assessing-Child-Domestic-Labour-in-India (Date of Accession : 12 May 2015)
2. ILO (2004) Child Labour: A textbook for University Students (ILO, Geneva) file:///C:/Users/user/Downloads/pol_ textbook _ 2004.pdf (D.O.A 5 May 2015)
3. Madhya Pradesh Human Rights Commission 2014 :16. http://www.mphrc.nic.in/WriteReadData/Pdf/Project%20Report%20on% 20Child%20Labour.pdf (D.O.A. 12May 2015)
4. http://www.upgov.nic.in/upinfo/up_eco.html) (DOA 17 April 2015)
5. Children In India 2012- *A Statistical Appraisal* : Social Statistics Division Central Statistics Office Ministry of statistics and Programme Implementation Government of India. http://mospi.nic.in/mospi_new/upload/Children_in_India_2012.pdf

6. Study on "Discrimination of the Girl Child in Uttar Pradesh" , conducted by Social Action Forum for Manav Adhikar. New Delhi. (Page 14) ncw.nic.in/.../discrimination_of_the_ girl_child _ in_ uttar_ pradesh.pdf (DOA 5 May 2015)
7. http://www.census.gov/ipc/prod/wid-9801.pdf# search=% 22 uttar % 20pradesh %20girls% 20complete% 208% 20years%20of%20 schooling%22. (DOA 26 April 2015)
8. *Lucknow City Development Plan 2006 .* lmc.up.nic.in/pdf/ nnfinal.pdf (DOA 30 April 2015)
9. Andall ,Jacqueline. 2000. Gender, Migration and Domestic Service: The Politics of Black Women in Italy. U.K: Ashgate Publishing.
10. Banerjee SR , P.Bharati, T.S.Vasulu , S.Chakrabarty , P. Banerjee.2008. Whole time domestic child labor in metropolitan city of Kolkata. *Indian Pediatrics*; 45: 579-582.
11. Barta, Patrick and Krishna Pokharel. 2009. Megacities Threaten to Choke India. *The Wall Street Journal*. (http://www.wsj.com/ articles/SB124216531392512435)
12. Basu-Mallik, Samit and Soma Basu-Mallik. 2006. *A Study Report on Knowledge, Attitude, Practice on Child Domestic Work with ICDS Functionaries*. Kolkata : Right Track.
13. Boonpala, P. and Kane, J. 2001. *Trafficking of Children: The Problem and Responses Worldwide*. Geneva: ILO-IPEC
14. Blagbrough, Jonathan. 2012. Child Domestic Workers: Protected Persons or ModernDay Slaves? *Global Dialogue*. 14(2).
15. Blagbrough, Jonathan, and Edmund Glynn.1999. Child Domestic Workers: Characteristics of the Modern Slave and Approaches to Ending Such Exploitation. *Childhood* 6 (1).
16. Brown, E. 2007. *The Ties that Bind- Migration and Trafficking of Women and Girls for Sexual Exploitation in Cambodia*. Bangkok: IOM.
17. Castle, S. 1996. The Current and Intergenerational Impact of Child Fostering on Children's Nutritional Status in Rural Mali. *Human Organization*, 55 (2):193–205.

18. Chakravarty,Deepita and Ishita Chakravarty. 2011.Girl Children, Family and Dirty Work: Paid Domestic Service in the Indian State of West Bengal. *CSSSC-UNICEF Social Inclusion Cell. Occassional Paper*, No. 1
19. DSAPK. 2006.*A Report on Study of Migrant Girl Domestic Workers from Tribal Areas of Jharkhand,Chhattisgarh and Orissa*. Pune : Drishti Stree Adhyayan Prabodhan Kendra(DSAPK)p145.
20. Foster, G. 2000. The Capacity of the Extended Family Safety Net for Orphans in Africa, *Psychology Health and Medicine*, 5 (1): 55–63.
21. Ghouse, A.1992. *Street Children of Calcutta*. Noida :National Labour Institute.
22. Goody, E. 1982. *Parenthood and Social Reproduction: Fostering and Occupational Roles in West Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
23. Grier,Beverly.1994. Invisible Hands: The Political Economy of Child Labour in Colonial Zimbabwe 1890-1930. *Journal of Southern African Studies*. 20(1):27-52.
24. Kumar, S . Vijaya. 1992. Children of Darkness. *Man in India*. 72(2) pp 233-237.
25. Madhumati, M. 2013. Migration for Domestic Work – A Case of Female Domestic Workers in Bangalore. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, Vol.2 (1), January.
26. Mehrotra, Surabhi Tandon and Mewa Bharti.2008.. *Rights and Dignity: Women Domestic Workers in Jaipu*r., New Delhi: Jagori (http://www.jagori.org/wp-content/uploads/2006/01/Final_DW_ English _ report_10-8-2011.pdf)
27. Miller, Joanna. The Abuse of Child Domestic Workers: Petites Bonnes in Morocco. *Topical Review Digest:Human Rights in the Middle East and North Africa* http://www.du.edu/korbel/hrhw/ researchdigest/mena/ChildWorkers.pdf. (DOA 21 May 2015)

28. Mishra, Dharmendra Kumar. 2012. Child Rights and Situation of Children in Odisha. *OdishaReview*,July.(http://odisha.gov.in/e-magazine/Orissareview/2012/July/engpdf/14-18.pdf). (DOA 14 May 2015).
29. Mishra D and P. Arora.2007.Domestic Child Labor. *Indian Pediatrician*; 44: 291-292.
30. Mishra, D. 2009. Domestic Child Labor in India – Reasons and Responses.IndianPaediatrics46:p226. http://medind.nic.in/ibv/t09/i3/ibvt09i3p266.pdf (DOA 29 April 2015)
31. Nangia, Sudesh. 1992. *Child Workers in the Carpet Weaving Industry of Jammu and Kashmir*. New Delhi: National Labour Institute.
32. NationalDomesticWorkersMovement.2011.September, www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/Study/NDWM.doc (DOA 22 April 2015)
33. Nayar, Usha.1991. Labour of Indian Girl Child :Multi Curse, Multi Abuse and Multi Neglect. *The Indian Journal of Social Work*. III(1) Jan:pp 37-47.
34. Nieuwenhuys, O.1995.The Domestic Economy and the Exploitation of Children: The Case of Kerala. *International Journal of Children's Rights* 3: 213–25.
35. Press Trust of India.2005. Save Toiling Tykes, Unionize Domestic Help. http://www.expressindia.com/news/fullstory.php? newsid = 45958#compstory (DOA 18 April 2015)
36. Rahman, H.1995. *Child Domestic Workers: Is Servitude the Only Option?* Dhaka: Shoishab Bangladesh.
37. Raghuram, Parvati.2005. Global Maid Trade: Indian Domestic Workers in the Global Market. in Shirlena Huang, Noorashikin Abdul Rahman and Brenda Yeoh (eds*.). Asian Transnational Domestic Workers*. Singapore: Marshall Cavendish. 1–32. A draft version.
38. Rani,D.Lakshmi, Aparna Bhattacharjee and Manabendranath Roy (eds).2005.*Child Domestic work: A Violation of Human Rights- Report on the Legal Position of Child Domestic Workers in India*. New Delhi: Save the Children.

39. Silva-de-Alwis, Rangita de. 2007. Legislative Reform on Child Domestic Labour: A Gender Analysis. UNICEF: Legislative Reform Initiative Paper Series. January. http://www.unicef.org/gender/files/Leg_ Reform _ on _ Child_Domestic_ Labour%281%29.pdf. (DOA 18 April 2015).
40. Social Alert.2000. Estimates cited in *Child Comestic work: A Violation of Human Rights, Report on the legal position of child Domestic workers in India*, Dr.D. Lakshmi Rani and Mr. Manabendranath Roy (eds.) 2005.
41. Subramaniam, Aparna.1991. Work Patterns of the Girl Child. *The Indian Journal of Social Work*. 52(1), Jan. pp49-59.
42. SEWA:2008. *Issues faced by domestic workers: Organizing strategies used by SEWA-Self Employed Women's Association*, A Paper Presentation on the Regional conference on Domestic Workers Asian Domestic Workers Network and Committee of Asian Women on 26-27th August 2008 Bangkok. http://www.abhinavjournal.com/images/Arts_&_Education/Feb13/1.pdf (DOA 2 May 2015)
43. Tandon , Pankhuri.2012. *Domestic Workers: How to Give Them Their Due*. CCS Working Paper No. 278 Summer Research Internship Programme . Centre for Civil Societyhttp://ccs.in/internship_papers/2012/278_domestic-workers_pankhuri-tandon.pdf (DOA 27 April 2015)
44. Tetteh Peace Mamle.2014. Child Domestic Labour In Accra: A Juxtaposition of the Myths with the Reality. *Childhoods Today, Volume 8, Issue 2, 2014.*

Origin And Development of Tabla Baz and Gharana of North-indian Music
[From 18th To 20th Century A.d]

Partha Dey*

In North Indian Music, i.e., in Hindusthani Sangita, the most pouplar drum or percussion instrument in TABLA. It is played to express musical rhythm which is the nucleas of Indian Tala.

Rhythm is a proportion of time inherent in all aspects of nature. In music, rhythm is not only that which beautifies the melody, it is also the vital force in melodic imagination. Thus it has been said that rhythm is the 'pulsation of melody, nay of the universe'. The great poet Rabindranath Tagore, said, "What is rhythm ? It is the movement generated and regulated by harmonious restrictions. This is the creative force in the hand of the artist. So long as words remain in uncadenced prose from, they do not give any lasting feeling of reality. The moment they are taken and put into rhythm they vibrate into a radiance".[1]

Time charged with energy sweeps across endless space, translating all things, from the smallest to the biggest, into rhythmic vibrations. It is not known what the earliest form of express-ing rhythm was. Possibly primitive man discovered rhythm from the movement of his own body, and melody from the varying pilch of his voice. In course of time, his familiarity with rhythm and melody, inherent in all living beings , sharpened his musical sense.

Thus after a checkered career of musical development through centuries, man transformed his sense of rhythm into a Tala and his sense of melody into a Raga or classical melodies both of which are the organised and sophisticated forms of

*Research Scholar, Hindusthani Classical Music, Sangeet Bhavana, Visva-Bharati University.

rhythm and melody respectively Hence, although the rhythmic and melodic expressions are the purpose of Tala and Raga a Tala is much more than what is called rhythm and similarly a Raga is much more than a more Melody.

Time, when measured and marked with a certain number of beats is called a "time-measure". But in India, a Tala is a conditioned time measure. Just like Ragas, there are numerous Talas, under independent names, features and a motive.

A Tala has a disciplined framework and it offers endless possibilities of expressing varied rhythmic ideas through compositions, which may be pre-conceiv-ed or spontaneous or a combination of both-A Tala has several important factors of which a few are explained below:—

a) In every Indian Tala there are a definite number of beats or 'Matras'.

b) Grouping of these beats into Sections called 'Anga' (bar divisions).

c)'The first Matra, called the 'Sam' is the most important Matra, having maximum accent in the Tala-cycle known as the Focal point of the Tala-cycle. The compositions which may start off from any Point of the cycle, though usually from the Sam, But all of them irrespective of their starting points, do end up on the Sam, either delicately and gracefully or with an exciting climax.

d) Similarly, there is a counterbalance in a Tala-cycle, called the Khali, the least accentuated beat. For practical purpose, it only helps to locate the position of the other Angas, and Matras.

e) Avrtti (Cyclic rotation)

f) Finally, the most important factor in a Tala-cycle in the 'Theka' consisting of certain standard and fixed syllables (Bols) which matchingly represent the Tala-cycle. Such syllabic sounds go to make up the language of the Tabla.

Membranophonic syllabus (Bols) of Tabla:

Now, though the pair of the drums (Tabla & Bayan) is considered as one unit or one instrument, independently the

bass drum is called the Bayan or Dagga while the trable drum is called Dahina or Tabla. But the Tabla having more varieties of sound and timbre than its partner, both jointly, is called Tabla.

The ingredients of the small phrases and big compositions are evolved from the following seven basic syllabic sounds,and their fifteen variations. Among the seven basic sound two are from the Bayan, left-hand drum; (1) ghe, open sound. (2) ka or kat, closed sound and five are from the Tabla right-hand drum: (1) na, on the kinar , side: (2) ta, on the. Sur (Lav); (3) di open sound; (4) te, giving the onomatopoeic terekete' and (5) the, a closed sound for dhir-dhir which is produced by the palm. The additional fifteen derivative syllabic sounds of Bols are produced by modulations of these seven sounds. Thus, altogether twenty-two sounds are produced for musical purpose like the twenty-two Srutis, microtonal intervals, in a saptak, gamut of seven notes, in music. Of these twenty-two sounds eight are peoduced by the left hand on the Bayan and fourteen by the Dayan or right hand; and by means of combinations many other interesting sounds are produced. They are numerous syllables / mnemonic-syllables called bols which can also be pronounced orally phonetically like Na, Tu, Tit, Tak, Ghe, Kat and combinations like Dha, Dhet, Dhina, Tereketetak, Dhinegene, Ghentaraan, Dheredherekat etc.(Demonstration).[2]

Syllables having no literal meaning as such, are the raw materials of all types of rhythmic compositions, and they have a life of their own. They have colour, timbre and aesthetic value, and a quailty that comes from association in their use by the great masters of abstract musical language.

If we take a few syllables and put them together in a way, not explicable, they flash into life, and we have not just a syllable sentence but a song, a revelation, a new creation, a joy for ever.

These drum syllables of Tabla have no literal meaning . They are Abstruct yet, with the help of these syllables, great composers have given expression to their rhythmic imaginations, feelings, ideas and thoughts. They created beautiful

compositions of varied designs to finally project in a Tabla Solo recital an animated and magnificent rhythmic mural . The Tabla-maestros in this way created diffent “Gharanas”.

Just as in the field of vocal and instrumental music and also as in Western Classical Music, a galaxy of great composers, of Tabla art, lived during the last 150 to 200 years.

Origin of Tabla playing :[3]

Though there are different opinions as to the origin of the Tabla-playing art. The earliest name available from authentic sources is that of ***Ustad Siddhar Khan*** who lived sometime in the 18th century in ***Delhi***. The earliest of the other available names of great Tabla players, if we go back in an unbroken chronological form, today, would date back to early 18th century.

As far as the usage of Tabla is concerned , we can definitely say that Tabla, as a concert instrument gradually came into prominence in the mid 18th century to provide suitable accomniment to the then newly introduced Noth Indian ‘***Khayal’*** singing introduced by the great composer Sadarang (Niyamat Khan), under the partronage of Mughal emperor of Delhi Muhammed Shah II and Gulam Rasool of Lucknow.However, **Dhrupad** form of classical song used to be the main and popular form of classical vocal music North India, for which accompaniment was provided by the **Pakhawaj** a horizontal double-faced percussion instrument, with a mighty sound.

Tabla has two roles (i) **accompaniment** and (ii) solo. Firstly, it is used is accompaniment to vocal and instrumental music and to Kathak dance , and secondly, it is used for solo performances. Accompaniment, again, is of two kinds (i) Just keeping time (literally) **‘Sath-Sangat’** ; and (ii)Skilful Sangat ‘**Jawabi**- **Sangat’**,the art of accompaniment, in the real sense of the term.

In classical music , whether it is for opera or concert, there are two methods of accompaniment on the drums : (i) well rehearsed; and (ii)unrehearsed. In the case of opera and the

cinema the music is well rehearsed. In a concert hall. However, it may be otherwise . The accompanist sometimes plays with a musician he meets for the first time on the stage. This is truly a crucial trial for the accompanist , for he does not know on which Tala the the song or '**Gat'** composition for instruments is based; nor does he know the tempo and the '**Sam'** . If he fails to identify the Tala and pinpoint the place of the 'Sam' the performance is a failure and such a failure tells upon the prestige of the accompanist, irrespective of the seniority of otherwise of the main artiste.

Then after detecting the appropriate Tala its 'Sam' and the tempo either on his own or by a hint from the main artiste. He has to establish very firmly in the minds of all the rhythmic structure if the melodic composition. Thus he gradually creates confidence in his own mind and then, with feelling of relief. Transmits that confidence to the minds of the main artiste and the audience. There after the performance proceeds smoothly, with appropriate rhythmic embellishments. In the case of North Indian classical vocal music, Khayal , for example, the present trend is to include the '**Alap'** known as '**Vistara'** or elaboration within the frame of the ' **Vilambit'** , (slow) song. Alap is not executed before the actual song composition, as it is done in Dhrupad. Hence the Tabla accompanist is supposed to play, during the **'Vistara'**,only the **Theka** of the necessary Tala, clearly and melodiously but in a subdued manner and with a strong sense of accommodation. This continues until the main artiste steers the movements further. Then, with the slightly faster tempo, the accompanist feels stimulated to play out one or two small rhythmic compositions with a view to keeping pace with the musical need. The vocalist then takes up a **'Drut'** or faster song in the same **Raga** or melody but in a faster tempo, and the accompanist gets a better chance to display his talent and sometimes to allow the vocalist to pause for breath or a short rest, thus enriching the total effect.[4]

Everyone present becomes more attentive when a **Saval-Javab**,[question and answer], takes place. The main artiste, usually an instrumentalist, produces a melodic **Tihai**, or a **Tukda**, or **Chakradar**, and expects the Tabla-player to reproduce the rhythm exactly on his Tabla with identical syncopation paraphrasing, scansion and intomation. The Tabla-player,summoning all his sincerity, ready wit, and other necessary qualities, responds to the challenge, and usually succeeds in full measure ; only rarely does a Tabla-player fails. If, however, the main artiste detects even a single small flaw, he will relish the discomfort of the accompanist . 'Saval-Jawab' is normally found to be one-sided, because it is not customary for the Tabla-player to expect the main artiste to reproduce a **'Tukda'** or an intricate **Chakradar** played on the Tabla. However, from the layman's point of view, it is very interesting and exciting. But on the part of the Tabla-player it is a test of skill and musical intelligane.

The most thrilling section of the whole performance takes place when the Tabla-player is inspired to extemporize in the form of **'Sath Sangat'**. Instead of playing the 'theka' of the Tala being performed, he plays extempore to synchronize with the rhythmic outlines of the various metres being employed by the vocalist or the instrumentalist. But here, especially in North Indian music, both the artistes keep the outline of the Tala cycle in mind and try to outwit each other by way of dodging, hide and seek, surprise cross-rhythm and so or, all without the assistance of any external signals.In south Indian music and dance a third person keeps time either on a pair of cymbals, or by clapping . At times both artistes go far away from the orbit of the Tala cycle and then try to puzzle or confuse each other while keeping the correct tempo and the Tala-cycle in mind , and then both return together exactly on the Sam and reestablish the original pace of the music. A truly exciting moment !

As a solo performing art, the Tabla developed to its highest and most refined stage during the last 100 or at the most 150

years, during which time , thousands of beautiful and brilliant compositions were created by the great Tabla-composers and players. There is a small 'But' which is very significant.[5]

Most of the great composers and players didn't know to read and write. Yet, they learnt, composed and remembered thousands of composition. The dimension of repertoire of the subject developed through group-discussions, competition , challenge posed between the musicians and of course through a lot of intense thinking and research. Quite a lot of these compositions have come down to the North Indian Tabla-players today, mainly through oral-transmission, coupled with **Talim** (Coaching). Many compositions of course have been lost, because they were never written. But the compositions that have survived till today, are so many that it will take generations to learn, digest and assimilate them.

Among the Tabla traditions established in North India, the following are the major schools; **Delhi, Ajrada, Lucknow , Farukhabad** and **Punjab**. Each school or Gharana having its distinctive style and concept has been named after the above mentioned places where the great thinkers/composers lived.

A tabla solo recital is supposed to be performed with a melodic accompaniment provided on a stringed instrument named Sarangi. The Sarangi accompanist steadily repeats the suitable melody called nagma, till the finale od soloist .

A solo performance opens with a short and brilliant composition called **'Mukhda'** or **'Mohra'** which literally means a face or glittering entry piece. This may be followed by a set of other **Mukhdas** just to establish the proper atmosphere/warming up.

Then comes the first introductory section called the '**Peshkar**'. Which is coined from a Persian word '**Pesh-Karna**' (to introduce). The peshkar consists of a few syllables arranged to from a theme or a base of the Tala. The principal syllables, are borrowed from the Bols of the **'Theka'** (the standard set of syllables representing the Tala-cycle). However, with the theme

as a base, the artiste improvises as per his feelings and vision, yet, systematically, sequentially with the same syllables of the theme for quite sometime and then sounds off with a **Tihai** comprising the same syllables. Mush of the **Peshkar** Is improvised spontaneously.

Then the artiste moves to another type of composition called '**Qaide**' (lit.rule). The principle of improvisation though similar to that of the **Peshkar** is much more elaborate because its theme goes on forming various definite shapes termed as **Bal, Pech , Girah , Fanda.**[6]

References:

1. Tagore, Rabindra Nath . (1953). *The Religion of an artist.* (Kolkata,Visva-Bharati Granthana Vibhaga), 18.
2. Ghosh, Pdt.Nikhil. (1968). *The Art and Science of Traditional Tabla Recital.* (Bombay,Sangit Mahabharati), 2-3.
3. Ibid,4-8.
4. Basu, Rathin. (1957). *Sachitra Tabla Siksha*. (Calcutta,Author), 19.
5. Ibid,26.
6. Ghosh, Pdt.Nikhil. (1968). *The Art and Science of Traditional Tabla Recital.* (Bombay,Sangit Mahabharati), 9.

Psychotherapeutic Impact of Rabindrasangeet On Bengali Culture for stress Management

Siddhartha Sankar Deb*

Introduction Music is regarded as the best art of the fine arts. Because Music can take us into a world of serenity and composure taking all the grievances away. For the hectic schedules of modern life stress, anxiety, depression, insomnia, frustration, all these evil forces declare their autocracy over everybody's life. Music has had a tremendous effect on mortals. Music helps to deal with grief sadness, anxiety and anger. Singing regulates, sustains and deepens the breath, increases the sensitivity of auditory system and refines the internal sensing process. Singing can resonate the entire physical body and the electromagnetic field, fully engage the mind, and give the emotions a vehicle for expression and produce an overall sense of wellbeing. All these aspects we can find in Tagore Songs, and they always help in channelizing the mind and body science of human being.

The research started with the hypothesis that as Tagore songs have always been a center of respect and curiosity for the Bengalis. Rabindrasangeet, by its simplicity and melody, has been helping them in a spontaneous leading of life.

The root of the word 'stress' comes from Old French, the language of the Norman Conquest which took place nearly 1,000 years ago, where estresse meant narrowness, straightness or oppression. It is interesting to look at this – the most ancient meaning of the word already implies a force that is pressing or squeezing things into tightness or constriction. How does that

*Research Scholar, Musicology, Rabindrabharati University.

compare with the way we feel when we think about the effects we associate normally with stress? (Harding 2011, 4)

For most of us, that word conjures up pictures of discomfort and pain, trials and tribulations or setbacks and problems. What we are going to explore is the fact that life events are often made worse by stress, so by unlocking and understanding what stress is we can start to understand it and deal with things much more positively. This does not have to be a painful process either; in fact, it can shed light on all aspects of our lives and give us new tools to help ourselves.

The word 'stress' is bandied about in these days, but do we really know what it is? Well, after this journey we will have a much better idea. If we can bring an open mind, a sense of humor and a dose of honest self-observation to this journey, we will really reap the benefits. Firstly why we wants to study stress at all? Stress is a physical and emotional reaction that everyone experiences as he/she encounters changes in life. These changes can have positive or negative effects. Stress has positive effects when it makes us deal constructively with daily problems and meet the challenges. Stress has negative effects when it becomes continuous. Selye (1983) classified four types of stress as – 1. Overstress or Hyper stress, 2. Under stress or Hypo stress, 3. Damaging stress (Distress), 4. Good stress. Well, perhaps because it is a fact of modern life and it affects us all at some time or the other, it's also something that is very personal: it is very easy to go through life on a treadmill, burdened more and more by the build-up of stress, experiencing its effects and feeling powerless to do anything about it. However, we don't need to be at its mercy and we really can help ourselves. If we are willing to take a clear and honest look at our lives and apply some simple principles, then things can really start to change. Change is really at the heart of the picture, and it is a fact of existence that is beyond doubt these days. Whether we consider the environment, work, economics, geography, family life or the

weather, recent world events are showing that change is at work on a scale that is vast and multifaceted. For example, only one generation ago, expectations of a 'job for life' were common and people felt might be over decades. Now it is barely possible to project a year ahead– and perhaps not even that far. Man's adaption to today's environment must be seen from an evolutionary point of view. It took us millions of years of development to become the species we are to-day, and in most of this time the conditions for survival have been quite different than the conditions we meet to-day. The basic requisitions for the survival of our ancestors were mostly of physical nature. To-day's challenges are mostly of psychological nature.

Our emotion or feelings are another aspect of the overall picture of stress, Emotions are literally 'e-motions' or 'energy in motion'; they are powerful and can strongly influence our lives, sometimes bringing change incredibly quickly. People are being hit by waves of change that can seem overwhelming and, again, a sense of powerlessness can bring deep levels of emotional stress. However, change is also exciting and empowering if we can turn our perceptions around.

Stress often feels like something that crushes us, something that presses down on us and makes us feel helpless. Perhaps some of us highlighted emotions, like fear, anxiety, worry; or the effects of stress like feeling breathless, our heart racing or our palms becoming damp. Anxiety is a form of fear that can immobilize a person and totally influence his life. We all feel anxious at times, but usually these feelings pass. A person in a severely anxious state will entirely shift the way they function when faced with the idea that something they dread will happen. All these things help to build up a picture of what stress might look like – and already we can see it is complex. It is not easy to narrow it down. Sometimes it seems to link to emotions, sometimes to effects, sometimes to things from outside us and sometimes to things inside us. In fact, stress is all these things and more – a truly compact idea with many facets.

Stress as a subject is now taking on a different meaning; we know it is a word that is simple to say, but as an idea it already covers many different levels. At this point we need to consider other elements that can be influenced by the impact of stress on our lives. These are called 'lifestyle factors', and they revolve around important areas of our daily existence. Lifestyle factors relate to choices we make on a daily basis about what we eat, drink or take into the body. These factors can be affected by our stress levels because they relate to things we choose to put into our bodies to influence how we feel a racing mind is one of the key sings of mental stress. It means our thoughts are flying through our head at an incredible pace and nothing gets to completion. Mental stress affects us all at one time or another. It is a state where the mind feels totally overloaded and all our usual coping mechanisms seem to disappear, leaving us in a state of confusion and even helplessness. Mental stress is often connected to lifestyle issues around work or family and is accompanied by a -feeling of 'build-up' over time. However, there are ways to cope with these stress patterns to keep a better internal balance. Thought patterns are more like a flood and they do not help us make useful choices. This mental state is often associated with insomnia; the mind cannot switch into sleep mode because it is replaying events over and over. If we are under extreme pressure then it is easy to lose our sense of 'center', a balanced place inside where we feel calm. Listening to proper Rabindrasangeet is very helpful to learn and apply on a regular basis because its therapeutic purpose improves the situation.

Firstly the term 'Psychotherapy' embraces a wide variety of techniques, all of which have the goal of helping emotionally disturbed individual's modify their behavior, so that they can more satisfactorily adjust to the environment. The different branches of Psychotherapy are (1) Psychoanalysis, (2) Behavior therapy, (3) Cognitive behavior therapy, (4) Expressive therapy, etc. 'Music Therapy' comes under 'Expressive Therapy'. It involves "The use of sound and music within an involving relationship between client

and therapist to support and encourage physical, mental, social and emotional wellbeing" (Bunt, 1994.) This is called 'Music Therapy'.

Now a day's people in many parts of world are using music for therapeutic purpose. Researchers are working a lot on the effectively of this therapy. The quality of our voice can be a reflection of our emotional, physical and spiritual condition, which revitalize our internal organs and our endocrine gland. And its pros are already used for the welfare of human being. And we can see the positive result that those who are using these therapies seem to be cured farther than normal. The use of music for treatment is known as Music therapy all over the world. In India also therapists are studying the subject to use it properly. And some positive results have already come out.

Music gives wanderings to human life. And its pleasing tune releases a person from all the worries and anxieties and connects him with the divinity or spirituality. In everyday life we come across a lot of problems. But that problematic and hectic life can be changed to a heavenly and peaceful life by the help of music. We, the human beings always like to fantasize and are fond of art and aesthetic. And music is the device to express our expression.

Music has the potential to influence us both psychologically and physiologically, it is an important area of therapy for stress management. Music therapy can make use of biofeedback, it can reduce tension and facilitate the relaxation response. It may be more compatible with relaxation than verbal stimuli, which may be distracting – music is processed mainly in –nonverbal area of the brain. Music may help people to identify and express the feelings associated with their stress.

From the ancient age Bengalis are known to be culturally rich because they are famous for their art and culture. In this cultural atmosphere the creative songs of Rabindranath play a vital part tounderstand the Bengali culture. Though 21 st century witnesses the introduction of a number of music forms, Tagore songs continue to be a subject of priority for the Bengalis. The

work –of Rabindranath gives a new identity to the Bengali community. Tagore Songs have left a permanent mark in the hearts of Bengalis. As in Bengali culture the lyrics and tune of his songs plays a significant role. So the songs of -Tagore stand as cultural milestone to every Bengali. For the Bengali community, Tagore's songs will always be an ideal, in comparison to other Bengali songs. As Rabindranath is an idealistic figure to the Bengalis and his created pieces of art an asset to them. So it is true that Rabindrasangeet and Bengalis are bound in a strong, deep bond from where they get their inspiration to life.

Tagore Songs have strong therapeutic value. The three aspects of music are its Tune, Rhythm and the Lyrics. The Tune helps in relaxing and realizing one's own self and to slowly unbind oneself from the aliments of mind and body, the Rhythm helps in body movements which rejuvenate the mind and Lyrics unfold repressed wishes and desires.

For the destruction of stress of all kinds and for the proper constructiveness of modern man's competitive mechanical life the therapeutic value of Tagore Song's is increasing day by day. Tagore songs have acquired an extraordinary position in the mindset of the Bengalis. And hardly any other form of music can describe their mental setup better than Rabindrasangeet. In 'Sangeetchinta' and 'Jibonsmriti' Gurudev Rabindranath expressed many musical and philosophical opinion to relate about our daily lines. Rabindranath expressed his personal outlook towards life through his songs which now finds relevance even in our contemporary lives.

The efficacy of Music Therapy depends on appropriate choice and application of music and rhythm. Therapeutic application of Tagore songs depends on the mental state of the individual. For example, the well-known song 'Prano bhariye trisha horiye more aro aro dao pran' filling the heart and quenching the thirst give me more and more life and another popular song 'Jodi tor dhak sune keu na ashe tobe ekla cholo re' means If no

one responds to your call then proceed alone can work as an antidote for a depressed mind. Besides most of his songs are related to our daily lives to motivate our emotion and mental stress. These songs are like-

1. ‘Nai nai voy, hobe hobe joy, khule jabe eai dar’ means we, at this point of time, are victims of stress and stress related problems. For example, we suffer from depression and withdrawal symptoms. And this song is intimately connected with these problems. Its essence is the message we have to conquer our fears, we have to overcome our familial fears. The poet invokes us to come out of this sphere of problems.

2. ‘Hobe joy, hobe joy, hobe joy re, ohe bir he nirvoy.’ This song is address to cope with our tiredness and depression. In fact, each and every time of this song helps us to overcome our stress and despair. The inner message of the song in question is the following: we have to be fearless and victorious, only then love, life and power will strengthen us and our existence and will help us in battling the adversities of life

3. ‘Bipode more rokhya koro ea nohe mor prarthona.’ This song is highly relevant, it tells us not to depend on prayers and consolation. It tells us to cultivate the power of the heart, learn politeness, recognize the role of power to identify sorrow, danger, loss and inspire the inner desires. The poet say he is not seeking relief from mental stress, from pain in losing near and dear ones, financial problems, professional pressures, problems in family life. The poet says he does not want to evade or avoid these negatives. In fact, on the contrary, he seeks the help of this song to pare the reality and, seeks courage to battle the negatives.

4. ‘Moder jemon khela temni je kaj janish ne ki vai.’ People often adopt a middle way to seek release from stress. We shall discuses here the problem of apathy towards work. The poet tells us not to any fear connected with work but to enjoy work as play. We should think we are engaged in play while laboring. At present, we are victims of mental problems related to our work

and profession. From this emanates various complex problems which affect our daily routine. It could often lead to indifference to work we have to conquer this negative aspect.

5. 'Jodi tor dak sune keu na ashe tobe ekla cholo re.' This song conveys the following message. A therapist should identify the depression, anxiety and withdrawal symptom and say that we are not born to become failures. Rather, he should be guided by the inner light and glow which will bring success to him.

After analyzing these songs, we find that if we feel and try to realize our lives very minutely then we enjoy our life to the fullest. In the present globalized world, we are leading a very mechanical life. To overcome this we can take the help of music. And for the Bengalis Rabindrasangeet plays a vital role. Tagore wrote his songs to depict his realizations from life. And without any hesitation we say to what great extent conscious and sensible he was towards life. In 'Sangeetchinta' the poet says that "Chirokalei ganer sur amar mone ekta onirbochoniyo abeg upostit kore. Ekhono – kajkormer majkhane hotath ekta gan sunile amar kache ekmuhurtei somosto songsarer vabantor hoiya jay. Ei somosto chokhe dhekar rajjyo gane sonar modhyo diya hotath ekta ki nuton ortho lav kore."[1]

It means that Tagore song has the power to create joy and it also connects us to infinite divinity. At the same time we can take Rabindrasangeet as a source of inspiration in our busy daily life. The creativity in Tagore's song has always been infusing the Bengali emotion. Tagore has realized the facts of day to day life and composed his songs with his own life experience. In 'Sangeetchinta' the poet also says that "Amader kache amader protidiner songsarta thik samonjosyomoy noy - Tar kono tuchho ongsho hoyto oporimito boro khudatrisna, jhaghrajhati, aram-beyaram, tukitaki, khutinati, khitimiti eiguli bortyoman muhurtoke kontokito kore tulche, kintu sangeet tar nijer vitorkar sundor samonjoshyer dara muhurter modhye jeno ki ek mohomontre somosto songsartike emon ekti perspective er modhye dar koray

jekhane or khudro khonosthayi osamonjoshyogulo ar chokhe pore na."[2]

Besides, if producing music in an improvisational way, and discussing pieces of music and lyrics in a group, in that case Rabindrasangeet can also help us become more aware of our emotional reactions and encourage us to share constructively with the group. Therefore we realize that music can be taken as igniting power in mind. And it also produces a meditative effect on our polluted hectic life.

In 21st century the popularity of Rabindrasangeet is increasing above the expectation level. It implies that the present generation is also getting fascinated by Rabindrasangeet gradually. Apart from the tune, lyrics, rhythm, Rabindrasangeet has also become an indispensable part of Bengali culture. People can easily get over their gloom, melancholy, grief through the mesmerizing tune of Rabindrasangeet. In 'Sangeetchinta' the poet says that "Sangeeter moto emon ashchorjyo indrojal bidhya jagate ar kichui nei, e ek nuton sristikorta. Ami to vebe paine Sangeet ekta nuton mayajagat srishti kore na puraton jagater ontorotomo oporup nityo rajyo udghatito kore dey. Gan provriti kotokguli jinis ache ja manushke ei kota bole je, 'Tomora jagoter sokol jiniske jotoei poriskar budhigomyo korte chesta koro na keno er aasol jinishta onirbochoniyo, ebong tarei songe amader mormer mormantik jog, tarei jonnye amader eto dukhyo, eto sukh, eto bekulota."[3]

Conclusion In the end, this journey is about US, It allows us to think about things such as, Why do We act like this? How do We want to be seen? How do We want to live our life? Do we want to be a puppet on strings pulled by stress, or do We want to take a good look at ourselves and find out how We can make things better? We decide, We choose. We may be surprise at how much pleasure We have while We find out. It means Bengalis can get all the answers to the problems of life in Rabindrasangeet and it works as an unstoppable inspiring source which gives fuel to the lives of the Bengalis.

End Notes: -

1. Rabindranath Thakur, Sangeetchinta (Culcutta: Visha bharati Granthan Bivag, Ograhayan, 1393), 175.
2. Ibid, 191.
3. Ibid, 192.

Reference:

1. Carnegie, Dale. How to Stop Worrying and start living. New Delhi: Arnold Helineman, 1982.
2. Chapra, Dr. H. K. Lifestyle & Health. New Delhi: Sterling Publishers, 2006.
3. Harding, Jennie. Stress Management. London: British Library Cataloguing Publication, 2011.
4. Mukhopaddhay, Provatkumar. Gitobitan Kalanukromik Suchi. Kolkata: Tagore Research Institute. 25 Se boishak, 1385.
5. Mukhopaddhay, Provatkumar. Rabindra Jiboni prothom khando. Culcutta: Visha bharati Granthan Bivag. Ograhayan, 1392.
6. Nalapat, Suvarna. Music Therapy. New Delhi: Readworthy Publication, 2008
7. Thakur, Rabindranath. Sangeetchinta. Culcutta: Visha bharati Granthan Bivag. Ograhayan, 1393.
8. Thakur, Rabindranath. Jibonsmriti. Culcutta: Visha bharati Granthan Bivag. Ograhayan, 1398.

Labour Politics

Kashi Nath Mahaldar

Why a Particular is Called Laborer? When Mankind itself is Laborer! The word labor means workforce and which turned into a very crucial word in our society. We all work, we all effort to accomplish our tasks. But why we particularize in the name of labour (*workforce*) to a class or a man as labourer? While mankind itself is labourer. I'm going through a few steps to annoyance your brain.

A man in nature is labour. A man born and brought up like a labour, working for nature. He earns and he waits for fruits get ripe through his own labour, sometimes against nature and sometimes for nature.

Man is a part of nature, it is sure, similarly, labour is a part of mankind and labor is a natural to you, you cannot eschew it.

And remember, to be laborer, One has to be laborious, and to be laborious, one has to be laborer first (*Laborer, One who works for body or fame*) either mental or physical labourer.

But questions is that labourer are unskilled worker, earn daily using their body instead of brain, in this manner , you defined and classified a class or group of man as a labourer. Isn't it?

But who does not earn daily, per day? I mean, Who does not calculate their income per day, daily? The man who works as a scientist or president!

Then, why? They retire after a limited and calculated days? Then Why they are paid calculating days? The only difference is rate which you have right to made, giving the common worker the title, where you Don't allow them to make any right of them because of your critical knowledge.

Yes! Scientist do not retires but he or she has to invent or mend the theory or has to vomits his experience till death

*Prose Writer

laboriously day and night because of his scientific knowledge which needs only mental labour.

Again let me explain the term ‘unskilled’ which is used in the definition. You called them unskilled, but Are they really unskilled?

No! They are not unskill! They are skilful enough,

How?

You can questions. Look, An Engineer or a driver, or a player are skilled, they go through a course, it’s true. Who said the primary worker do not ? but we fails to see that! If a man don’t have skill to dig the crust, or if a man don’t have skill of carrying loads on his head,

Do you engaged them to your work?

Skill is everywhere, in the works of everybody. Do you think only they have workforce, labor , by which they perform a task, then why an Healthy Engineer cannot do the same work who has enough workforce? Because he has workforce but not skillful on that particular works which the man has. All are skillful in their field, but the difference is the field of taking course of skill.

Here all labors for wages, and the only difference is levels of rate of wages. The primary worker works much get less wages and after that you underestimate them giving a title laborer as you are Hawk, sitting top of the Tree, busy to make differentiation according your own interest.

And good laborers are sometimes rewarded , either he works in the field or parliament with fame and popularity.

We all are laborers. If you don’t know this , you should discuss it with your wife, if you are married. Women are always good laborers, they cannot avoids it a little but it is sure they cannot tolerate the word labourer because it seems to underestimate them. If she doesn’t know, she is ignorant or innocent. She should know how much she has to labour in a day!

Again let me remind the term laborer, the term is a noun which means someone who works with their hands or one who uses his body instead of brain to earn wages.

You know, she, I mean your wife, makes you awake; she makes foods for you, as early as possible. She is always busy, day and night, for your needs —busy with husband and sons. She does everything with the help of her hands and brain, then, Is she laborer ? Laborer uses hands and body to earn according the dictionaries, instead of brain. But question is that only using brain , can any work be performed without bodily effort? Or any task can be performed with bodily effort without using brain? Certainly! no.

When you cannot make yourself awake after the alarm of wife, you shake your body just in couch, then you wife, late night-slept wife keep busy herself for your office foods or school foods for your sons. She always thinks of needs, your own needs. Not labour! She works with her work force timely. Here she knows her responsibilities. And to perform these responsibilities need both brain and bodily labour. When she make you awake , she uses brain, when she cooks foods , standing alone in a small kitchen room, she uses hands , means body …and brain when she mixes spices. That means one has to uses both body and brain in the same time to cook.

One day I ask an educated young lady of 34,

Are you labourer?

She replied, what! Are you mad!

After that I don't dare to ask any questions on that day. But I know about her, she does every day the said works. Then who is labourer? They man who works in the field only?

Again in the next day, I asked her another question, who does your household works?

She replied, 'Definitely me"

Then I threw another question, who according you is laborer?

"One who works for wages" ————she replied.

I asked, Do you work for wages?

"wives doesn't work for wages" ———she replied hurriedly and went away.

But really wives do not work for wages!

She uses both body and brain as the man or woman who works hourly to earn. She mentally accepts herself, she is the workforce of the family, but when one calls her laborer, she gets angry, but She does not know what I am doing is labour too , if her husband would keep a woman to do all the tasks, she does every day, she surely would introduces her as a laborer or servant of the house to her guests.

(*Again, I am saying same thing,)* She sends you office, she sends your sons schools, take cares your old busy parents, and cook your arrival foods, night foods, and household works. In between them, she does beauty herself otherwise you will not take her to the parties or cinema hall. If she one day forgets to iron your shirt, you don't care to slap or rebuke her. And this slapping needs labour.

But why one slaps or rebuke to spouse ? And you say! What happens when your mate get satisfied with your works? I think he or she rewards you?

But why the word reward or rebuke or slapping comes between the two most sweet relation? Because the relationship is conditional, depends on needs of each other.

If you keep a man or woman instead her , you call her or him a labourer or labour, but she or he too is a wife or husband of someone and she or he begins to depend upon your wages and his bodily works, but here everybody depends on each other, dependency is chained in our society.

Again, the term, labour and laborer may mean different to you. Labour is noun and verb both but laborer is only noun. If you go to works in NASA as a scientist, they will pay you hourly or par day or per month or year. But to get payment you are selling your labour. There you labor laboriously day and night to performs a task, and your labour makes you socially difference in our society but what makes you socially difference is labour . And you labored for the wages not immediately but surely.

But The man who works in NASA and who works in field both uses workforce, both uses brain.

How both uses brain?

The Scientist from early of his life struggling laboriously to invent something or recreate something, using various theory, similarly a Man who works in the field has been practising the technique of his works from early of his life with the help of workforce and brain. Level of brain is different, level of labour is different, but each labors ————————Do you think laborer don't have brain?

Do You Think scientist does not labour?

No. isn't it?

An engineer study hard to get theory through bookish knowledge and apply it , advice it to the primary workers. And the primary workers who always practically efforts to work through the advice of an engineer as he never went through the books. Similarly, Engineer can't not work the works of primary workers as he never went through the course of his works. but both laboring in two different field for body and fame, both same; mankind. Weapon (*labor)* of both is same.

Again, Struggling is not labour but to struggle one need labor. Here everybody struggling—struggling for existence, in more specifically, the politicians are struggling to snatch the seats, the business men are struggling to profit more, but you don't compare with farmers, they struggle too —————struggle with nature— natural hazards to protect your Banquet. But their struggle is always laborious. They are the wives of mankind. They are close more close to nature. They like wives makes foods , cooks for you, sends it for you, after that ,they are deprived sections, you say, you name them according your pleasure, you say sometimes, underestimating them, laborers or sometimes mistaking and make you so! Ask him how painful it is, to hear.

Again who works in the construction building, you call them labourer but — Are they only labourer or hard worker working for wages daily ? you don't labour ! Think! Sometimes they too take their wages at the end of week or month and sometimes a

professor too take their wages daily, when the works for one day. You can question ——— How?

Think, when a professor go to the University to examine the answer sheet or when he guards in any competitive exam, he calculates his wages of his labour per day, daily. Isn't it?

Busyness is not labour. Cops keep themselves busy, ministers keep themselves busy, they are busiest, they can't give time to their dear one even but they are busy but what make them busy is labor. They themselves call this "We are Busy, I 'm busy" these frequently use term I heard myself.

You name a person labourer, in exchange of money or dollar, your own laborer, you say proudly! Labour is not work ! Here everybody works, but everybody is not called laborer or laborious.

why?

You broadly can divide labor into two ————mental labour and physical labour.

But what is mental labor?

First let me say, what we accept here is mentally, definitely by here I means in the earth. If I say, I study, I teach, I talk , I deliver speech, and all these cost energy but we don't say energy is labor, labour always cost energy too,——

But do you think?

Talking, studying, teaching are laborious?

Yes, these are. These are Mental labors. In mental labour , we give labour to think, to talk, isn't it?

But how you make one understand that you are mentally laborious?

If you make understand , Then everybody laborer, the mad who singing is laborious, the boy who playing sick and hide is laborious. Will you accept it ? Again I am warning you, energy is not labor, we know, without energy, there is no shape of labor. But energy is not labor. we can do work energetically, laboriously,

Then what is labour?

We say, The labour is the effort by which we perform a particular task. But eating, drinking, sitting, everywhere needs

efforts , then these are labor! Then why an intellectual old man uses “I feel pain when I sit in arm chair” instead of the word labour? Because he lakes labour (*workforce)* and gets hurt. And again we use laborer as a name of working people. But the question is that, here every body works, everybody performs, and then why a particular is called laborer?

Then what we understand by Laborer?

Performance of task or working people?

Once, I ask a business man, what do you understand by labour?

He replied “daily worker”

Then I threw another questions to him, what do you understand by laborious?

He said, “one who works hard”

Again I threw a next questions, ————Do you work daily? But unfortunately he cannot give me response because of the arrival of the train. But my intelligent readers know what could be his response. ..

Who does not work every day?

Likes wives, like farmers everybody uses their workforce, their efforts, everybody labors, every day.

Then, only hard working people are laborious?

And, one who daily works is laborer?

Is it?

Again, Intelligence is not labour but intelligent person is laborer or laborer. To be intelligent you have to laborious. The difference between ‘laborer’ and ‘laborious’ is noun and adjective. You know but you don’t know what is, You too a laborer, either mental laborer or physical laborer. The people who works physically, be tired physically and one who works mentally, he be tired mentally. But remember both the labors make you tired and cost your energy.

Actually, after all, we are all laborers, either physically or mentally… but what is the problem is that, we cannot tolerate the word ‘laborer’ mentally.

When one calls us laborer, we cannot swallow it.

One day, mine a friend, Roma went to the Burdwan University for attested but she came back being insulted because the officer was busy and he entered into the office and requested him thrice for attested her documents, when she third time made the request, he shouted at him—"Do think I'm labourer!!" in English and all others men who were working beside the officer desk, began to chuckle at her. Why he shouted? Because he has to be laborious more than before to do the extra work (*attested*).

And this mental labors (*Shouting)* costs his energy. He labors to shout. He labors to work there, but he being labourer is not ready to endure the word 'laborer' when he is called a laborer.

Again, can't stop to say myself, a few writers , social writers of India, are very much conscious about the term labour and politics under it in their writing, but problem is their private life and real life, not writing, they are conservative in nature but in artificially they are against social torture of division and underestimation. Look, when those writers are printing something, dived deeply into it but they cannot stop there themselves from true, And when he or she engage a man to prune his or her garden. He use mentally the term labour instead of his good name. And while one man is engaged to prone garden, he or she round many a time during the man's labour (pruning) to watch , for watching he or she has to cost labour not less than the man who pruning (*according his level of daily labors*). But he being conscious of his own labor, he cannot express it the man but to his spouse. As, if he express his own feeling to him, he thinks I am underestimating myself, I too labour not in his type but type.

If a economical man go to a primary worker to labors for him, he carries reporter with him or pre-papered himself announcing but it is knowing unknown that all primary workers always labor to make stomach satisfied of the mankind. Their announce is unheard, their labor continue for the sake of mankind

and artificial man's labour is for announcing death, But the lazy class always run after artificiality, they give importance on virtual reality rather than reality and differentiation. They try minutely differentiate mankind. The true hearts who working in factory or field or constructions are called labour or laborer but they don't fear or don't care or perhaps cannot care of their poor rate of income or system created by those uplift men.

We find in Tagore,

(চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে-জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীর নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে-উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।)

"There have always been one group of unseen people in society, their number is always greater, they are the carriers; they have no time to evolve as humans; they live off what their country throws away. They eat the least, they have the least to call their own, they learn less than all the others and they look after the rest; their labour is the greatest as is their misfortune. They die of disease at the slightest excuse, or of starvation and their mistreatment at the hands of those who are above them – they are deprived of every kind of comfort one needs in life. They are the stands upon which the lamp of civilization is placed, standing straight with the flame held above them – they ensure that everyone above receives light while they are covered in the drips of oil."

রাশিয়ার চিঠি
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

In Rabindranath Tagore, the Nobel laureate, we find many broad and open writing about the socially deprived section but I don't find anywhere like APJ Abdul Kalam and his family. Kalam in his Autobiography, "Wings of Fire" wrote , "I do not recall the

exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together" but Tagore don't have instances like him.

But Tagore by "unseen people in society" classified and underestimated them and named them according his pleasure and interest it seems that he sympathising them but true is he labored for own, underestimating them as "unseen people in society"

If we ourselves cannot make our hearts alerts that we are labour of nature or laborer in nature, and slave of labour, our classifications, differentiation and underestimations and deprivations will increase itself day to day.

But what should we remember is, the word labor is an inseparable part of our life. G.B. Shaw in his essay "Freedom" wrote, **" ...we are slave to necessities"** we easily swallow it "slave to necessities" but can't Swallow the Word 'laborer'. Being fully conscious of our daily labour to satisfy our stomach daily, we are unable to sallow the word , labour or labourer in case of us but what we call easily to the primary worker because we, when increase our knowledge or health power or wealth , we begin to underestimate them who works under us because of their high availability and give wages and name of them according our own pleasure and interest. Actually, we are always busy to be socially classified, forgetting our continuous labour , being laborer. Here every body labors and the type of labors of each can be different but workforce (*which I mean ability to do a particular task*) is always same. But we can't swallow it, the word labourer.

(Again, being everybody labour, we cannot marks everybody labour or labourer, if it is expose to our dear wives, engineers, doctors, scientists and players labourer (etc) so, they will think they are made fool like them who works in the construction buildings or fields and will not be encouraged to do such difficult tasks as only earning large amount of money is not enough,

look, to-days there is so many easy and escaped ways by which we can earn money enough and they will not take steps forward making life mechanical device.)

This creates difference of opinion and difference of social class. Force us to call our laborious sister who sweeps your floor, a laborer, our laborious brother who cultivates your banquet, a labourer, but cannot think labor is effort, instead, we make him or her a class, laborer. We forget, we all laborers, and we are all "Slave of nature", because here everybody efforts, labors or uses workforce resolutely to make our stomach satisfied.

"Labour is blossoming or dancing where
The body is not bruised to pleasure soul"
—-W. B Yeats

Kajoli in 'So Many Hungers' By Bhabani Bhattacharya

Amit Kumar De*

Bhabani Bhattacharya is an outstanding Indo-Anglian novelist of the present times. He has written both fictional and non fictional works but he is best known for his novels which have received highest critical acclaim in India and abroad. He is a social realist. He went on to produce such literary master pieces as so many Hungers (1947) Music for Mohini (1952), He who Rides a Tiger (1954), A Goddess Named Gold (1960), Shadow From Ladakh (1966) and Dream in Hawaii (1978).

All the novels of Bhattacharya present a true picture of the problems of contemporary India society. Sudhakar Joshi feels "His novels have a penetrating and sympathetic analyses of the simple but unsurmountable problems in Indian life. His themes general revolve round poverty, hunger, pestilence, traditionalism, caste system, Industrialization and the resulting controversy of Gandhian pan aches versus rapid industrialization".

Bhabani Bhattacharya is a writer with a missionary zeal. His novels give us a glimpse of his personality, his awareness of the human predicament, his interest in what goes on in the inner chamber of the human mind and his philosophy of moderation and compromise. This article shows how Bhabani Bhattacharya portrays the picture of Indian women characters who seem to be at wars with both self and the society.'

In his first novel, Bhattacharya deals with the famine in Bengal. As Balaram S. Sort writes 'In so many Hungers, Bhattacharya synthesizes the old and the new value through

*Research Scholar, F. M. University, Ballasore.

different sets of character and episodes. The stories of the Basu family in Calcutta and Kajoli's family in Baruni project his belief that life is all compromise and there can, never the less, be unity in diversity."

When the story begins Kajoli is an innocent rustic girl of fourteen. She lives in her ancestral mud-and-thatch house along with her mother and a Younger brother, Onu, aged ten or eleven. Her father and an elder brother, Kanu are in the prison.

Bhattacharya very strongly expresses his intimate knowledge of village life. In this novel he has shown how the villagers of Baruni lead their simple but dignified life. Kajoli does not forget the old customs of India then Rahoul arrives at the house in the company of Devesh Basu whom the villagers call him 'Devata' out of love and respect. He is a retired teacher. He is an earnest follower of Gandhji. He often shares their plain meal consisting of " Steamed rice and lentils, a pinch of salt and a lemon, some baked sweet potato and a vegetable curry of sorts and perhaps some thickened milk in a small brass by way of luxury" Kajoli shows her due respect and admiration to Rahoul by removing the shoes from his feet, pouring cold water on the feet and washing off the dust. Rahoul is embarrassed. Devata reminds him that Kajolis is 'a well bred peasant girl with a legacy of manners as old as India." Here Bhattacharya delineates the social picture of the so called aristocratic people like Basu, Mukherjee, Bhattacharya, Chatterjee etc. how they receive the respect from the poor peasant girl of rural Bengal. Bhattacharya, by name a Bengali Brahmin likes up the social issues of caste system traditional of Hindu society. "Human relationship here implies family relationship Kajoli misses her father and elder brother. She is moved by the parental love for Devesh Basu and brotherly affection for Rahoul. Kajoli expresses respect, love, anxiety, ambition and wonder for them.

Another important feature of Bhattacharya's art of characterization is that his women characters belong to a

particular class in which they have wonderful fighting spirit. Hunger uprooted millions of peasants from their soil. Most of the hungry rural people rush to the big cities. In the country side they catch the fish crabs and figs and the roots to eat in the city they are completed to catch the rats to survive. The garbage cans become their food bowls in the city. Hungers makes them very weak. They are unable to protect themselves from the wild animals.

"A woman lay stretched by the trunk, groaning, while a Jackal crouched and ate her body. The Jackal saw Kajoli, grunted and slunk off unhurried."

Kajoli never imagines what danger lives before her. There are another type of hunger, hunger for sex appears when one night during their journey for Calcutta Kajoli is raped by a soldier in the meadows. The soldier is a pray to sex. But he does not lose his humanity, he takes Kajoli and her family to Calcutta, in an ambulance and admit her in a hospital. Here Kajoli can not save her chastity for two reasons, firstly as she is pregnant she is too weak to fight or run and secondly it is hunger which makes her helpless. In order to get some more bread for her mother and brother she offers her body to the soldier's hunger for sex. Kajoli's mother is happy that Kajoli is at least gets food in the hospital. But in spirit she is pure.

Kajoli recovers her strength to fight against the poverty which is prevalent every where. Through Kajoli Bhattacharja shows that poverty hunger can not degrade the true human spirit. Kajoli suffers terribly. At last her soul has been awakened and she has progressed from spiritual darkness to light when she feels that the purity can not be restored and she decides to sell herself for the sake of her mother and brother.

Bhattacharya had no use for "art for art's sake" and firmly believed that art should be for life's sake. Art should not keep away from life and its problems, rather it should deal with such problems, focus attention on them and thus provoke thinking, so that the problems concerned may be tackled and solved.

Through Kajoli’s character Bhattacharya shows the wretched condition of the contemporary Indian society. Bhattacharya writes, “The need for self expression could be as strong as other needs…. for food, for sleep, for women.” Kajoli devours the bread offered by an Indian soldier without thinking about her starving younger brother. This shows that “Self preservation is great in man when a person is on the verge of death, he knows no human relations.”

In this novel through Kajoli’s character Bhattacharya has mentioned Indian spirit and though in his novels there was a greatt impact of Mahatma Gandhi and Tagore. Like them the main purpose of Bhattacharya is to depict the India of tomorrow as strong, self sufficient and spiritually great Bhattacharya dreams of a socialistic society for India. In his novels he firmly shows equality and justice for all. In So Many Hungers Kajoli respects Deveta because through his character the novelist focuses the quit India movement the other phases of National movement, such as the civil Disobedience movement and re breaking of the salt law.

Bhattacharya’s realism has made of Kajoli a pregnant figure, but her rate in the total design of the novel is nevertheless a subsidiary one. She becomes the symbol of human love. In her complexity he stands for all men. She suffers deeply in badly and mind in the middle reach of her life but she never loses her courage and honesty. Through her character, Bhattacharya shows that he is a serious observer of life. The novelist is strongly conscious about social affairs and has deep concern for the suffering humanity, Kajoli, who is on the verge of her personal degradation” responds to her inner voice and chooses the right path. Through her character Bhattacharya attacks the British government for their negligence and condemns the British administration for its different attitude towards Bengal in the economic crisis.

References :

1. Bhattacharya, Bhabani, So Many Hungers, New Delhi : Orient Paper backs, 1978.
2. Sorot Balaram S. The Novel of Bhabani Bhattacharya.
3. Dr. B. Syamalarao: Bhabani Bhattacharya and his works.
4. Monika Gupta: The novels of Bhabani Bhattacharya.
5. Ram Sewak Singh: Bhabani Bhattacharya, A Novelist of Dreamy Wisdom.
6. Narendrapratap Singh: Social criticism in the novels of Bhabani Bhattacharya.
7. G. Rai: Bhabani Bhattacharya, A study of his novels.Papers, Ph.D. thesis paper on A.K. Mukherjee, Amaravati University, I.G. Purohit: Sourashtra University, Meenakshi Tewari: Kumaun University.

‘এবং প্রান্তিক’ প্রকাশনীর প্রবন্ধ গ্রন্থ :

চিনব নূতন করে

বিভাবসু দত্ত

জগতের আনন্দভুবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতি এতটাই বিঘোষিত, যে ‘বিপরীতের বাস্তব’ খোলা মনে পড়া হয়ে ওঠেনি আজও। সেই রবি-সৃষ্টিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। আজীবন সৃষ্টির আনন্দে মাতোয়ারা কবির বিচিত্রগামী বিচরণকে লেখক রামধনুর রঙে মেলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। চিরপরিচিত গান, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস আক্ষরিক অর্থেই আমাদের নতুন করে চিনিয়েছেন, শুনতে পেয়েছি রবি-সৃষ্টির অন্তরালে সংগুপ্ত থাকা অন্তঃস্বর। আকাশে ছড়িয়ে পড়া আলোর মতোই আমাদের চেতনার বলয়কে অনুভববেদ্য করে তোলে রচনাগুলির বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রসাহিত্যের রহস্যময় ভুবনপরিক্রমার সার্থক সৃষ্টিলোক ‘চিনব নূতন করে’ গ্রন্থটির জাদুভাষা নির্মিত হয়েছে। এ জাদুভাষা কখনো রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে, কখনো রবীন্দ্র-নাটক নিয়ে আবার কখনো ‘গোরা’র মতো মহাকাব্যিক উপন্যাস নিয়ে একান্ত স্বাদু, রমণীয় ও রূপবান গদ্যে বিস্তার লাভ করেছে। চিন্তাকে উপযুক্ত অবয়ব দানের মতো দুরূহকর্ম অবলীলায় সমাধা করেছেন লেখক তাঁর দার্শনিক মনোভঙ্গির সাহায্যে। রবীন্দ্র বিশ্বদর্শনের একটি মানচিত্র হয়ে থাকল এ গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলি।

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

http://ebongprantik.wordpress.com/
www.ebongprantik.in

₹ 250/-

Ebong Prantik
2348487X

Published By : Ashis Roy, Vill - Bhagwanpur, P.O. - B.H.U, Varanasi - 221005, Uttar Pradesh &
Debasish Roy, Kestopur Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 102
Ph : 9804923182, 9332358644
Email : ashis.jibonda.roy@gmail.com